মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল

হযরত আবু বকর (রা)

আধুনিক প্রকাশনী

হযরত আবু বকর

রাদিয়াল্লাহু আনহু

সিদ্দীকে আকবর

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী, দু'জনের দ্বিতীয়জন–
প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যথাযোগ্য জীবন চরিত

মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল

অনুবাদ ঃ এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১৭১

২য় প্রকাশ (১ম সংস্করণ)

রবিউল আউয়াল	১৪২১
আষাঢ়	১৪০৭
জুন	২০০০

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

HAZRAT ABU BAKAR (R)-SIDDIKE AKBAR by Mohammad Hossain Haykal. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane , Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 7115191

Price : Taka 170.00 Only.

www.pathagar.com

মিসরের প্রখ্যাত লেখক ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, জামাল আবদুন নাসেরের এক কালের একান্ত সহচর ও মন্ত্রীসভার সদস্য পরে রোষানলে পতিত, জনাব মোহাম্মদ হুসাইন হাইকলের অনবদ্য গ্রন্থ "হযরত আবু বকর" রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি অনুপম জীবনী গ্রন্থ। ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট বেলা থেকে শুরু করে তাঁর রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন বিধৃত হয়েছে এতে। একজন ব্যক্তি, একজন ব্যবসায়ী, ইসলাম গ্রহণকারী একজন বয়স্ক প্রথম মুসলমান, রাসূলের একজন নিত্য সহচর, প্রথম খলিফা—খলিফাতুর রাসূল হিসাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমগ্র জীবনের উপর এ ধরনের যথাযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় এর আগে এভাবে রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মুহ্তারাম হুসাইন হায়কল এ বিরল জীবনি গ্রন্থটি রচনা করে নিসন্দেহে একটি বিরল ও সর্বোত্তম খেদমত সম্পাদন করেছেন। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ইনকিলাবের যে জাগরণ উঠেছে —গোটা বিশ্বের মুসলিম যুব চিন্তা-চেতনা যেভাবে আজ ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনার জন্য অতীতের ইতিহাস পাঠের দিকে উদগ্র বাসনা নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে—সে প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর অমর চির উজ্জ্বল ইতিহাস তাদেরকে সাহায্য যোগাবে সবচেয়ে বেশী।

এই বইটি অনুবাদ করেছেন সুসাহিত্যিক ও বহু গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক জনাব এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। আশা করি ইসলামী ইনকিলাবের পতাকাবাহী বাংলা ভাষাভাষী মুজাহিদ ও পাঠকদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে। আর এটা হলেই আমরা সুখী ও সার্থক। মহান আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হউন।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম কথা ১৫

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে
আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ৩৪

প্রাথমিক জীবন ৩৪

বংশ পরিচয় ৩৪

নাম, পদবী ও ডাকনাম ৩৫

শৈশব ও যৌবনকাল ৩৬

পেশা, অবয়ব, গঠন ও চরিত্র ৩৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক ৩৭

ইসলাম গ্রহণ ৩৮

নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করার কারণ ৩৯

ঈমানী সাহসিকতা ৪০

দীনের প্রাথমিক খাদেমদের একজন ৪০

গরীব-দুঃখী ও মজলুমের সাহায্য ৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগিতা ৪২

'মেরাজের' ঘটনা ৪২

'মেরাজের' পরে ৪৩

অসহায় মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ ৪৪

হিযরতের প্রস্তুতি ও হিযরত ৪৫

গাওরে সাওরে ভীরিত কারণ ৪৬

মদীনায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ৪৭

ঈমানের মর্যাদা ৪৮

রোমীয়দের বিজয়লাভের ভবিষ্যত বাণী ৫০

বদরের যুদ্ধ ৫১

বদরের বন্দীদের সম্পর্কে সুপারিশ ৫৩

বদরের যুদ্ধের পরে ৫৪

ওহোদের যুদ্ধ ৫৪

হুদাইবিয়ার সন্ধি ৫৫

আমীরুল হজ্জ ৫৭

বিদায় হজ্জ ৫৭

নামায পড়াবার নির্দেশ ৫৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে
আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫৯

www.pathagar.com

২. খেলাফতের বাইয়াত ৬১

রাসূলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ৬১

আবু বকরের সংযম ৬৩

খেলাফতের সমস্যা ৬৩

আনসার ও মুহাজিরদের মতভেদ ৬৩

সাকিফায়ে বনি সায়েদা ৬৬

আনসারদের প্রথম দুর্বলতা ৬৭

আওস ও খাযরাজের ঝগড়া ৬৮

মদীনাবাসীদের ঐক্য ৬৯

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দার আলাপ ৬৯

ওমর ও আবু বকরের সাকিফায় উপস্থিতি ৭০

সাকিফায় বনি সায়েদার বৈঠকের গুরুত্ব ৭১

সাকিফায় আবু বকরের ভাষণ ৭২

কোনো কোনো আনসারের বিরোধিতা ৭৩

হাব্বাব বিন মানজার আনসারী ৭৪

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণ ৭৫

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হাব্বাবের বিতর্ক ৭৫

কিছু মুনাফিকের কারসাজী ৭৬

বশির বিন সায়াদের ভাষণ ৭৬

আবু বকরের হাতে ওমর ও আবু ওয়ায়দার বাইয়াত ৭৭

বশির বিন সায়াদ ও অন্যান্য আনসারদের বাইয়াত ৭৮

বাইয়াত গ্রহণে সায়াদ বিন ওবায়দার অস্বীকৃতি ৭৮

বাইয়াতের উপর আনসারদের দৃঢ়তা ৮০

মসজিদে নববীতে সাধারণ বাইয়াত ৮১

খেলাফতের প্রথম ভাষণ ৮২

কিছু বড় বড় মুহাজির বাইয়াত গ্রহণ করেননি ৮২

বিরোধিদের সম্মেলন ৮৩

বায়াত অস্বীকারের বিখ্যাত বর্ণনা ৮৬

নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বসম্মত বর্ণনা ৮৭

আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত সম্পর্কে মধ্যপন্থী রায় ৮৭

বনু উমাইয়ার ফেতনার চেষ্টা ৮৮

পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী ৯০

আবু বকরের শান্তিপূর্ণ খেলাফত ৯১

খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা ৯১

ইসলামের শাসনব্যবস্থা ৯২

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় আরবের অবস্থা ৯৩

ধর্ম ত্যাগের দ্বারপ্রান্তে মক্কাবাসী	৯৩
ধর্ম ত্যাগের ফেতনা ও সাকিফ বংশ	৯৪
অন্যান্য আরব গোত্রের কর্মপদ্ধতি	৯৪
বিদ্রোহ ও ধর্ম ত্যাগের কারণসমূহ	৯৫
ভৌগলিক কারণ	৯৬
বৈদেশিক কারণ	৯৬
যাকাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি	৯৭
মিথ্যা নবীদের আবির্ভাব	৯৮
আসওয়াদে উনসির নৈরাজ্য	৯৯
ইয়ামেনে আসাদের ফেতনা	১০০
ফেতনার শুরু	১০১
উনসির ফেতনার কারণসমূহ	১০১
ফেতনার মুকাবিলা	১০২
আসওয়াদে উনসির প্রতিনিধি	১০২
উনসির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	১০৩
আসওয়াদের হত্যা	১০৪
দক্ষিণ আরবে বিদ্রোহ	১০৫
মুসাইলামার নবুয়াত দাবী	১০৬
রাসূলুল্লাহর কৌশলী পদক্ষেপ	১০৭
আরব ও ধর্ম ত্যাগীদের ফেতনা	১০৮
মিথ্যা নবী দাবীদারদের সাময়িক সফলতা	১০৯
ধর্ম ত্যাগের কলহ ও প্রাচ্যবিদগণ	১১০
ধর্ম ত্যাগের বাইরের হস্তক্ষেপ	১১১
৪. উসামার যুদ্ধ যাত্রা	**১১২**
প্রথম খলিফার প্রথম নির্দেশ	১১২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াত	১১৩
উসামার সাথে রাসূলের ভালবাসা	১১৩
উসামার অধিনায়কত্বে আপত্তি	১১৩
আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসম্মতি	১১৫
বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ	১১৬
বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি	১১৭
বাহিনীর উদ্দেশ্যে উপদেশ	১১৭
বালকার দিকে সেনাবাহিনীর যাত্রা	১১৮
উসামার সফল প্রত্যাবর্তন	১১৮
উসামার বাহিনীর অভ্যর্থনা	১১৯

www.pathagar.com

৫. যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ ১২১
মদীনায় বিদ্রোহের খবর ১২১
সাহাবীদের সাথে পরামর্শ ১২২
শত্রু গোত্রের প্রতিনিধি দল ১২৩
প্রতিনিধি দলের নিরাশ ফেরত ১২৪
আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপদেশ ১২৪
আবু বকরের শাসনামলের প্রথম ঘটনা ১২৪
জিল কিসসা ও বদরের যুদ্ধের সাদৃশ্য ১২৬
আবু বকরের দৃঢ়তা ১২৬
সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণ ১২৭
বাইরের মুসলমানদের যাকাত আদায় ১২৮
সিরিয়া হতে উসামার প্রত্যাবর্তন ১২৯
পুনরায় যুদ্ধ ১২৯
পরাজিত গোত্রগুলোর আচরণ ১৩০

৬. ধর্ম ত্যাগীদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি ১৩২
যুদ্ধের প্রস্তুতি ১৩২
মদীনায় অবস্থানের কারণ ১৩৪
মুহাজিরদের নেতৃত্বের কারণ ১৩৪
জাতীয়তার উর্ধে আবু বকর ১৩৫
খালিদ বিন ওয়ালীদ ১৩৬
ধর্ম ত্যাগীদের প্রতি শেষ আহ্বান ১৩৮
ধর্ম ত্যাগীদের নামে চিঠি ১৩৯
হেদায়াতের প্রচেষ্টা ১৪০
সর্বোত্তম রাজনীতির নিদর্শন ১৪০
ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধগুলোর গুরুত্ব ১৪১

৭. তোলাইহার ও বাজাখার যুদ্ধ ১৪৩
তোলাইহার নবুওয়াতের দাবী ১৪৩
মিথ্যা নবীদের দমন ও জাররারের অভিযান ১৪৫
ওয়াইনাহ ও তোলাইহার ঐক্য ১৪৫
ধর্ম ত্যাগীদের প্রতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হুশিয়ারী ১৪৬
আদীর প্রানান্তকর প্রচেষ্টা ১৪৬
বনু তায়ের পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ১৪৭
মুকাবিলার জন্য তোলাইহার উপর চাপ ১৪৮
তোলাইহার বিরুদ্ধে অভিযান ১৪৯
মুসলমানদের উদ্বিগ্নতা ১৪৯

www.pathagar.com

বনু তায়ের দুঃখ প্রকাশ	১৫০
তোলাইহার সাথে যুদ্ধ ও তার পলায়ন	১৫০
পুনরায় তোলাইহার ইসলাম গ্রহণ	১৫২
অন্যান্য ধর্ম ত্যাগীদের দমন	১৫৩
অবশিষ্ট ধর্ম ত্যাগী গোত্র	১৫৩
হত্যাকারীদের উপর খালিদের কঠোরতা	১৫৪
খালিদের কর্মকাণ্ডে আবু বকরের সন্তুষ্টি	১৫৫
ধর্ম ত্যাগীদের প্রতি আবু বকরের অনুকম্পা	১৫৫
কোররা বিন হোবাইরা	১৫৬
আলকামা বিন আলাসা	১৫৭
ফুজায়াহ আইয়াস	১৫৭
আবু শাজারাহ	১৫৭
উম্মে জুমালের আবির্ভাব	১৫৮
উম্মে জুমালের পরাজয় বরণ	১৬০
দক্ষিণাঞ্চলের ধর্ম ত্যাগীরা	১৬০
৮. সাজাহ ও মালিক বিন নুবিরা	**১৬২**
বনু আমের ও তাদের বাসস্থান	১৬২
যাকাতদানে অস্বীকৃতি	১৬২
সাজাহর তামিমে আগমন	১৬৩
সাজাহর আগমনের উদ্দেশ্য	১৬৩
বনু তামিমের কার্যক্রম	১৬৪
সাজাহ ও মালিক বিন নুবীরা	১৬৪
মালিক বিন নুবীরার বৈশিষ্ট্য	১৬৫
সাজাহর পরাজয়	১৬৬
সাজাহ ও মুসাইলামার বিয়ে	১৬৭
সাজাহর মোহরানা	১৬৭
মালিকের উদ্বিগ্নতা	১৬৮
খালিদের বাতাহা অভিযান	১৬৯
জাতির সাথে মালিকের পরামর্শ	১৭০
মালিক বিন নুবিরার গ্রেফতারী	১৭১
মালিকের হত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা	১৭১
খালিদের উপর আবু কাতাদার অসন্তুষ্টি	১৭৪
খালিদকে মদীনায় তলব	১৭৬
খালিদের ব্যাপারে ওমরের পদক্ষেপ	১৭৭
খালিদের ব্যাপারে আবু বকরের দৃষ্টিভঙ্গি	১৭৭
ইয়ামামার উপর খালিদের আক্রমণ	১৭৮

www.pathagar.com

৯. ইয়ামামার যুদ্ধ	১৮০
মুসাইলামার বিরুদ্ধে খালিদের অভিযান	১৮০
মুসলমানদের অপূর্ব বিজয়	১৮০
ইকরামার পরাজয়	১৮১
মুসাইলামার শক্তির উৎস	১৮২
মুসাইলামার প্রতি আনুগত্যের কারণ	১৮৩
শোরহাবিলের পরাজয়	১৮৪
খালিদের সাথে মোজায়ার যুদ্ধ	১৮৫
খালিদ মুসাইলামার যুদ্ধ	১৮৬
মুসাইলামার পুত্রের অগ্নিঝরা ভাষণ	১৮৬
মুসলমানদের উপর বনু হানিফার চাপ	১৮৭
নাহারুর রেজালকে হত্যা	১৮৭
খালিদের রণ কৌশল	১৮৭
মুজাহিদদের অটুট মনোবল ও দৃঢ়তা	১৮৮
মুসাইলামার হত্যার পেছনে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু	১৯০
মুসাইলামার পলায়ন	১৯০
বাগান অবরোধ	১৯১
বনু হানিফার হত্যা	১৯২
মুসাইলামার হত্যা	১৯২
পলায়নপরদের ধাওয়া ও অবরোধ	১৯৩
সন্ধির প্রস্তাব	১৯৩
মোজায়ার চালবাজী	১৯৪
খালিদ ও বনু হানিফার সন্ধি	১৯৪
আবু বকরের নিকট বনু হানিফা	১৯৫
মোজায়ার ধোঁকা ও খালিদের সন্ধি	১৯৫
বনু হানিফার নিহতদের সংখ্যা	১৯৬
মুসলমান শহীদদের সংখ্যা	১৯৬
মুসলমানদের শোকের ছায়া	১৯৬
মোজায়ার কন্যার সাথে খালিদের বিয়ে	১৯৭
এ বিয়েতে আবু বকরের অসন্তুষ্টি	১৯৭
১০. ধর্ম ত্যাগের অন্যান্য যুদ্ধ	১৯৯
বাহরাইন, ওমান, মোহরা, ইয়েমেন, কান্দাহ এবং হাজরামাউত	১৯৯
বিদ্রোহে অটল ঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ	১৯৯
দক্ষিণ আরবে ইরানী প্রভাব প্রতিপত্তি	২০০
সামরিক তৎপরতার সূচনা	২০১

www.pathagar.com

বাহরাইনের ধর্ম ত্যাগের সূচনা	২০২
আলা বিন হাজরামীর অভিযান	২০৩
বাহরাইনের ধর্ম ত্যাগীদের পরাজয়	২০৩
দারাইনে পলাতকদের আশ্রয় গ্রহণ	২০৪
দারাইন বিজয়	২০৪
বাহরাইনে আলীর প্রত্যাবর্তন	২০৫
ইরাক অভিযান	২০৬
আম্মানে যুদ্ধ-বিগ্রহ	২০৬
আম্মানে ধর্ম ত্যাগের মূল নায়ক	২০৬
মুসলমানদের বিজয়	২০৭
মোহরার যুদ্ধ	২০৮
ইয়েমেনে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা	২০৮
ইয়েমেনে বিদ্রোহের কারণ	২০৯
ইয়েমেন বিদ্রোহের প্রথম কারণ	২০৯
আসওয়াদের পর তার সহযোগীদের তৎপরতা	২১০
বিদ্রোহের দ্বিতীয় কারণ	২১১
কায়েসের ফেতনা	২১১
আসওয়াদ সহযোগীদের নিকট কায়েসের সাহায্য প্রার্থনা	২১২
ওয়াজদিয়াকে হত্যা	২১২
কায়েসের সানয়া নিয়ন্ত্রণ	২১২
আবনাসীদের সাথে কায়েসের আচরণ	২১৩
কায়েসের পরাজয়	২১৩
ইয়েমেন ও হিজাজের আত্মকলহ	২১৪
ওমর বিন মায়াদী কারবের বিদ্রোহ	২১৪
ইয়েমেনে ইকরামা ও মুহাজির	২১৪
কায়েস ও ওমরের মধ্যে মতভেদ	২১৫
কায়েস ও ওমরের গ্রেফতারী	২১৫
আবু বকরের অনুকম্পা	২১৫
ইয়েমেনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান	২১৬
ইরানীদের সাহায্যের কারণ	২১৬
কান্দা ও হাজরামাউতের যুদ্ধ বিগ্রহ	২১৭
মুহাজিরের কান্দাহর শাসক হবার ঘটনা	২১৭
কান্দাহরবাসীর ধর্মত্যাগ	২১৭
মুসলমানদের সাথে আশআছের যুদ্ধ	২১৮
ইকরামা ও মুহাজিরের কান্দায় যাত্রা	২১৮
বখায়ের দুর্গ অবরোধ	২১৯

www.pathagar.com

নিজ গোত্রের সাথে আশআছের বিশ্বাসঘাতকতা ২১৯
আশআছের মদীনা যাত্রা ২২০
আশআছকে আবু বকরের ক্ষমা ২২১
হাজরামাউত ও কান্দায় নিরাপত্তা বিধানস্থাপন ২২২
ইয়েমেনের শাসক হিসেবে মুহাজির ২২৩
নোমানের কন্যার সাথে ইকরামার বিয়ে ২২৩
আবর বিদ্রোহের চির অবসান ২২৩
ভবিষ্যত পদক্ষেপ ২২৪

১১. ইসলামী জয়যাত্রার সূচনা ২২৫
আরবের উত্তর সীমান্ত ২২৫
সিরিয়ার উসর মরুতে বসতিস্থাপন ২২৫
আরবীয় জীবনযাপনের সাথে সম্পর্ক ২২৭
ইরান ও রোম সম্পর্কের ধরণ ২২৮
ইসলামী বিজয়ের পটভূমি ২৩১
হিরার বাদশাহগণ ২৩২
খৃষ্টধর্ম ২৩৩
লাখমী ও গাসসানীরা উন্নতির তুঙ্গে ২৩৫
হিরার সুলতানাতের অন্তিমকাল ২৩৭
গাসসানী সুলতানাতের শেষ সময় ২৩৮
রোম ও ইরানের হামলা ২৩৯
আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদক্ষেপ ২৪০
মুসান্না বিন হারেছা ও ইরাক ২৪৪

১২. ইরাক বিজয় ২৫০
খালিদের ইরাক যাত্রা ২৫০
হরমুজের সাথে মুকাবিলা ২৫২
মাজারের যুদ্ধ ২৫৬
ওয়ালজার যুদ্ধ ২৫৮
ইল্লিসের যুদ্ধ ২৫৯
হিরা ২৬৩
সরদাররা জিজিয়া দিতে রাজী হলো ২৬৬
আম্বারের যুদ্ধ ২৭০
আইনুত তামার ২৭০
দাওমাতুল জুন্দুল ২৭২
খালিদের ইরাক প্রত্যাবর্তন ২৭৬

www.pathagar.com

হোসাইদ, খানাফিস ও মুদিহর হামলা ২৭৭
ফারাজ বিজয় ২৭৮
খালিদের গোপন হজ্জ ২৮০

১৩. সিরিয়ায় হামলার কারণ **২৮৩**
রোমকদের উদ্বিগ্নতা ২৮৩
উভয় পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি ২৮৫
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যস্ততা ও দায়িত্ব ২৮৮
জিহাদ ও গানিমাত ২৯২
সিরিয়া যাত্রার প্রস্তুতি ২৯৩

১৪. সিরিয়া বিজয় **২৯৮**
ইসলামী বাহিনীর অগ্রাভিযান ২৯৮
ইসলামী বাহিনীর যাত্রা ২৯৯
ইয়ারমুক ঃ রোমক বাহিনীর আক্রমণ ৩০৪
সিরিয়াভিমুখে খালিদের যাত্রা ৩০৭
যুদ্ধের সূচনা ৩১৯
ইয়ারমুক বিজয় ৩২১
সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা ৩২৫

১৫. ইরাকে মুসান্না **৩৩৬**
ইরাকে মুসান্নার সমস্যা ৩৩৬
দ্বিতীয়বার ইরানের পশ্চাদাপসরণ ৩৩৮

১৬. কুরআন সংকলন **৩৪১**
ইয়ামামার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ৩৪১
ওমরের পরামর্শ ৩৪২
অন্যান্য বর্ণনা ৩৪৪
কুরআন একত্র করার সময়কাল ৩৪৫
ওসমানের যুগে কুরআন সংগ্রহ ৩৫২
ইবনে মাসউদের দ্বিমত পোষণ ৩৫৩
যায়েদের কর্মপদ্ধতি ৩৫৭
সূরার ক্রমবিন্যাস ৩৫৯
কুরআন সংকলন সম্পন্ন ৩৬১
আবু বকরের সর্বোত্তম অবদান ৩৬২

১৭. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল **৩৬৪**
খেলাফতের ধারণা ৩৬৬

www.pathagar.com

ওমরের লকব	৩৬৬
আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা	৩৬৭
মুহাজির, আনসার ও খেলাফত	৩৬৯
ইসলামে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা	৩৭১
আবু বকর ও আরবের রাজনৈতিক ঐক্য	৩৭৫
ইসলামী শক্তির উৎস	৩৭৭
আবু বকরের শাসনব্যবস্থা	৩৭৯
১৮. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল	**৩৮৩**
মৃত্যু সংক্রান্ত বর্ণনা	৩৮৪
স্থলাভিষিক্তের ব্যাপার	৩৮৪
আত্মসমালোচনা	৩৯২
ভাতা ফেরত দেয়া	৩৯৩
কাফন দাফনের ওসিয়্যাত	৩৯৫
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল	৩৯৬
শেষ কথা	**৪০১**

www.pathagar.com

প্রথম কথা

ইসলামী বিশ্বের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা হতে মদীনায় হিযরত ও সেখানে বসবাস আরম্ভ করার পর থেকেই শুরু হয়েছে। এ বিখ্যাত ঘটনাকেই ইসলামী ইতিহাসের প্রারম্ভ ধরা হয়। কারণ, এ সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সঠিক উন্নতি ও অগ্রগতি শুরু হয়েছে। আর এ সময় থেকেই মূলতঃ আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা বিশেষভাবে শুরু হয়েছে। একাধারে তের বছর পর্যন্ত ইসলামের ঘোর বিরোধিতা করেও যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, তখন মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্তে একমত হলো। কিন্তু এবারও তাদেরকে পরিপূর্ণ ব্যর্থতা বরণ করে নিতে হলো। এ ঘোর কঠিন সময়ে একমাত্র হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে পরিগণিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ ঘটনার দশ বছর পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত—নামাযের ইমামতি করতে মসজিদে তশরীফ আনতে পারছেন না ; তখন তাঁর পরিবর্তে তিনি যাঁকে ইমামতির জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু। এ সৌভাগ্য হযরত ওমরের ন্যায় মর্যাদাশালী সাহাবারও হয়নি।

হিজরাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে কেন সাথী নির্বাচন করেছিলেন এবং মৃত্যু শয্যায় নামায পড়াবার জন্য কেন তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বেশ সুস্পষ্ট। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম রাসূলের রিসালাতের উপর ঈমান এনেছিলেন। সত্য দ্বীনের জন্য স্বীয় জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে দেবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সকলের শীর্ষে। ইসলাম গ্রহণ করার দিন থেকে শুরু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বরাবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য, দীনের প্রচার এবং কাফেরদের নির্যাতন নিষ্পেষণের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীকে তিনি দিতেন সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার। তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি তাঁর পাশে থেকে কাফেরদের মুকাবিলা করতেন। অতীব বলিষ্ঠ ঈমান ছাড়াও তাঁর সুমধুর চরিত্রও ছিল অত্যন্ত উন্নত। এ উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। প্রতিটি মুসলমান অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন তাঁকে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীনি মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি মানুষের সীমাহীন আস্থার কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর স্থলাভিষিক্তের প্রশ্নে মানুষের দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হয়েছিল। আর

www.pathagar.com

সকলেই একমতে তাঁকেই প্রথম খলিফা হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি তাঁর স্বল্পতম খিলাফত আমলে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। তাঁর খেলাফতকালেই ইসলামী শাসনের সূচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে এ শাসন বিশ্বের অনেক অংশকে তার আওতার মধ্যে এনে দিয়েছে। এ বিশাল রাষ্ট্রের সীমা একদিকে এশিয়ার হিন্দুস্তান ও চীন পর্যন্ত ও অপরদিকে ইউরোপের স্পেন ও ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মানব সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ রাষ্ট্রীয় শাসনামল যে অবদান রেখেছে তা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত অমর অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকবে। আমার রচিত গ্রন্থ "হায়াতে মোহাম্মদী" ও "মানজালুল ওহী" রচনা হতে অবসর হবার পর ইসলামী শাসনামলের ইতিহাস, এর উন্নতি ও অবনতির কারণ সম্পর্কে কিছু গবেষণামূলক লেখার বাসনাও মনে জাগে। এ বাসনা আরো তীব্র হলো এ কারণে যে, এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফসল। মানবতার অস্তিত্ব ও তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজীরবিহীন শিক্ষা পেশ করেছেন, আর তারই কারণে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এ শিক্ষার ফলেই আমরা আজ বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিবিধ সোপান দেখতে পাই।

প্রকৃতপক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। একটাকে আর একটা হতে পৃথক করা যায় না। কোনো জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করার জন্য তার অতীতের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করা ছাড়া আর কোনো উত্তম পন্থা নেই। জাতির মধ্যে যেসব ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্যও অতীত দিনের প্রতি তাকিয়ে বর্তমানকাল দ্বারা তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা চালাতে হয়। একজন রোগীর রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসার জন্য যেমন রোগীর পূর্বাবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি একটি জাতির বর্তমানের জন্যও এর পূর্বাবস্থা তথা অতীত জানা থাকা প্রয়োজন। মুসলমানদের আজ অবনতির যুগ। যে জাতি শতাব্দির পর শতাব্দি সুখ্যাতির সাথে বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশে রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনা করেছে, তাঁরা আজ লাঞ্ছনার গহীন গহ্বরে নিপতিত। আজ চৌদ্দশত বছর আগেকার কার্যক্রম ও ঘটনাবলীর প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যেসব কারণ আমাদের অবনতির জন্য দায়ী, তা তালাশ করে বের করে দূর করতে হবে। আর যে পথে আমরা আমাদের হৃত সুনাম-সুখ্যাতি ফিরে পেতে পারি তা খুঁজে বের করতে হবে।

এসব চিন্তা-ভাবনায় আমি যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, সে সময় আমার রচিত গ্রন্থ "হায়াতে মোহাম্মদী" পড়ে কিছু পাঠক-এ ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা ও আল্লাহর মর্যাদাশালী বান্দাদের জীবন চরিত রচনার জন্য আমাকে বার বার বলতে থাকেন। আমিওআগ থেকেই তা ভেবেছিলাম। তাই বন্ধুদের অনুরোধ আমার উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে দিলো। এ কাজ আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং জ্ঞান সমৃদ্ধ লোকের প্রয়োজন জেনেও আমি অবশেষে এ কাজে হাত দিলাম।

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে তো অনেক গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনাবলী বিভিন্ন সাহাবীগণ লিখেছেন। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো জীবন চরিত বর্তমান ছিল না। এ কারণেই আমি তাঁর জীবন চরিত রচনার প্রতিই বেশী মনোযোগ দিলাম। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যাত জীবনের প্রথম নিবেদিত বন্ধু ও পরিপূর্ণ অনুসারী। অপরিসীম দয়ালু ও অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া লাখো মুসলমান তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে গর্বের কারণ বলে মনে করেন। হযরত আবু বকর সে ভাগ্যবান ব্যক্তি; যাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো। ধর্মদ্রোহীদের হাতে যখন ইসলামের কঠিনতম অবস্থা বিরাজ করছিলো, সে সময় একমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যক্তিত্বই মুসলমানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের উপর সামরিক তৎপরতা চালিয়ে তিনি যে বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, তার প্রভাব আজও বিশ্ব জাতির মন থেকে মুছে যেতে পারেনি। তাই এ গ্রন্থে আমি যা কিছু বর্ণনা করবো, তা শুধু সিরাত ও জীবনীর সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এসব হবে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের সূচনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাল থেকেই শুরু হয়েছে।

এ পূত-পবিত্র ও স্বর্ণযুগের যেসব ঘটনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই তা খুবই বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক। এসব ঘটনাবলী থেকে হযরত সিদ্দীকে আকবরের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বিভিন্ন উজ্জ্বল দিক আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। একদিকে দুঃখী ও নিঃস্ব মানুষের জন্য সত্যের পতাকাবাহী এ মানুষটিকে সবসময় উদগ্রীব থাকতে দেখা যায়। মনে হয়, এমন সংবেদনশীল ও পরোপকারী মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ হবে না। অপরদিকে আল্লাহর বাণীকে উজ্জীবিত করে তোলার ও ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় বহন করার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যেতেন তিনি। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাঁকে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। দৃঢ়তা ও সংকল্পে অবিচল। এ বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথেও অপরিচিত। মানুষের সুপ্ত গুণের বিকাশ ঘটিয়ে তাদের থেকে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে কাজ আদায় করে নেবার মেধার মালিকও ছিলেন তিনি।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর একজন খাটি প্রেমিকের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরাইশবাসীর অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, সে সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের মুকাবিলায় বুক টান করে এসে সামনে দাঁড়াতেন। রাসূলের দাওয়াতে যে ব্যক্তি

২—

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম "লাব্বাইকা" বলেছিলেন, তিনি এই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুই ছিলেন। হিজরতের ভয়াবহ ও কঠিন সময়ে গারে সাওর থেকে শুরু করে মদীনা পর্যন্ত দীর্ঘ পথের নিবেদিত সাথী ছিলেন এ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুই। মদীনায় ইহুদী চক্রান্ত ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মক্কার কুরাইশদের অবিরত হীন কারসাজীতে যখন গোটা আরব উঠে পড়ে লেগেছিল সে ঘোর দুর্দিনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুই রাসূলে কারীমের খাস পরামর্শদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করার ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে চিরদিন যে সেবা করেছেন, তা শুধু স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে না বরং প্রতিটি কাজই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট হবে। প্রকৃত কথা হলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উন্নত মর্যাদা ও চরিত্র লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহর কালেমাকে উড্ডীন করার জন্য যে ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের সাথে। আর এটা শুধু আল্লাহই অবহিত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনে ইসলাম ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অকৃত্রিম ভালবাসা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তা বাহ্য দৃষ্টির তুলনায় অন্তর দৃষ্টিতে কত গভীর ছিল এবং তার আভ্যন্তরীণ ইখলাস, বাহ্যিক ইখলাস থেকে কত নিগূঢ় ও নিবিড় ছিল তা শুধু আল্লাহরই জানা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালে যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল, তা থেকে তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবের ধর্মত্যাগীদের সংকট থেকে উদ্ধার পাবার পর যখন তিনি ইরান ও রোমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, তখন এ দু' রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে ইসলামের সাম্য ও মৈত্রির অমোঘ হাতিয়ার প্রয়োগ করেন। যে সাম্য মৈত্রীকে ইসলাম মূলনীতি হিসাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিল। ইরানী ও রোমক শাসক শক্তি এ অস্ত্রের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। ইরান ও রোমীয় জনগণ ব্যক্তি শাসনের যাঁতাকালে যে সময় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল প্রজা সাধারণকে ; গোত্রীয় পার্থক্যের অভিশাপের শৃংখলে আবদ্ধ ছিল জনমানুষ ; শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীকে নিজেদের চেয়ে হীন, বরং অচ্ছুত বলে মনে করতো এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই তাদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো, ঠিক এ সময়েই ইসলাম ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও সাম্যের বাণী উড্ডীন করে তোলে। ইরান ও রোমে বাহিনী প্রেরণ করার সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেনাপতিদেরকে বিশেষ উপদেশ দিয়ে বলে দিয়েছেন, সর্বাবস্থায় ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ঝাণ্ডাকে আকড়িয়ে থাকবে। বিজিত দেশে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সাম্যের আচরণ প্রদর্শন করবে। যেসব লোক যুগ যুগ ধরে অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যনীতির শিকারে পরিণত হয়ে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো, আজ তারা ইসলামের

www.pathagar.com

ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও সাম্যের আচরণ দেখে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। এসব শাসকরা পর্যন্ত সামরিক শক্তির অধিকারী এবং বিরাট বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর মালিক হওয়া সত্বেও মুসলমানদের সাথে পরাজয় বরণ করতে শুরু করলো। যুলুম, শোষণ ও দমননীতি অবলম্বনকারী শাসক যত শক্তিশালীই হোক না। হোক না তার বাহিনী খুব সুশৃংখল। তারপরও এরা ও জাতির মুকাবিলা করতে পারে না, যে জাতি ইনসাফ ও ন্যায়নীতির শুধু পতাকাবাহীই নয় বরং তাদের জীবন এ ছাঁচেই ঢেলে গড়া হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এ জীবন পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে হযরত আবু বকরই বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন।

রেসালতের কালের সাথে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগ সংযোজিত হবার কারণে হযরত আবু বকরের শাসনামল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বাহক ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কাল ছিলো ইরশাদ ও ইসলাহর সময়কাল। তাঁর কালে শরীয়ত নাযিল হচ্ছিলো। বান্দাহর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একের পর এক হুকুম আসছিলো। এর বিপরীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামল ছিলো সংগঠিত। এ সময় নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য নীতিমালা ও আইন-কানুন ঠিক করা ও বিভিন্ন বিভাগ কায়েম করা হচ্ছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আমল ছিলো ঐ দু'টি আমলের মধ্যবর্তি কষ্টিপাথর। ওখানে ঐসব অসাধারণ অবস্থার কারণে, যা সে সময় সংগঠিত হয়েছিলো ঐ দু' অবস্থা থেকে ভিন্ন ছিল।

অতি অল্প সময়ের খেলাফত আমলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যেসব সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠার উপক্রম হয়েছিলো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে আরব ঐক্যে বিচ্ছিন্নতার আলামত দেখা যেতে লাগলো। তিনি যা দীর্ঘ তেইশ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ জীবনকালেই বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততার নমুনা দেখা যেতে শুরু করেছিলো। ইয়ামামায় মুসাইলামা বিন হাবিব কাজ্জাব নবুয়াতের দাবী করে দূত মারফত তাকেও নবুয়তে অংশীদার বানাবার ও অর্ধেক আরব ভূখণ্ড তাকে দেবার জন্য রাসূলুল্লাহর কাছে পাঠিয়েছিলো পয়গাম।

মুসাইলামার দেখাদেখি আসওয়াদে উনসিও বনে বসলো নবী। যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে সে ইয়ামেনবাসীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে লাগলো। কিছু শক্তি সঞ্চয় করে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলো। সে রাসূলুল্লাহর গভর্নরদেরকে ওখান থেকে বের করে দিয়ে নিজের রাজত্ব কায়েম করে বসলো। এরপর নাজরানের দিকে অগ্রসর হয়ে ওখানেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে নিলো। এ অবস্থা দেখে রাসূলে মাকবুলকে বাধ্য হয়েই ওখানে ওদের দমনের জন্য বাহিনী পাঠাতে হলো। মূলকথা আরবরা যদিও তাওহীদের সমর্থক বনে গিয়েছিলো, মূর্তিপূজাও ছেড়ে দিয়েছিলো তারা, কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি যে, দীনি ঐক্য ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ঐক্য এক সূত্রে গাঁথা। আর ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই ছিলো মদীনার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাছে আনুগত্যের মাথা নত করা। আরববাসীরা স্বেচ্ছাচারী ধরনের মানুষ ছিলো। কোনো সুশৃংখল শাসনের কাছে মাথা নত করা এবং হৃদয়-মন দিয়ে তাদের কথা মেনে নেয়া ছিলো তাদের ধাচের বাইরে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পাবার সাথে সাথেই আরবের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম ত্যাগ করলো। মদীনার প্রশাসনের আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

বিদ্রোহের এ কলহ দাবানলের মতো আরবের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। মদীনায় এসে এ খবর পৌছলে লোকেরা ঘাবড়িয়ে গেলো। এ নাজুক পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ দমনের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারছিলো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ কিছু নেতৃস্থানীয় লোক এ অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত এরা কালেমার উপর ঈমান অক্ষুণ্ন রাখে। যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে তাদের এ অবস্থায় ছেড়ে দেবার মতামত ব্যক্ত করলেন। এদের ধারণা ছিলো, যদি ধর্ম ত্যাগীরা যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে সাথে নিয়ে নিতে পারে, তাহলে তাদের দল ভারী হয়ে যাবে। যুদ্ধের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। পরিণতি কি হবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু সকল বিপদাপদকে উপেক্ষা করে ধর্মত্যাগীদের মতো যাকাত অস্বীকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে দিলেন। কোনো শক্তি, কোনো বাঁধাই তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখতে পারলো না।

ধর্মত্যাগের যুদ্ধসমূহকে মামুলী মনে করে কেউ কেউ এর গুরুত্ব আন্দাজ করতে পারছে না। আবার কেউ কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কয়েক শতের বেশী নয় বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ত্যাগের এসব যুদ্ধে দশ হাজার লোকও অংশগ্রহণ করেছেন। উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক যুদ্ধ করেছে। উপরন্তু ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি মদীনাবাসীদের অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ না করতেন, এ কলহ হ্রাস না পেয়ে বরং আরো বহুগুণে বেড়ে যেতো। আর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারতো না।

আল্লাহ না করুন, যদি এসব যুদ্ধে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজয় লাভ করতে না পারতেন তাহলে অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতো। ফলে ইসলাম ও মুসলমান উভয়েরই অধঃপতন দেখা দিতো।

এসব অবস্থার নিরিখে নিসন্দেহে দাবী করা যেতে পারে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। বিশ্ব ইতিহাসের মোড় তিনি ঘুরিয়ে দেন। নতুনভাবে যেনো তিনি আবার ইসলামী তামাদ্দুন তাহজিবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি বিজয় লাভ করতে না পারতেন, তাহলে ইরান ও রোমক সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া তো দূরের কথা সিরিয়া ও ইরাক অভিযানে বের হওয়াও সম্ভব হয়ে উঠতো না। এ অবস্থায় এ বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের প্রাচীর পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। ইরানী ও রোমীয় তাহজিব তামাদ্দুনের স্থলে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের পথও প্রস্তুত হতো না।

ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হবার ঘটনা যদি না ঘটতো এবং এতো অধিক হাফেজে কুরআন শহীদ না হতেন, তাহলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হয়তো কুরআন একত্রিকরণের পরামর্শ হযরত আবু বকরকে দিতেন না। এভাবে চিরদিনের জন্য কুরআনকে একত্রে এক জায়গায় হেফাজত করার মর্যাদাবান কাজ সম্পাদনও হয়তো হতো না।

আল্লাহ না করুন ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধে যদি মুসলমানরা পরাজিত হতো। তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে মদীনায়ও শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন হয়ে পড়তো। আর এ শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে হযরত ওমরও বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জনকারী এতবড় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পুনর্গঠন করতে সমর্থ হতেন না।

এসব বিশাল বিরাট ঘটনাসমূহ সাতাশ মাসের মত কম সময়ের মধ্যেই সম্পাদন হলো। এ স্বল্প সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলকে এড়িয়ে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীর্ঘ শাসনামলের প্রতি বেশী লক্ষ্য আরোপ করে। তারা মনে করে দুনিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী বড় বড় ঘটনা আঞ্জাম দেবার জন্য হাতে গোনা কয়টি মাস মোটেই যথেষ্ট নয়। একথা ঠিক নয়। সেসব বিপ্লব—যা মানবতাকে ধীরে ধীরে অগ্রগতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়েছে, তা সাধারণত কম সময়ের মধ্যেই সংগঠিত হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাস এর সাক্ষী।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকাল সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যা তিনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং সব সমস্যা সত্ত্বেও তিনি এতবড় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ কিভাবে ঠিক রাখলেন এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে। এ প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরল বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অংশ ছিলো অপরিসীম। কিন্তু এ বিজয়ের ব্যাপারে সবচেয় বেশী অংশ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীর্ঘ তেইশ বছরের পবিত্র ঘনিষ্ঠ সাথীত্ব। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও সান্নিধ্যের সাক্ষাত ফল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়েজ ও বরকতের ফলশ্রুতিতেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শিরায় উপশিরায়

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা স্রোতের মত প্রবাহিত হয়েছিলো। তিনি 'এল্‌কার' মাধ্যমে এ প্রকৃত রূহের অধিকারী ছিলেন যা রাসূলে কারীমের দাওয়াতে সুপ্ত ছিল। এ 'এল্‌কার'১ মাধ্যমেই তিনি এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ঈমান এমন একটি শক্তি, যার উপর কোনো মু'মিন বিজয় লাভ করতে পারে না যতক্ষণ দীনের জন্য তার ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে উঠে জীবন উৎসর্গ করে না দেয়।

এ সত্যকে সন্দেহাতীতভাবে বিভিন্ন যুগে আরো অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের এ উপলব্ধি ছিলো নিছক বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পবিত্র হৃদয় বাইরের কোনো চাপ ছাড়াই আপনা আপনিই তাঁকে এ সত্যের দিকে ধাবিত করেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নমুনা ও আমল এ অনুভূতিকে প্রখরভাবে প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছে এ ব্যাপারে সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনে কোনো সন্দেহ থাকারই অবকাশ রইলো না।

সত্য ঈমানের এ বলিষ্ঠতার কারণেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে অদম্য সাহস, অতুলনীয় দৃঢ়তা জন্ম লাভ করেছে। ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্নে সকল সাহাবীগণ অবস্থার নাজুকতার জন্য নমনীয়তা প্রদর্শনের পরামর্শ দিলে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, ধর্মত্যাগীদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করবো। একাও যদি আমাকে বের হতে হয় তবুও।

দৃঢ়চেতা মনোবলের এ শিক্ষা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হযরত আবু বকরকে শিখিয়েছেন। নিজের পবিত্র জীবনের নমুনার দ্বারা তিনি তাঁর মনে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, সত্যের মুকাবিলায় ঝুঁকে পড়া আর দুর্বলতা দেখাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময়কে কি ভুলে যেতে পারেন, যখন কঠোর বিরোধিতার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা একা মক্কার গলিতে গলিতে আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রমের লোভ-লালসা, যুলুম-নির্যাতন, বয়কট এমনকি প্রাণ হননের কোনো ধমকও তাকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে চুল পরিমাণও হঠাতে পারেনি। তিনি বরাবরই অটুট মনোবল ও আস্থার সাথে ঘোষণা করতেন ঃ

"আল্লাহর কসম এসব লোকেরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাম হাতে তুলে দেয় তাহলেও আমি আল্লাহর দীন প্রচারের দায়িত্ব আদায় করা হতে বিরত থাকবো না। যদি এ পথে আমার জীবন বিপন্নও হয়।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আজও সেই ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। ওহোদের প্রান্তরে সাহাবায়ে কেরামের বহুসংখ্যক শাহাদাত প্রাপ্ত হবার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শুনলেন, মক্কার কাফেররা ফিরে এসে আবার মুসলমানদের উপর হামলা করতে চায় তখন সকল বিপদ ভুলে গিয়ে, সকল

১. কোনো ব্যাপারে কিছু করার জন্য আল্লাহ তার কোনো বান্দার মনে সিদ্ধান্ত ঢেলে দেয়া।

www.pathagar.com

পরিণতিকে উপেক্ষা করে শুধু ওহোদে অংশগ্রহণকারী আহত অনেক মুসলমানদেরকে নিয়েই কাফেরদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে তবে থেমেছেন। মুসলমানদের এ হিম্মত দেখে কাফেররা সাহস হারা হয়ে পড়লো। তারা ফিরে এসে আক্রমণ করার চেয়ে মক্কায় দ্রুত ফিরে যাওয়াতেই কল্যাণ নিহিত বলে মনে করলো। এভাবে ওহোদ প্রান্তরে মুসলমানদের প্রাপ্ত দুঃখ-কষ্ট অনেকটা লাঘব হলো।

হুনাইনের যুদ্ধের সে ঘটনাকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি করে ভুলতে পারেন, যখন কিছু নওমুসলিমদের ভুলে মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ আরোহী ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুসংখ্যক সাহাবা সহ তখন অত্যন্ত বীর বিক্রমে শত্রুর মুকাবিলায় প্রতিষ্ঠিত রইলেন। তাদের অবিরাম তীর বর্ষণের প্রতি সামান্য মাত্রও ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। অতপর হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করলেন, হে মদীনার আনসারগণ ! যারা আল্লাহর রাসূলকে আশ্রয় দিয়েছো ; হে মুহাজির গোত্রসমূহ ! যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে রাসূলের হাতে মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করেছো, আল্লাহর সে রাসূল জীবিত আছেন। তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন। এ ডাক শুনে মুসলমানগণ ফিরে আসলেন। আবার তারা যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

রাসূলের জিন্দিগীর এসব নমুনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখের সামনে আজও সমুজ্জ্বল। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী। এ দৃঢ়তা ও প্রবল ইচ্ছার কারণেই স্বল্পসংখ্যক মু'মিন বান্দারা আরবের দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ধর্মত্যাগী গোত্রের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাদের অন্তরে একথা মাইল ষ্টোনের মত গেড়ে বসেছে যে, তাদের অভিযানে পরাজয়ের সম্ভাবনা নেই। সত্য ও সততার পথে শাহাদাত প্রাপ্তির অনুপ্রেরণা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের দৃষ্টিতে শাহাদাতই সফলতা লাভের একমাত্র উপায়।

পাঠকগণ ! এ ধরনের বহু ঘটনা এ গ্রন্থে দেখতে পাবেন। এসব ঘটনার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। রাসূলে কারীমের যুগে মুসলমানগণ নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত থাকতেন। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলের সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কে ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। প্রতিটি ব্যাপারেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর মদদ নাযিল হতো। কিন্তু প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় এমনটি হবার কথা নয়। রাসূলের ইন্তেকালের পরপরই ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এখন শুধু হৃদয়ের মধ্যে ঈমানের জজবা পোষণ ও রাসূলের 'উসওয়ায়ে হাসানা'কে পূর্ণভাবে আকড়িয়ে ধরার মাধ্যমেই মুসলমানরা বিজয় লাভের গৌরব অর্জন করতে পারে। সফলতা লাভের এ মানদণ্ড হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানা ছিলো। আর এ মানদণ্ড পালন করেই তিনি তার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে ঐসব কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন যা অবলোকন করে দুনিয়া বিস্মিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ঈমানের যে জজবা দীনের খেদমতের যে স্পৃহা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে উদ্বেলিত ছিলো ও তার জন্যই তিনি এত কম সময়ে এতসব বড় বড় কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন। নতুবা বছরের পর বছর আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমেও এতসব কাজ সমাধা করতে পারা যেতো না।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানাকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সত্যের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন জাতির প্রকৃত উন্নতি অগ্রগতি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত জাতি সংকট সংকুলে ধৈর্য, দৃঢ়তা স্থিরতা সহকারে এগুতে না জানে। এসব অবস্থায় নিজের মধ্যে সংযত থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে জাতির উত্থান পতনের রহস্য এ মানদণ্ড ও নীতিমালা গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যেই নিহিত আছে। যে জাতি এ মর্যাদা অর্জন করতে চায়, বিশ্বের দরবারে নিজেদের একটা বিশিষ্ট আসন করে নিতে চায়, যাদের দুনিয়ার সামনে পেশ করার মতো একটি নিখুঁত কর্মসূচীও আছে, সে জাতির এ আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে তাদের পেশকৃত কর্মসূচীর মধ্যেই মানবতার মুক্তি এবং দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত আছে। এ জাতির ধৈর্য শক্তি থাকা খুবই প্রয়োজন। কঠিন সংকটেও এ গুণ তার থাকতে হবে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেনো দৃঢ় সংকল্প, স্থিরতা ও হিম্মতের সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে। পথের সকল প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বীরের মতো সামনে পা বাড়াতে হবে।

যে জাতি জাতি গঠনের কর্মসূচীতে সাম্যের আহ্বান জানায়। যুলুম- নিপীড়ন, শোষণ-অত্যাচার, চিরতরে বন্ধ করতে চায়, সে জাতির জন্য এসব উপায়-উপকরণ সংরক্ষণ খুবই প্রয়োজন। সাম্য ও গণরায়ের অধিকারকে মূলনীতির ভিত্তি বানিয়ে অনেক রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। এর ছায়ায়ই শাসনকে মযবুত করেছে। এর বিপরীত অনেক রাষ্ট্র দীর্ঘদিন নিজের শান-শওকত ও জৌলুস দেখিয়ে সাম্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে পরিহার করে অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সাম্যবাদ ইসলামের একটি বুনিয়াদী স্তম্ভ। এ বুনিয়াদী স্তম্ভ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিরাট অট্টালিকা পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম একটি গণ-প্রতিনিধিত্বশীল ধর্ম। এ সত্যকে আমরা শুধু আমাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়েই জানতে পেরেছি। আর আমাদের আগে যারা এ সত্যকে জেনেছে তারাও জেনেছে বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই। কিন্তু এ উপলব্ধির পরও আমরা ও আমাদের পূর্বসূরীদের কেউই ইসলামী রাষ্ট্রের পুরোপুরি হেফাযত করতে পারিনি। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার দ্বারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সত্য অনুধাবন করেননি। বরং তিনি করেছেন, 'এল্কায়ে রাব্বানী' তথা আল্লাহর তরফ থেকে হৃদয়ে ঢেলে দেয়া জ্ঞানের মাধ্যম। তিনি 'ইলমুল ইয়াকীনের' সাথে একা এর উপর শুধু ঈমান আনেননি বরং নিজ সঙ্গী-সাথীদেরকেও এ মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর ও তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীদের দিন-রাতের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে যে সালতানাতের অস্তিত্ব লাভ করলো তার মূল ভিত্তিই সাম্যবাদ। এ কারণেই এ রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো কয়েকদিনের জৌলুশ ও বাহাদুরী দেখিয়েই চিরদিনের মত

www.pathagar.com

অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং শতাব্দির পর শতাব্দি নিজের সুখ্যাতি সুবাশ দ্বারা দুনিয়াকে আলোকিত ও বিমোহিত করে চলেছে।

'এল্‌কার' মাধ্যমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করেছেন ইসলাম বর্ণ-বৈষম্যহীন সাম্যবাদের পতাকাবাহী। জাত-পাত, বর্ণ-গোত্রের উপর গড়ে উঠা মানবজাতির মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য সূচনার পক্ষপাতী নয়। এ জন্যই ইসলামের দাওয়াত কোনো বিশেষ জাতির প্রতি নির্দিষ্ট নয়। বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতি তার এ উদাত্ত আহ্বান। রাসূলে কারীমের পবিত্র যুগে আরব জাতি ছাড়াও গোলাম ও অনারবের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো দাস বা অনারবের সাথে কখনো হেয়-বরণীয় আচরণ তো দূরের কথা বরং তাদেরকে তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে আরো উন্নত ও মর্যাদাশালী করে তুলেছে। সেসব স্মৃতি স্মরণ করে মুসলমানরা আজ খুশী ও গর্বিত। হযরত সালমান ফার্সি রাসূলে কারীমের ঘনিষ্ঠতমদের একজন ছিলেন। হযরত জায়েদ বিন হারেসাকে মুক্ত করে দিয়ে তিনি নিজের ছেলে বানিয়ে নিয়েছেন। মাওতার যুদ্ধে তাঁকে সেনাবাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করেছেন। এর আগেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার দায়িত্বে সম্পাদন করা হয়েছে। যায়েদের ছেলে উসামাকে ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর সেনাপতি বানিয়েছেন। তাঁর অধীনে ছিলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মর্যাদাশালী মুহাজির ও আনসারদের অনেক মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব। বাজান ফার্সিকে তিনি ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করেছেন। এসব ঘটনা হতে এসব লোকের সাথে রাসূলের আচার-আচরণের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু আরব বা কোনো মর্যাদাশালী পরিবারের লোক হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো মর্যাদা পাবার মানদণ্ড ছিলো না। শুধু আল্লাহভীতিই ছিলো মর্যাদার মাপকাঠি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস পরামর্শদাতা এবং ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয়ে যায় যারা ঈমান, ইখলাসে ঈর্ষাযোগ্য উন্নতি ও মর্যাদা অর্জন করেছেন ; দীন ও মিল্লাতের জন্য নিজের জীবন, সম্পদ, মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ; শুধু তাঁরাই তাঁর প্রিয় সাহাবী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের মন থেকে বংশীয় গৌরব, মান-ইজ্জতের ফখর একেবারেই নির্মূল করে ছেড়েছেন। আরব-অনারব, মুক্ত ও দাসের পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে সকলকে এক কাতারে এনে দাঁড় করে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজের নেতার এ কর্মধারার উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করেছেন। মানুষের মধ্যে সঠিক ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য কায়েম করার জন্য আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এ সাম্যনীতির প্রভাবেই মুসলমানরা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়ে উঠে। ইরান ও রোমের মত পরাশক্তিও এদের মুকাবিলা করতে সমর্থ হয়নি। মুষ্টিমেয় কিন্তু ইস্পাত কঠিন এ আরব বাহিনীর আক্রমণে তাদের বিরাট বাহিনীকে পালাতে হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একথাও জানতেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এ ধর্মের দাওয়াতের পরিসীমাও শুধু জাযিরাতুল আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দুনিয়ার অপর প্রান্তের মানুষও এ দাওয়াতের আওতাধীন। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব জগতের বাইরের রাজা-বাদশাহদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠাতেন।

একথা স্বীকার করার সাথে সাথে প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা বড়ো নেয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তা যেনো তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং অন্যান্যদেরকেও এ নেয়ামতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। আর আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য জীবন বাজী রাখতেও যেন কুণ্ঠাবোধ না করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাতি-গোত্র নির্বিশেষে সকলের কাছেই দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে তার খলীফাগণও ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে পৌছানোর এবং এ পথে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করেননি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাই করেছেন। ইসলামের দাওয়াত দিক দিগন্তে প্রসারিত করার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখেননি। এ পথে তাঁকে অনেক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। খিলাফতের প্রথম থেকে যে দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তাতে ভাটা পড়েনি। নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ধারাকে অব্যাহত গতিতে জারি রেখে তা পরিপূর্ণ করেই ছেড়েছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পৌরুষজনিত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় ইচ্ছার ফলেই ইসলামী সালতানাত অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত বিশ্বের দিগ্বিদিক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। বহু শতাব্দি পর্যন্ত এ সালতানাত দুনিয়ায় তামাদ্দুন-তাহযিবের ঝাণ্ডা উড্ডীন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলো।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শাওকতের সাথে দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনার পর অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো ইসলামী সালতানাতেরও পতন আসা শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত অবনতির শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। এখন প্রশ্ন উঠে, এ পতনের কারণ কি ? ইসলামের যে বুনিয়াদী নীতিমালার পতাকাবাহী হয়ে তারা উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছিলো। সেই নীতিমালাকে গ্রহণ করাই কি এ পতনের কারণ। না পরিহার করে চলাই এ পতনের কারণ। একথা বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের অধপতন ও অবনতির মূল কারণই হলো ইসলামের নীতিমালাকে ছেড়ে দেয়া। আর এ নীতিমালাই ছিল একদিন ইসলামী সালতানাত কায়েমের আসল কারণ। ইসলামের ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক মাত্র স্বীকার করবেন, যেদিন থেকে মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে সেদিন থেকেই ইসলামী সালতানাতের পতন ও পঁচনের পালা শুরু হয়েছে।

প্রথমতঃ জাযিরায়ে আরবের মুসলমানদের মধ্যেই এ কলহের সূত্রপাত ঘটে। এরপর অনারবদের মধ্যে কলহের এ ধারা সংক্রমিত হতে শুরু করে। এ কলহ

www.pathagar.com

অবশেষে মুসলমানদের শক্তি-সাহস, মান-মর্যাদা, যশ-সুখ্যাতি, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ভুলুণ্ঠিত করে দেয়।

এ দুঃখের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লেখার সময় ও সুযোগ কোনোটাই এখানে নেই। তাই শুধু কিছু ইঙ্গিত দিয়ে আমি আমার বর্ণনাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবো। যদিও তা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। তবু প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যকেও তা হার মানাবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, শতাব্দির পর শতাব্দির চেষ্টা-সাধনার পর কায়েম হওয়া শাসনব্যবস্থা আড়াই বছরের গড়া এ স্বল্প সময়ের হুকুমতের তুলনায় কিছুই ছিলো না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে খুশীতে আমার মন ভরে উঠছে। সত্যিকারে আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে এ ইতিহাস লিখছি। এ ইতিহাস লেখার মাধ্যমে আমি যদি পাঠকদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগের প্রকৃত চিত্র, রাসূলের নিবেদিত আশেকের চরিত্রের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারি তাহলে এটাই হবে আমার পরম সৌভাগ্য।

আমি আগেও বলেছি যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকাল নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ে মানুষ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্বর্ণযুগের কিছু ঝলক অবলোকন করে এ উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কিছু তো আন্দাজ করা যায়। কিন্তু প্রতিটি দিক পর্যালোচনা করে দেখা চাট্টিখানি কথা নয়। ধৈর্য-সহ্যের সাথে জ্ঞান-গবেষণা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে গবেষণামূলক কাজের ছক এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ অনুপম মানুষটির জীবনের অসংখ্য দিক এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তাঁর জীবনের অসংখ্য উজ্জ্বল গুণাগুণ এখনো জনসাধারণ্যে আসতে পারেনি। এ আলোকবর্তিকা সম্পন্ন ব্যক্তিটি নিজের সকল গুণাগুণ সহকারে দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হননি। অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর জীবন-চরিত-ইতিহাস লিখে অজানা দিকগুলোকে জানা ছাড়াও সমসাময়িকদের সাথে তাঁর তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। সমসাময়িক জাতিগুলো সভ্যতা ও কৃষ্টির কোন্ স্তর দিয়ে চলছিলো, তাদের তুলনায় আরববাসীদের কি অবস্থা ছিলো আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে কিভাবে ও কি করে ঐসব জাতির শুধু সমকক্ষই নয় বরং প্রতিক্ষেত্রে ওদের চেয়ে অনেক উত্তম বানিয়ে দিয়েছেন তার পর্যালোচনা করাও আজকের দিনের দাবী।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুঃসাহসিক ইতিহাসবেত্তাগণ অচিরেই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধারাবাহিক চেষ্টার মাধ্যমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবনের সবগুলো দিক আর তাঁর খেলাফতকালের সব বৃত্তান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকাল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন। প্রাচীন আরবীয় উৎসগুলো হতে এ কালের

www.pathagar.com

কিছু অবস্থা জানতে পারা গেলেও বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী। এর দ্বারা কোনো কোনো সময় প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো বর্ণনা তো একেবারেই বাজে কথার দোষ-ক্রটিতে ভরপুর। আবার কোনো কোনো বর্ণনা পড়লে মানুষকে অবাক হয়ে যেতে হয়। তার মাথা চক্কর খেতে শুরু করে। সে ভাবতে শুরু করে এ ধরনের ঘটনা ঘটাও কি সম্ভব?

এরপরও পরস্পর বিরোধী বর্ণনার দোষ-ক্রটির জন্য প্রাচীনদের অপারগতা মনে করতে হবে। কেননা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সময় খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, সে সময়টা ছিলো পরিপূর্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়। প্রতিটি মুসলমান পাগলপারা হয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ছুটে যেতেন। কোনো একটি দিনও নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা সম্ভব হতো না। পেছনের ঘটনাসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখার অবকাশ কারো ছিলো না। ভবিষ্যতের দিকেই ছিলো দৃষ্টি নিবদ্ধ। এ জন্যই সে সময়কার সংগঠিত ঘটনাবলী নিয়মানুসারে লিখে রাখার চেষ্টা কেউ করেনি। আর এ ধরনের চেষ্টা চালাবার সুযোগও হাতে আসেনি। এসব বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী- কালে। তাও কোনো সুষ্ঠু নিয়ম-কানুনের অধীনে হতে পারেনি। মানুষেরা অন্যের কাছে যা শুনেছে ও মনে করে রেখেছে। তাই অনুসন্ধান ও কোনো যাচাই-বাচাই ছাড়াই এক জায়গায় জমা করে দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলনে যে ধরনের সতর্কতা ও যাচাই-বাছাই অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়েছিলো তাও এখানে চালানো হয়নি। আর এমনটি হওয়া সম্ভবও ছিলো না। কারণ, তখন মুসলমানরা বিজয়ের পর বিজয় লাভের নেশায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন একটি বিশাল সালতানাতের কাঠামো ও শাসন পদ্ধতি প্রণয়নে মশগুল ছিলেন যার সীমা-পরিসীমা দিন দিনই প্রসারিত হয়ে চলেছিলো।

এ সময়ের বর্ণনা একত্রিত করার ব্যাপারে যেহেতু কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি তাই ইতিহাস গ্রন্থে প্রত্যেক ভাল-মন্দ বর্ণনাগুলোও জমা করা হয়েছে। বর্তমান শতকের ঐতিহাসিকদের জন্য ঘটনার সত্যতা যাচাই করেই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কোনো একটি বর্ণনার উপর নির্ভর না করে বিশেষ ঘটনার ব্যাপারে যেসব বর্ণনা আছে সবগুলোই যথাসম্ভব যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। একটি বর্ণনাকে অন্য বর্ণনার সাথে তুলনা করে দেখে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতে হবে।

আগের ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনার দোষ-ক্রটি অনুসন্ধানের ব্যাপারে যথেষ্ট মেহনত করেছেন। এ মেহনতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখেই বলবো, তাঁরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের ঐসব উজ্জ্বল চিত্রকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেননি, যেসব চিত্র আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিতে পারতো।

আমি এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যেসব বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছি শেষের দিকে তার একটি তালিকা সন্নিবেশিত করেছি। পাঠকগণ এ বইগুলো পাঠ করলেই আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তো আবু বকর

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালে সংগঠিত অসাধারণ কার্যক্রমগুলো বর্ণনাই করেননি। যদি কোথাও করেও থাকেন তাও সাধারণভাবে করেছেন। যেমন তিবরী, ইবনে আসির, বালাজুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে আবু বকরের অবদান সম্পর্কে কিছুই লিখেননি। অথচ কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারটি এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি তাঁর আমলে এ কাজটি ছাড়া আর কিছুও না করে থাকতেন, তাহলেও এই একটি অবদানের জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকার জন্য যথেষ্ট ছিলো। ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধ, ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ যত সব মতভেদপূর্ণ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরূপ মতভেদপূর্ণ বর্ণনা, দু'টি ভিন্ন বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বরং একই বইতে একটি ঘটনার ব্যাপারেই মতভেদ ও দুই বিপরীত বর্ণনা আনা হয়েছে। এসব বই পড়লে পাঠকগণের মাথা চক্কর দিয়ে উঠবে। তারা বুঝতেই পারেননি বর্ণনার কোন্‌টি গ্রহণ করবে আর কোন্‌টি করবে বর্জন।

ঘটনা সংগঠিত হবার সময়কালের ব্যাপারেও মতভেদের অভাব নেই। কোনো কোনো সময়কাল তো চোখ বন্ধ করে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যেমন তিবরীতে—ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধ ১১ হিজরী সনে ; ইরাক বিজয় সম্পন্ন হয়েছে ১২ হিজরী সনে ; সিরিয়া বিজয়ের ঘটনা শেষ হয়েছে ১৩ হিজরী সনে বলে উল্লেখ আছে। ঘটনাসমূহের এ ক্রমবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধ শেষ হবার আগে ইরাক বিজয়ের ঘটনা শুরু হয়নি, আবার ইরাক বিজয় সুসম্পন্ন হবার আগে—সিরিয়া বিজয়ের অভিযান শুরু হয়নি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। ধর্মত্যাগের যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ইরাক বিজয়ের অভিযান শুরু হয়েছে। আর সিরিয়া বিজয় অভিযানের ধারা ধর্মত্যাগের যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথেই শুরু হয়েছিলো। এ সময়ই খালিদ বিন ওয়ালিদের সামরিক বাহিনী ছিলো ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।

মতভেদের পালা এখানেই শেষ নয়। যেখানে ঘটনা সংগঠিত হবার ও সময়কালের ব্যাপারে মতপার্থক্যের ভীড়, সেখানে স্থানের ব্যাপারেও মতভেদের অভাব নেই। এসব মতভেদের কারণে অনেক সময় বর্ণনার অবয়বই পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন বুঝেই আসে না কিভাবে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কোনো কোনো সময় একই নামের কয়েকটি জায়গাও বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রেওয়ায়েত থেকে মোটেই মনে হয় না এখানে কোনো জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানের নামও বিলীন হয়ে গেছে। ঘটনা ঘটার প্রকৃত স্থান জানাও কঠিন হয়ে পড়ে। (অবশ্য প্রাচ্যবিদরাও সমস্যা সমাধানের জন্য নক্সা তৈরি করে দিয়েছেন। এ কারণেই অজ্ঞাত জায়গার সঠিক নাম নির্ণিত হয়ে থাকে।) কোনো কোনো বর্ণনা এমন সন্দেহযুক্ত যে এর সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার উপর বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত কারণে বর্তমানকালের কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় সংগঠিত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন। এগুলো তাঁরা সহজে বিশ্বাসও করতে চায় না। অধিকাংশই তাঁর যুগের ঘটনাবলীকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রকৃত ব্যাপার সুস্পষ্ট হয় না। তাঁর যুগের বৈশিষ্ট্যের চিত্র আমাদের চোখে ভেসে উঠে না। ইসলামের ইতিহাসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল ইসলামী সালতানাত কায়েমের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করেছে—তাও প্রমাণিত হয় না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের প্রাথমিক উৎসমুখগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আরো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রতিভাত হয়ে উঠে। আমাদের ঐতিহাসিকগণ সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অতটুকু লিখাও লিখেননি যতটুকু লিখেছেন খালেদ বিন ওয়ালিদসহ ঐসব সিপাহসালারদের ব্যাপারে যারা সিরিয়ায় গিয়ে ওখানকার বিজয়াভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের লেখায় মনে হচ্ছে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ঘরে বসে বসে আল্লাহর যিকির করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না। মদীনায় বসে তিনি দিনরাত আল্লাহর তাসবীহ-তাহলিলে নিমগ্ন ছিলেন। খেলাফতের বিষয়সমূহ দেখাশুনা করেছেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত বিচক্ষণ সাহাবাগণ অথবা সামরিক বাহিনীর সেনাপতি বা বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ। অথচ এ ধারণা নিরেট মিথ্যা এবং খুবই বিভ্রান্তিকর। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে দীনের মযবুতি ও ইসলামী শাসনের পুনর্গঠনের জন্য যা হয়েছে তার সবই তাঁর নিজস্ব লক্ষ্যারোপ ও প্রচেষ্টার ফলেই হয়েছে। তাঁর গাঁথা মুতির মালা তাঁরই গলায় বাঁধতে হবে অন্য কারো গলায় নয়।

আমি আগেও বলেছি, ধর্মত্যাগী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ফেতনা সৃষ্টি হবার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অধিকাংশ সাহাবা তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাদের কথা শুনলেন না। বরং দৃঢ় মনোবল প্রকাশ করে বললেন, 'আমার সাথে কেউ যদি না থাকে একা একা হলেও তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করবো' মুসান্না বিন হারিসার তরফ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা হলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই তার সাহায্যের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইরাকে পাঠিয়েছেন। সিরিয়ায় সমরাভিযান করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলে তিনিই সমগ্র আরবের সামরিক শক্তি একত্রিত করেছেন। আবু ওয়াবায়দা বিন জাররাহ এবং সিরিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য ইসলামী সেনাপতিগণ রোমক সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করতে শীথিলতা দেখালে তিনিই বিশেষ হুকুম দিয়ে সেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত করেছেন।

একদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও সিরিয়ার দিকে বাহিনীর পর বাহিনী ও সাহায্যের পর সাহায্য পাঠাতে থাকেন। আবার অপরদিকে রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

বায়তুলমালের পুনর্গঠন, গনিমাত লব্ধ মালের বন্টন, বিভিন্ন প্রদেশে শাসক নিযুক্তিকরণ সহ খিলাফতের নিয়ম-শৃংখলা বিধানে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। প্রশাসনিক কাজে ডুবে থাকার কারণে এমন কি তিনি পরিবার-পরিজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে পারতেন না। আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে যেনো কোনো ত্রুটি না হয় এ ধ্যানেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। শাসনকার্যের ব্যাপারে গভীর মনোনিবেশই ছিলো তাঁর এতো অল্প সময়ে এতো বড় বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারার মূল কারণ। যা অন্যান্যরা দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও করতে পারতেন না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর খেলাফতকালের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের শিথীলতা প্রদর্শনের একটি কারণ সম্ভবত রাসূলের পূত-পবিত্র সান্নিধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ তেইশ বছরের সময় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করাও হতে পারে। এ সময়ে রাসূলের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক ছিলো, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় ঃ

"আমি যদি বান্দাদের কাউকে আমার বন্ধু বানাতাম—বানাতাম আবু বকরকে।"

কাজেই তারা রাসূলে কারীমের এ সার্টিফিকেটের তুলনায় আবু বকরের খেলাফতনামাকে নগণ্য মনে করে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ লেখা প্রয়োজন মনে করেননি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসাধারণ ও গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং এ সম্পর্কের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু তার খিলাফতকালের অবদানগুলোও কম গুরুত্বের দাবীদার নয়। রাসূলের সাথে তেইশ বছর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে যে ঈমান-আকীদা তিনি লাভ করেছেন, আর এর বাস্তব মহড়া তিনি যেভাবে করেছেন, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানতের প্রাপ্য যেভাবে তিনি আদায় করেছেন তা ইতিহাসের পাতা থেকে ভুলে যাওয়ার নয়। এ হিসাবেই তার শাসনকালের সমস্ত বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিলো।

উপরে উল্লেখিত ঐসব কারণে প্রাচ্যবিদদের লিখিত গ্রন্থে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কথাবার্তা কমই দেখতে পাওয়া যায়। আর এ কারণেই পরবর্তীগণও তাদের গ্রন্থে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সুবিচার করার সুযোগ পাননি। তারা এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু লিখে ওমরের খিলাফতকালের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। আবার কেউ কেউ তো উভয়কালের তুলনা করা শুরু করে দেন—এটা ঠিক নয়। উভয় মহাসম্মানিত ব্যক্তিই শান-শওকতের দিক থেকে দুনিয়ার কোনো বড় বড় রাজনীতিক থেকে কোনো অংশেই কম ছিলেন না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ অবশ্যই ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময় সালতানাতকে খুবই মযবুত করা হয়েছে। শাসন প্রণালী প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশাসনকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে। মিসর সহ অন্যান্য রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যের অধীনের দেশগুলোর

www.pathagar.com

উপর প্রথমবারের মত ইসলামী পতাকা উড্ডিন করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ গুরুত্বপূর্ণ শাসনকাল ছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালের পরিশিষ্ট ও পরিপূর্ণতা। ঠিক যেমন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগ ছিলো রাসূলুল্লাহর সময়কালের পরিশিষ্ট ও পরিপূর্ণতা।

বর্তমানকালে কম সংখ্যক বইতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর আমলের বিস্তারিত বিষয়সমূহ যথাযোগ্য অনুসন্ধান ও গবেষণার পর লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এরপরও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐ অভাবের ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত ইংরেজী আঠার শতকে 'আরব জাতির ইতিহাস' (HISTORY OF THE ARABIANS) গ্রন্থে 'ইবেদী মারীনি' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর খেলাফতকালকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে "কোসিন দি পারসিগুয়াল' (ESSAI SURI HISTORIC DES ARBES) নামক একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১৮৮৩ইং সনে স্যার উইলিয়াম মেয়র (ANNALSS O THE EARLY CALIPHATE) নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগের অবদান পর্যালোচনা করেছেন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত জার্মান, ইটালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সহ অন্যান্য উইরোপীয় দেশগুলোর বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ ইসলামের ইতিহাসের এ স্বর্ণ যুগের ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন এবং যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন।

প্রাচ্যবিদদের সাথে সাথে কিছু মুসলিম এবং আরব ঐতিহাসিকও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফত আমলের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তাদের গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রফিক কেন্দ আল আজম নিজ গ্রন্থ "আশহুরু মাশাহিরুল ইসলাম"-এর প্রথম খণ্ডে বিশেষভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর খেলাফতকালের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করলে বুঝা যায়, গ্রন্থকার প্রাচ্যবিদদের পদ্ধতি দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। মরহুম শেখ মোহাম্মাদ খিজরী বেকও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আমলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে অবশেষে লিখেছেন ঃ

"আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, যদি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্ম না হতো ইসলামের ইতিহাসের ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হতো। তিনি যখন খেলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তখন মুসলমানদের মনে ভয়-ভীতি ও হতাশা বিরাজ করছিলো। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর অবিশ্বাস্য দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততা সহকারে সকল কলহ ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করে মুসলিম কাফেলার অগ্রযাত্রাকে মনযিলের দিকে নিয়ে ছুটলেন।" এখন আর কারো মনে সন্দেহ রইলো না।

www.pathagar.com

ওস্তাদ ওমর আবু নসর তার গ্রন্থ "খোলাফায়ে মোহাম্মদ"-এর প্রথম খণ্ডে পরিপূর্ণভাবেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালের বর্ণনা পরিপূর্ণ করেছেন। এভাবে শেখ আবদুল ওহাব নাজ্জার এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও তার শাসনামল সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধানমূলক কাজ করেছেন।

আমার এ পটভূমিকা আমি এ দোয়া করে শেষ করছি, আল্লাহ যেনো ঐতিহাসিকদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃত মর্যাদা বুঝার শক্তি দান করেন এবং অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে এমন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন যার দ্বারা এ বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়। এতদিন পর্যন্ত যে অবিচার তার উপর চলে আসছে তার যেনো ক্ষতি পূরণ হয়। এ গুরুত্বহ কাজ আঞ্জাম দিতে পারার জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর তাঁর করুণা ছাড়া কোনো কাজ সম্পন্ন হবার নয়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর আল্লাহর মেহেরবানীতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকাল সম্পর্কে লেখার বাসনাও আমার রইলো। আমীন।

মোহাম্মদ হুসাইন হায়কল

www.pathagar.com

১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রাথমিক জীবন

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাল্য ও যৌবনকাল সম্পর্কে ইতিহাসে খুব অল্প ঘটনাই পাওয়া যায়। তাই তাঁর পিতা-মাতার নাম ছাড়া তাঁর সম্পর্কে তাঁর সে সময়ের জীবনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পিতার মনে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো কিনা অথবা তিনি তাদের দ্বারা কতটুকু প্রভাবান্বিত ছিলেন এ সম্পর্কেও ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এথেকে কুরাইশ বংশে এ গোত্রের মর্যাদার আসন ছিলো বলে বুঝা যায়। গোত্রীয় মর্যাদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ থাকলে কোনো কোনো সময় গোত্রের দ্বারাই ব্যক্তির আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

বংশ পরিচয়

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের বংশের নাম ছিলো তায়েম বিন মুররা বিন কায়াব। তাঁর বংশ অষ্টম শিড়িতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে এক হয়ে গেছে। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

মুররা

কিলাব	তায়েম
কোসাই	সায়াদ
আবদে মোনাফ	কায়াব
হাশেম	ওমর
আবদুল মুত্তালিব	আমের
আবদুল্লাহ	ওসমান আবু কোহাফা
মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু

মক্কায় বসবাসকারী সকল গোত্রের উপরই পবিত্র খানায়ে কাবার কোনো না কোনো দায়িত্ব অবশ্যই অর্পিত হতো। আবদে মোনাফ গোত্রের উপর অর্পিত

www.pathagar.com

হয়েছিলো হজ্জের মৌসুমে পানি পান করানোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব। বনু আবদুদ দার গোত্রের উপর ন্যস্ত ছিলো যুদ্ধের সময় পতাকা বহন করা। খানায়ে কাবার পাহারা দেয়া। আর দারুন নাদওয়ার ব্যবস্থাপনা করা। খালিদ বিন ওয়ালিদের পিতৃ পুরুষ বনু মাখদুমের উপর অর্পিত ছিলো সেনাপতিত্বের দায়িত্ব। রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো বনু তায়েম বিন মুররা গোত্রের উপর। যৌবনে পদার্পণ করার পর এ দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পিত হয়েছিলো। রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পর্কিত সকল মামলা তাঁরই সামনে পেশ হতো। তিনি যে রায় দিতেন তাই কুরাইশবাসীকে মেনে নিতে হতো। রক্তপণের সকল অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে জমা হতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কারো কাছে এ অর্থ জমা হলে কুরাইশগণ তা মেনে নিতো না।

বিভিন্ন গ্রন্থে বনু তায়েম বংশের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে অন্যান্য আরব বংশ থেকে তা ভিন্নতর কিছু নয়। এদের মধ্যে এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো না, যা সমসাময়িককালে অন্যান্য গোত্র থেকে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য করে রাখতে পারে। শৌর্যবীর্য, দানশীলতা, মর্যাদা, বীরত্ব এবং প্রতিবেশীর সাহায্য-সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণের মতো যেসব গুণাবলী অন্যান্য গোত্রের মধ্যে পাওয়া যেতো তা বনু তায়েমের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো।

নাম, পদবী ও ডাকনাম

হযরত সিদ্দীকে আকবরের নাম ছিলো আবদুল্লাহ। ডাকনাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। পিতার ডাক নাম ছিলো আবু কোহাফা। আর মূল নাম ছিলো ওসমান বিন আমের। তাঁর মা'র ডাকনাম ছিলো উম্মুল খায়ের। প্রকৃত নাম ছিলো সালমা বিনতে ছখর বিন আমের। কোনো কোনো গ্রন্থে ইসলাম গ্রহণ করার আগে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম আবদুল কা'বা বলে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মুশরেকী নাম পরিবর্তন করে নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে 'আতিক' বলেও ডাকা হতো। এসব নাম রাখার কারণ ছিলো হযরত আবু বকর আনহুর মা'র পুত্র-সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করার পর বেঁচে থাকতো না। তাই তিনি মানত করেছিলেন, যদি তাঁর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর বেঁচে থাকে তাহলে তার নাম রাখা হবে আবদুল কা'বা। খানায়ে কা'বার খেদমতের জন্য তাকে ওয়াকফ করা হবে। এবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মা মানত অনুযায়ী সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল কা'বা। বড়ো হবার পর তাঁকে 'আতিক' (মুক্ত মানুষ) নামে ডাকতে শুরু করা হলো। কেননা তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে খুব সুন্দর ও সুশ্রী হবার কারণে 'আতিক' নামে ডাকা হতো বলেও বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় আছে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর পিতার নাম 'আতিক' রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে

www.pathagar.com

তিনি বলেন, "একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন, হাজা আতিকুল্লাহ মিনান নারে—আল্লাহর এ বান্দা আগুন থেকে মুক্ত।"

এ বর্ণনাটি এভাবেও বলা হয়েছে যে, একবার কিছু লোকের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে আল্লাহর রাসূল বলে উঠলেন, "আগুনের শাস্তি থেকে মুক্ত কোনো লোককে দেখতে হলে তোমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখো।" আবু বকর ছিলো তাঁর ডাকনাম। সারা জীবন এ নামেই তাঁকে ডাকা হতো। কিন্তু এ ডাকনামের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। পরবর্তীকালে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো।[১]

শৈশব ও যৌবনকাল

অন্যান্য সমবয়সী ছেলেদের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু শৈশবকালে মক্কার অলিতে-গলিতে খেলা-ধূলায় কাটাতেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর কাতিলা বিন আবদুল ওজ্জার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এ স্ত্রীর গর্ভে আবদুল্লাহ এবং আসমা জন্মগ্রহণ করেন। আসমাকে পরে জাতুন নাকাতাইন বলে ডাকা হতো। কাতিলার পরে তিনি উম্মে রোমান বিনতে আমের বিন ওয়াইমারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর গর্ভে আবদুর রহমান ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহু জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায় আগমনের পর তিনি হাবিবা বিনতে খারিজাকে বিয়ে করেন। এরপর বিয়ে করেন আসমা বিনতে ওমাইসকে। আসমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ।

পেশা, অবয়ব ও চরিত্র

ব্যবসা-বাণিজ্য করেই কুরাইশরা জীবিকা নির্বাহ করতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও বড় হয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায় সুখ্যাতি জমিয়ে তিনি মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব ও নিখুঁত চরিত্র ব্যবসায় সুনাম ও তা প্রসারের ব্যাপারে বেশ সাহায্য করে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর গায়ের রং ছিলো ফর্সা। পাতলা গড়ন, সুশ্রী দাড়ি, প্রস্ফুটিত চেহারা, উজ্জ্বল চোখ ও প্রসস্ত কপালের অধিকারী ছিলেন তিনি। কোমল হৃদয় ও বিনয়ী চরিত্রের মতো দু'টি বিরল গুণের মালিকও ছিলেন তিনি। সতর্ক, সচেতন, পরিণামদর্শি, উন্নত চিন্তাধারা ও সুদৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে তাঁর সমকক্ষ লোক সে সময় মক্কায় খুব কমই ছিলেন। এ ধরনের প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষও কোনো

১. ঐতিহাসিকরা হযরত আবু বকরকে এ ডাক নামে খ্যাত হবার আর একটি কারণও উল্লেখ করেছেন। তাহলো, আরবী ভাষায় জোয়ান উটকে 'বকর' বলা হয়। উট কেনা-বেচার ব্যাপারে তার বড়ো আগ্রহ ছিলো এবং তাদের চিকিৎসার ব্যাপারেও তাঁর অবগতি ছিলো বেশী। এ কারণেই লোকেরা তাঁকে আবু বকর-উটের পিতা নামে ডাকতে শুরু করে।

www.pathagar.com

কোনো সময় বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে আটকে পড়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ পাক হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করেছিলেন। ফলে সে সময়ের প্রচলিত বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাস, কুরীতিনীতি স্পর্শ হতে তিনি পবিত্র ছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "জাহিলিয়াত ও ইসলাম এ উভয় জীবনের কোনো অংশেই মদ সহ কোনো খারাপ কাজ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ সে সময় মক্কাবাসীরা শুধু মদে অভ্যস্তই ছিলো না বরং মদের জন্য ছিলো পাগলপারা।" ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম তাঁর উন্নত চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর জাতির খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মক্কার কুরাইশদের সকল খান্দানের কুষ্টিনামা ছিলো তার ঠোটস্থ। প্রত্যেক গোত্রের দোষ-ত্রুটি ও গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে তার সমকক্ষ বলতে কুরাইশদের মধ্যে কেউ ছিলো না। তিনি চরিত্রবান, ঈমানদার ও সদাচারী ব্যবসায়ী ছিলেন। জাতির সকলেই তাঁর উত্তম চরিত্র ও সদাচারে মুগ্ধ ছিলেন। এসব গুণাগুণের জন্য সকলের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।"

রাসূলের সাথে সম্পর্ক ও ইসলাম গ্রহণ

বিবি খাদিজা বিনতে খুয়াইলাদ সহ বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে মহল্লায় বাস করতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিবাসও ছিলো সে একই মহল্লায়। সুদূর সিরিয়া ও ইয়েমেন দেশের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ছিলো প্রসারিত। প্রকৃতিগতভাবে ভালো মানুষও একই মহল্লায় বসবাস করার কারণে রাসূলুল্লাহর সাথে আগে থেকেই তাঁর একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। পরস্পর পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হন। কারণ, এ সময়ে আল্লাহর রাসূল বিবি খাদিজার পানি গ্রহণ করে তার গৃহে বসবাস শুরু করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে দু' বছর কয়েক মাসের ছোট ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। মনে হচ্ছে বয়স, ব্যবসা, চরিত্র, সৎ গুণাবলী, কুরাইশদের ভ্রান্ত আকীদার প্রতি ঘৃণা, বদ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার ঝোঁক প্রবণতার মিলের কারণে উভয়ের প্রাগাঢ় বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে উভয়ের বন্ধুত্বের ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, নবুয়াত প্রাপ্তির আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভীর ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল। আর এ বন্ধুত্ব ও এক মুখীনতাই সর্বপ্রথম তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আবার কেউ বলেন উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করার পরে। ইসলাম পূর্ব অবস্থায় উভয়ের সম্পর্ক ছিলো প্রতিবেশীসুলভ, সমরুচি ও সম প্রবণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রমাণ হিসেবে বলা হয় নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ একাকী ও লোকালয় ছেড়ে থাকতে ভালোবাসতেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি লোকদের সাথে চলাফেরা মেলেমেশা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। নবুয়াতের নেয়ামাত প্রাপ্তির পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর

www.pathagar.com

কথা তাঁর মনে পড়লো। তাঁর স্বভাব ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকেই তিনি প্রথম ইসলামের দাওয়াত দেয়া সঠিক মনে করলেন। দাওয়াত পাওয়ার পরই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ঈমান আনলেন। উভয়ের সম্পর্ক এখান থেকেই গভীর হতে শুরু হয়। আর এ সম্পর্ক দিন দিনই প্রগাঢ় হয়ে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রাসূলের ভালোবাসায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ডুবে গিয়েছিলেন। দুনিয়া এত গভীর ভালবাসার দ্বিতীয় কোনো নজীর পেশ করতে সমর্থ হবে না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন—"বড়ো হবার পর থেকেই আমি আমার পিতাকে দীনের ভালোবাসায় দিন দিনই অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করতে দেখেছি। এমন কোনো দিন ছিলো না, রাসূলুল্লাহ সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেননি।"

ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দীনের প্রচার ও প্রসারে রাসূলে কারীমের সাহায্য-সহযোগিতার প্রবল বাসনা পোষণ করতেন। অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে প্রতিটা মুহূর্ত এ কাজে লাগাতেন। যেহেতু তিনি প্রতিটি মানুষের কাছে প্রিয় ছিলেন। লোকেরাও তাঁকে মর্যাদার চোখে দেখতো। তাই অল্পদিনের মধ্যে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং জুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপরে আবু ওয়াবায়দা ইবনে জাররাহ[১] এবং আরো অনেকে ইসলাম কবুল করেছেন তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমেই।

নিসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করার কারণ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা পাঠ করলে স্বভাবতই বুঝা যায়, কত সহজে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কোনো দ্বিধা-সংকোচ প্রকাশ না করে দাওয়াত পাবার সাথে সাথেই শত শত বছর ধরে প্রচলিত একটি ধর্মের বিপরীত আর একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব ধর্ম গ্রহণ করে বসলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছি, সে কিছু না কিছু প্রশ্ন এ ব্যাপারে ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছে। ব্যতিক্রম ছিলো শুধু হযরত আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা। আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই কোনো বাক্য ব্যয় না করেই সে ইসলাম কবুল করে ফেলে।"

এ ব্যাপারেই শুধু তিনি নিসংকোচ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়। 'গারে হেরায়' ফেরেশতার আগমন ও অহী অবতীর্ণ হবার ঘটনা শুনেও তিনি পূর্ণ সন্দেহমুক্ত

১. এঁরা সকলেই উন্নত মর্যাদার সাহাবী ও আশারায়ে মুবাশশারাদের (বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবার) অন্তর্গত ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন তাদের সকলেই ঈমান ও ইখলাসের দিক দিয়ে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মনে তা বিশ্বাস করে ফেলেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার ঐসব বুদ্ধিদীপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা মূর্তিপূজাকে একদিকে বোকামীপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন। অপরদিকে মন-প্রাণ দিয়ে রাসূলুল্লাহর সত্যবাদিতা, আমানতদারী, সততা ও পবিত্রতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। রাসূলের আহ্বান শুনে তাঁর মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেকই হয়নি। কাল বিলম্ব না করে ঈমান এনে ফেললেন তিনি। কেননা শুধু তাঁর সত্যবাদিতার উপরই তাঁর পূর্ণ ঈমান ছিলো তা নয়। বরং তাঁর পেশকৃত সব বাণী ও কাজে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দেখতে পেতেন। সততা, বিজ্ঞতা ও চিন্তাধারায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলে কারীমকে পরিপূর্ণ সঠিক দেখতে পেতেন।

ঈমানী সাহসিকতা

সন্দেহ মুক্ত মনে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটির চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ হলো ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারটি। দীন গ্রহণ করার সাথে সাথেই তিনি তাঁর প্রচারের কাজে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাওহীদ ও রিসালাতের উপর দৃঢ় ঈমান আনার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথেই তিনি প্রকাশ্যে দীন প্রচারের দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে ভবিষ্যতে কত রকমের বিপদ সংকুল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এদিকে সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। তিনি ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের অন্যতম। ব্যবসায়ীরা সাধারণত মানুষের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিতে তারা ব্যবসায় ক্ষতি হবে ভয়ে কোনো আঘাত হানে না। অনেক মানুষই সাধারণ মানুষের মতামত ও রায়কে পসন্দ করে না। কিন্তু অমঙ্গল ঘটার ভয়ে অথবা স্বার্থে ভাটা পড়বে মনে করে কোনো উচ্চাবাচ্যও করে না। বরং অনেক সময় তারা ভুল ভ্রান্ত ও অর্থহীন বলেও মনে করে। নিজের চিন্তা ও মতামতের বিপরীতে সাধারণের মতামতের পোষকতা শুরু করে দেয়। এ অবস্থা শুধু সাধারণ নাগরিকেরই নয় বরং জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও জাতির ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়নের দাবীদারদের মধ্যেও এ গুণের (?) পরিচয় পাওয়া যায়। সরাসরি তারা গণরায়ের বিরোধিতা করতে সাহস পায় না।

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করার সূচনালগ্ন থেকেই এ সুযোগ সন্ধানী নীতি পরিহারের যে উদাহরণ দেখিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। ব্যবসার খাতিরে তিনি যদি গোপনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতেন ও ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতেন তাহলেও বোধ হয় রাসূলে কারীম কোনো আপত্তি করতেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণই হয়তো তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এমনটি করেননি। তিনি প্রকাশ্যে ঈমান আনলেন। আর সাথে সাথেই তাঁর গোটা জীবন ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করে দিলেন। তিনি না ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার দিকে তাকালেন আর না তাকালেন মক্কার কাফেরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের দিকে। বরং খুবই মনোনিবেশ

www.pathagar.com

সহকারে তিনি দীন প্রচারে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। এ ধরনের ভাবলেশহীন ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ তার পক্ষেই সম্ভব। দীনের পথে যার জীবনের কোনো পরওয়া থাকে না। আর থাকে না স্বার্থ ও সম্পদেরও খেয়াল। যারা ধন-সম্পদ আর দুনিয়ার প্রয়োজন, মান-সম্মানকে দীনের খেদমাত ও দীনের প্রচার-প্রসারের মুকাবিলায় তুচ্ছ মনে করে।

দীনের প্রাথমিক খাদেমদের একজন

হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিব ও হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিসন্দেহে ইসলামের প্রচার, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করেছেন। তাদের দ্বারা দীনের যথেষ্ট শক্তিও সঞ্চয় হয়েছে। কিন্তু এরপরও একথা বলতে সংকোচ নেই, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন সে ব্যক্তিত্ব যাকে দীনের খেদমতের জন্য আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম নির্বাচন করেছিলেন। দীন ইসলাম এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পবিত্র আত্মা এবং অপরিসীম কোমল প্রাণ ব্যক্তিটির মধ্যে এমন ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা সৃষ্টি করা দুনিয়ায় আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দৃষ্টান্ত হতে বুঝা যায়, ঈমানী শক্তি নিজের মধ্যে কত বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

গরীব-মিসকীন ও মাযলুমের সাহায্য

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বন্ধু-বান্ধব, তাঁর পরিচিত ব্যক্তি এবং সহায়-সম্বলহীন নির্যাতিত ব্যক্তিদের প্রতি শুধু সহানুভূতি প্রকাশ করেই তৃপ্ত ছিলেন না বরং যারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মক্কার কুরাইশদের হাতে অমানুষিক নিগ্রহ-নির্যাতনে পতিত হয়েছেন। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ দু' হাতে খরচ করে ঐসব গরীবদের সাহায্য করতেন। যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দেরহাম সঞ্চিত ছিলো। ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। এতে তিনি প্রচুর মুনাফাও অর্জন করেন। এতদসত্ত্বেও দশ বছর পর হিযরতের সময় হযরত আবু বকরের কাছে মাত্র পাঁচ হাজার দেরহাম অবশিষ্ট ছিলো। যা কিছু তিনি কামিয়েছেন এবং যা কিছু তাঁর হাতে আগ থেকেই জমা ছিলো তার সবই তিনি আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে আল্লাহর রাহে এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যেসব ক্রীতদাসগণ বেদীন মালিকদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছিলো তাদেরকে মুক্ত করে দেবার কাজে খরচ করে ফেলেন।

একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক দেখলেন বেলা দুপরে প্রখর রোদের তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চড়িয়ে দিয়ে মনিব উমাইয়া বিন খালফ তার ক্রীতদাস বেলালকে শাসাচ্ছে আর বলছে—"ইসলাম ছেড়ে দেবার ঘোষণা কর, নতুবা এভাবে তোকে মেরে ফেলবো।" এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মনিব থেকে কিনে এনে হযরত বেলালকে মুক্ত করে দিলেন। এভাবে আর একজন দাস আমের বিন ফাহিরাকেও ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ভীষণ নীপিড়ন করা হতো। তাকেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রয় করে নিজের ছাগল

www.pathagar.com

বকরী দেখাশুনা ও চরাবার কাজের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। এভাবে আবু বকর প্রায় বিশজন ক্রীতদাসকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।

রাসূলের সহযোগিতায়

কুরাইশদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কুরাইশদের সবচেয়ে সম্মানিত লোকদের মধ্যে তাঁকে পরিগণিত করা হতো। তাছাড়াও বনু হাশেম তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু এরপরও কুরাইশদের নির্যাতনের হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি। আবু বকরও এ একই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শুধু ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে শহরের সবচে' গণ্য-মান্য ও নেতৃস্থানীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও আবু বকরকে কুরাইশদের যুলুমের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিলো। এরপরও যখন কুরাইশরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্যাতন করতে তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের জীবনকে বাজী রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতেন। ইবনে হিশাম তার সিরাত গ্রন্থে লিখেন—"হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মক্কার কাফেরদের নির্যাতন নিগ্রহের মাত্রা মূর্তিপূজার নিন্দা সূচক আয়াত নাযিল হবার পর থেকেই বেড়ে গিয়েছিলো। তারা খানায়ে কা'বায় একত্রিত হলো। এক ব্যক্তি বলতে শুরু করলো—"তোমরা শুনেছ ! মুহাম্মদ আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কি সব কথা বলছে। এসব শুধু তোমাদের দুর্বলতার কারণেই সম্ভব হচ্ছে। তোমাদের দীন ও তোমাদের দেব-দেবীর ব্যাপারে মুহাম্মদ যা ইচ্ছা তা বলছে। তোমরা কোনো প্রতিবাদ করছো না।" ঠিক এ সময়ই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর যায় কোথায় তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগলো—"তুমি কি আমাদের দেব-দেবীর ব্যাপারে এসব কথা বলছো ?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "নিশ্চয়ই আমি এসব কথা বলছি।" একথা শুনেই তাদের একজন তাঁর চাদর ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়েই তাঁর গলা পেঁচিয়ে ধরলো। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে এসে উপস্থিতি হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নিগ্রহ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন—, 'আমার রব আল্লাহ'—একথা বলার অপরাধেই তোমরা একজন লোককে মেরে ফেলতে চাও।" বর্ণনাকারী বলেন, এদিন কাফেরদের হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিসীম নিগৃহীত হয়েছিলেন।

শুধু এ দিনই নয়। এরপরও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অনেক ব্যাপারে আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালতের উপর পরিপূর্ণ ঈমানদারীর পরিচয় দিয়েছিলেন। ঈমানের এ বলিষ্ঠতা দেখে অনেক প্রাচ্যবিদকেই রাসূলের সত্যবাদিতা স্বীকার করতে হতো। তারা বলতো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোনো পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ ছিলো না। বরং তার বিপরীত তিনি দিনরাত দেখতেন মক্কাবাসীরা তাঁকে কিভাবে কষ্ট দিচ্ছে।

www.pathagar.com

তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। তার সমর্থনকারীদেরকে উত্যক্ত করছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এ দাবীতে সত্য না হতেন তাহলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত বিজ্ঞ ও সত্য নিরূপণকারী ব্যক্তির পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দাবীগুলোকে বিশ্বাস করে, তাঁকে সবরকমের সাহায্য-সহযোগিতা যুগিয়ে কুরাইশদের মধ্যে নিজের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা নষ্ট করার কি দরকার ছিলো। তিনি শুধু প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁর মধ্যে এমন ঈমান সৃষ্টি করতে পারতেন না যা মানুষকে সকল বিপদাপদ থেকে বেপরওয়া করে তার মধ্যে ভীষণ পেরেশানী সৃষ্টি করে। যে ঈমান হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রদর্শন করেছেন আর যেভাবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথা, কাজকে সমর্থন ও বিশ্বাস করেছেন তা একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, ইসলাম নিসন্দেহে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। কেননা একটি বাতিল ধর্ম এবং একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কখনো তাঁর সমর্থনকারীদের হৃদয়ে এমন জ্বলন্ত ঈমান পয়দা করতে পারে না।

'মেরাজের' ঘটনা

মেরাজের ব্যাপারেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যে ঈমানী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু বিস্ময়করই নয় বরং তাৎপর্যপূর্ণও বটে। তিনি অনেক মুসলমানকে পদস্খলন হতে বাঁচিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবাসীদেরকে শুনালেন—রাতের বেলায় তাঁকে খানায়ে কা'বা হতে বায়তুল মাকদাস নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে মসজিদে আকসায় তিনি নামায পড়েছেন। মক্কার কাফেররা তখন তা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো, মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত এক মাসের পথ। বায়তুল মাকদাসে যাতায়াতে দু' মাসের পথ। এক রাতে এতো মাসের পথ অতিক্রম করা কিভাবে সম্ভব। কোনো কোনো মুসলমানের মনেও এ সন্দেহের উদ্রেক হলো। তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বললেন, "তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যার অপবাদ আনছো ? লোকেরা বললো, "আমরা মিথ্যা বলছি না। এ মাত্র মসজিদে তিনি এ বক্তব্য পেশ করেছেন। এবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় তা সত্য ও সম্ভব। আল্লাহ্ যদি এক পলকে আসমান হতে ওহী নাযিল করতে পারেন, তাহলে তাঁর পক্ষে একরাতের মত দীর্ঘ সময়ে রাসূলকে মক্কা হতে বায়তুল মাকদাস ঘুরিয়ে আনা কি অসম্ভব ব্যাপার ?" একথা শেষ করেই তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদাসের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এর আগে বায়তুল মাকদাস ভ্রমণ করে এসেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মাকদাসের বর্ণনা শেষ করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

সত্য বলেছেন। সে সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিদ্দীকে আকবার উপাধীতে ভূষিত করলেন।

মে'রাজের ঘটনার ব্যাপারে যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করতেন, তাহলে অনেক মুসলমানই মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যেতো। আর যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকতো তাদের মনেও সবসময় একটা সন্দেহ দোলা দিতো। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানী বল শুধু মানুষকে মুরতাদ হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখেনি, বরং তাদের অন্তরকে সন্দেহ মুক্তও করেছে। এ ঘটনা হতে একথা মানতেই হবে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা দীন ইসলামের যে শক্তি অর্জিত হয়েছে, তা হযরত হামজা ও হযরত ওমরের দ্বারা অর্জিত হতে পারেনি। এ কারণেই তাঁর খেদমতের স্বীকৃতি দিয়ে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বান্দাদের কাউকে যদি আমি আমার খলিল বা বন্ধু বানাতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বানাতাম। আসল খলিল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।"

মে'রাজের পরে

মে'রাজের ঘটনার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সমস্ত সময় রাসূলের সাহচর্য, দুর্বল ও মযলুম মুসলমানদের সহযোগিতায় এবং ইসলামের তাবলিগে ব্যয় করতে লাগলেন। সংসার চালাবার মতো উপার্জনের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন শুধু ততটুকু সময়ই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে খরচ করতেন। এ সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য মুসলমানদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের ভয়াবহতা বেড়েই চলছিলো---- অত্যাচার নিপীড়নে কুরাইশরা কোনো কৌশলই বাকী রাখেনি। পরিস্থিতির অবনতির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মুসলমানেরা হাবশায় হিজরত করে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূলকে ছেড়ে যাওয়া পসন্দ[১] করলেন না। তিনি মক্কায় থেকেই তাবলিগের কাজ ও মযলুমদের সাহায্য এবং

১. এর বিপরীত একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও হাবশা হিজরত করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। পথে মক্কার সর্দার ইবনে দাগানার সাথে তাঁর দেখা। তাঁর উদ্দেশ্য জেনে সে বললো—"আপনি হিজরত করবেন না। আপনি প্রতিবেশীর হক আদায় করেন। সত্য কথা বলেন। অভাবীদের সাহায্য করেন। অসহায়দের দুঃখ দূর করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। আপনি মক্কায় ফিরে চলুন।" বস্তুত মক্কায় তিনি ফিরে আসলেন। ওয়াদা মতো ইবনে দাগানা খানায়ে কা'বায় ঘোষণা দিয়ে দেয়, আমি আবু বকরকে আশ্রয় দিয়েছি। কুরাইশরা এ আশ্রয়কে স্বীকার করলো। বাড়ীর সামনে একটি মসজিদ বানিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে নামায পড়তেন ও মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াতের সুরে মুশরিকদের নারী ও বাচ্চারা তাঁর চারিদিকে একত্রিত হয়ে মনোযোগের সাথে কুরআন শুনতো। এ অবস্থায় কুরাইশরা তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা হলো। আবার না তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। এ অবস্থায় তারা ইবনে দাগনার কাছে অভিযোগ করলো। সে তার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার কাফেরদের যুলুমের শিকারে পরিণত হলেন।

www.pathagar.com

তাদেরকে যালেমদের হাত থেকে মুক্ত করার কাজে দস্তুরমতো ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মক্কায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার করার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে আঞ্জাম দিতে থাকেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবাসীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে অন্যান্য আরব গোত্রকে দীনের দাওয়াত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি 'তায়েফ' গমন করলেন। ওখানকার লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে আচরণ করলো তা মর্মন্তুদ। এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে রাখতেন। যথাসম্ভব তাদের নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকেন।

অসহায় মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ

যদিও এ ব্যাপারে সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা এবং আবু বকরের জীবন চরিত রচয়িতাগণ বেশী কিছু আলোকপাত করেননি তারপরও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জীবনের উপর গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে একথা গোপন নয়, এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খামুশ হয়ে থাকেননি। বরং অভ্যাসমত তিনি হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহ আনহুও, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত সম্মানীত ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে অসহায় ও নিঃস্ব মুসলমানদেরকে কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতেন। তিনি তাঁর প্রতাপ প্রতিপত্তি দিয়ে ইসলাম বিরোধী অথচ মূর্তিপূজক কিছু কাফেরদের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তারা গরীব অসহায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের এ ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি তাদেরকে তাদেরই ভাই বন্ধুদের উপর মুশরিকদের অমানবিক আচরণের প্রকাশ্য নিন্দা এবং এদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে রাজী করিয়েছেন। সীরাত গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায়, মক্কার কাফেরদের মধ্যে এমন ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ মানুষও ছিলেন, যারা স্বধর্মাবলম্বী লোকদেরকে মুসলমানদের উপর যুলুম থেকে বিরত রাখতেন। এর উজ্জ্বল নমুনা হলো, কুরাইশরা যখন ষড়যন্ত্র করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুসলমানদের সাথে পরিপূর্ণ 'বয়কট' শুরু করলো এবং রাসূলুল্লাহ 'শায়ারে আবু তালেবে' অবরুদ্ধ হতে বাধ্য হলেন। একাধারে তিন বছর বয়কট চললো, মুসলমানদের রুজি-রুটির সব পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। মুসলমানদের এমন কষ্ট ও নির্যাতন দিতে লাগলো যা উল্লেখ করতেও কলম কেঁপে উঠে। কলিজা হয় উষ্ঠাগত। এ সময় অবশেষে কুরাইশদেরই কিছু লোক এ নিবর্তনমূলক অবরোধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ মুসলমানরা বয়কটের অবরুদ্ধতা হতে নিষ্কৃতি পেলেন। আমাদের বিশ্বাস আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রভাবের দ্বারা ঐসব ন্যায়পন্থী মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণেই সন্ধির বিরুদ্ধে দাবী উঠতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা ও নিবিষ্টচিত্তে ইসলামের তাবলিগে নিমগ্ন থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে এমন সুসম্পর্ক গড়ে উঠলো যার নজীর খুঁজে পাওয়াই দুরূহ। বাইয়াতে আকাবার পরে মদীনায় ইসলাম প্রচারিত হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের অনুসারীদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। কুরাইশরা মোটেই জানতে পারেনি, এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে হিজরত করবেন অথবা হাবশার হিযরতের মতো মুসলমানদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে নিজে মক্কাতেই থেকে যাবেন। এবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় হিজরত করার অনুমতিই চাইলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় যেতে বারণ করে দিলেন। তিনি বললেন, "এখন হিজরত করো না। হতে পারে আল্লাহ তোমার হিজরতের সময় কোনো সাথী বানিয়ে দেবেন, যিনি তোমার সাথে থাকবেন।"

হিজরতের প্রস্তুতি ও হিজরত

হিজরতের ঘটনার দ্বারা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঈমানের দৃঢ়তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে যেনো মদীনায় হিজরত করে যেতে না পারে সে জন্যে কাফেররা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলো না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদেরকে মক্কায় রেখেই নির্যাতন নিগ্রহ দিয়ে তিলে তিলে মারবে। 'দারুন নাদওয়ায়' বসে কাফেররা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে—এ খবরও হযরত আবু বকর রাদিয়ল্লাহ আনহু জানতেন। হিজরতের সময় যদি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকেন, আর আল্লাহ না করুন কাফেররা যদি তাঁকে হত্যা করার সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে তারা রাসূলের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও হত্যা করে ফেলবে। এত সবের পরও যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে হিজরত না করে মক্কায় থেকে যেতে বললেন, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করলেন। হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হবার নিশ্চিত ইঙ্গিত বুঝে খুশীতে আত্মহারা হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হবার মত নেয়ামত প্রাপ্তির সৌভাগ্যের সমান দুনিয়ার সকল নেয়ামত প্রাপ্তি এক সাথে মিলেও তা হতে পারে না। বস্তুত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী আর হিজরত করলেন না। তিনি ভাবলেন, যদি এ সময়ে শাহাদাত প্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জন হয়, তা হবে জান্নাতের সব নেয়ামাতের বিনিময়ে। আর এ নেয়ামাত প্রাপ্তির জন্য দুনিয়ার হাজারো বছরের জীবনকেও আনন্দচিত্তে বিসর্জন দেয়া যায়।

এদিন থেকেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'টি উটের ব্যবস্থা করে অপেক্ষা করতে লাগলেন রাসূলের হিজরতের সফর সঙ্গী হবার সৌভাগ্যজনিত হুকুমের জন্য। একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যার সময়

www.pathagar.com

আবু বকরের বাড়ীতে এসে খবর দিলেন। আল্লাহ তাঁকে মদীনায় হিজরত করার হুকুম দিয়েছেন। উদ্বিগ্নতার সাথে রাসূলের সফর সঙ্গী হবার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আনন্দভরে তা গ্রহণ করলেন। তিনি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন। এদিনই কুরাইশের যুবকেরা রাসূলে কারীমের বাড়ী অবরোধ করে বসলো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর থেকে বাহির হবার অপেক্ষা করতে লাগলো। হাতের তরবারীকে রাসূলে কারীমের রক্তে রঞ্জিত করার নেশায় তারা বিভোর। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাঁর সবুজ চাদর গায়ে জড়িয়ে নির্ভয়ে তার বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাই করলেন। গভীর রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ যুবকদের অমনোযোগের ফাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাড়ী চলে গেলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন সদাপ্রস্তুত। সাথে সাথেই তাঁরা ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে তিন মাইল দক্ষিণে 'গারে সাওরে' পৌছে গা ঢাকা দিলেন।

ভোরে রাসূলের মক্কা থেকে চলে যাবার খবরে চারিদিকে তার খোঁজে কুরাইশরা লোকজন পাঠাতে লাগলো। মক্কার আশেপাশের সকল মাঠে-ময়দানে পাহাড়ে-উপত্যকায় খোঁজা হলো। এমন কি খুঁজতে খুঁজতে গারে সাওরে গিয়েও পৌছলো তারা। জনৈক ব্যক্তি গারে সাওরে নামতে শুরু করলে আবু বকর ভীত হয়ে পড়লেন। শত্রুরা তাঁদের যেনো খোঁজ না পায় এজন্য তিনি নিশ্বাস পর্যন্ত থামিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশান্তির সাথে ও নির্বিঘ্নে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন রইলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উদ্বিগ্নতা দেখে তিনি ঝুঁকে কানে কান রেখে বললেন, 'লা তাহ্‌জান ইন্নাল্লাহা মায়া'না'—ভয় করো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। এদিকে কুরাইশ যুবক 'গারে সাওরের' চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলো এর মুখে মাকড়সা জাল বুনে আছে। এখানে থাকার সম্ভাবনা নেই. ভেবে সে ফিরে গেলো। কারণ, কোনো লোক এতে প্রবেশ করলে নিশ্চয়ই মাকড়সার বুনা জাল নষ্ট হয়ে যেতো। কুরাইশরা নিরাশার ছায়া মাড়াতে মাড়াতে ওখান থেকে চলে গেলো। তাদের বেশ দূরে চলে যাবার পর আল্লাহর রাসূল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে শোকর আদায় করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুও আল্লাহর কুদরতের এ বিস্ময়কর খেলা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

গারে সাওরে ভীতির কারণ

সাওর গুহায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনে যে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়েছিলো তাতে তিনি ভয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে—এ ভয় কি তাঁর নিজের জন্য ছিলো, না রাসূলে পাকের জীবনের জন্য?

www.pathagar.com

ইবনে হিশাম হাসানুল বসরী থেকে বর্ণনা করেন—'গভীর রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন গারে সাওরে উপস্থিত হলেন তখন হযরত আবু বকরই প্রথম গুহায় ঢুকলেন। গুহার অভ্যন্তর ভালভাবে দেখলেন। সাপ বিচ্ছু বা এমন কোনো হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে যা দ্বারা রাসূলের ক্ষতি হতে পারে। গুহার মুখে কুরাইশ যুবকদের দেখার মুহূর্তেও রাসূলের অনিষ্টের এ খেয়ালই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে উঁকি মেরেছিল। যে সময় তিনি ঝুঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুপে চুপে বললেন, "যদি তারা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পাবে।" সে সময়ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজের জীবন রক্ষার জন্য কিছু মাত্রও খেয়াল ছিলো না। রাসূলুল্লাহর এবং দীনে হকের জন্যই তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে নিজের প্রতি তাঁর কোনো লক্ষ্য ছিলো না। তিনি ভেবেছিলেন, আল্লাহ না করুন, এ সময়ে যদি কাফেররা রাসূলের জীবন নাশে সক্ষম হয় তাহলে দীন ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। রাসূল প্রেম ও দীনের জন্য নিজেকে এভাবে বিলীন করে দেয়ার পর নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ কোথায়? যে ব্যক্তি নিজেকে আগে থেকেই রাসূল-প্রেমে ফানাহ করে দিয়েছেন তার আবার ফানাহ হবার ব্যাপারে কি ভয় থাকতে পারে?

ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন অনেক ব্যক্তির খবর পাওয়া যাবে যারা আপন জীবনকে তাদের সর্দার ও বাদশাহদের জন্য কুরবান করে দিয়েছে। আজকালও এমন অনেক অনুসারী আছে যারা তাদের পূর্বসূরীদেরকে বেশ মর্যাদার চোখে দেখে। তাদেরকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসে। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওর গুহায় রাসূল প্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সকলের উর্ধে। রাজা-বাদশাদের ইতিহাস খুঁজে এমন কোনো উদাহরণ কি পাওয়া যাবে তাদের অনুরাগী অনুসারীদের কেউ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করতে পেরেছে? এ উদাহরণ পেশ করতে ইতিহাস অপারগ।

কাফেরদের তৎপরতা কিছু কমে আসলো। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওর গুহা হতে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এ যাত্রা পথেও এমন অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে যা সাওর গুহা হতে কম ছিলো না। মক্কা হতে বের হয়ে আসার সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে করে পাঁচ হাজার দেরহাম নিয়ে এসেছিলেন। এ দেরহাম ছিলো ব্যবসার মুনাফা। মদীনায় পৌছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন ওজীর ও মুশীর হওয়া সত্বেও তিনি একজন সাধারণ মুহাজিরের মত জীবনযাপন শুরু করেন।

মদীনায় আবু বকর

মদীনায় শহরতলীতে 'সাখ' নামক স্থানে খাজরাজ বংশের শাখা বনু হারিসের সাথে সম্পর্কশীল খারিজা বিন যায়েদের ওখানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.pathagar.com

বসবাস শুরু করেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন সে সময় হযরত আবু বকর এবং খারিজার মধ্যেই ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে দিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরিবার-পরিজন মক্কা হতে মদীনায় এসে পৌছলে তাদের সাথে তিনিও জীবিকা নির্বাহের উপায় বের করার সন্ধানে চেষ্টা শুরু করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর আত্মীয়স্বজনদের মতো হযরত আবু বকরের আত্মীয়স্বজনরাও আনসারদের ভূমিতে মালিকদের সাথে একত্রে কাজ করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে খারিজা বিন যায়েদও শামিল ছিলেন। খারিজার সাথে এভাবে আবু বকরের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। অতপর খারিজা তার কন্যা হাবিবাকে তার কাছে বিয়ে দেন। উম্মে কুলসুম হাবিবার গর্ভজাত সন্তান। আর হযরত আবু বকরের মৃত্যুর সময় হাবিবা সন্তান সম্ভাবা ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরিবার-পরিজন তাঁর স্যাথে 'সাখে' খারিজা বিন যায়েদের ওখানে ছিলেন না। বরং উম্মে রোমান, তাঁর কন্যা আয়েশা এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রায় সকল পুত্র সন্তানরা মদীনায় আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ীর নিকট বসবাস করতেন। প্রতিদিন আবু বকর 'সাখ' থেকে ওখানে আসতেন। অবশ্য তিনি ভিন্নভাবে 'সাখে' তার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন।

হিজরতের কিছুদিন পরই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জ্বরে আক্রান্ত হলেন। শুধু তিনিই নন বরং আবহাওয়ার অমিলের কারণে অধিকাংশ মুহাজিরই জ্বরের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বালুকাময় স্থানে অবস্থিত হবার কারণে মক্কার আবহাওয়া ছিলো শুষ্ক। আর মদীনার আবহাওয়া ছিল আদ্র। কারণ, এখানে বৃষ্টিপাতের দরুন গাছপালা জন্মাতো ঘরবাড়ী তৈরি হতো।

ভরণ-পোষণের দিক থেকে প্রশান্তি লাভ করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মক্কার জীবনের মতো মদীনায়ও ইসলাম প্রচার, রাসূলের সহযোগিতা এবং মুসলমানদের নতুন নতুন বিভাগ ও কেন্দ্রকে মযবুত করার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন।

ঈমানের মর্যাদা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু কোমল হৃদয় ও বিনয় চরিত্রের লোক ছিলেন। কিন্তু ইহুদী ও মুনাফিকদের মুখে ইসলাম সম্পর্কে হাসি-তামাশার কথা শুনলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন। মদীনায় তাশরীফ আনার পর পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় ঈহুদীদের একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ সন্ধির মাধ্যমে ইহুদী ও মুসলমান উভয় জাতিই আপন আপন ধর্মীয় প্রচারের কাজ, রীতিনীতির অনুসরণ ইত্যাদিতে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম প্রথম ইহুদীদের ধারণা ছিলো তারা মুহাজিরদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে অতপর মদীনার 'আওস-খাজরাজ' বংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলো এটা সম্ভব নয়। মুহাজির ও মদীনাবাসীদের মধ্যে এমন সম্পর্ক

www.pathagar.com

ইতিমধ্যেই স্থাপন হয়ে গেছে যা টুটে যাওয়া সম্ভব নয়। এ সময় তারা কৌশল পরিবর্তন করে মুসলমানদের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লেগে গেলো। ইসলাম সম্পর্কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা শুরু করলো। একদিন কয়েকজন ইহুদী তাদের একজন আলেম 'ফোখাস'-এর ঘরে বসেছিলো। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। ইহুদীদের এ সম্মেলনকে তিনি সুযোগ মনে করে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তিনি 'ফোখাস'কে বললেন—"হে ফোখাস আল্লাহকে ভয় করো। ইসলাম গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই তুমি জানো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর তিনি তাঁর তরফ থেকেই 'হক কথা' নিয়ে এসেছেন যা তোমাদের তাওরাতে পেয়েছো।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে একথা শুনে ফোখাসের ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠলো। সে বলতে লাগলো, "খোদার শপথ, হে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের কাছেই তাঁর প্রয়োজন। আমরা তাঁর দিকে ঝুঁকবো না। বরং তিনিই আমাদের কাছে ঝুঁকতে বাধ্য। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু তিনি আমাদের সাহায্য-সহযোগিতার অমুখাপেক্ষী নন। যদি আমাদের সাহায্য তার প্রয়োজন না থাকতো তাহলে আমাদের ধন-সম্পদ আমাদের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে নিশ্চয়ই তিনি নিতে চাইতেন না যেমন তোমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা। আল্লাহ তোমাদের সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে আমাদের সুদ প্রদান করেন। যদি তিনি আমাদের কাছে ঠেকা না থাকবেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতে যাবেন কেন ?"

এ অপবিত্র কথাগুলো দ্বারা 'ফোখাস' পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের প্রতি কটাক্ষ করছিলো। সে আয়াতটি হলো ঃ

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط

"কে আছে যে আল্লাহকে করজ দিবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ সে ব্যক্তির ধন-সম্পদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দিবেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৫)

'ফোখাস'কে আল্লাহর কালাম নিয়ে ঠাট্টা করতে দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ফোখাসকে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারলেন যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। এরপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহর দুশমন ! মুসলমান আর ইহুদীদের মধ্যে যদি সন্ধিচুক্তি না থাকতো তাহলে আল্লাহর কসম আমি তোর ঘাড়ই মটকিয়ে দিতাম।"

এটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার নয় ? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কোমল চিত্তের লোক হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে এতো উত্তেজিত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিলেন। তাছাড়াও তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের উর্ধে। এ বয়সে সাধারণত মানুষের স্বভাবে ক্ষিপ্রতা ও উত্তেজনা বেশী থাকে না। এতদসত্ত্বেও দীন ও ঈমানের প্রশ্নে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফোখাসের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে পারেননি। এটা ছিলো প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানী শক্তির অভিব্যক্তি। এ ঘটনা প্রমাণ করে তিনি আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপকে কোনো অবস্থাতেই সহ্য করতে পারতেন না।

রোমীয়দের বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে এ ধরনের আরো একটি ঘটনা আমাদের চোখে ভেসে উঠে। হিজরতের দশ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন ইরান রোমের উপর বিজয় লাভ করেছিলো। যেহেতু ইরানীরা ছিলো 'অগ্নি উপাসক' আর রোমকরা ছিলো 'আহলী কিতাব' এ কারণে রোমীয়দের পরাজয়ে মুসলমানরা মনে মনে আহত হয়েছিলেন। রোমকদের বিজয় ছিলো মুসলমানদের কাম্য। এ সময়ে একজন মুশরিক স্বধর্মীয় জাতি ইরানীদের বিজয়ের কথা উল্লেখ করে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। একথায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে খুব ব্যথা পেলেন। ঠিক এ সময়ই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হলো ঃ

الٓمّٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّومُ ۙ فِىٓ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۙ فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ -(الروم : ١-٤)

"যদিও রোমীয়রা ইরানের হাতে পরাজয় বরণ করেছে কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার ইরানীদের উপর বিজয় লাভ করবে।"-(সূরা আর রূম ঃ ১-৪)

এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের সাথে এক বছরের মধ্যে ইরানের উপর আবার রোমানদের বিজয়ের শর্ত লাগালেন। পরে রাসূলে কারীমের ইরশাদ অনুযায়ী তিনি এ শর্তের সময়সীমা নয় বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করলেন। যদি তা না হয় তাহলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দশটি উট দিবেন বলে অঙ্গীকার করলেন।

এ ঘটনা হতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, অত্যন্ত ধীর স্থীর ও কোমলমতি হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও আকীদার প্রশ্নে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইস্পাত কঠিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে দীনে প্রবেশ করার পর থেকে তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরায় সত্য ঈমানের স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে এ সত্য ঈমানের রং তক্ তক্ করে জ্বলতো। ব্যবসা-বাণিজ্য, বংশ-মর্যাদা, মনের বাসনা, এমন কি দুনিয়ার যে কোনো

www.pathagar.com

জিনিসই যা মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের তুলনায় এসব জিনিস তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিলো। তাঁর দেহ মন-মেজাজ আত্মা সবকিছুই শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে ছিলো নিবেদিত। এ ঈমানী প্রেরণাই তাঁকে আধ্যাত্মিকতার উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করে সিদ্দীকীন তথা সত্যবাদীদের দলভুক্ত করেছিলো।

বদরের যুদ্ধ

হিজরতের কিছুদিন পরই বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানরা রণাঙ্গনে স্ব স্ব স্থান নিয়ে পরস্পর পরস্পরের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেলো। হযরত সায়াদ বিন মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শে মুসলমানরা নিকটস্থ একটি পাহাড়ে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি এ শামিয়ানার মধ্যে এসে বসুন। মুসলমানদের অবস্থা যদি ভালো মনে না হয়, তাহলে উটে চড়ে মদীনায় চলে যাবেন। এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে কেবলামুখী হয়ে সিজদায় পড়লেন। আল্লাহকে তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সাহায্য ও মুসলমানদের বিজয় কামনা করে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك ! اللهم فنصر كالذى وعدتنا اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد !

> "হে আল্লাহ ! এরা হলো মুশরিক কুরাইশ। বিরাট শক্তি নিয়ে তারা তোমার রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন ও ধ্বংস করার জন্য এখানে এসেছে। মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারে তোমার ওয়াদা আছে। হে আল্লাহ ! তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করো। এ ক্ষুদ্র দলটি এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ভবিষ্যতে এ জমিনে তোমার নাম নেবার কেউ থাকবে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন। বার বার তিনি আকাশের দিকে হাতকে উঁচু করে তুলে দোয়া করতে লাগলেন। হাত থেকে চাদর বারবার মাটিতে পড়ে যেতো। অবশেষে তিনি অবচেতন হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায়ই আর একবার আল্লাহর তরফ থেকে মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের সুখবর দেয়া হলো। প্রশান্তি লাভ করে তিনি শামিয়ানা হতে বেরিয়ে আসলেন। এবার খুব উচ্চস্বরে মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালাবার হুকুম দিলেন। তিনি বললেন, "যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীন প্রতিষ্ঠার আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে যুদ্ধ করে যাবে। যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। তার জন্য জান্নাত অবধারিত।"

www.pathagar.com

যদিও প্রথম থেকেই আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধে বিজয়ের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। তবু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দরবারে অত্যন্ত মিনতি সহকারে দোয়া চাইতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ থেকে মুসলমানদের বিজয়ের শুভ সংবাদ আসেনি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবার হতে তিনি হাত নামাননি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি অবশ্যই মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। এরপরও তাঁর কাছে অবিরত মিনতি জানিয়ে দোয়া করা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা রাসূলের শান। কেননা আল্লাহ তার সৃষ্টিজগতের অমুখাপেক্ষীও। বলা যায় না যদি যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, আর এতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে মুসলমানদের সাথে করা ওয়াদা 'বিজয়কে' সুদূর পরাহত করে দেন, তাহলে তারা প্রথম অবস্থায়ই নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবেন।

যুদ্ধের এ পুরো সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে ছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিলো, 'জয়' মুসলমানদের অবশ্যম্ভাবী। এদের উপর নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। এজন্য তিনি বিনয় বিস্ফারিত নেত্রে, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মুসলমানদের বিজয়ের জন্য আল্লাহকে তাঁর দেয়া ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। বার বার রাসূলে কারীমের গায়ের চাদর মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা রাসূলের কাঁধে আবার উঠিয়ে দিতে দিতে বলতেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি ঘাবড়িয়ে যাবেন না। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য ও বিজয় দান করার ওয়াদা দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদা তিনি পালন করবেন।"

এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীদের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখতেও রাজী নয়। এটাকেই তারা মযবুত ঈমানের পরিচায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু পরিপূর্ণ ঈমানদার হবার পরও অত্যন্ত কোমলমতি লোক ছিলেন। কর্কশ, কঠোরতা, নির্মমতা ইত্যাদি তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। নিজের পুরো মুঠে পেয়েও শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়া, বিজয় লাভ করার পরও শত্রু বাহিনীর সাথে ভাল ব্যবহার করা ছিলো তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এভাবে তাঁর মধ্যে ন্যায়, সততা, সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগ এবং দয়া ও দানশীলতার প্রতি আগ্রহ এসব জিনিসই এক সাথে পাওয়া যেতো। সত্যের পথে তিনি নিজের জীবন কুরবান করাকেও সামান্য বলেই মনে করতেন। আল্লাহর দীনের কালেমার খাতিরে যে কোনো কুরবানী স্বীকার করতে তিনি হৃষ্ট চিত্তে রাজী থাকতেন। কিন্তু সত্যের বিজয় ঘটবার পর শত্রুপক্ষের উপর অত্যাচারের খড়গ হস্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াকে তিনি খুবই অপসন্দ করতেন। শত্রুর ব্যবহারের পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ভালো ব্যবহার, দয়া, ভদ্রতা ইত্যাদি প্রদর্শন করাই ছিলো তাঁর চরিত্রের অলংকার।

www.pathagar.com

বদরের বন্দীদের সম্পর্কে সুপারিশ

বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর সত্তরজন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। এ বন্দীদের হাতেই দীর্ঘ তের বছর যাবত মুসলমানরা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছে। কাফেররা মনে করলো, মুসলমানদের উপর অত্যাচার, অবিচার করার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করার সময় ও সুযোগ তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। মুসলমানরা এখন যতো অত্যাচারই করুক না কেনো তাদের অত্যাচারের তুলনায় তা হবে খুবই নগণ্য। মুসলমানদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আবেদন জানানো ছাড়া আর কোনো পথই দেখতে পেলো না। বস্তুত কাফেররা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে মিনতির স্বরে বললো ঃ

"হে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরা যারা আজ তোমাদের হাতে বন্দী। এদের কেউ তোমাদের পিতা, কেউ ভাই, কেউ চাচা, কেউ মামা। যদি তোমরা আমাদের হত্যা করো অথবা কোনো রকম নির্যাতন করো তাহলে এ নির্যাতন বা হত্যা করবে তোমাদের আপনজন ও নিকটাত্মীয়দেরকেই। আমরা নিকটাত্মীয়ের অধিকারের দাবী জানিয়ে তোমার কাছে আবেদন করছি। তুমি মুহাম্মদের কাছে সুপারিশ করে আমাদের জীবন ভিক্ষা দাও অথবা আমাদের উপর দয়া করে মুক্তি দাও কিংবা ফিদইয়া (বন্দী বিনিময় মূল্য) নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।"

কুরাইশদের এ আকুতি-মিনতি শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য কোনো মঙ্গলকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ওয়াদা করলেন। কুরাইশরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতাকে ভয় করতো। তিনি কোনো গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসেন কিনা তাদের এ আশংকা ছিলো। তারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বলা কথাগুলো মিনতি সহকারে জানালো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চোখ রাঙ্গিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না বলেই চলে গেলেন। কৃত ওয়াদা অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুশরিকদের সম্পর্কে সুপারিশ জানালেন। বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমরের মত ছিলো তাদের সকলকে হত্যা করা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মতের সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি বার বার অনুরোধ করে রাসূলে পাককে সম্মত করালেন। ফিদইয়ার বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করা হলো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ তাঁর প্রশস্ত ও পবিত্র হৃদয়ের কোমলতার পরিচায়ক। তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝে থাকতে পারেন যে, অবশেষে করুণা প্রদর্শনের মাঝেই কাফেরদের পরাজয় নিহিত।

এত অত্যাচারিত নির্যাতিত হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্তি সঞ্চয় করে কাফেরদের মুঠির ভেতর পেয়েও যদি তাদের সাথে করুণা করেন,

www.pathagar.com

তাহলে তারা ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হবে বেশী। শক্তি দিয়ে মানুষকে দৈহিক নির্যাতন দেয়া যায় বটে মন জয় করা যায় না। করুণা ও ভালবাসার বন্ধনই প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নিজের দিকে অথবা কোনো আদর্শের দিকে টেনে আনা যায়।

বদরের যুদ্ধের পরে

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য নব দিগন্তের সূচনা করলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনেও আনলো এক নতুন মোড়। এ যুদ্ধের পর মুসলমানরা এক নতুন পদ্ধতিতে নিজেদের রাজনীতিকে সুসংহত করতে শুরু করলো। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ হলো। এদিকে শত্রু পক্ষও তাদেরকে ঘৃণা ও ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলো। এ যুদ্ধের ফলাফলে ইহুদী জাতির চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো। তারা বুঝলো যে মুসলমানরা আর তাদের দয়ার উপর বসবাস করবে না। মদীনার আশেপাশের লোকগুলোর মনেও এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হলো। তারা ভাবলো এবার মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের দিকে নিপতিত হবে। অতএব ইহুদী ও আশেপাশের সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সতর্ক ও সচেতনভাবে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে লাগলেন। সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় রাসূলুল্লাহর খাস পরামর্শদাতা ছিলেন। এ মহান দু' ব্যক্তির চরিত্রে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো। এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয় অত্যন্ত সরল ও রাসূলুল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন। অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দান করতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ দু'জন ছাড়াও অনান্য প্রভাবশালী মুসলমানদের সাথেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ করতেন।

ওহোদের যুদ্ধ

ইহুদীদের হিংসা-দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা অবশেষে চরম আকার ধারণ করলো। মুসলমানদের বিরোধিতায় তারা প্রকাশ্যে উঠে পড়ে লেগে গেলো। এর ফলে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা বনু কাইনুকা গোত্র ঘেরাও করে তাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দিলেন। মদীনার চারিদিকের অন্যান্য গোত্রগুলো একত্রিত হতে শুরু করলো। কিন্তু এদের বিরোধিতাও মুসলমানদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো না। কোনো ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হলে মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনী ওদিকে প্রেরিত হলে তারা পালিয়ে যেতো। মুকাবিলা করার সাহস তারা সঞ্চয় করতে পারতো না।

মদীনায় সংগঠিত যে কোনো খবরই বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিত গতিতে মক্কায় পৌঁছে যেতো। কিন্তু মুসলমানদের এ সফলতা কাফেরদেরকে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ স্পৃহা গ্রহণ করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। এক বছর পর তারা একদল দুর্ধর্ষ সেনা নিয়ে

www.pathagar.com

মদীনায় চড়াও হলো। ফলে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু কিছু কিছু মুসলমান যুদ্ধ-কৌশল ও নেতার নির্দেশ না মানার কারণে অবশেষে তা ভিন্ন দিকে মোড় নিলো। পেছনের দিক থেকে যেন মুসলমানদের হামলা করতে না পারে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুসংখ্যক লোককে পাহাড়ের পাদদেশে এক জায়গীয় মোতায়েন করে রাখলেন। কোনো অবস্থাতেই এ জায়গা ত্যাগ না করার নির্দেশ দিলেন তাদেরকে ; কিন্তু তাঁরা কাফেরদেরকে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে ও মুসলমানদেরকে গনিমাতের মাল কুড়াতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ভুলে গেলেন। নিজেদের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে এসে পৌছলেন। বিপক্ষ সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালিদ দূর থেকে এ অবস্থা দেখে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বসলো। পেছনের দিক থেকে সে মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ হানলো। অতর্কিত এ হামলার প্রচণ্ডতা মুসলমানরা প্রতিহত করতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কাফেরদের পাথর নিক্ষেপে এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন। এ সুযোগে কাফেররা রটিয়ে দিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মুসলমানরা মনোবল হারিয়ে ফেলল। এ সময় মুসলমানদের কিছু জানবাজ মর্দে মু'মিন যদি রাসূলে কারীমকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে কাফেরদের প্রতিহত করতে না পারতেন এবং খোদা না করুন রাসূলুল্লাহ যদি শহীদ হতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস লেখা হতো অন্যরূপে। আল্লাহর ফজলে কাফেরদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি। ক্ষণিকের এলোমেলো অবস্থার পর মুসলমানরা আবার একত্রিত হয়ে কাফেরদেরকে পিছু হটিয়ে দিলেন। এ যুদ্ধেও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবদান ছিলো অপরিসীম।

ওহোদের যুদ্ধের পর মক্কা বিজয় পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে অবিরত যুদ্ধ নতুবা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো। হাই বিন আখতারের নেতৃত্বে একদিকে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেবার পরিকল্পনা করছিলো। অপরদিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে পরাজিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। এ সময় ছোট ছোট কিছু ঘটনা ছাড়াও বনু নজির, খন্দক, বনু কুরাইজার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিলো ইহুদীদের হিংসাত্মক রাজনীতি এবং কুরাইশদের ক্রোধের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। এসব ঘটনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিত্য সাথী হিসাবে সকলের চেয়ে বেশী সাহসিকতা, দৃঢ়তা, স্থিরতা, সত্যবাদিতা এবং ঈমানদারীর পরিচয় দিয়েছেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরতের ছয় বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহ পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে মুসলমানদেরকে মক্কায় যাবার আদেশ দিলেন। এ খবর পেয়ে কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাথী-সঙ্গীদের যে

www.pathagar.com

কোনো মূল্যে মক্কায় প্রবেশ ও ওমরাহ্ আদায় করার অনুমতি না দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো।

মক্কার কিছু দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের কাছে খবর পাঠালেন যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য কোনো যুদ্ধ বা ঝগড়া-কলহ বাধানো নয়। শুধু ওমরাহ্ পালন করার উদ্দেশ্যে তারা মক্কায় আসছে। কুরাইশদের তরফ থেকে দূত আসা শুরু হলো। অবশেষে এ বছর মুসলমানরা ফিরে যাবে ও আগামী বছর এসে ওমরাহ্ পালন করবে। এ মর্মে সন্ধি স্থাপিত হলো।

মুসলমানরা বিশেষ করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সন্ধিকে পসন্দ করলেন না। সন্ধির শর্তগুলোকে মর্যাদাহানিকর ও নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ বলে মনে করলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব শর্ত আগ্রহ সহকারে মেনে নিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সন্ধি চুক্তি করছেন, নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো না কোনো রহস্য নিহিত আছে। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই তা সমাধা হয়েছে। এখানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর একবার মযবুত ঈমানের পরিচয় দান করলেন।

সূরা ফাতাহ নাযিল হবার পর মুসলমানরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'ফাতেহ মুবিন' (প্রকাশ্য বিজয়) বলে বুঝতে পারলেন। এ বিজয় আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতপক্ষে তার প্রিয় রাসূলকে দান করেছেন।

এখন থেকে মুসলমানদের শক্তি সঞ্চয় ও দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে লাগলো। খায়বার, ফেদাক, তিমা অবরোধ করে ইহুদীদেরকে অনুগত হতে বাধ্য করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য, রোম, মিসর, হিরা ও ইয়েমেন সহ অন্যান্য অনেক দেশের বাদশাহদের নামে চিঠি লিখে দূত পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত পাঠালেন। মক্কা বিজয় ও তায়েফ অবরোধের কারণে মুসলমানদের বেশ উন্নতি অগ্রগতি সাধিত হলো। সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের আলোক রশ্মি ঝলমল করে জ্বলতে লাগলো। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত সুদূর ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌছলো। এরপর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী মুসলমানরা স্বস্তি ও প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সুযোগ পেলো। ইসলামের এ নব উত্থিত শক্তিকে দুনিয়া হতে এক ফুঁৎকারে নিভিয়ে ফেলা আর কারো পক্ষে সম্ভব হলো না।

মুসলমানদেরকে পরাভূত করতে না পেরে এবং দিন দিন মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে অতপর আরববাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এ অগ্রগতি দুনিয়ার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একজন লোক একটি আদর্শের দাওয়াত নিয়ে উঠলেন। জাতি তাঁর ঘোর বিরোধিতা করলো। ইহুদী জাতি বদ্ধপরিকর হয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। আরবের বিভিন্ন গোত্র শত্রুতায় নেমে

www.pathagar.com

পড়লো। কিন্তু সকল বিরোধিতা ও শত্রু পক্ষকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর দাওয়াত চালিয়ে গেলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক ও মুশরিকসহ সব বিরোধী শক্তি অবশেষে পরাজিত হয়ে তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। সত্য অবশ্যম্ভাবী বিজয় লাভ করে। আর অসত্য ও বাতিল হয় পরাভূত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, না মিথ্যার উপর এবং তাঁর দাওয়াত সত্য ছিলো না মিথ্যা এ ব্যাপারটি মীমাংসা করার জন্য শুধু এ প্রমাণই যথেষ্ট। চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তৎকালীন সব পরাশক্তির উপর বিজয় লাভ করেন। সকল শক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে পরাজয় বরণ করে। তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে শাসন দণ্ড পরিচালনা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি শুধু চাইতেন, এসব লোক আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসস্থাপন করে তাঁর হুকুম মেনে চলুক। নেক কাজ করে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিগণিত হোক।

আমীরুল হজ্জ

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের পথের সমস্ত অন্তরায় দূর হয়ে গেলো। এখন থেকে তিনি দীনের ফরযও ওয়াযিব কাজ সহ সকল হুকুম সহজে বাস্তবায়িত করতে পারতেন। কিন্তু সে সময় দলে দলে লোক মদীনায় আগমনের দরুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ পালন করতে পারছিলেন না। এজন্য মক্কা বিজয়ের পরের বছর তিনি নিজের পরিবর্তে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তিনি তিনশত মুসলমান নিয়ে মক্কা পৌছলেন এবং হজ্জের ফরয কাজসমূহ আদায় করলেন। এ হজ্জের সময়ই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজে ঘোষণা করে দিলেন, এবারের পর থেকে কোনো মুশরিক আর হজ্জ করতে পারবে না। চার মাসের মধ্যে মুশরিকদেরকে মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। সেদিনের ঘোষণা থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মুশরিক আল্লাহর ঘর জিয়ারত করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও আর কোনোদিন পারবে না।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং মক্কায় গমন করলেন। এ হজ্জকেই বিদায় হজ্জ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ হজ্জ। তার সাথে এ হজ্জে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্যান্য সাহাবা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ছিলেন। এবারে আরাফাতের ময়দানে অসংখ্য লোক হাজির হয়েছিলো। এ জায়গায় আজকের লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনলেন। অথচ এ জাগয়াই একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কেউ শুনতে রাজী ছিলো না।

www.pathagar.com

হজ্জ সমাপন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সিরিয়ায় সামরিক অভিযান প্রেরণের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। এ বাহিনীর প্রধান ছিলেন হযরত উসামা বিন যায়েদ। এ অভিযানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও তাঁর অধীনে ছিলেন। মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় এ বাহিনী পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তারা যাত্রা বিরতি করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এ অভিযান চালানো আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।

নামায পড়াবার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নামায পড়াবার নির্দেশ দিলেন। এ ব্যাপারে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার একটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থ অবস্থায় নামায পড়াবার জন্য হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে আরজ করতে এলে তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নামায পড়াতে বলো। আমি বললাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খুবই কোমলমতি লোক। নামায পড়াবার জন্য তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না। ফলে নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যেতে পারে। আপনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নামায পড়াবার আদেশ দিলেই ভাল হতো। একথা শুনার পরও আবার তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নামায পড়াতে বলো। এরপর আমি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বললাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কোমল প্রাণ ব্যক্তি। নামাযের মধ্যে তিনি কান্না শুরু করে দেবেন। আর এতে নামাযে দোষ-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলুন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরিবর্তে যেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নামায পড়াতে আদেশ করেন। হযরত হাফসা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বললে উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা ঐ জাতি যারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মন ভোলাতে চেষ্টা করেছো। তোমরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলো নামায পড়াবার জন্য। এরপর হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহা ফিরে এসে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বললেন, তুমি অযথা আমাকে লজ্জিত করলে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নামায পড়ালেন। একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। নামাযের সময় হয়ে গেলো। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে না পেয়ে হযরত ওমরকে নামায পড়াতে বললেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উচ্চস্বরের তাকবির হযরত

www.pathagar.com

আয়েশার কক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছালে তিনি বললেন, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কোথায় ? আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা তো তাঁর নামায পড়ানোকে ভালোবাসেন।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামায পড়ানোর নির্দেশকে অনেকে তাঁকে খেলাফতের জন্য মনোনীত করার ইঙ্গিত বলে মনে করেন। কারণ, নামায পড়ানোই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার প্রমাণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় একদিন মসজিদে আগমন করলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহ তার বান্দাকে, দুনিয়া বা আখেরাতের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দান করেছেন। কিন্তু এ বান্দা আখেরাতে আল্লাহর নৈকট্যকে গ্রহণ করেছে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা নিজেকে উদ্দেশ করেই বলেছেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা বুঝতে পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের জীবন, আমাদের বংশধর সবই আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমরা কি আপনার পরে জীবিত থাকতে পারবো ?"

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দরজা ছাড়া মসজিদের দিকে অন্য সকলের ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে ইশরা করে বললেন ঃ

"আমি সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর চেয়ে উত্তম আর কাউকে পাইনি। মানুষের মধ্যে যদি আমি কাউকে খলিল বন্ধু বানাতাম—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বানাতাম। কিন্তু আবু বকরের সাথে আমার সম্পর্কে এক সাথে চলা বা সহচর ভাই এবং ঈমানদার হিসাবে। এমন কি আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছেও একত্র করবেন।"

মৃত্যুর দিন ভোরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং ফযল বিন আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আগমন করলেন। সে সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নামায পড়াচ্ছিলেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে অপরিসীম খুশী হয়ে তাঁকে জায়গা করে দেবার জন্য এদিক ওদিক সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। ইশারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে স্ব স্ব জায়গায় থাকার হুকুম দিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা বুঝতে

www.pathagar.com

পেরে নিজের জায়গা হতে পিছে চলে এসে তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু ইশারায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর জায়গায় দণ্ডায়মান থাকতে বলে দিলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাম পাশে বসে পড়লেন। বসে বসেই তিনি নামায আদায় করলেন।

নামায শেষে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে তাশরিফ আনলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর জ্বর এলো। একটি থালায় করে কিছু ঠাণ্ডা পানি তিনি চেয়ে নিলেন। এ পানি দিয়ে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুতে লাগলেন। এর কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র আত্মা আরশের দিকে উড়ে চলে গেলো।

www.pathagar.com

২

খেলাফতের বাইয়াত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

১১ হিজরী সনের ১২ রবিউল আউয়াল, মুতাবেক ৩ জুন, ৬৩২ ঈসায়ী রোজ সোমবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এদিন ভোরে তিনি কিছু সুস্থতাবোধ করে হযরত আয়েশার ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে এলেন। লোকজনের সাথে কিছু কথাবার্তা বলে উসামা বিন যায়েদের বাহিনীর জন্য দোয়া করলেন। তাকে তাঁর বাহিনী নিয়ে রোমের দিকে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। এরপর আবার তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ লোকজন তাঁদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যাবার সংবাদে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তরবারী হাতে করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মসজিদে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ

> "রাসূলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন, একথা যে বলবে আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করেননি বরং মালিকের কাছে গমন করেছেন। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম গমন করেছিলেন মালিকের কাছে আবার চল্লিশ রাত অতিবাহিত হবার পর ফিরে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই আবার আসবেন এবং মুনাফিকদের হাত-পা কেটে দিবেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আয়েশার ঘরে পৌছিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখে মদীনার শহরতলীতে নিজের বাড়ী চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তিনি দ্রুত মদীনায় চলে এলেন। তরবারি হাতে করে তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মসজিদে নববীতে লোকজনদেরকে ধমকাচ্ছিলেন। এদিক ওদিক ভ্রূক্ষেপ না করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সরাসরি বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহের কাছে গিয়ে চেহারা মুবারক হতে চাদর সরিয়ে নিয়ে মুখে চুমু খেলেন এবং বললেন, "কি বরকতপূর্ণ জীবন আপনার। কত পবিত্র আপনার মৃত্যু।" এরপর আয়েশার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মসজিদে নববীতে গিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

www.pathagar.com

ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت ـ

"হে লোক সকল ! যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদাত করেছো তারা জেনে রেখো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদাত করেছো। তারা জেনে রেখো আল্লাহ অমর। তাঁর মৃত্যু নেই।"

এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ۭ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ۭ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ! তাঁর আগেও অনেক নবী অতিবাহিত হয়েছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা শহীদ হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পূর্ব জীবনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কানে এ শব্দগুলো পৌঁছলে তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তাঁর মগজের উপর ছেয়ে থাকা আবরণ যেনো আস্তে আস্তে সরে গেলো। ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস জন্মালো যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে ঢলে পড়লেন।

এ ঘটনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব ও অন্তর উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রমাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের সবচেয়ে বড় ইহসানকারী ও একনিষ্ঠ সাথী। সমগ্র চড়াই-উৎরাইতে তিনি যাঁর নিত্য সাথী ছিলেন, তিনি আর জগতে বেঁচে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানে সবচেয়ে বেশী মনোবেদনা, দুঃখের দাহন তাঁরই থাকার কথা সবচে' বেশী। রাসূল প্রেমিকদেরকে স্বাভাবিক রাখার জন্য আল্লাহর অমোঘ বিধান রাসূলের মৃত্যুতে সময়ের প্রয়োজনে তিনি আজ লৌহ কঠিন। কত বড় মনোবলের পরিচয় তিনি আজ দিলেন। তাঁর তিরোধানের মর্মব্যথা, হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়নি। এখানেই ব্যবধান। যখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তখনই তিনি উপস্থিত রাসূল প্রেমিকদেরকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করে দিলেন।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংযম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ভাষণ পেশ করলেন, তা-ই তাঁর আত্মসংযমের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। বিপদে-আপদে, কঠিন ও দূর্যোগপূর্ণ সময়ে ধীরস্থিরভাবে সমস্যা মুকাবিলা করার হিম্মত ও প্রজ্ঞা তাঁর কতটুকু ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের মত দুঃখবহ ঘটনা ও ঘন-ঘোর বিপদ সংকুল দিনগুলোতেই সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মোমের মত কোমলমতি একজন মানুষ থেকে এমন ইস্পাত কঠিন পদক্ষেপ দুনিয়াকে বিস্মিত করেছে। প্রলয়-সম এ ঘোর বিপদে লাজ-নম্র, করুণ হৃদয়, বিনয়ী ব্যক্তির কাছ থেকে এত সাহসীকতাপূর্ণ পদক্ষেপ, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ তাঁর প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ। এ কঠিন বিপদসংকুল সময়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এহেন দৃঢ় ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কলহের ঝাঞ্ঝাবর্ত থেকে বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়তো।

খেলাফতের সমস্যা

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরো যেসব মুসলমান মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারিদিকে উপস্থিত ছিলেন, তারা ছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরহ ব্যথায় মুহ্যমান। তাই তারা চিন্তাও করতে পারেনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ রাখার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। আর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছেন। তাঁরা রাসূলকে হারাবার ব্যথায় ব্যথাতুর হলেও খেলাফতের জটিল সমস্যার প্রতি তাদের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। রাসূলের অদম্য বিরহ ব্যথা সত্ত্বেও দীনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত তাঁর শাসনব্যবস্থা ধরে রাখার চিন্তা হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

হিজরতের পর মদীনার সার্বিক ব্যবস্থা ছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে। আর তাঁর হুকুমতও শুধু মদীনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং এর সীমা ধীরে ধীরে গোটা আরবেই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। আর সে সময় আরবের প্রায় সব লোকই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলো। আর যারা মুসলমান হয়নি তারা 'জিযিয়া কর' আদায় করে মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করতে রাজী ছিল। এখন মুসলমানদের সম্মুখে সমস্যা হলো একটি, আর তাহলো এ নতুন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কর্ণধার হবেন কে ? কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন ?

আনসার ও মুহাজিরদের মতভেদ

আনসারদের ধারণা ছিলো মুহাজিরদেরকে সে সময় তাদের স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তারাই সে বিপদের সময় তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহায্য করেছে, তাই খেলাফত পাবার অধিকার এখন তাদেরই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায়ও তারা দু' একবার এমন কথা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছিলো যে, তারা মুহাজিরদের চেয়ে নিজেদেরকে অগ্রগণ্য ও উত্তম মনে করতো। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়েফের ঘটনায় যথেষ্ট গনিমাতের মাল পাওয়া গেলো। মক্কার যেসব লোক তখন নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে এ গানিমাতের মাল বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায়ও আনসারদের কিছু কিছু লোক আপত্তি তুলেছিলো। তারা বলতে লাগলো "রক্ততো আমাদের তরবারি হতে গড়িয়ে পড়েছে। আর গানিমাতের মাল চলে গেলো মক্কায়।" এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছলে তিনি খাজরাজ বংশের নেতা সায়াদ বিন উবাদাকে আনসারদের সব লোককে একত্র করার নির্দেশ দিলেন। সকলে একত্রিত হলে তিনি বললেন ঃ

"হে আনসারেরা ! তোমাদের একটি কথা আমার কানে পৌছেছে। গানিমাতের মাল সম্পর্কে তোমরা অভিযোগ তুলেছো। এর আগে কি তোমরা আমার কথাগুলোর জবাব দেবে ? একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে। আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা গরীব ছিলে। আমার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের ধনী বানিয়েছেন। তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। আমার কারণে তোমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হলে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথাগুলো শুনে আনসারগণ লজ্জায় মাথানত করে ফেললো। তারা বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর যথেষ্ট ইহসান করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ

"হে আনসারগণ ! তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন ?"

কিন্তু আগের মতই তারা মাথানত করে বসে থেকে এছাড়া আর কিছুই বললো না ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমরা আপনাকে কি জবাব দেবো ? নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর অনেক ইহসান করেছেন।"

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তরফ থেকে জবাব দিলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ ! তোমরা চাইলে বলতে পারতে। তোমাদের বলাও সত্যিই হতো। তোমরা বলতে পারতে, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম ! আপনার জাতি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনি আমাদের কাছে আগমন করেছেন। আমরা আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার জাতি আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। আমরা আপনাকে মদদ যুগিয়েছি এবং আশ্রয় দিয়েছি। আপনি নিঃস্ব অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছেন। আমরা আপনাকে প্রয়োজনের সবকিছু সরবরাহ করেছি। আপনি ভগ্ন হৃদয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমরা আপনার মন ভুলিয়েছি।"

এসব কথাগুলো বলার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা আবেগাকুল ছিলো। তিনি আরো বলতে থাকেন ঃ

"দুনিয়ার অতি সামান্য জিনিসের ব্যাপারে তোমরা এসব কথা বলেছো। গানিমাতের মাল আমি শুধু মন যোগানোর জন্যই কুরাইশদের নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকদেরকে দিয়েছি। তারা যেনো ইসলামকে মযবুতভাবে গ্রহণ করে। তোমরা তো আগে থেকেই ইসলামের উপর অটুট আছো। তোমাদের মন যোগানোর জন্য তো কিছু দেবার প্রয়োজন নেই। হে আনসারগণ ! তোমরা একথার উপর সন্তুষ্ট নও, অন্যরা উট আর ছাগল নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা সাথে নিয়ে যাবে আল্লাহর রাসূলকে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, যদি হিযরাত সংঘটিত না হতো, তাহলে আমি আনসারদের একজন লোক হতাম। যদি মানুষ এক পথে চলতো আর আনসাররা চলতো অন্য এক পথে—তাহলে আমি আনসারদের পথ অবলম্বন করতাম। হে আল্লাহ ! তুমি আনসারদের উপর রহম করো। আনসারদের সন্তানদের উপর এবং তাদের সন্তানদের উপরও।"

অন্তরের গহীন কোণ থেকে উৎসারিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলো আনসারদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে দিলো। অশ্রুজলে তারা বুক ভাসিয়ে দিলো এবং সমোস্বরে তারা বলে উঠলো ঃ

"আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্টনে ও দানে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট আছি।"

হুনাইনের ঘটনাতেই আনসারদের মনে খটকার সৃষ্টি হয়েছিলো শুধু তা নয়। বরং এর আগে মক্কা বিজয়ের সময়ও তাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিলো। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের উদ্দেশে বক্তৃতা পেশ করতে, খানায়ে কাবার মূর্তি ভাংতে এবং বহু পুরাতন জাত শত্রুদেরকে ইসলামের ছায়াতলে দলে দলে আসতে দেখে, তখন তারা ভেবেছিলো এখন বুঝি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাবেন না। কিছু লোক প্রকাশ্যই বলেছে ঃ

"এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করে নিয়েছেন। তার নিজের দেশ এখন তাঁরই দখলে এসে গেছে। এখন তিনি কেন মদীনায় ফেরত

www.pathagar.com

যাবেন ?" একথা শুনতে পেয়েও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার জীবন, আমার মৃত্যু, তোমাদের সাথে হবে। তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে আমি পারি না।"

এ অবস্থায় রাসূলে কারীমের তিরোধানের পর আনসারদের মনে একথার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো এখন মদীনার ব্যবস্থাপনার পরিচালনা এবং শাসন কাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে ? কি মুহাজিরের হাতে থাকবে যারা সর্বশান্ত হয়ে মদীনায় এসেছিলো ? মদীনাবাসী তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো। মর্যাদা ও শক্তি-সামর্থ দান করেছে। অথবা এ দায়িত্ব মদীনাবাসীদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হচ্ছিলো। তিনি মদীনাবাসীদের কাছে আসেন, তারা তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁকে তাঁর জাতি পরিত্যাগ করে। মদীনাবাসীরা তাঁকে সাহায্য করে। তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, মদীনাবাসীরা তাঁকে আশ্রয় দেয়। তিনি হতাশ ছিলেন, তাঁরা তাঁকে আশাবাদী করে তোলেন।

সাকিফায়ে বনি সায়েদা

খেলাফতের ব্যাপারটি ফায়সালা করে ফেলার জন্য কিছু কিছু আনসার সাকিফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত হলেন। অসুস্থ নেতা সায়াদ বিন উবাদাকেও ওখানে ডেকে আনা হলো। আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। প্রথমে সায়াদ বিন উবাদা উপস্থিত সকলের কথা শুনতে থাকলেন। পরে নিজের ছেলেকে ডেকে এনে বললেন ঃ

"আমি অসুস্থতার দরুন সকল লোককে আমার কথাগুলো শুনাতে পারছি না। আমার বক্তব্য বিষয়টি উপস্থিত জনতার কাছে তুমি পৌঁছিয়ে দাও।"

তাঁর ছেলে তাই তার কথাগুলো উপস্থিত জনগণকে শুনাতে লাগলো। বলা হলোঃ

"হে আনসারগণ ! সত্য দীনের সাহায্য করার মর্যাদা ও ইসলামকে সহায়তা করার গৌরব তোমরাই অর্জন করেছো। এ মর্যাদা ও গৌরব আরবের কোনো গোত্রের নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ তের বছর যাবত তাঁর জাতিকে আল্লাহর ইবাদাত ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দেবার জন্যে হেদায়াত করেছেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। আর যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে ঈমান এনেছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষা, দীনের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্বয়ং তাদের নিজেদেরকেই কাফেরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারেননি। এ সময়ই আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা তার পুরস্কারের উত্তরাধিকার, মর্যাদার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছো। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের হিফাযতের জন্য তিনিই তোমাদেরকে ঈমানের নেয়ামাত দ্বারা ভূষিত করেছেন। দীনের ইজ্জত বাড়িয়েছেন। নিজের জীবন ইসলামের জন্য কুরবানী করে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি দান করেছেন। তোমাদের তরবারির দ্বারা ইসলামের বিজয়ের

www.pathagar.com

দিনকে নিকট হতে নিকটতর করেছেন। আরববাসীকে অবশেষে বাধ্য হয়েই ইসলাম গ্রহণ করতে হয়েছে। এখন আল্লাহর রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি সারা জীবন তোমাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তোমরা ছিলে তাঁর চোখের মণি। তিনিও ছিলেন তোমাদের চোখের মণি। এখন তোমরা খেলাফতকে তোমাদের হাতে নিয়ে নাও। তোমরা ছাড়া এ পদের উপযুক্ত আর কেউ নয়।"

উপস্থিত সকলে মনোযোগ সহকারে সায়াদের কথাগুলো শুনলেন এবং সকলে একমত হয়ে জবাব দিলেন ঃ

"হে সায়াদ আপনি যা বলেছেন সঠিক বলেছেন। আপনার সিদ্ধান্তে আমরা মতভেদ করবো না। খেলাফতের দায়িত্ব আমরা আপনার উপরই ন্যস্ত করলাম। কেননা আপনিই এ দায়িত্বের উপযুক্ত, সৎ ব্যক্তি এবং আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাহ।"

আনসারদের প্রথম দুর্বলতা

আনসাররা খেলাফতের দায়িত্ব পাবার উপযুক্ত, একথা তো বলে দেয়া হলো। কিন্তু একথায় তারা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলো না। গোটা জাতি সায়াদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে যাবে ও অন্যান্য সকল মুসলমানকে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে—এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন ও বলতে শুরু করলেন ঃ

"মুহাজিরগণ যদি আমাদের রায় অনুযায়ী সায়াদ বিন উবাদার হাতে বাইয়াত না করেন এবং দাবী করে বলেন, "আমরা মুহাজির, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথমদিকের সাহাবা, তাঁর বংশধর আমরা, এজন্য আমরাই খেলাফতের দাবীদার ও হকদার, আমাদের এ হককে অস্বীকার করা আনসারদের ঠিক হবে না, তাহলে আমাদের জবাব কি হবে?"

একথা শুনে গোটা সম্মেলনে পিনপতন নীরবতা নেমে আসলো। কেউ এ কথার কোনো জবাব দিতে পারলো না। অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ

"যদি তাই হয় আমরা বলবো—তাহলে আমীর হবেন দু'জন। একজন আনসারদের থেকে আর একজন মুহাজিরদের হতে। এছাড়া আর অন্য কোনো প্রস্তাবেই আমরা রাজী হবো না।"

সায়াদ বিন উবাদা খুব ভাল করে জানতেন, এ প্রস্তাব অর্থহীন। এতে আনসারদের কোনো লাভ হবে না। তাই তিনি বললেন ঃ

"তোমরা তো শুরুতেই নিজেদের দুর্বলতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছো।"

সায়াদ বিন উবাদার একথার ইঙ্গিত ছিলো আউস বংশের দিকে। কেননা সে বংশের জনৈক ব্যক্তিই উক্ত আপত্তি উত্থাপন করেছিলো। খাযরাজ বংশের কেউ এ

www.pathagar.com

ধরনের কথা বলতে পারতো না। কারণ, সায়াদ ছিলো এ বংশেরই লোক। তাদের প্রবল ইচ্ছা ছিলো খেলাফতের দায়িত্ব তাদের বংশের কারোর উপর ন্যস্ত হোক।

আউস ও খাযরাজের ঝগড়া

ইসলাম পূর্ব অবস্থা থেকেই এ দু' বংশের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া ও কলহ বিবাদ লেগেই ছিলো। তাদের পূর্বপুরুষগণ ইয়েমেন থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসার পর থেকেই এ পারস্পরিক শত্রুতার সূত্রপাত। সে সময় মদীনা এবং এর আশপাশ ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের দখলে ছিলো। আউস ও খাযরাজের লোকেরাও এ জাতির অধীনে গোলামীর জীবন অতিবাহিত করেছে। অনেক দিনের গোলামী জীবনের পর মান-মর্যাদার প্রশ্নে এদের মধ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি সুপ্ত আন্দোলন জেগে উঠেছে। অবশেষে আউস ও খাযরাজের বিজ্ঞ লোকদের আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে তারা ইহুদীদের পাঞ্জা হতে মুক্তি পায়। কিন্তু তাদের উভয় বংশের পারস্পরিক কলহ চলতেই থাকলো। এ কলহ বেড়ে বেড়ে তাদের মধ্যে কঠিন শত্রুতার রূপ ধারণ করলো। তাদের এ চরম কলহের ফলেই 'বুয়াসের' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে উভয় গোত্রের হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ যুদ্ধের পর পুনরায় ইহুদীরা মদীনায় নিজেদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বাড়াতে শুরু করলো। আউস ও খাযরাজের গোত্র ইহুদীদের আগেকার অত্যাচার-অবিচারের কথা ভুলতে পারেনি। এখন আবার তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা দেখে তারা নিজেদের মধ্যে একটা সন্ধিচুক্তি করে নিলো। সিদ্ধান্ত হলো খাযরাজের আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন কুলসুম তাদের নেতা হবে।

আউস খাযরাজের এ মীমাংসার আলোচনা চলছে। এ সময় এদের একদল লোক হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এলো। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াত শুনে তাদের একজন আর একজনকে বললো ঃ

> "আল্লাহর কসম, ইনি সেই নবী যাঁর কথা ইহুদীরা আমাদেরকে বলতো। এ দাওয়াত আগে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। ইহুদীরা যেনো আমাদের আগে এ দীন গ্রহণ করে আমাদেরকে পিছে ফেলতে না পারে।"

সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো, আল্লাহর রাসূলকে উদ্দেশ করে তারা বললো ঃ

> "আমরা এমন একটি জাতিকে রেখে এসেছি, কলহ-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষে যাদের জুড়ি নেই। আমাদের আশা, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এ কলহ ও বিবাদের অবসান করবেন। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন। আপনার মাধ্যমে যদি তারা একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে মদীনায় কোনো লোক আপনার চেয়ে বেশী মর্যাদাশীল হতে পারবে না।"

www.pathagar.com

মদীনায় ফিরে গিয়ে তারা নিজেদের বংশের লোকদের কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। এ ঘটনাই 'বাইয়াতে আকাবাতুল কুবরা' নামে ইতিহাসে অভিহিত এবং তা ইসলাম বিস্তার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিযরাতের প্রথম সিঁড়ি বা ধাপ হিসাবে পরিগণিত হয়।

মদীনাবাসীদের ঐক্য

ইসলাম মদীনাবাসী সকল মু'মিনদেরকে এক করে দেয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরাট ব্যক্তিত্ব সকল মুসলমানকে এমন ভাই-বন্ধুর কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করলো, পার্থিব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যার নজীর দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসলমানদের এ অনুপম ঐক্যের কারণে ইহুদীদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। তবু আউস ও খাযরাজের মন থেকে ইহুদীদের পূর্ব শত্রুতার কালো দাগ জেগে উঠতো। ইহুদী ও মুনাফিকদের উস্কানিতে কোনো কোনো সময় এ শত্রুতা প্রকাশও হয়ে পড়তো। এ জন্যই সায়াদ বিন ওবায়দা যখন দেখলেন—একজন নেতা মুহাজিরদের মধ্য হতে ও আর একজন আনসারদের মধ্য হতে নির্বাচন করার প্রস্তাবে আনসারদের কেউ কেউ প্রভাবিত হচ্ছে—তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"এটাই তোমাদের প্রথম দুর্বলতা, শুরুতেই তোমরা এ দুর্বলতা প্রদর্শন করে ফেলেছো।"

কেননা এ প্রস্তাব উত্থাপনকারী ছিলো আউস গোত্রের লোক।

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দার আলাপ

আনসাররা খেলাফতের ব্যাপারে যে সময় সাকিফায়ে বনু সায়েদায় তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত। সে সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু ওবায়দা সহ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী মসজিদে নববীতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের বিরাট বেদনা বিধুর ঘটনা সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু খান্দানের অন্যান্য সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন-কাফনের ব্যবস্থাপনার কাজে মশগুল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ব্যাপারে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পূর্ণ নিশ্চিত হবার পর তিনিও খেলাফতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। তাঁর ধারণায় আদৌ এ চিন্তা আসেনি যে আনসাররা ইতিপূর্বেই তাদের কাউকে খলিফা নির্বাচন করার জন্য তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত।

ইবনে সায়াদ 'তাবকাতে' লিখেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু ওবায়দা বিন জারাহর কাছে এসে বললেন ঃ

"আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবো। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে 'আমিনুল উম্মাত' বলে আখ্যা দিয়েছেন।"

ওমরের এ প্রস্তাব শুনে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলে উঠলেন ঃ

www.pathagar.com

"ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ! ইসলাম গ্রহণ করার পর এ প্রথমবার আমি তোমার মুখে একটি বোকামীর কথা শুনলাম। আমাদের মধ্যে এখনো ঐ ব্যক্তি জীবিত আছেন যাঁকে আল্লাহ স্বয়ং 'ছানিয়া এছনাইন' দু'জনের দ্বিতীয়জন ছাহেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতাব দিয়েছেন। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন 'সিদ্দীক' খেতাব। সে অবস্থায় তুমি কিভাবে আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতে পারলে ?"

এ দু'জন সাহাবা এসব আলাপ-আলোচনায় আছেন, এ অবস্থায়ই 'সাকিফায়ে বনু সায়েদার' আনসারদের গোপন বৈঠকের খবর তারা জানতে পারলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দ্রুত উঠে গিয়ে হযরত আয়েশার ঘর হতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠালেন। কাজে ব্যস্ত আছেন বলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জানালেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘটনার গুরুত্বের ইঙ্গিত দিয়ে আবার তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে বের হয়ে আসার প্রয়োজন বলে জানালেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাকিফায় উপস্থিত

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার ঘর হতে বেরিয়ে এসে একটু রাগত স্বরে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, এমন কি কাজের জন্য আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে ডেকে পাঠালে। যে কাজ এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন-কাফনের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ?

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সব ঘটনা শুনালেন। শুনালেন সাকিফায়ে বনু সায়েদায় আনসারদের একত্রিত হওয়া, সায়াদ বিন উবাদাকে খলিফা বানানোর প্রস্তাব উঠেছে। তাছাড়াও প্রস্তাব উঠেছে মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে দু'জন পৃথক পৃথক আমীর নির্বাচিত হবার। এসব কথা শুনে উভয়েই হযরত আবু ওবায়দা বিন জারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাথে নিয়ে দ্রুত সাকিফায়ে বনু সায়েদার দিকে রওনা হলেন। পথে এঁদের সাথে আসিম বিন আদি ও উয়াইম বিন সায়েদার দেখা। সাকিফায় আনসারদের উত্থাপিত প্রস্তাবে একমত হচ্ছে না বলে এ দু'জনকে তারা সেখান থেকে বের করে দেয়। তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, "আপনারা আপন আপন কাজ করুন। আনসারদের কাছে যাবেন না।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "তা হতে পারে না। অবশ্যই আমরা সেখানে যাবো।" বস্তুত এ তিন মহান ব্যক্তিত্বই অবশেষে সাকিফায় গিয়ে পৌছলেন। তখনো আনসারদের বিতর্কিত আলোচনা চলছিলো। সায়াদের হাতে বাইয়াত করা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তেও তারা একমত হতে পারছিলো না।

এ তিন ব্যক্তিত্বের হঠাৎ উপস্থিতিতে আনসাররা স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সকলেই চুপচাপ।

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'কম্বল জড়িয়ে মাঝখানে বসা উনি কে ?" লোকেরা বললো, "ইনি সায়াদ বিন উবাদা তিনি অসুস্থ। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার দু' সাথী ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ ওখানে বসে পড়লেন। সমবেত লোকজন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাবার আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত।

সাকিফায়ে বনী সায়েদার বৈঠকের গুরুত্ব

বস্তুত ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে সাকিফার এ বৈঠকের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজ্ঞজনোচিত ও দূরদর্শিতার সাথে এ ঘটনার মুকাবিলা না করতেন, তাহলে স্বয়ং ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনাতেই বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে যেতো। ধীরে ধীরে তা আরবের অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়তো। আর এমন নাজুক সময়ে এ বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো, যখন ইসলাম ও শরীয়াতের বাণীবাহকের 'পবিত্র দেহ' তখনো ঘরেই পড়েছিলো।

যদি আনসাররা সায়াদ বিন উবাদার কথায় একমত হয়ে খেলাফত তাদেরই এবং তা তাদেরই অধিকার বলে জিদ ধরতেন, আর ওদিকে কুরাইশরা তাদের ছাড়া অন্য কারোর কাছে খেলাফতের বাইয়াত করতে রাজী না হতেন, তাহলে এ কলহের পরিণতি কি দাঁড়াতো। বিশেষ করে যে অবস্থায় উসামার সশস্ত্র বাহিনী শত্রুর সাথে যুদ্ধে যাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বসেছিলো, সে সময় এসব অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের বিরুদ্ধেও তো ব্যবহার হতে পারতো। সাকিফায় যদি এ তিন মহিমান্বিত সাহাবা ছাড়া অন্য কেউ যেতেন—যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাতার সৌভাগ্য অর্জন করেননি এবং 'আমিনুল উম্মাত' হবার সম্মানও পাননি, তাহলে আনসার ও মুহাজিরদের এ মতবিরোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো। এর ভয়বাহ পরিণতি সম্পর্কে আজকের ঐতিহাসিকগণ ধারণাও করতে পারতেন না।

ঘটনার সঠিক অনুমানকারীদের কাছে একথা অজানা নয়। ইসলামের ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বাইয়াতে আকাবাতুল কুবরা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের ঘটনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল। সাথে সাথে একথাও তাদের কাছে গোপন নয়, এসব সংকটপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম দীনের দিক দিয়ে তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব উঁচু মর্যাদার প্রমাণ ছাড়াও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ও পরিণতির প্রতি গভীর দৃষ্টি ও লক্ষ্য আরোপকারীও ছিলেন। প্রতিটি ব্যাপারেই তিনি সর্বোত্তম প্রতিফল লাভ করার চেষ্টা করতেন। অযথা ঝগড়া-কলহ বাঁধানো সবসময়ই তিনি পরিহার করে চলতেন।

সাকিফায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণ

বক্তব্য পেশ ও ভাষণ-ভঙ্গির কোনো দিককে আজকালকের রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ একটি নতুন আবিষ্কার বলে মনে করেন। বক্তব্য পেশের মাধ্যমে বিরোধী

www.pathagar.com

শিবিরকে না ক্ষেপিয়ে তাদেরকে স্বমতে আনতে পারাটাও একটি ভাষণ-ভঙ্গিজনিত কৌশল। এ কৌশলকে নতুন আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁর ভাষণ পেশ করেছেন ও যে সদাচরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে নিষ্পত্তি করেছেন। তা আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ ও তাঁর রহমাত।

এ তিন সম্মানিত মুহাজির ব্যক্তিত্ব একত্রে এসে প্রশান্তির সাথে আনসারদের মধ্যে বসে থাকার কারণে আনসারদের অস্থিরতা কিছু কমে গেলো। পিনপতন নীরবতা ভঙ্গ করে 'খেলাফাত তাদের হক। তাদের এ হক তাদেরই পাওয়া উচিত।' এ ধরনের কিছু কথাবার্তা বলা আনসাররা শুরু করলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বললেন, "আমি কিছু কথা চিন্তা করে রেখেছিলাম।" সে কথাগুলো বলতে তিনি মজলিসে দাঁড়ালে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বললেন, "একটু থামো ! আগে আমাকে কিছু বলতে দাও। তারপর তুমি তোমার বক্তব্য পেশ করবে।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু রাগ হয়ে যান কিনা এ ভয়েই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁকে প্রথম বলার সুযোগ দেননি। সময়টা তো গরম হবার ছিলো না। অবস্থাকে শান্ত রেখে ধীরস্থিরভাবে ব্যক্তিত্ব সহকারে অবস্থাকে আয়ত্বে আনার সময় ছিল তখন।

হযরব আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর মর্যাদা ও ইসলাম গ্রহণে প্রথম হবার কারণে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাথে সাথে বসে পড়লেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বক্তব্য পেশের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হামদ ও সানা পড়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আনীত পয়গামের উল্লেখ করে বললেন ঃ

> "আরবদের জন্য নিজ পিতৃপুরুষের দীন ত্যাগ করা ছিলো খুব কঠিন কাজ। আর তারাও এ কাজের জন্য তৈরি ছিলো না। এ সময় আল্লাহ তাঁর জাতির প্রথম দিকের মুহাজিরদেরকে তাঁকে বিশ্বাস করা, তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁকে প্রবোধ দেয়া এবং নিজ জাতির নির্যাতন নিগ্রহকে ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করার জন্য শক্তিদান করলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর বিরোধী ছিলো। তাঁর উপর অত্যাচারের পাহাড় চেপে ধরতো। নিষ্ঠুরতম শাস্তি দেয়া হতো তাঁকে। কিন্তু এরপরও স্বপক্ষীয় লোকের সংখ্যাল্পতা, শত্রুর সংখ্যাধিক্য তাঁকে ভীত করেনি। এ মাটিতে এ মুহাজিররাই প্রথম ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার ও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন। অতএব খেলাফতের দায়িত্বভার তাদেরই পাওনা। এ ব্যাপারে যালেমরাই শুধু তাদের সাথে মতভেদ ও কলহে লিপ্ত হতে পারে।"
>
> "হে আনসারগণ ! তোমরা ঐ লোক যাদের মর্যাদা দীন ও ইসলামে অনস্বীকার্য। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাঁর দীন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম মদদগার হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে তোমাদের কাছে এসেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ পবিত্র স্ত্রী এবং সাহাবা তোমাদেরই লোক। প্রথমদিকের মুহাজিরদের পরেই তোমাদের স্থান। আর তোমাদের প্রাপ্য ওজারত। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। আর তোমাদের অংশগ্রহণ ছাড়াও কোনো কাজ সমাধান করা যাবে না।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু কথাবার্তা আগেও একজন আনসারের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ ------- তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর আর আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর—একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ শুধু গ্রহণযোগ্যই নয় বরং রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও পরিচায়ক ছিলো। মুহাজির ও আনসাররা উভয়েই এ প্রস্তাবে নিশ্চিত থাকতে পারবে। কারণ, আউস গোত্রীয় লোকেরা খাযরাজ গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করতো। খাযরাজের প্রাধান্য আউসের কাছে ছিল অসহনীয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উক্ত প্রস্তাবে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো খাযরাজ গোত্রের অনেকেই এর সাথে আন্তরিকভাবে ঐকমত্য পোষণ করলো। কারণ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু উবাদার মতো শুধু মুহাজিদেরকেই খেলাফতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা একচেটিয়া হকদার নির্দিষ্ট করেননি। বরং তিনি আনসারদেরকেও উজীর হিসাবে মুহাজিরদের সহকর্মী বানাবার কথা বলেছেন। কেননা উভয় পক্ষই আল্লাহর রাসূলের উপর খাঁটি মনে ঈমান আনা, তাঁর সাহায্য করা ও জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে এক সমান ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু 'আমারাত' ওজারতের ব্যাপারে ক্রমিকভাবে মুহাজির ও আনসারদেরকে হকদার বলে ঠিক করেছেন। আরবদের অন্য কোনো গোত্রকে তিনি এতে শরীক করেননি। কারণ, দীনের ব্যাপারে এসব গোত্র মুহাজির ও আনসারদের মত মর্যাদাশীল ও অগ্রাধিকার সম্পন্ন ছিলেন না। মুহাজির ও আনসারদের মতো তারা দীনের ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও পদক্ষেপ সম্পাদন করতে পারেনি।

কোনো কোনো আনসারের বিরোধিতা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যুক্তিসঙ্গত ও ইনসাফ ভিত্তিক ভাষণের পর কোনো কথা বা আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক ছিলো না। কারণ, তাঁর সব কথাই ছিলো সত্য ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক। কিন্তু এরপরও যারা মুহাজিরদের 'আমারাত' বা নেতৃত্ব পসন্দ করতেন না। তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণে প্রভাবিত হয়নি। কারণ, তাদের আশংকা ছিল মুহাজিররা আনসারদের অধিকার হরণ করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে তারা মনগড়া আচরণ ও কাজ-কর্ম চালাবে। আর তাই তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো ঃ

"আমরা আল্লাহর আনসার এবং ইসলামের সৈনিক। আর হে মুহাজিরগণ! তোমরা আমাদের তুলনায় সংখ্যায় স্বল্প। তোমরা আমাদের অধিকারকে ছিনিয়ে

www.pathagar.com

নেয়া ও আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছো—এটা কখনো হতে পারবে না।"

এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা চক্কর খেয়ে গেলো। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ঠাণ্ডা মেজাযে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে আবার বললেন ঃ

"হে লোক সকল ! আমরা মুহাজিররা প্রথম দিকের মুসলমান। বংশ মর্যাদা ও ফখর-গৌরবের দিক দিয়েও আমরা সমস্ত আরবের সবচেয়ে বড়। এ সকল কথা ছাড়াও রাসূলুল্লাহর নিকটাত্মীয় হবার গৌরব আমাদের। আমরা ঈমানও এনেছি তোমাদের আগে। কুরআনেও তোমাদের আগে আমাদের কথা উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ـ (التوبة : ١٠٠)

"আমরা মুহাজির। আর তোমরা আনসার। দীনে তোমরা আমাদের ভাই। গানিমাতের মালে তোমরা আমাদের অংশীদার। শত্রুর মুকাবিলায় তোমরা সাহায্যকারী। এছাড়া তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছো আমরা তা অস্বীকার করি না। সত্যিই তোমরা এসবের যোগ্য। এ জগতে তোমরা সবচেয়ে বেশী প্রশংসার অধিকারী। কিন্তু আরবরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো হাতে যাবে—একথা মেনে নিবে না। অতএব আমিরিয়াত বা নেতৃত্ব মুহাজিরদেরকে ছেড়ে দাও। আর ওজারত তোমরা গ্রহণ করো।"

হাব্বাব বিন মানজার আনসারী

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ভাষণের পরও কিছু সংখ্যক আনসারের উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। তাদের একজন হাব্বাব বিন মানজার বিন জুমুহ উঠে বলতে লাগলেন ঃ

"হে আনসারগণ ! আমিরিয়াত তোমাদের হাতেই রাখো। মানুষ তোমাদের অনুগত। তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো নেই। তোমাদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত দেবারও কারো হিম্মত নেই। তোমরা সম্মানিত ও মর্যাদাশীল। তোমরা সংখ্যায় ও অভিজ্ঞতায় অন্যদের চেয়ে অগ্রসর। তোমরা বীরের জাতি। জাতি তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। এ অবস্থায় তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করে নিজেদের ভবিষ্যত নষ্ট করো না। এ লোকেরা তোমাদের কথা মানতে বাধ্য। খুব বেশী বিবেচনা করলে আমরা শুধু এটুকুই করতে পারি যে, দু'জন আমীর হবেন একজন আমাদের আর একজন তাঁদের।"

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণ

হাব্বাবের বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। এতক্ষণ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিরত করে রাখার কারণে কোনো রকমে তিনি বসেছিলেন। কিন্তু আর বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। তিনি উঠে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলেন—"এক জায়গায় দু'টি তরবারির স্থান হয় না। আল্লাহর কসম, আরববাসীরা তোমাদেরকে আমীর বানাতে কখনো রাজী হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ যাঁদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন তাদের কেউ আমীর হলে আরববাসীর কোনো আপত্তি থাকবে না। যদি আরবের কোনো লোক আমাদের আমিরিয়ত ও খেলাফত প্রাপ্তিকে অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে প্রকাশ্য অকাট্য দলিল মওজুদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে কে আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। আমরা তাঁর জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং তার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি। এ ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া কলহে লিপ্ত হতে পারে তারা, যারা বাতিলের অনুসারী, পাপে নিমজ্জিত এবং ধ্বংসের গহীন গহ্বরে পতিত হবার জন্য তৈরি।"

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হাব্বাবের বিতর্ক

আনসারদের উদ্দেশ করে হাব্বাব ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষণের জবাব দিতে উঠে বললেন ঃ

"হে আনসারগণ ! তোমরা হিম্মত সহকারে কাজ করো। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর সাথীদের কথায় কর্ণপাত করো না। যদি তোমরা এখন দুর্বলতা প্রকাশ করো তাহলে এরা খেলাফতে তোমাদের অংশ ছিনিয়ে নেবে। যদি এরা তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। ক্ষমতা দখল করো। আল্লাহর কসম তোমরাই খেলাফতের সবচেয়ে বড় হকদার। তোমাদের তরবারির জোরেই ইসলামের শানশাওকত বেড়েছে। এজন্য মূল্য ও মর্যাদা রক্ষা করাও তোমাদের কর্তব্য। তোমরাই ইসলামকে আশ্রয় দিয়েছো। তোমাদেরকেই এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। আর তোমরা যদি ইচ্ছা করো তাহলে এর শানশাওকাত বিনষ্ট করে দিতে পারো।"

এ অংশ শুনেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"যদি এ ধরনের চেষ্টা চালাও তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন।"

উত্তরে হাব্বাব বললেন ঃ

"আমাদেরকে নয়, আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।"

হাব্বাবের কথায় এক বিপজ্জনক সুর লুক্কায়িত ছিলো। আনসারদের অধিকাংশ মানুষ যদি হাব্বাবের সাথে থাকতো এবং সায়াদ বিন উবাদার হাতে বাইয়াত করতে

রাজী হয়ে যেতো তাহলে মুহাজিররাও আনসারদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হতে বাধ্য হতো। এর ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতো। এ পরিস্থিতি রুখে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হতো না।

কিছু মুনাফিকের কারসাজী

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হাব্বাবের গরম গরম কথা কাটাকাটির সুযোগে কিছু কিছু মুনাফিক ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার সুযোগ খুঁজে। তাবারী তো একথাও লিখেছেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাব্বাব খাপ থেকে তরবারীও বের করে ফেলেছিলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ত্বরিতে হাত থেকে ঝটকা মেরে তারবারী ফেলে দিয়ে আবার নিজ হাতে তুলে নিলেন। তরবারি হাতে করে সায়াদ বিন উবাদার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি। এতক্ষণ নিশ্চুপ বসে উভয়ের বিতর্ক শুনছিলেন হযরত আবু ওবায়দা বিন জারাহ। এবার তিনি উঠে গিয়ে উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

> "হে আনসারগণ ! তোমরাই সে জাতি, যারা একদিন এ দীনের সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলে। আর আজ তোমরাই এ দীনের ধ্বংসের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে চলছো।"

বশির বিন সায়াদের ভাষণ

হযরত আবু ওবায়দার একথায় খাজরাজ গোত্রের এক সরদার বশির বিন সায়াদ আবু নোমান খুব প্রভাবিত হলেন। সমাবেশে তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ

> "আল্লাহর কসম ! মুশরিকদের সাথে জিহাদ আর আল্লাহর দীন গ্রহণে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে যদিও মুহাজিরদের মর্যাদা বেশী। কিন্তু এসব করেছি আমরা শুধু আমাদের রবের সন্তুষ্টি, রাসূলের আনুগত্য এবং নিজেদের আত্মসংশোধনের জন্য। এ জন্যই এসব কারণে আমাদের কোনো প্রকার গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করা নিজেদের দীনের খেদমতের জন্য দুনিয়ায় কোনো বিনিময় গ্রহণ করা উচিত হবে না। আল্লাহ আমাদের এসব খেদমতের বিনিময়ে ফলদান করবেন। আর তাঁর দেয়া নেয়ামতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূল কুরাইশ বংশের আর তাঁর বংশই এর সবচেয়ে বেশী হকদার। আল্লাহ না করুন আমরা যেনো এদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হই। হে মদীনাবাসী ! আল্লাহকে ভয় করো। মুহাজিরদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না। কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়ো না।"

বশির বিন সায়াদের বক্তব্যের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু লক্ষ্য করলেন, আউস বংশের লোকেরা নীচুস্বরে কিছু বলাবলি করছে। আর খাজরাযের লোকদের চেহারায় পরিবর্তনের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বশিরের বক্তব্য তাদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে।

www.pathagar.com

এ ভাব দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর বিশ্বাস হলো, ব্যাপারটি ফায়সালার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এটাই হলো সময়। এ সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ও আবু ওবায়দার মধ্যে বসা। তাদের একজনের হাত ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আনসারদেরকে ঐক্যের আহ্বান জানালেন। অনৈক্যের পরিণাম সম্পর্কেও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ

"এ হলো ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আর এ হলো আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তোমাদের মধ্যে উপস্থিত। এঁদের যাঁকে ইচ্ছা তাঁরই হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত

এ সময় আমিরিয়াতের দায়িত্বের জন্য দীনি দৃষ্টিভঙ্গিতে কে বেশী উপযুক্ত এ নিয়ে বেশ গুণ গুণ শব্দ উঠলো। হযরত ওমরের দীনি মর্যাদা সম্পর্কে সকলেই একমত। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ভরযোগ্য সাহাবী এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহার পিতা ছিলেন। তাঁর কঠোরতা ও কড়া মেজাযকে সকলে ভয় করতেন। এ জন্য তাঁর হাতে 'বাইয়াত' গ্রহণ করতে লোকেরা ইতস্তত করছিল। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো কঠোর ছিলেন না। কিন্তু দীনের মানদণ্ডে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত স্থান ও মর্যাদা তাঁর ছিলো না।

এ অবস্থা বেশীক্ষণ বিরাজ থাকলে মতভেদ আরো বেশী বেড়ে যেতো। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা হতে না দিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন ঃ

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক হাত বাড়ালে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাথে সাথেই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ

"হে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ! আপনাকে কি আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের নামায পড়াবার জন্য নির্দেশ দেননি ? তাই আপনি আল্লাহর খলিফা। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। কারণ, আপনি আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী।"

হযরত আবু ওবায়দাও একথায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ

"হে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ! মুহাজিরদের মধ্যে আপনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। গারে সাওরে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর বিপদের সাথী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপস্থিতিতে

www.pathagar.com

আপনি মুসলমানদের নামায পড়িয়েছেন। তাই খেলাফতের গুরুদায়িত্ব পালনে আপনার চেয়ে বেশী হকদার আর কেউ নেই।"

বশির বিন সায়াদ ও অন্যান্য আনসারদের বাইয়াত

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণের পর পরই বশির বিন সায়াদও তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। বশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ দেখে হাব্বাব বিন মানজার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে বলতে লাগলেনঃ

"হে বশির বিন সায়াদ ! তুমি তোমার জাতির নাক কান কেটে দিয়েছো। এটা করার তোমার এমন কি দরকার ছিলো ? আমিরিয়াতের ব্যাপারটি নিয়ে তুমি তোমার চাচাতো ভাই সায়াদ বিন ওবায়দার বিরোধিতা করলে ?"

সাথে সাথে বশির জবাবে বললেন ঃ

"আমি আমার জাতিকে হেয় ও অপমান করিনি। আর কেউ নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ মুহাজিরদেরকে যে হক দিয়েছেন, সে হক থেকে আমি তাদের বঞ্চিত করা পসন্দ করিনি।"

উসাইদ বিন হুযাইর আউস বংশের নেতা এতক্ষণ বশির বিন সায়াদের কার্যক্রমের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে আসছিলেন, নিজের গোত্রের দিকে ফিরে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! খাজরাজ গোত্র যদি একবার খেলাফতের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতো। চিরদিনের জন্য তারা তোমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাশালী হয়ে যেতো। খেলাফতে এদেরকে অংশিদার হতে দিও না। তোমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো।"

বস্তুত আউস গোত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এদিকে খাজরাজ বংশের লোকেরাও তাদের নেতা বশির বিন সায়াদের কথায় স্বস্তি লাভ করলেন। তারাও এগিয়ে এসে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

বাইয়াত গ্রহণে সায়াদ বিন উবাদার অস্বীকৃতি

একজন আর একজনকে ডিঙ্গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাইয়াত গ্রহণ করতে লাগলেন। তাড়াহুড়োর জন্য সায়াদ বিন উবাদার প্রতি কারো খেয়াল ছিলো না। তাঁকে দলিত-মথিত করেই বাইয়াতের জন্য তারা সামনে বাড়তে শুরু করলেন। এ দৃশ্য দেখে কেউ কেউ বললো ঃ

"আরে ! তোমরা একটু লক্ষ্য রেখো। সায়াদ না আবার তোমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যায়।"

www.pathagar.com

"ও পিষ্ট হবারই যোগ্য। আল্লাহ তাকে অপমানিত করুন।" বললেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

সায়াদকে তিনি আরো কিছু কঠোর কথা শুনালেন। এ দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বললেন ঃ

"ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ! এ কি করছো ? নমনীয়তার সাথে কাজ সম্পূর্ণ করো। কঠোরতা অবলম্বনের সময় এটা নয়।"

সায়াদ বিন উবাদার সাথীরা তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এখানেই সায়াদ চুপচাপ তার অবশিষ্ট জীবন নিঃসঙ্গভাবে অতিবাহিত করেন। তাকে বলা হলো ঃ

"আপনিও বাইয়াত করে নিন। সকল মুসলমান—এমনকি আপনার বংশীয় লোকেরাও বাইয়াত গ্রহণ করেছে।"

কিন্তু সায়াদ বাইয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তীরের শেষ শর তোমাদের উপর নিক্ষেপিত না হবে, আমার নেজার অগ্রভাগ তোমাদের রক্তে রঞ্জিত না হবে, আমার তরবারী চিক চিক করে জ্বলে না উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি আমার বংশধর ও অনুগামীদের নিয়ে তোমাদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করবো।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এ খবর পৌঁছলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"তাঁর ঔদ্ধত্যকে আর প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তার কাছ থেকে বাইয়াত আদায় করা ছাড়া তাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়।"

কিন্তু বশির বিন সায়াদ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে একমত হলেন না। তিনি বললেন ঃ

"তার এ অস্বীকৃতি চরম সীমার অস্বীকৃতি। যুদ্ধ করে করে সে মরে যাবে কিন্তু বাইয়াত গ্রহণ করবে না। আর তার সন্তানাদি, গোত্রীয় লোকজন ও অনুসারীদের তার জন্য জীবন না দেয়া পর্যন্ত সে নিহত হবে না। কাজেই তাঁকে তার অবস্থায়ই ছেড়ে দিন। এখন আর সে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করবে না। তার মতে এখন সে একা।"

বশিরের পরামর্শের সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু একমত হলেন। সায়াদকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হলো। সায়াদ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পেছনে নামায পড়তেন না। তাঁর সাথে হজ্জ পালন করতেন না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু পর্যন্তই তার এ অবস্থা ছিলো।

রাসূলুল্লাহর দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সাকিফার বাইয়াতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ সম্মানিত কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত হতে পারেননি।

www.pathagar.com

এছাড়াও মসজিদে নববীতে অনেক মুহাজির উপস্থিত ছিলেন। সাকিফার ঘটনার সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না। তাই তারা বাইয়াতে শরীক হতে পারেননি।

সাকিফার বাইয়াত সম্পর্কে হযরত ওমরের প্রতি ইঙ্গিত করে কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, এ বাইয়াত ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। এর পেছনে পরিকল্পনা ছিলো না। কোনো কোনো বর্ণনাকারী আবার বলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু আগ থেকেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে একমত হয়েই সাকিফায় গিয়েছিলেন। এ দু'টি বর্ণনার যেটিই সত্য হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাকিফায়ে বনি সায়েদায় যা ঘটেছে তা ইসলাম ও মিল্লাতকে এমন এক ভয়াবহ কলহ থেকে বাঁচিয়েছে যা না হলে আল্লাহই ভালো জানেন, পরিস্থিতি কি রূপ পরিগ্রহ করতো।

বাইয়াতের উপর আনসারদের দৃঢ়তা

এ দিনের পরে আনসাররা আর কোনো সময় খেলাফতের দাবী উত্থাপন করেননি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হলেন। কিন্তু আনসাররা আর খেলাফতের দাবী করেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধের সময়েও আনসাররা খেলাফত লাভের কোনো চেষ্টা চালায়নি। অথচ ইচ্ছা করলে এ সুযোগে তারা তা করতে পারতেন। কিন্তু তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথায় পূর্ণ আস্থা এনেছিলেন যে ঃ

"আরবরা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো খিলাফতে রাজী হবে না।"

এরপর চিরদিনের জন্য তারা রাসূলে কারীমের ওসিয়ত অনুযায়ী মুহাজিরদের নেতৃত্বাধীন প্রশান্তির জীবনযাপন করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসিয়ত করেছিলেন ঃ

"হে মুহাজিরগণ ! আনসারদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা আরবের অন্যান্য গোত্রে জনসংখ্যা বাড়বে কিন্তু আনসারদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। আমি তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। তাই তোমরাও তাদের উপর ইহসান করবে। আর তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।"

মসজিদে নববীতে সাধারণ বাইয়াত

'সাকিফায়ে বনি সায়েদার' বাইয়াত শেষে জনগণ মসজিদে নববীতে ফিরে আসলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা। পরের দিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে গিয়ে মেম্বারে উঠে বসলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম দাঁড়িয়ে গতকালের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। গতকাল তিনি হাতে তরবারী নিয়ে বলেছিলেন, "যে বলবে আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন আমি তার শিরচ্ছেদ করবো।"

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"কাল আমি তোমাদের এমন কথা বলেছিলাম যার প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাতে নেই। আমি ভালবাসার আবেগ উচ্ছ্বাসে মনে করেছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিরদিন থাকবেন এবং স্বয়ং আমাদের সকল কাজ-কর্ম দেখাশুনা করবেন। কিন্তু তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব অবশিষ্ট আছে। আর এ কিতাব থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বয়ং হেদায়াত গ্রহণ করেছেন। তোমরা যদি এ কুরআনকে মযবুত করে ধরে রাখো তাহলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে তোমাদের খলিফা বানিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম। আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ট। এ ব্যক্তিই 'গারে সাওরে' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হবার গৌরব অর্জন করেছেন। তাই তোমরা সকলে উঠো এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো।"

বস্তুত এখানেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে মুহাজির ও আনসারদের ব্যাপক বাইয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সাকিফায়ে বনি সায়েদার শপথ হয়েছিল কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিশেষ বিশেষ লোকের।

খেলাফতের প্রথম ভাষণ

আম বাইয়াত অনুষ্ঠানের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দাঁড়ালেন এবং খেলাফতের প্রথম ভাষণ দান করলেন। হামদ ও সানার পর তিনি বললেন ঃ

"হে লোক সকল ! আমাকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি আমি নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে বারণ করে রাখবে। সত্যবাদিতা হলো আমানত। আর মিথ্যাচার হলো খিয়ানাত। তোমাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ; যদি তার পাওনা আমি তার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে না পারি। আর তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল তার কাছে পাওনা যদি আমি আদায় করতে না পারি। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়, সে জাতির উপর আল্লাহর অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষণ করেন। আর যে জাতি নির্লজ্জ ও বেলেল্লাপনায় ডুবে যায়, সে জাতির উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হয় ব্যাপকভাবে। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করে চলি, তোমরাও আমার অনুসরণ করবে। আর আমার কোনো কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানী দেখতে পেলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। এখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন।"

www.pathagar.com

কিছু বড় বড় মুহাজির বাইয়াত গ্রহণ করেননি

কোনো কোনো বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় যে, মুহাজিরদের কিছু সম্মানিত বড় বড় মুহাজির 'বাইয়াত' গ্রহণ হতে সরে থাকেন। এঁদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবু তালিব, হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও শামিল ছিলেন। শিয়াপন্থী ইতিহাসবিদ ইয়াকুবী লিখেন ঃ

"মুহাজির ও আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত গ্রহণে শামিল ছিলেন না। বরং তাঁদের ঝোঁক ছিল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবু তালিবের প্রতি। এঁদের মধ্যে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিব, ফযল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, জুবাইর বিন আওয়ান বিন আস, খালিদ বিন সাঈদ, মেকদাদ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, সালমান ফার্সি, আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, আমনার বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহু, বারা বিন আযেব, উবাই বিন কায়াবও শামিল ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু ওবায়দা বিন জারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুগিরা বিন শোবার সাথে এদের সম্পর্কে পরামর্শ করেন। তাঁরা তাকে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে দেখা করে তাঁকেও খেলাফতে অংশ দিয়ে পরবর্তীকালে খেলাফতের তাঁর বংশধরদের দিকে ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দেন। এভাবে চাচা-ভাতিজার মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলায় সুফল পাওয়া যাবে।"

পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে দেখা করলেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আপনি রাসূলুল্লাহর চাচা। আমি আপনাকে খেলাফতের অংশ দিতে চাই। আর এ অংশ আপনার পর আপনার বংশধরদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে থাকবে।"

কিন্তু এ প্রস্তাবে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু রাজী হলেন না। তিনি বললেন, যদি খেলাফত আমাদের প্রাপ্য হয় তাহলে আমরা অর্ধেক খেলাফত প্রাপ্তির প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না।

বিরোধীদের সম্মেলন

ইয়াকুবীর আর এক বর্ণনাসহ আরো কিছু ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, মুহাজির ও আনসারদের একটি অংশ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তনয়া বিবি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার ঘরে একত্রিত হলেন। এদের মধ্যে খালিদ বিন সাঈদও ছিলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য আমি আপনার চেয়ে উত্তম আর কোনো ব্যক্তিকেই দেখছি না। আপনি আমার বাইয়াত গ্রহণ করুন।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সম্মেলনের খবর পেয়ে কিছু লোক সাথে করে হযরত ফাতেমার ঘরে হাজির হয়ে আক্রমণ চালালেন। হাতে তরবারী নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তার প্রথম টক্কর লাগে। হযরত ওমর তাঁর তরবারী ভেঙ্গে ফেলে অন্যান্য সাথীসহ ঘরে ঢুকে পড়লেন, এতে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ্ আনহা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ

"তোমরা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। তা নাহলে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবো।[১] তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবো।"

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার একথা শুনে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর্যন্ত এসব উল্লেখিত সাহাবীগণ বাইয়াত গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। এরপর ধীরে ধীরে একের পর এক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া সকলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ছয় মাস পর্যন্ত বাইয়াত গ্রহণ করেননি। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার ইন্তেকালের পর অবশেষে তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অন্য আর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু চল্লিশ দিন পর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

অপর আর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু হাশেম গোত্র যদি হযরত ফাতেমার ঘরে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠক থেকে বিরত না হয়, তাহলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছা ছিলো ইন্ধন দিয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া।

বাইয়াত অস্বীকারের বিখ্যাত বর্ণনা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ অপরাপর বনু হাশেমীদের বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতির ব্যাপারে ইবনে কুতাইবার গ্রন্থ 'কিতাবুল ইমামাত ওয়াসসীয়াসায়' উল্লেখিত বর্ণনাটিই সবচেয়ে খ্যাত। বর্ণনাটিতে উল্লেখ হয়েছে ঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কিছু লোক সাথে নিয়ে বনু হাশেম গোত্রের কাছে গেলেন। তারা সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঘরে একত্রিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের কাছে 'বাইয়াত' গ্রহণের দাবী জানালে সকলেই বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। জুবাইর বিন আওয়ামে তো

১. হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একজন শরীফ, লজ্জাশীলা ও পবিত্র এবং সম্ভ্রান্ত রমণীর মুখ থেকে (নাউযুবিল্লাহ) এ ধরনের অশালীন শব্দ বের হতে পারে না। এ শব্দগুলোর দ্বারাই বর্ণনার অসত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।—অনুবাদক

www.pathagar.com

হাতে তরবারী নিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জুবাইরকে ধরে ফেলার জন্য সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন। জুবাইরকে ধরে তারা তার হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিলেন। বাধ্য হয়ে এবার জুবাইর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও 'বাইয়াত গ্রহণের দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন ঃ

"আমি তোমার বাইয়াত গ্রহণ করবো না। কেননা আমি তোমার চেয়ে খেলাফতের বেশী হকদার। আমার হাতে তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করা উচিত ছিলো। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়। আর নিকটাত্মীয়রাই খেলাফত পাবার যোগ্য। একথা বলেই কি আপনারা আনসারদের বাইয়াত গ্রহণ করেননি ? এ নীতিমালা অনুযায়ীই তো খেলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা আপনাদের উচিত ছিলো। কিন্তু আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর থেকে খেলাফতকে ছিনিয়ে নিয়ে জবর দখল করেছেন। আপনারা কি আনসারদের কাছে এ দলিল পেশ করেননি যে, আমরা খেলাফতের বেশী হকদার। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আমাদের বংশের। এ কারণেই আপনারা এখন আমাদের আনুগত্য করুন এবং খেলাফত আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। আনসারদের কাছে আপনাদের পেশকৃত দলিল অনুযায়ী আমিও এখন আপনাদের কাছে দলিল পেশ করছি যে, আমি আপনাদের চেয়ে বেশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়। তাই খেলাফত আমার প্রাপ্য। আপনাদের যদি সামান্য ঈমানও থাকে তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেলাফত আমার হাতে ছেড়ে দিন। আর যদি যালেম হতেই পসন্দ করেন তাহলে যা খুশী তা-ই করুন। এতে আপনারা স্বাধীন।"

এসব কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন ঃ

"বাইয়াত গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি আপনাদের ছাড়বো না।"

এতে হযরত আলী ভীষণ রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "ওমর তুমি বেশ আনন্দ করে দুধ দোহন করছো। এতে তোমারও অংশ আছে। খেলাফতের ব্যাপারে তুমি আজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্য করছো। কেননা কাল খেলাফত তোমার কাছে ফিরে যাবে। আমি তাঁর হাতে কখনো 'বাইয়াত' গ্রহণ করবো না।"

কথা বাড়তে বাড়তে মন্দাচারে পৌঁছে যাবার ভয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তুমি যদি বাইয়াত করতে না চাও তাহলে আমিও তা করতে তোমাকে বাধ্য করবো না।"

www.pathagar.com

এরপর আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লক্ষ্য করে খবুই নরম স্বরে বললেন ঃ

"ভাতিজা ! এখনো তোমার বয়স কম। এসব লোক খুবই সম্মানিত। এদের সামনে তোমার অভিজ্ঞতাও নেই। বিশ্ব সম্পর্কেও তারা বেশী ওয়াকেফহাল। জাতির কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব ও খেলাফতের হক যথাযথভাবে পালন করতে পারে তাহলে তা করতে পারবে শুধু আবু বকরই। তাই তুমি তাদের খিলাফত গ্রহণ করো। যদি তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করো তাহলে অবশ্যই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দীনি মর্যাদা, জানা-বুঝা, ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমান, বংশ মর্যাদা এবং রাসূলুল্লাহর জামাই হবার কারণে অবশ্যই তুমি খেলাফতের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।"

একথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু আরো রেগে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে মুহাজিরগণ ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমাতকে তাঁর ঘর থেকে বের করে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করাবে না। তাঁর আহলে বাইয়াতকে সঠিক স্থানে স্থান দিও। তাদের হক তাদেরকে দিও। হে মুহাজিরগণ ! আল্লাহর কসম। আহলে বাইয়াত হবার কারণে আমরাই খেলাফত ও হুকুমাতের হকদার। ততদিন পর্যন্ত আমরা এ হকের দাবীদার যতদিন আল্লাহর কিতাবের 'ক্বারী' দীনের 'ফকীহ', রাসূলুল্লাহর সুন্নাতের 'আলেম', প্রজা সাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত, তাদের অভাব-অনটন দূর করতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে সম আচরণ প্রতিষ্ঠাকারী বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ আহলে বাইয়াতে বর্তমান আছে। তাই নিজেদের আশা-আকাংখার অনুগামী হয়ে আল্লাহর পথে গুমরাহী খরিদ করে নিও না। এবং সত্য পথ থেকে দূরে সরে যেও না।"

বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময়ে বশির বিন সায়াদ এখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথাগুলো শুনে তিনি বললেন ঃ

"হে আলী ! এখন আপনি যে কথাগুলো বললেন, যদি আনসাররা আগে তা শুনতো, তাহলে অবশ্যই তারা আপনি ছাড়া আর কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতো না।"

এসব কথার পর অগ্নিশর্মা হয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ভিতরের দিকে চলে গেলেন। রাতে বেরিয়ে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে একটি খচ্চরের উপর বসিয়ে আনসারদের কাছে চলে গেলেন। বিবি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা[১] ঘরে ঘরে গিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থনে আনসারদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেক জায়গা থেকে জবাব এই এলো ঃ

---

১. একথা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার মর্যাদার সাথে মিলছে না। তিনি স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে আনসারদের ঘরে ঘরে গিয়ে বাইয়াতের জন্য লোকদের মধ্যে প্রচার করবেন একথা বিশ্বাস করা যায় না।—অনুবাদক

www.pathagar.com

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ! আমরা তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ফেলেছি। বাইয়াতের পূর্বে যদি আপনার স্বামী আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাদের কাছে আসতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতাম।"

একথা শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু রেগে গেলেন এবং বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাফন-কাফন ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্থলাভিসিক্তের ব্যাপারে আমি বুঝি দ্বারে দ্বারে ঝগড়া করে ঘুরে বেড়াবো ?"

হযরত বিবি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহাও আলীকে সমর্থন করে বললেন ঃ

"হাসানের পিতা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পক্ষে যা সমীচীন মনে হয়েছে, তা-ই করেছেন। আর ঐসব লোক যা করেছেন তাদের থেকে অবশ্যই একদিন আল্লাহ তার হিসাব-নিকাশ নেবেন ও জিজ্ঞেস করবেন।"

নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বসম্মত বর্ণনা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকার করেছেন বলে যেসব বর্ণনা আছে তা প্রকাশ করা হলো। এর বিপরীত এমন অনেক বর্ণনা আছে তা পূর্ব বর্ণনাগুলোকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে। বনু হাশেম ও কিছুসংখ্যক মুহাজির হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছেন বলে পরের বর্ণনা স্বীকার করে না। এসব বর্ণনা হতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'সাকিফায়ে বনু সায়েদার বিশেষ বাইয়াতের পর মসজিদে নববীতে আ'ম বাইয়াতের সময় মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। বস্তুত তাবারিতে উল্লেখ আছে—জনৈক ব্যক্তি সাঈদ বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আপনি কি রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর সময় মদীনাতে বিদ্যমান ছিলেন ?" তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ছিলাম।' সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত কখন অনুষ্ঠিত হয়েছে ?' তিনি জবাব দিলেন, ঐদিনই যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন।'

'খলিফাবিহীন একদিনও অতিবাহিত করা সাহাবীগণ পসন্দ করতে পারেননি।' আবার প্রশ্ন হলো—'কেউ কি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করার বিরোধিতা করেছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'না, ধর্মত্যাগীরা অথবা ওরা, যারা ধর্মত্যাগের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিলো। তারা ছাড়া কেউ বিরোধিতা করেননি।' আবার প্রশ্ন করা হলো—'মুহাজিরদের কেউ কি বাইয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'না, বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য কেউ তাদেরকে ডাকতে আসবেন–এর জন্যও কোনো মুহাজির অপেক্ষা করেননি। তারা নিজে নিজে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন।'

www.pathagar.com

একটি বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, বাইয়াত গ্রহণের জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মসজিদে নববীতে গমন করেছেন শুনেই নিজ ঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এক কাপড়ে ওখানে চলে যান। বাইয়াত গ্রহণ করার পর ঘর থেকে তিনি দ্বিতীয় কাপড় চেয়ে এনে পরে নেন।

আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত সম্পর্কে মধ্যপন্থী রায়

কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এসব বর্ণনার সারমর্ম হলো—বাইয়াতের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মেম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত সকলের প্রতি তাকালেন। জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতে না পেয়ে তাঁকে ডেকে এনে তিনি বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই ও তার সাথী ! আপনি কি মুসলমানদের খুঁটি ভেঙ্গে ফেলতে চান। বাইয়াত গ্রহণ না করে কি মুসলমানদের শক্তিকে দুর্বল করতে চান।"

হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা ! আমাকে মন্দাচার করবেন না। আমি এখনই বাইয়াত গ্রহণ করছি।"

বস্তুত তিনি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আবার উপস্থিত জনতার প্রতি তাকিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতে পেলেন না। তাকেও তিনি ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ

"হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ও তাঁর প্রিয় জামাই ! আপনি কি মুসলমানদের খুঁটি ভেঙ্গে ফেলতে চান ?"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা, এখনি আমি আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করছি।"

একথা বলেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

বনু উমাইয়ার ফেতনার চেষ্টা

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনায় দেখা যায় যে, বনু উমাইয়ার লোকেরা বনু হাশেম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য নানা ধরনের ফেতনা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। উল্লেখ হয়েছে, যে সময় মদীনাবাসীরা বাইয়াত গ্রহণের জন্য মসজিদে নববীতে একত্রিত হলেন, সে সময় আবু সুফিয়ান হাশেম গোত্রের কাছে এসে বলতে লাগলেন ঃ

www.pathagar.com

"আমি একটি বিপদ দেখছি। রক্ত প্রবাহিত ছাড়া তা ছুটাবার পথ নেই। হে আবদে মানাফের বংশধরেরা ! আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কখন থেকে তোমাদের হর্তাকর্তা হয়ে গেলো ? কোথায় ঐসব লোক যারা দুর্বল থাকতেই ভালবাসে। আর কোথায় আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু যাদের অপমান ও লাঞ্ছনাই ভাল লাগে।"

এরপর তিনি একটি কবিতার পংক্তি পাঠ করলেন ঃ

ولا يقيم على ضيم يرادبه   الا الاذ لان غير الحى والوتد ـ

هذا على الخسف محبوس برمته   وذايشج فلا يبكى له احد ـ

"দু'টি লাঞ্ছিত জিনিস ছাড়া কোনো যুলুম করা যায় না। একটি হলো গোত্রের গাধা আর দ্বিতীয়টি হলো খিল। ছেড়া ফাটা রশি দিয়ে বাধা গাধাও সকল রকম তর্জন গর্জন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে থাকে। আর খিল গাড়বার সময় আহত করা হয় কিন্তু তার জন্য কেউ অশ্রুপাত করে না।"

পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী

কেউ কেউ মনে করেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ না করার বর্ণনাগুলো আব্বসীয় শাসনামলের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রচিত হয়েছে। তারা বলেন শিয়া সম্প্রদায় আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত না করার প্রমাণ হিসাবে একটি ঘটনা পেশ করেন। আর এ ঘটনাটি সঠিক হবার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইয়াত না করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনাটি হলো—হযরত আবু বকরের বাইয়াত গ্রহণের পর হযরত বিবি ফাতেমা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে এসে ফেদাক ও খায়বারের পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী জানিয়ে বসলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূলের একটি হাদীস আমি শুনেছি ঃ نحن معاشر الانبياء لانورث، ماتركنا صدقة –'আমরা আল্লাহর রাসূলের গোত্র। আমরা কোনো সম্পদ রেখে যাই না। আমরা যা ছেড়ে যাই তাহলো সাদাকা।' যে সম্পদের কথা আপনারা উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা রাসূলের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ চলতো। তাই আমিও ঐ সম্পদ ঐ খাতেই খরচ করবো, যে খাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে খরচ করতেন।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা এতে অসন্তুষ্ট হলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে[1] কথা বলেননি। মৃত্যুর পরে

১. মিরাসের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার নারাজ হবার বিষয়টা বুঝে আসে না। রাসূলের হাদীস উদ্বৃত করার পর পথ ছিলো দু'টো। একটি হাদীসকে সঠিক মনে না করা অথবা তা মেনে নেয়া। কেউ একথা বলেনি যে, তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করেছেন। ব্যাপার যখন তা নয়, তাহলে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার মত সম্মানিতা রমণী কি করে রাসূলের হাদীস থেকে মুখ ফিরাতে পারেন এবং একখণ্ড জমির জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর এতো অসন্তুষ্ট হতে পারেন ?–অনুবাদক

www.pathagar.com

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু রাতের বেলায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খবর না দিয়েই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে দাফন করে ফেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর ছয় মাস পরেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট থাকার কারণে তাঁর উপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুও অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার তিরোধানের পর উভয়ের সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত আসল বর্ণনা হলো এটা, আসলে কিন্তু এর সাথে আরো একটু জুড়ে দেয়া হয় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহার জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। হযরত ফাতেমার মৃত্যুতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সমবেদনা জানাবার জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাড়ীতে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

"এখন আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে আমার আর কোনো বাধা নেই। তবে আমার ধারণা, খেলাফত আমাদের প্রাপ্য। আপনি তা দখল করে নিয়ে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। এভাবে আমাদের উপর যুলুম করেছেন।"

এর জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"এ ধন-সম্পদ নিয়ে আমার আর তোমাদের মধ্যকার বিরোধে আমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তা করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্যেই।"

উল্লেখিত সদর আসহাব বলেন, এ বর্ণনার শেষাংশ বুদ্ধির দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানদের সর্বসম্মত বাইয়াত গ্রহণ ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খলিফা নির্বাচন করার পরই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মিরাস দাবী করার প্রশ্ন উঠে। এর আগে এ ধরনের দাবীই উত্থাপন অর্থহীন। বনু হাশেম ও হযরত আলী যদি তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ না করবেন ও তাঁকে খলিফা হিসাবে স্বীকার না করবেন, তাহলে তাঁর কাছে তাদের এ দাবীর অর্থ কি দাঁড়ায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু কালবিলম্ব না করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত গ্রহণ করেছেন বলে যারা বলেন, তারা ঐসব বর্ণনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আব্বাসী যুগের মনগড়া রচনা বলে আখ্যায়িত করেন। আবার কেউ কেউ এসব বর্ণনাকে আব্বাসী যুগের আগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় বনু হাশেম ও বনু উমাইয়া গোত্রের রেষারেষির ফল বলে উল্লেখ করেন।

শেষোক্ত গোষ্ঠীর বর্ণনা হলো—ইরান ও পারস্য বিজয়ের পর ওখানে ইরান বংশোদ্ভূত কিছু লোক নিজেদের স্বার্থে এ ধরনের বর্ণনা মনগড়াভাবে তৈরি করেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের উপর উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণের কারণে তারা এ ধরনের বর্ণনা প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি। গোপনে গোপনে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতো। আর তাদের আকীদা প্রকাশ করতে এসব প্রচারের সুযোগ পাবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকতো। আবু মুসলীম খোরাসানীর আত্মপ্রকাশের পর তাদের এসব আভ্যন্তরীণ আশাবাদ পূরণ হলো। এরপর যা হয়েছে এবং যেভাবে এসব বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করে আব্বাসীয়রা শাসন ক্ষমতা দখল করেছে—তা ইতিহাসের এক রক্তঝরা অধ্যায়।

যারা বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও বনু হাশেম চল্লিশ দিন অথবা ছয় মাস পর বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, তাদের স্বপক্ষে তারা আগের বর্ণনাগুলো ছাড়াও আর একটি ঘটনা পেশ করেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর অনুগামীরা উসামার বাহিনীতে যোগ দেননি। অথচ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শৌর্যবির্য ও বীরত্ব ছিলো প্রবাদ বাক্যের মতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন।

মুহাজিররা আনসারদের তুলনায় খেলাফতের বেশী হকদার। সাকিফায় বনি সায়েদায়ে একথার পক্ষে দলীলও পেশ করা হয়েছিলো। রাসূলের সাথে তাদের আত্মীক যোগ সম্পর্ক ছাড়াও দৈহিক সম্পর্কও ছিলো। আরবরা কুরাইশ ছাড়া আর কারো আনুগত্য স্বীকার করবে না। কেননা তারা কা'বার রক্ষক। আরব উপদ্বীপের সকল মানুষের দৃষ্টি প্রত্যেক ব্যাপারেই কুরাইশদের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এতেই প্রমাণিত হয়, অন্যান্যদের তুলনায় বনু হাশেমই ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্তের হকদার। নিজেদের হকের অগ্রাধিকার দিয়ে উচিত ছিলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাইয়াত হতে ফিরে থাকা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাই করেছিলো। কিন্তু মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে অবশেষে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে সে সময় গোটা আরবে ধর্ম ত্যাগের কলহ জেগে উঠেছিলো এবং মদীনার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে ইসলাম বিপন্ন হবার বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শান্তিপূর্ণ খেলাফতকাল

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও বনু হাশেমের খেলাফতের বাইয়াতের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের যত বিরোধই থাকুক না কেনো এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথম দিন থেকেই কোনো বাধা-বিপত্তি ও কলহ-বিগ্রহ ছাড়াই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বনু হাশেম গোত্রের কোনো ব্যক্তি বা অন্য কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে—এমন একটি প্রমাণও নেই। এর কারণ, মানুষের মনে এ মহান ব্যক্তির মর্যাদা ছিলো যা রাসূলের কাছে ছিলো। রাসূল ইরশাদ করেছিলেন, "বান্দাদের মধ্যে যদি আমি কাউকে 'খলিল' বানাতাম, তাহলে বানাতাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে।" হিজরতের সময় যে মর্যাদা ও সান্নিধ্য তিনি লাভ

www.pathagar.com

করেছিলেন তাঁর ঐসব ফযীলত ও সৌন্দর্যাবলীর দরুন মানুষের মনে তাঁর জন্য শ্রদ্ধাভক্তির শেষ ছিলো না। রাসূলের মৃত্যু শয্যায় তাঁকে মুসলমানদের নামায পড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। মোটকথা, তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার কারণ যা-ই হোক, প্রকৃত ঘটনা হলো, তাঁর বিপক্ষে কেউ দাঁড়াননি। আর যে একবার তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, বাইয়াত গ্রহণে অনিচ্ছুক লোকদের সাথে তারা যোগ দেননি। এটা একথারই প্রমাণ করে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মনে খেলাফতের যে ধারণা ছিলো, পরের যুগের বনু উমাইয়াদের যুগে সে ধারণা ভিন্ন ছিলো। প্রথম যুগের মুসলমানদের মনে খেলাফতের ধারণা ছিল, এ আরবী তামাদ্দুনের অনুরূপ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের সময় বিরাজিত ছিলো। ইসলাম বিজয়ের বিস্তৃতির ফলে বিভিন্ন বিজিত জাতির সাথে আরবদের ব্যাপকভাবে মেলামেশা শুরু হলো তখন মেলামেশা ও রাষ্ট্রীয় বিস্তৃতির কারণে খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাও পালটে গেলো।

খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা

প্রথম প্রথম আরবী দৃষ্টিভঙ্গিতেই মুসলমানদের খেলাফতের ধারণা ছিলো। সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলাফতের ব্যাপারে কোনো ওসিয়াত করেননি। একথা সামনে রেখে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর সাকিফায় বনি সায়েদায় আনসার ও মুহাজিরদের বিরোধ, আ'ম বাইয়াতের পর বনু হাশেম ও অন্যান্য মুহাজিরদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে বির্তকের দিকে তাকাই তখন পরিষ্কার বুঝতে পারি—প্রথম খলিফার নির্বাচনের সময় মদীনাবাসী 'ইজতেহাদ' করে কাজ করেছেন। কুরআন ও সুন্নায় খেলাফত সম্পর্কে কোনো সনদ ছিলো না। এ কারণেই মদীনাবাসী মুসলমানরা খেলাফতের দায়িত্ব সমাপন করা যাকে দিয়ে সম্ভব মনে করেছেন, তাঁর কাঁধেই খেলাফত অর্পণ করেছেন। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি যদি বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যেতো, তাহলে অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। আর এ অবস্থায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথানুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের হাতে ঘটনাক্রমে ও তাৎক্ষণিকভাবে বাইয়াত হতে পারতো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বেলায় খেলাফতের নির্বাচনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো তা পরের দু' খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্বাচনের সময় অবলম্বন করা যেতে পারেনি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মৃত্যুর পূর্বেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর খেলাফতের দায়িত্বভার অর্পণের ওসিয়াত করে গেছেন। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের মৃত্যুর আগেই খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় ব্যক্তির একটি কমিটি গঠন করে গেছেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হবার ফলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের পরিণতিতে খেলাফত অবেশেষ উমাইয়া বংশের

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে খেলাফত নির্বাচনের পদ্ধতিই বদলিয়ে যায়। খলিফার যোগ্যতাগত বৈশিষ্ট্য বাদ গিয়ে খেলাফত পিতার কাছ থেকে ছেলে, ছেলের পরে নাতি, নাতির পরে পুতি এভাবে বংশগত মিরাসী সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়।

এসব ঘটনা দেখে একথা বলার সুযোগ থাকে না যে, ইসলাম শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য অবিকল কোনো নীতিমালা রচনা করে দিয়েছে। মূলকথা হলো, খেলাফত নির্বাচনের ব্যাপারটি একটি ইজতেহাদী ব্যাপার। পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে এতেও পরিবর্তন চলে আসছে এবং বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের সামনে পেশ হয়ে আসছে।

ইসলামের শাসনব্যবস্থা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের খেলাফতকালে যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন তা ছিলো পরিপূর্ণ আরবী শাসন ব্যবস্থা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে সাথে এবং তাঁর সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে তার খেলাফত যুগের ব্যবস্থা ছিল রাসূলের ব্যবস্থার মতই। কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো ইসলামী বিজয়ের পরিধি বাড়তে লাগলো তখন থেকে ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থারও বিলোপ হতে শুরু করলো। আব্বাসীয় যুগের অগ্রগতির সময়কার শাসন ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফাত যুগের শাসনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সূচিত হলো। শুধু তাই নয় বরং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরের তিন খলিফার জারী করা শাসনব্যবস্থায়ও অনেক পার্থক্য ছিলো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত যুগ নিজস্ব ধরন প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন, সিয়াসাত এবং হুকুমাতের পার্থিব রাজনীতির সঙ্গমস্থল। একথা ঠিক যে, দীন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। এ ব্যাপারে পরিবর্তন-পরিবর্ধন অদল-বদল ও বাতিলের কারো কোনো অধিকার ছিলো না। রাসূলের মৃত্যুর সাথে সাথে আরবে ধর্ম ত্যাগের বড় বিপদ নেমে আসে এবং অনেক অনেক গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে। এ অবস্থায় এক বিরাট সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য একটি মযবুত নীতিমালা তৈরি করা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন শুরু করে দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব পরিপূর্ণতায় পৌছাবার কাজ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই সম্পন্ন করতে হয়েছে।

তিনি কিভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কিভাবে আদায় করলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সংযোজিত হবে।

---

www.pathagar.com

৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় আরবের অবস্থা

একদিকে মদীনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে খেলাফতের বাইয়াত চলছে। অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র আরব গোত্রে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের মৃত্যু সংবাদ যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, এত দ্রুত আর কোনো ঘটনা আরবে ছড়ায়নি। ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরবের লোকেরা মদীনার শাসনের জোয়াল কাঁধ থেকে সরিয়ে ফেলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পূর্ব অন্ধকার যুগ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তখন আরবের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলো, মুনাফিকি বৃদ্ধি পেলো, ইহুদী খৃষ্টানদের দৌরাত্ম বেড়ে গেলো, চারিদিকে মুসলমানদের শত্রু সংখ্যাও বেড়ে চললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে মুসলমানের অবস্থা ছিলো অন্ধকার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে ঘনঘোর জঙ্গলে পতিত রাখালবিহীন মেষ পালের মত। মাথা গুঁজার মতো আশ্রয় তারা পাচ্ছে না।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে এর আগে ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিলো। আল্লাহর অপার করুণা না হলে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কৌশল কাজে না লাগালে, এ ঝগড়ার রেশ কোথায় গিয়ে পৌঁছতো তা আল্লাহই ভালো জানেন। এ কলহের অবসান সে সময় না ঘটলে মুসলমানরা আর কোনো দিন ঐক্য ও সংহতির মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ।

ধর্ম ত্যাগের দ্বারপ্রান্তে মক্কাবাসী

মক্কা-মদীনার অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে মদীনার চেয়ে মক্কার অবস্থা ছিলো বেশী ভয়াবহ। মদীনায় ছিলো শুধু খেলাফতের ঝগড়া, আর মক্কাবাসীরা ধর্ম ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলো। মক্কার শাসক 'ইতাব বিন উসায়দ' তাদের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলো। মক্কাবাসীরা এ ফেতনা থেকে বেঁচে থাকুক—এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো। তাই তারা আল্লাহর রাসূলের সরলপ্রাণ সাহাবী সুহাইল বিন ওমরের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে ধর্ম ত্যাগের অভিশাপ থেকে নিরাপদ থাকে। তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা দেখে সকলকে একত্রিত করে রাসূলের ইন্তেকালের উল্লেখ করে বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে ইসলামের শক্তিতে কোনো দুর্বলতা আসেনি। এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও সংশয়ে ভুগবে।

www.pathagar.com

অবলম্বন করবে দোদুল্যমান পথ অথবা ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে চিন্তা করবে, তার গর্দান আমি উড়িয়ে দেবো।"

ধমকের ফল উল্টো হবার সম্ভাবনাও ছিলো। তাই সুহাইল ধমকের সাথে সাথে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে ইসলামে মযবুত থাকার হেদায়াত দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"নিশ্চয়ই ইসলাম অবিকল কায়েম থাকবে। কোনো দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী খেলাফাতও তোমাদের ভাগ্যে থাকবে।"[১]

সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ দৃঢ় ও শক্তিশালী বক্তব্য মক্কাবাসীদের মনে ধমকের চেয়েও আশার আলো বিস্তার করেছে বেশী। তারা ধর্ম ত্যাগ করার পথ পরিহার করে বসলো। সাথে সাথে তারা শুনলো খেলাফতের দায়িত্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হয়েছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে ইসলামের উপরে দৃঢ়ভাবে কায়েম রইলো।

ধর্ম ত্যাগের ফেতনা ও সাকিফ বংশ

তায়েফের সাকিফ গোত্রও ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেছিলো। ওখানকার শাসক ওসমান বিন আবুল আস তাদের এ মনোভাবের খবর পেয়ে তাদেরকে একত্রিত করে বললেন ঃ

"হে সাকিফ সন্তানেরা! তোমরা সকলের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। এখন সকলের আগে ইসলাম ত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত হয়ো না।"

হুনাইনের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে কি আচরণ করেছিলেন তা তাদের মনে আছে। তারা আরো জানতো যে, তাদের এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তাই ওসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তারা ধর্ম ত্যাগের খেয়াল পরিহার করে যথারীতি ইসলামের উপর কায়েম থাকে। মনে হচ্ছে—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতলাভের খবরে মক্কাবাসীদের মত সাকিফবাসীরাও প্রভাবান্বিত হয়েছিলো।

অন্যান্য আরব গোত্রের কর্মপদ্ধতি

মক্কা-মদীনা ও তায়েফের মাঝখানে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেনি। মুজনিয়া, গির্জার, জুহাইনা, বালি, আশ্‌জা, আসলাম এবং খাজায়া গোত্রগুলোও ইসলাম পরিত্যাগ করলো না। কিন্তু এ কয়টি গোত্র ছাড়া গোটা আরবেই

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ ঃ لا يمن قريش । খলিফা হবে কুরাইশদের মধ্য হতে, সম্ভবত একথার প্রতি সুহাইল ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

এ সময়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বেশী দিন হয়নি, অথবা যাদের মনে এখনো ইসলামী শিক্ষার প্রভাব পড়েনি, তারা খোলাখুলি ইসলাম ত্যাগ করলো। অন্যদের আকীদা-বিশ্বাসেও নড়বড়ে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুসংখ্যক লোকতো ইসলামের উপর কায়েম ছিলো কিন্তু মদীনার শাসন মানতে তৈরি ছিলো না, শাসক মুহাজির হোক অথবা আনসার।

মদীনার শাসক তাদের উপর যে যাকাত ধার্য করেছিলো এসব লোক তাকে জিযিয়ার মতো মনে করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্ত যাকাত আদায় করার ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি ছিলো না। কারণ, তিনি রাসূল ছিলেন। তাঁর উপর অহী নাযিল হতো। তিনি যা কিছু তাদের কাছে চাইতেন তা তাঁর হক ছিলো। এখন তিনি আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে স্থান গ্রহণ করেছেন। আর মদীনাবাসীরা কোনোদিক দিয়েই তাঁর চেয়ে অগ্রসর নন। তাই মদীনাবাসীদেরও তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো যাকাত আদায় করার অধিকার নেই।

যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলো তারা ছিলো মদীনার নিকটবর্তী গোত্র আবাস, জুবিয়ান এবং তাদের সংলগ্ন গোত্র বনু কেনানা, গাতফান এবং ফাজারাহ। কিন্তু যেসব গোত্র ছিলো মদীনা থেকে বেশ দূরে তারা ধর্ম ত্যাগের পথেই অগ্রসর হচ্ছিলো। অধিকাংশ লোকই নিম্নবর্ণিত মিথ্যা নবীর দাবীদারদের অনুসারী হয়েছিলো।

তোলায়হা বনী আসাদ গোত্রে নবুয়াতের দাবী করেছিলো।
সাজায়া বনী তামিম গোত্রে নবী হবার দাবী উত্থাপন করেছিলো।
মুসাইলামা ইয়ামামায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলো।

জত্তাজ লকিত বিন মালেক আম্মানে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলো। এছাড়াও ইয়েমেনে আসওয়াদে উনসি তার সমর্থকদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা একত্রিত করে একটি দল গঠন করে রেখেছিলো। তার নিহত হওয়া এবং ধর্ম ত্যাগের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এসব লোক অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলো।

বিদ্রোহ ও ধর্ম ত্যাগের কারণসমূহ

কুরাইশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আরবের শহুরে বাসিন্দা ও বেদুঈনরা বিদ্রোহ ঘোষণাসহ অধিকাংশ গোত্রের ইসলাম ত্যাগ শুধু এ জন্য হয়নি, তারা মদীনা থেকে অনেক দূরে ছিলো এবং এ সময়টিকে চরম সুযোগ মনে করে তারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলো। বরং এ ছাড়া আরো একাধিক কারণ ছিলো যা এ ফেতনাকে চরম আকার ধারণ করতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফ অবরোধ ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত আরবের দূর-দূরান্তে ইসলাম প্রসারিত হতে পারেনি। এতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম মক্কা-মদীনা আর এ দু' শহরের

www.pathagar.com

মধ্যে বসবাসকারী গোত্রসমূহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। মদীনায় হিজরতের অল্প আগে ইসলাম মক্কার সীমা ছেড়ে বের হতে পেরেছিলো। হিযরতের পর কয়েক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় ইসলামের শিকড় মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। এরপর যখন মুসলমানরা ইহুদীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও প্রভাবকে সমূলে উপড়ে ফেলেন এবং কুরাইশদেরকে পদানত করে মক্কা বিজয় করেন, তখন আরবের অন্যান্য গোত্রও ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়লো। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ দলে দলে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় দীনের জ্ঞান শিখাবার ও যাকাত ইত্যাদি আদায় করার জন্য শাসকদের এসব এলাকায় পাঠাতে লাগলেন।

ভৌগলিক কারণ

এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো যে, মক্কা-মদীনা এবং আশেপাশে এলাকার মুসলমানদের মতো দীনের সত্যতা ও অকাট্যতা আশেপাশের গোত্রের লোকদের মনে মযবুত প্রত্যয় সৃষ্টি হয়নি। পুরোপুরিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে প্রায় বিশ বছর সময় লেগেছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মুসলমানদেরকে আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করা, বছরের পর বছর বিরোধীদের যুলুম-নিপীড়নের শিকার হওয়া এবং একাধারে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছিলো। পরিশেষে বিরোধীরা পরাজিত হয়েছে। মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও নিকটবর্তী গোত্রের লোকজন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও সাহাবীদের সাথে বেশী বেশী মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে, তাদের মনে ইসলামী জ্ঞান মযবুত হয়ে গিয়েছিলো। আর যারা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে ছিলো, ইসলামের জন্য মুসলমানদের সংগ্রাম- সাধনাকে যারা না চোখে দেখেছে, না তাদের ত্যাগ-কুরবানীকে অবলোকন করেছে, তাদের মনে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই তারা এ নতুন দীন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। তাদের ধারণায় এ দীন তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক কারণ

ভৌগলিক কারণ ছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোর কর্মকাণ্ডও ঐসব গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কম ইন্ধন যুগায়নি। মক্কা-মদীনার চারপাশের এলাকা তো ইরান ও রোমক সাম্রাজ্যের হস্তক্ষেপ মুক্ত ছিলো। কিন্তু আরবের উত্তর সীমান্ত সিরিয়ার সাথে এবং দক্ষিণ সীমান্ত ইরানের সাথে সংযুক্ত হবার কারণে এসব এলাকা ঐ দু'টি মস্তবড় দেশের প্রভাবাধীন ছিলো। এসব এলাকায় এ দুই তৎকালীন পরাশক্তির বেশ প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিলো। আর এখানকার নেতারাও সরাসরি ইরান ও রোমকদের অনুসারী ছিলো। এসব ব্যাপার বিদ্যমান থাকার জন্যে অসম্ভব নয় যে, ধর্ম ত্যাগের এ সংক্রমণের সময় নিম্নলিখিত উপকরণগুলোও কার্যকর নয়।

www.pathagar.com

(১) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবণতা।

(২) উত্তর সীমান্তে খৃষ্টান ও দক্ষিণ সীমান্তে অগ্নি উপাসক সাম্রাজ্য সংযুক্ত বিধায় খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসকদের প্রভাব প্রতিপত্তি।

(৩) পিতৃ পুরুষের ধর্ম মূর্তিপূজার আকর্ষণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এসব উপকরণগুলো কাজ করতে শুরু করলো। জায়গায় জায়গায় ধর্ম ত্যাগের ঝগড়া -কলহ শুরু হলো। কোনো কোনো জায়গায় তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই এসব কারণগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু হয়েছিলো। এসবের বিস্তৃত বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে। এমন কিছু লোক উঠে দাঁড়ালো যারা তাদের স্ব স্ব গোত্রকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানী দিয়ে তাদের পতাকাতলে সমবেত করা শুরু করলো। এভাবে গোটা আরবে একটা বিরাট গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটলো।

যাকাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি

যাকাত অস্বীকারকারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, যেহেতু খেলাফতের ব্যাপারে মুহাজির ও আনসাররা ঝগড়া করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মৃত্যুর পূর্বে খেলাফতের বিষয়ে কারো নাম ওসিয়াত করে যাননি। তাই ইসলামে কায়েম থেকেই আমরা স্বাধীন থাকবো। আর আনসার ও মুহাজিরদের মতো আমরাও আমাদের মধ্যে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেবো। তিনিই হবেন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অথবা অন্য ব্যক্তির আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন- হাদীসে কোনো নির্দেশ বা দলীল নেই। অতএব যাকে আমরা নিজেরা আমাদের আমীর নির্বাচন করবো তারই আনুগত্য আমাদের জন্য ওয়াযিব।

এসব লোক তাদের দাবীর স্বপক্ষে বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই আরবের কয়েকটি শহরকে স্বাধীনতা দান করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর যদি তারা পরিপূর্ণ আযাদী চায়, তাতে কারো কোনো আপত্তি তোলার কারণ থাকতে পারে না। তাদের দাবী ছিল যে, ইয়েমেনের শাসক বুধহান অথবা বাজান ইরানীদের পক্ষ থেকে সেখানে শাসন কার্য চালাচ্ছিলো। অগ্নিপূজা ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যথারীতি ওখানকার শাসক বানিয়ে রেখেছিলেন। এভাবে বাহরাইন, হাজারামাউত ইত্যাদি শাসকগণকে ইসলাম কবুল করার পর ঐখানেই শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। কোনো নতুন শাসক সেখানে পাঠাননি।

যাকাতকে তারা 'জিযিয়া' হিসাবে মনে করেছিলো। অথচ 'জিযিয়া' অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত অবশ্যম্ভাবী কর। মদীনাবাসীরা যেমন মুসলমান, তারাও তো তেমন মুসলমানই। এ অবস্থায় তারা কেন মদীনার শাসককে যাকাত দিতে যাবে? তারা এবং মদীনাবাসীরা একই যোগসূত্রে 'দীন ইসলাম' দ্বারা সংযুক্ত। এর অর্থ এ নয়,

www.pathagar.com

মদীনাবাসীরা তাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকারী। মদীনাবাসীরা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হবার মর্যাদা অর্জন করেছে। কিন্তু অন্যান্য গোত্রের উপর তারা তাদের এ মর্যাদাকে তখনই প্রকাশ করতে পারবে, যখন তারা সেখানকার অধিবাসীদেরকে দীনের শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক পাঠাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পাঠাতেন। তারা এবং আমরা একই উম্মত। কাজেই এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করবে, স্বাধীনতা ও স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে কোন্ যুক্তিতে।

এসব ধারণা মক্কা-মদীনা এবং তায়েফের নিকটবর্তী গোত্রগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু ইয়েমেনসহ অন্যান্য দূর-দূরান্ত এলাকার অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর খবর শুনার সাথে সাথেই তাদের 'ঈমান' টলমল হয়ে উঠলো। তারা সে সময় শুধু ধর্ম ত্যাগের পথই বেছে নেয়নি। তাদের পতাকার নীচে একত্রিত হয়ে ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতিও গ্রহণ করা শুরু করে দেয়। যারা গোত্রীয় জাতীয়তার আগুন জ্বালিয়ে মানুষের মনে মক্কা-মদীনার বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে। কোনো তাবলিগের মাধ্যমে এসব লোক মুসলমান হয়নি। বরং তারা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা, প্রতাপ-প্রতিপত্তি দ্রুত ইরান ও রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, সমগ্র আরবে তার হুকুমাত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, তখনই তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা তখন দলে দলে মদীনায় এসে তাদের গোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতো।

মিথ্যা নবীদের আবির্ভাব

'মিথ্যা নবী'র দাবীদাররাই প্রকৃতপক্ষে কলহের আগুন সবচেয়ে বেশী প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল। এরা দাবী উঠিয়ে ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেভাবে অহী নাযিল হতো, তাদের উপরও এভাবে অহী নাযিল হয়। এরা প্রথম ইসলাম কবুল করে নিজেরাই নবুয়াতের দাবী করে বসে। কেউ কেউ আবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই এ মিথ্যা দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো।

বনি আসাদ গোত্রে 'তোলাইহা' নবী হবার দাবী করেছিলো। একবার সে নিজ গোত্রের সাথে ভ্রমণে বেরোয়। সময়টা ছিলো প্রচণ্ড গরমের। পিপাসায় মানুষের দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম। হঠাৎ তারা ময়দানে একটি মিষ্টি পানির কূপ পেয়ে গেলো। এটা দেখে তোলাইহার নবুয়াতের উপর মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো।

বনু হানিফায় মোসায়লামা' নামক ব্যক্তি নবী হবার দাবী করলো। শুধু এ দাবীই সে যথেষ্ট মনে করলো না বরং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পয়গাম পাঠালো, "আমাকে নবুয়াতে আপনার অংশীদার বানানো হয়েছে। তাই অর্ধেক ভূমির মালিক কুরাইশগণ আর অর্ধেক ভূমির মালিক আমি। কিন্তু কুরাইশরা বড় বেইনসাফ জাতি।"

www.pathagar.com

'আসওয়াদে উনসি' ইয়েমেনে মিথ্যা নবীর দাবীদার হয়ে দাঁড়ালো। শক্তি সঞ্চয় করে সে ইয়েমেন দখল করে বসলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাসককে সেখান থেকে বের করে দিলো। এসব মিথ্যা নবীদের মিথ্যা দাবীর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহর দীনে এত শক্তি বিদ্যমান যে, এসব দাবীদারদের প্রবঞ্চনার মুকাবিলা করতে এ শক্তি সক্ষম। মুসলমানদের ঈমান খুব মযবুত ও দৃঢ়। সময় মতো এদের প্রতিরোধ করতে তারা পূর্ণ সামর্থ রাখে।

আসওয়াদে উনসির নৈরাজ্য

এসব মিথ্যা নবীর দাবীদাররা ভালো করে জানতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে তারা তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করে সফল হতে পারবে না। আর এ কারণেই আসওয়াদে উনসি ছাড়া আর কোনো মিথ্যা নবীর দাবীদারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি। আসওয়াদে উনসি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে থাকে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই নবুয়াতের দাবী করেছিলো। আবার তাঁর যুগেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ইতিহাসবিদের ধারণা আসওয়াদও সতীর্থ ভাইদের মতো আচরণ অবলম্বন করেছিলো .... এবং ভিতরে ভিতরে নিজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ঘোষণা দিয়ে সে ইসলামের বিরোধিতায় বিদ্রোহ করলো এবং মুকাবিলা করার জন্য ময়দানে নেমে গেলো। ইয়াকুবী তার নিজের গ্রন্থে লিখেন ঃ

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই আসওয়াদে উনসি নবুয়াতের দাবী করেছিলো। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো এবং নিজের গোত্রের হাজার হাজার লোক তার দলে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। সর্বশেষে 'কয়েস বিন মাকসুহ আলমুরাদী' ও 'ফিরোজ দায়লমী' নামক দু' ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে দেয়। সে সময়ে সে ছিলো নেশায় বিভোর।"

ঐতিহাসিক তাবারীও এক বর্ণনায় লিখেছেন ঃ

> "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগীদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বাধে আসওয়াদে উনসির বিরুদ্ধে ইয়েমেনের মাটিতে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষাংশে আরব পরিপূর্ণ শান্ত ছিলো না। ভিতরে ভিতরে কলহের আগুন জ্বলতে থাকে। আরবের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণাংশের গোটা এলাকাটাই আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলো। এ বিক্ষিপ্ত ও সহিংস অবস্থাকে ঐ রূহানী শক্তিই নিবারণ করতে পারে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূরদৃষ্টি, কর্মকৌশল ও সুব্যবস্থার সাথে যদি আল্লাহর অপার

www.pathagar.com

রহমত শামিল না হতো তাহলে এ আগুন তাঁর জীবনেই আরো প্রজ্জ্বলিত হয়ে সমস্ত আরবকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার সম্ভাবনা থাকতো।

ইয়েমেনে আসওয়াদের ফেতনা

খুব সম্ভব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকেই আসওয়াদে উনসির মিথ্যা নবুয়াত দাবীর ফেতনা সংঘটিত হয়েছিলো। ঐতিহাসিকরা এ বিদ্রোহের কারণ হিসাবে যা বলেন তার থেকে কিছু দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যা লক্ষ্য করার ব্যাপার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি-পত্র লিখতে শুরু করেন। তখন পারস্য রাজ কিসরাকেও একটি চিঠি লিখেন। এ চিঠিতে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। দোভাষী তাকে পত্রের মর্ম পড়িয়ে শুনালে সে ইয়েমেনের শাসক বাজানকে[১] নির্দেশ পাঠালো, "আরবের নবুয়াতের দাবীদারকে শিরচ্ছেদ করে রাজ দরবারে পাঠিয়ে দাও।"

সে সময় রোম ইরানের করতলগত ছিলো। কিন্তু কিসরার চিঠি লিখতে না লিখতেই অবস্থার পটপরির্তন ঘটে গেলো। যে রোমীয়রা এর আগে ইরানের নিষ্পেষণের চাকায় পিষে যাচ্ছিল তারা আজ ওদের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তারা ইরানীদের গোলামী হতে শুধু নাজাতই পায়নি বরং তাদের উপর বিজয় লাভ করে তাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছে।

বাজান তার মনিবের চিঠি পেয়ে তার নিজের দু'জন লোকের মাধ্যমে সে চিঠিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়কে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

> "আমার আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন, তোমাদের বাদশাহ কিসরাকে তার পুত্র শেরবিয়া হত্যা করে ফেলেছে, সে পিতার জায়গায় এখন বসেছে।"

এর সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজানকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিলেন। তাকে আশ্বাস দিলেন যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে ইয়েমেনেরই শাসক বানিয়ে রাখা হবে। এরই মধ্যে ইরানের গণ্ডগোল। সিংহাসনে শেরবিয়ার আরোহণ এবং রোমীয় বিজয়ের খবর বাজানের কানে গিয়ে পৌঁছালো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে স্বাগত জানিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আশ্বাস অনুযায়ী বাজানকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে রাখলেন।

বাজানের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। প্রত্যেক ভাগের আলাদা আলাদা শাসক নিযুক্ত করেন। বাজানের ছেলে 'শাহরকে' সুনয়া ও এর আশেপাশের অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত

---

১. কোনো কোনো বর্ণনায় শাসকের নাম বাজানের পরিবর্তে বুধান লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

করেন। অন্যান্য শাসকদের কেউ কেউ ইয়েমেনেরই নাগরিক ছিলেন। আর কোনো কোনো শাসককে তিনি মদীনা হতে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। এসব শাসকগণ নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছে শাসনব্যবস্থা মাত্র সামলিয়ে নিয়েছেন, এমন সময় আসওয়াদে উনসির পয়গাম পেলেন। তারা যেনো তাৎক্ষণিকভাবে ইয়েমেন থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, ইয়েমেন শাসনের অধিকার শুধু তারই। এভাবেই ফেতনার সূত্রপাত।

ফেতনার শুরু

আসওয়াদ ছিলো মূলত দক্ষিণ ইয়েমেনের অধিবাসী একজন যাদুকর। কথার যাদু, সুন্দর বাচনভঙ্গি ও ছন্দের লালিত্যে কথা বলে তাড়াতাড়ি সে মানুষের মনকে বিমোহিত করে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। শেষ পর্যন্ত সে নবুয়াতের দাবীই করে বসলো। নিজের নাম দিলো রহমানুল ইয়েমেন। যেমন মুসাইলামা রেখেছিল তার নাম রহমানুল ইয়ামামা।[১] সে বলতে লাগলো তার কাছে একজন ফেরেশতা আসে এবং সব কথা তাকে বলে যায়। আর শত্রুদের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে যায়। মাজহাজ নামক এলাকায় খাবানা নামক গুহায় ছিলো তার অবস্থান। মূর্খদের একটি বড় দল তার কথার ইন্দ্রজালে প্রভাবিত হয়ে তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকে।

উনসির ফেতনার কারণসমূহ

আসওয়াদ যখন শাহর বিন বাজানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তখন তার সাথে ছিলো মাত্র সাত শ' আরোহী সৈন্য। এদের কিছুসংখ্যক এসেছিলো মাজহাজ থেকে আর কিছুসংখ্যক নাজরান থেকে। এতো অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে এ যাদুকর কিভাবে এ এলাকার লোকদের উপর বিজয় লাভ করলো, কোনোদিক থেকেই তার বিরুদ্ধে কোনো টু শব্দটি কেনো উঠলো না তা রীতিমত এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এর কারণ, এ এলাকাবাসী প্রথমত ইরানের অধীনে ছিলো। এরপর হেজাযী মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এলো। ইয়েমেন ও হিজাযের লোকদের মধ্যে ছিলো আভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষ। আসওয়াদে উনসি দাঁড়িয়ে যখন শ্লোগান তুললো 'ইয়েমেন হলো ইয়েমেনবাসীর' তখন ইয়েমেনবাসী এ শ্লোগানে প্রভাবিত হয়ে পড়লো। কোনো লোক মুসলমানদের সাহায্যে এ যাদুকরের সামনে দাঁড়ালো না। ইয়েমেনে ছিলো বিভিন্ন ধর্মের আখড়া। এখানে ইহুদী ধর্ম ছিলো, ছিলো খৃষ্টান ধর্ম, অগ্নিপূজারও এখানে প্রভাব কম ছিলো না। এদের পরে ইসলাম এখানে তার পতাকা উড়িয়েছিলো। কিন্তু এখনো ইসলামের নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা ইয়েমেনবাসীদের মনে বদ্ধমূল হতে পারেনি। ইতিমধ্যেই মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটলো। ইয়েমেনবাসীর হিফাযত ও জাতীয়তার দোহাই দিয়ে সে তাদেরকে তার নিজের দিকে ডাকলো। দাবী করলো, সে বিদেশী শক্তিকে ইয়েমেন থেকে উচ্ছেদ করে তবে ছাড়বে। তাই যেসব লোক দীর্ঘদিন থেকে বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণের কারণে হেয়প্রতিপন্ন হয়ে পড়েছিলো, আসওয়াদের সাহায্যে দৌঁড়িয়ে

১. অভিধানের গ্রন্থ 'লিসানুল আরবে' লেখা আছে যে, 'রাহমানুল্লাহ' বিশেষণ যা তার নাম ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারতো না। এ গ্রন্থে একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, 'রহমান' ইবরানি শব্দ এবং 'রহিম' হলো আরবীশব্দ। কিছু কিছু প্রাচ্যবিদরা বলেন, ইসলামের আগে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে এক মাবুদের নাম ছিলো 'রহমান'। এ বিষয়ে হেজাযবাসীরা অবগত ছিলো না।

www.pathagar.com

গেলো। এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য ভেগে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ছিলো? অবশিষ্ট ইরানীদের জন্য আসওয়াদে উনসির আনুগত্য অথবা নিজেদেরকে মৃত্যুর গহ্বরে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

ফেতনার মুকাবিলা

যে সময় এ বিপজ্জনক খবর মদীনায় পৌছালো, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং উত্তর সীমান্ত থেকে আসা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রোমীয়দের উপর আক্রমণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। উসামার বাহিনীকেও এ সময় প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রে খবর পৌছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু'টিই ছিলো পথ। প্রথমত এ বাহিনীকে বিদ্রোহ দমনের জন্যে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দিবে। মুসলমানরা যেন আবার ইয়েমেন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে। অথবা প্রোগ্রাম অনুযায়ী রোম সীমান্তের দিকেই রওনা হয়ে যাবে এবং আসওয়াদে উনসির মুকাবিলা করার জন্য আপাতত ঐসব মুসলিমদেরকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়া হবে, যারা ইয়েমেনেই মওজুদ ছিলেন। যদি তারা তার উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো কথা হতে পারে না। আর তা না হলে রোম হতে বিজয় লাভ করে ফিরে আসার পর উসামা বাহিনীকে আসওয়াদসহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের মুকাবিলা এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে দেবার জন্য পাঠাতে হবে।

অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতার সাথে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করাই সমীচীন মনে করলেন। তিনি ওবর বিন ইয়াহনাসকে ইয়েমেনের মুসলমান সর্দারদের কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যেনো অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আসওয়াদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তার হুকুমাতের শিকড় উপড়িয়ে ফেলার জন্য সব সম্ভাব্য উপায়ে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ইয়েমেনের বিষয়ে আপাতত এ পদক্ষেপ গ্রহণ করাই তিনি সঠিক মনে করলেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে উসামার বাহিনীকে সংঘটিত করার কাজে লেগে গেলেন।

উসামার বাহিনী এখনো যাত্রা শুরু করেনি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাহিনী যাত্রাবিরতি করলো। এ সময়ে আসওয়াদ তার শাসনব্যবস্থাকে মযবুত করার সকল তদবির চালাতে থাকে। প্রতিটি এলাকায় সে তার নিজস্ব শাসক নিযুক্ত করে বিভিন্ন জায়গায় সামরিক বাহিনী মোতায়েন করলো। ফলে অল্পদিনেই সে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করলো। আদন পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্র উপকূল এলাকা, সানাআ থেকে তায়েফ পর্যন্ত সব বন-জঙ্গল আসওয়াদের দখলে এসে পড়লো।

আসওয়াদে উনসির প্রতিনিধি

কয়েস বিন আবদে ইয়াগুসকে আসওয়াদ তার সেনাপতি নিযুক্ত করে। আর দু'জন ইরানী—ফিরোজ ও দাজবিয়াকে নিজের উজীর হিসাবে মনোনীত করে। সে

www.pathagar.com

শাহর বিন বাজানের বিধবা স্ত্রী আযাদকে বিয়েও করে নেয়। আযাদ ছিলো মন্ত্রী ফিরোজের চাচাত বোন। এভাবে আরব ও আযম উভয়টাই তার পতাকাতলে একত্রিত হলো। এ শানশওকত দেখে সে নিজকে গোটা জাহানের মালিক ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো কেউ তার হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে এমন সম্ভাবনা আর নেই।

উনসির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

যেসব কারণে আসওয়াদের উত্থান ঘটেছিলো, সেসব কারণই অবশেষে তার পতনকেও ডেকে আনলো। যে ফিরোজ ও দাজবিয়াকে আসওয়াদ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করে রেখেছিলো সেই ফিরোজ ও দাজবিয়ার ব্যাপারেই সে সন্দিহান হয়ে পড়লো। শেষোক্ত দু' ব্যক্তি এবং ইয়েমেনে বসবাসকারী সকল ইরানীদের ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ জন্মালো তারা নানা বাহানাবাজী, ছলচাতুরী ও চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করে তার শাসনকে উৎখাত করার ফন্দি-ফিকিরে আছে।

আসওয়াদের ইরানী স্ত্রীও আসওয়াদের মুখেই ওদের বিরোধিতার খবর জানতে পারলো। তার শিরায়ও প্রবাহিত ছিল ইরানী রক্ত। তার মনেও এ যাদুকরের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ লুক্কায়িত ছিলো। এ আসওয়াদই তাকে তার প্রিয়তম স্বামী থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু নারীসুলভ আচরণের মাধ্যমে সে তার মনে লালিত এ জিঘাংসাকে গোপন রেখেছে তার বাহ্যিক আচরণে আসওয়াদের একজন স্বামীগতা প্রাণ স্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছে। ফলে আসওয়াদ তার স্ত্রীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলো। এ স্ত্রীও তাকে ধোঁকা দিতে পারে এমন কোনো সন্দেহ তার মনে উদিত হয়নি। সে ছিলো শুধু তার দুই উজির ও সেনাপতির উপর সন্দিগ্ধ। ওদের আচরণে মনিবের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো না। বিশেষ করে সে কয়েসের প্রতি সিন্দহান ছিলো। কারণ, সেনাবাহিনী ছিলো তার অধীনে। সেনাবাহিনীর দ্বারা সে তার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করে নিতে পারে। তাই সে একদিন কয়েসকে ডেকে এনে বললো, আমার ফেরেশতারা আমার কাছে অহী নাযিল করে বলেছেন ঃ

"যদিও তুমি কয়েসকে উঁচু মর্যাদা দান করেছো, কিন্তু সে যেহেতু প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করেছে ও তোমার সমকক্ষ মর্যাদা লাভ করেছে, এখন সে তোমার শত্রুদের যোগ সাজশে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তোমার দেশ ছিনিয়ে নেবার চক্রান্তে করছে।"

আসওয়াদের কথা শুনে কয়েস উত্তর দিলো ঃ

"আপনার ধারণা সঠিক নয়। আমার মনে আপনার মর্যাদা ও মূল্য অম্লান। আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।"

"ফেরেশতারা কি তাহলে মিথ্যা বলছে? তাতো হতে পারে না, অবশ্যই তারা সত্য বলেছে। তবে আমি এখন জানতে পেরেছি, তুমি তোমার অতীত কার্যকলাপের জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছ। আমার ব্যাপারে যেসব গোপন ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছিলে তা তুমি এখন পরিহার করেছো।"

www.pathagar.com

আসওয়াদের কথায় কয়েস বুঝতে পারলো, সে তার ক্ষতি করতে চায়। তাই সে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ফিরোজ ও দাজবিয়ার কাছে চলে গেলো। আসওয়াদের সব কাহিনী খুলে বলে সে তাদের কাছে তাদের নিজস্ব মতামত জানতে চাইলো। আসওয়াদের তরফ হতে তাদেরও বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে তারা তাকে জানালো। এসব আলোচনারত অবস্থায় আসওয়াদের তরফ থেকে এ দু'জনকেও ডেকে পাঠানো হলো। আসওয়াদ বললো, "তোমরা কয়েসের সাথে যোগসাজশে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো। কিন্তু মনে রেখো এর পরিণতি ভাল হবে না।" একথা শুনে তারা বুঝলো, আসওয়াদের ধারণা এদের উপরেও ভাল নয়।

ইয়েমেনের অন্যান্য মুসলমানরা এসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলো। আসওয়াদে উনসির সিংহাসন কুপোকাত করে দেবার জন্য এমনিতেই তারা আগে থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলো। এসব ঘটনা জানার পর তারা কয়েস সহ তার দু' সাথীকে জানিয়ে দিলো, আসওয়াদের ব্যাপারে তারা সকলে তাদের যে কোনো সিদ্ধান্তের সাথে একমত। অতএব তার বিরুদ্ধে সমন্বিত প্রোগ্রাম গ্রহণ করা দরকার। তারা নাজরান ও এর আশেপাশে বসবাসকারী সাথীদের জানিয়ে দিলো, 'আমরাও আসওয়াদের পতন চাই। তার মৃত্যু কামনা করি। এ ব্যাপারে আমরা সর্বতো সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত।' এরা এ সময় তাদের এমন কোনো কাজ করতে নিষেধ করলো, যা আসওয়াদের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে।

আসওয়াদের বিরুদ্ধে গোপন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য তাদের এ সিদ্ধান্ত ছিলো সঠিক ও সময়োপযোগী। কেননা প্রকাশ্য কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হবার চেয়ে গোপনে গোপনে কাজ সেরে ফেলাই হলো উত্তম। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা আসওয়াদের স্ত্রী আযাদও এদের সাথে মিলে গেলো। বাহ্যত সে তো তার স্বামীগত প্রাণ। গোপনে সে ফিরোজ, দাজবিয়া ও কয়েসকে আসওয়াদের শোবার কামরা দেখিয়ে দিয়ে বললো। তোমরা মুখোস পরে মহলে প্রবেশ করবে। মহলের প্রতিটি রুমে আসওয়াদের সিপাহীরা থাকে। শোবার কামরায় কেউ থাকে না। পেছনের দরযা দিয়ে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় আকস্মিকভাবে একে হত্যা করে সকলকেই যালেমের যুলুম থেকে রক্ষা করবে। তার নিগ্রহ থেকে সেও যেনো উদ্ধার পায়।

আসওয়াদ হত্যা

বস্তুত পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা পেছনের দিক দিয়ে প্রবেশ করে আসওয়াদকে হত্যা করে ফেলে। ভোর হলে তারা আযান দিতে শুরু করে দিলো। উচ্চস্বরে তারা বলতে লাগলো, "আমরা সাক্ষী দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর 'উবহালা' (আসওয়াদের নাম) মিথ্যাবাদী। আসওয়াদের কর্তিত মাথাও তারা মহল থেকে বাইরে নিক্ষেপ করলো। এ সময়ে আসওয়াদের নিহত হবার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মহলের রক্ষীরা তাড়াতাড়ি মহলের ভিতরের দিকে পালিয়ে গেলো। এ সময়ে ব্যাপক গোলযোগের এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হলো, কয়েস, ফিরোজ ও দাজবীয়া তিনজন মিলে ইয়েমেনের শাসনব্যবস্থা সামলিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আগে কি পরে আসওয়াদ নিহত হয়েছে, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সংক্রান্ত ইয়াকুবীর বর্ণনা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাবারী ও ইবনে আসির বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বেই জাহান্নামে পৌঁছে গেছে। তার নিহত হবার রাতেই অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাহাবীদেরকে তিনি বলেছেন ঃ

"উনসিকে হত্যা করা হয়েছে। একজন মর্যাদাশীল ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। তাঁর খান্দানও ছিলো মর্যাদাশীল খান্দান।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হত্যাকারী কে?

"তিনি জবাব দিলেন, ফিরোজ।"

আর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, আসওয়াদে উনসির মৃত্যু সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মদীনায় পৌঁছতে পারেনি। পৌঁছেছে ইন্তেকালের পরে। এ খবর সর্বপ্রথম পেয়েছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। স্বয়ং ফিরোজের এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন ঃ

"আসওয়াদকে হত্যা করার পর আমরা ইয়েমেনকে আসওয়াদের নিয়ন্ত্রণে আসার অবিকল পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। আমরা মুয়াজ বিন জাবালকে প্রথম ডেকে আনলাম। তিনি আমাদের নামায পড়ালেন। দীনের তা'লীম দিলেন। আমাদের খুশির অবধি ছিলো না। কেননা আমরা আমাদের একজন বড় শত্রুর হাত থেকে নাজাত লাভ করেছি। এর মধ্যে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে ইয়েমেনে আবার গোলযোগ শুরু হয়ে গেলো।"

দক্ষিণ আরবে বিদ্রোহ

ইয়েমেনে উল্লেখিত বিদ্রোহ ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বিরাট ঘটনা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিলো। এরপর ইয়ামামা ও পারস্য উপসাগরের সংলগ্ন এলাকার অবস্থা শান্ত ছিলো না। ওখানেও গোপনে গোপনে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছিলো। এ অবস্থায় মুসলমানদের অবস্থাও ভালো ছিলো না। কোনো কোনো সময় তারা বিদ্রোহের হোতাদের সাথে সন্ধি করতে এগিয়ে আসতো। তাদের বিজয় ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোনো সময় আবার শক্তিপ্রয়োগ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতো। এ এলাকা একদিকে মক্কা-মদীনা হতে বেশ দূরে অবস্থিত ছিলো। ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা মানুষের মনের দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হতে তখনো পারেনি। অপরদিকে এ এলাকা ছিলো পারস্যের সাথে গায়ে গায়ে লাগা। ইরানীদের সাথে ছিলো এদের ব্যবসায়ী সম্পর্ক। অতএব এসব বিদ্রোহে ইরানীদেরও কিছু উস্কানী থাকা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না।

www.pathagar.com

মুসাইলামার নবুয়াত দাবী

আগেই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছিলাম যে, বনু হানিফার গোত্রের নবুয়াতের দাবীদার মুসাইলামা বিন হাবিব দু'জন দূতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মদীনায় একটি চিঠি লিখে পাঠালো ঃ

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك اما بعد فانى قد اشركت فى الامر معك ، وان لنا النصف الارض ولقريش نصف الارض؛ ولكن قريشاً قوم لايعدلون ـ

"মুসাইলামা আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। অতপর প্রকাশ থাকে যে, আমাকে আপনার শরীক বানানো হয়েছে। কাজেই এ যমিনের অর্ধেক আমার আর অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশ জাতি ইনসাফের সাথে কাজ করে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চিঠি শুনে দূতদের জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যাপারে তোমাদের কি বক্তব্য ?"

তারা জবাব দিলো ঃ

"আমাদের বক্তব্য তাই, যা চিঠিতে লিখা আছে।"

তিনি এবার রাগত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম, দূতকে হত্যা করা যদি সিদ্ধ হতো। তোমাদের দু'জনের শিরোচ্ছেদ করতাম।"

তারপর তিনি মুসাইলামাকে লিখলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ـ اما بعد فان الارض الله يوثها من يشاء من عباده المتقين ـ

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে মুসাইলামা কাজ্জাবের নিকট প্রেরিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই এ যমিন আল্লাহর। তিনি তাঁর মুত্তাকী (আল্লাহভীরু) বান্দাদের যাকে ইচ্ছে তাকেই এ যমিনের ওয়ারিশ বানান।"

ঐ চিঠির গোপন মর্ম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনবহিত ছিলেন না। তিনি ইয়ামামাবাসীদের মন থেকে মুসাইলামার প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করার জন্য, তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দিতে মদীনা হতে নাহারুর রেজাল নামক জনৈক ব্যক্তিকে ইয়ামামা পাঠালেন। কিন্তু সে ঐখানে গিয়ে মুসাইলামার সাথে হাত মিলিয়ে ফেললো। সে ওখানে ইয়ামামাবাসীদের সামনে সাক্ষ্য দিলো, সত্য সত্যই

www.pathagar.com

মুসাইলামাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতে শরীক বানানো হয়েছে। নাহারুর রেজালের সহযোগিতায় মুসাইলামার প্রভাব আরো বেড়ে গেলো। ইয়ামামাবাসী দলে দলে মুসাইলামার দলে ভিড়তে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরও আল্লাহর রহমত হতে মোটেও নিরাশ হননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আল্লাহ মুসলমানদেরকে নিশ্চয় রোমকদের উপর বিজয় দান করবেন। এ বিজয়ের ফলেই সকল ঘরোয়া কলহের অপমৃত্যু আপনা আপনি ঘটবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৌশলী পদক্ষেপ

যে কোনো মূল্যে রোমীয়দের দমন। আরবের উত্তর সীমান্তকে হিরাকলের বাহিনীর লুটতরাজ থেকে রক্ষা করাই ছিলো তখন রাসূলের গৃহীত কর্মকৌশল। হেরাকলের লুটেরা বাহিনী এ সময় দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। তারা ইরানীদের দখলে যাওয়া এলাকাগুলোকেও নিজেদের অধীনে নিয়ে এলো। ইরানের দখলকৃত 'সোলাইবে আযম'ও নিজেদের দখলে এনে তা বাইতুল মাকদাসে সংস্থাপন করে দেয়। আরবে রোমীয় বাহিনীর আক্রমণ চালাবারও আশংকা ছিলো তীব্রভাবে। কেননা সেখানকার শাসক আরবে একটি নতুন শক্তির উত্থান দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। মুতার যুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনী রোমীয় বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় (যদিও তারা পরাজিত হয়নি)। তাবুকের যুদ্ধ মুসলমানদের প্রতাপ প্রতিপত্তি বেশ বাড়িয়ে দেয়। এরপরও আরবের উপর রোমীয়দের আক্রমণের আশংকা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা ছিলো, যদি রোমীয় বাহিনীর উপর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে আরব এলাকায় তাদের লুটতরাজের ধারা শুধু বন্ধই হবে না বরং কলহপ্রিয় আরব গোত্রগুলোও দমন হয়ে পড়বে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তারা মুসলমানদের আনুগত্য করতে বাধ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধারণা সঠিক ছিলো। কেননা সে সময় আরবের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত মুসলমানদেরই জয় জয়কার ধ্বনিত হচ্ছিলো। তাদেরকে আরবের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত করা হতো। ইয়ামামায় মুসাইলামা, ওমানে লকিত আর বনি আসাদে তোলাইহা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বিজয় লাভ করতে পারার মতো অবস্থায় ছিলো না।

লকিত, তোলাইহা এবং মুসাইলামা মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করার সুযোগ সন্ধানের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে বসেছিলো। এ তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কোনো ভর্ৎসনা ও কুৎসা রটনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর কোনো আপত্তিকর উক্তি উত্থাপন ছাড়াই নিজেদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা শুরু করে। তারা দাবী করে যে, 'তারা নবী'। যেমন প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহ একজন নবী পাঠান, তেমনি আল্লাহর তরফ থেকে তারা তাদের জাতির কাছে প্রেরিত রাসূল। মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য তাদের আগমন।

www.pathagar.com

ওখানে বসবাসকারী মুসলমানদের কাছে এ অবস্থা ছিলো বড় অসহ্য। তাদের ভূমিতে ফেতনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। কেউ জানে না কখন এ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদ পাবার সাথে সাথেই এ আগুন তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো। দেখতে না দেখতেই তা গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ে গোটা আরব একটি আগুনের পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো। এর লেলিহান শিখা হতে চারদিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিলো। বিভিন্ন এলাকায় এ কলহ বিভিন্নরূপে বিস্তৃত হতে শুরু করে। সব জায়গায় এর উপায়-উপকরণও ছিলো ভিন্ন। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হবে। তবু এখানে কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হলো।

আরব ও ধর্ম ত্যাগীদের ফেতনা

ফেতনা-ফাসাদ ও কলহের এ ঝড়ের দিকে লক্ষ্য করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এগুলোর প্রতি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য আরোপ করা খুবই প্রয়োজন।

প্রথম কথা হলো, যে ফেতনাই যখন উঠেছে, তা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে উঠেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আসওয়াদে উনসি দেশের একটা বৃহৎ অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পেরেছে। দক্ষিণে হাজরামাউত থেকে মক্কা ও তায়েফ পর্যন্ত তার রাষ্ট্রীয় সীমা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। মুসাইলামা এবং তোলাইহাও অল্প সময়ে অসাধারণ সফলতা লাভ করেছিলো। উপরন্তু যেসব এলাকায় ধর্ম ত্যাগের বিবাদ বিস্তৃত হয়েছিলো সেখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের আনুগত্যের জোয়াল কাঁধে উঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। কৃষ্টি ও সভ্যতা, ধন ও সম্পদের দিক দিয়ে সেসব এলাকা ছিলো সকল আরব গোত্র থেকে অগ্রসর। তাদের দেশের সীমান্ত ছিলো ইরানের খুব কাছাকাছি। এ কারণেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কলহকে দমন করতে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন এবং এসব এলাকার ইসলামী হুকুমতকে দৃঢ় ও মযবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বহাল না করা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস নেননি।

আসওয়াদে উনসি, মুসাইলামা ও তোলাইহার প্রস্তুতির দ্বারা মনে হয়, এ সময় ধর্মীয় অস্থিরতা অতিরিক্ত বেড়ে যায়। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যদি কেউ কোনো আন্দোলন চালাতে চাইতো তাহলে বেশ সহজভাবে সফল হতে পারতো। এর অর্থ এ নয় যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিশেষ ধর্মীয় প্রীতি পাওয়া যাচ্ছিল। বরং তার উল্টো কোনো আকীদা-বিশ্বাসই তাদের মনের গভীরে মযবুত শিকড় গাড়তে পারেনি। ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, মোটকথা হরেক ধর্ম ও মাযহাবের পূজারীরাই এখানে বিদ্যমান ছিলো। তারা সকলেই পরস্পর কলহ-ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। প্রত্যেকেই দাবী করতো তাদের ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দুনিয়ায় মানবতার কল্যাণের পথ পেশ করে। যেহেতু প্রত্যেক ধর্মই সত্যের দাবীদার। তাই কোন্ ধর্মকে

www.pathagar.com

গ্রহণ করবে, আর কোন্ ধর্মকে বর্জন করবে তা নির্ণয় করা ছিলো সাধারণের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ অবস্থায় স্ব স্ব গোত্রে সংকীর্ণ জাতীয়তার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজেরা সত্য সত্য সমর্থনে প্রমাণ পেশ করে নিজেদের দিকে ঝুঁকিয়ে নেয়া ছিলো মিথ্যা নবীর দাবীদারদের জন্য বড় সহজ কাজ। বস্তুত ঘটনা তাই ঘটেছিলো। ধর্মত্যাগী অধিকসংখ্যক লোককে নিজেদের চারিদিকে জড়ো করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাহ্যত সফলতা লাভ করেছিলো মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদাররা।

মিথ্যা নবীর দাবীদারদের সাময়িক সফলতা

প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদারদের অস্থায়ী সফলতার রহস্য তাদের দাবী এবং তাদের উপরে লোকদের ঈমান আনার উপর নিহিত ছিলো না। বরং আরো অনেক কারণ ছিলো। বস্তুত হিজায ও পারস্যের সাথে ইয়েমেনের অপরিসীম ঘৃণা-বিদ্বেষই ছিলো প্রকৃতপক্ষে আসওয়াদে উনসীর সফলতা লাভের মূল কারণ। ইয়েমেনবাসীর এ স্তুপীকৃত ঘৃণা-বিদ্বেষকে সম্বল করে অতি সহজেই তাদেরকে হিজাযের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছিলো আসওয়াদ।

আসওয়াদের পথ অনুসরণ করে মুসাইলামা এবং তোলাইহাও নিজ জাতির মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তার বিষবাষ্পকে জাগ্রত করে। তাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে তাদের পতাকার নীচে সমবেত করে নেয়। এসব এলাকায় যদি ইসলামের ভিত্তি মযবুত হতো, এর নীতিমালা মানুষের মনে বদ্ধমূল হতো। তাহলে এসব মিথ্যা নবীরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে এবং অসংখ্য লোককে তাদের চারিদিকে জড়ো করতে পারতো না। কারণ, যে আকীদা-বিশ্বাস একবার মনে বসে যায়, তা কদাচিতই কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যেহেতু এসব এলাকার লোকদের ঈমান ছিলো শুধু প্রথাগত। ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে তারা অবহিত ছিলো না। এ জন্য জাতীয়তার নামে যখনই কোনো আন্দোলন উঠেছে, এর দোহাই দিয়ে মানুষকে উস্কিয়ে তোলা হয়েছে, তখনই তারা ইসলামকে বিদায় সালাম জানিয়ে আসওয়াদ ও মুসাইলামাদের মতো লোকদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহের পরও মক্কা ও তায়েফের লোকদের পূর্ণ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই তো এ সত্যতার প্রমাণ। একথা সত্য যে, ইয়েমেনে ইসলামের চর্চা ওখানকার শাসনকর্তা বাজানের ইসলাম কবুল করার সময় থেকে শুরু হয়েছিলো। আর এ ঘটনা মক্কা ও তায়েফ বিজয়ের পূর্বের। কিন্তু একথাও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, তেরো বছর অবস্থানের সময়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা মক্কাবাসীদের মনে ইসলাম সম্পর্কে এমন গোপন অথচ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যা বাজানের ইসলাম গ্রহণ ও মুয়াজ বিন জাবালের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও ইয়েমেনবাসীদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তৃতীয় কথাটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইয়েমেনের বিদ্রোহই ইয়ামামা ও বনি আসাদ গোত্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস যুগিয়েছে। তোলাইহা

www.pathagar.com

ও মুসাইলামা উভয়ই মুসলিম শক্তিকে ভয় করতো। মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা বিজয় লাভ করতে পারবে না বলেই তাদের ধারণা ছিলো। তাই তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার দুঃসাহস করেনি। কিন্তু আসওয়াদে উনসি প্রথমত বিদ্রোহ করে বিজয়ও লাভ করে ফেলেছে দেখে বিদ্রোহ ঘোষণার সখ তাদের মনেও জেগে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে তাদের এ সাহস আরো বাড়িয়ে দেয়। আসওয়াদ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতো। ইয়েমেনে যদি কলহ-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদের আগুন জ্বলে না উঠতো তাহলে তারা দু'জন কখনো মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে সাহস পেতো না।

একবার কলহ ছড়িয়ে পড়লে তা থামানো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তাই আসওয়াদের মৃত্যুতেও এ কলহের অবসান ঘটেনি। বরং ধীরে ধীরে কলহের আগুন আরো বেড়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তা আরো জটিল আকার ধারণ করে আরবে তা ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্ম ত্যাগের কলহ ও প্রাচ্যবিদগণ

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদের ধারণা, আরবের বিভিন্ন শ্রেণী ও এলাকার সামাজিক জীবন পদ্ধতি রীতিনীতির মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বিরাজিত ছিলো এবং যার কোনো নজীরও আরব ছাড়া আর কোনো এলাকায় পাওয়া যেতো না, তাই ছিলো আসলে এ কলহের মূল কারণ।

শহুরে জীবন ও গ্রামীন জীবনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকার কারণে আরবদেরকে এক জাতীয়তায় নিয়ে আসা সহজ কাজ ছিলো না। শাসকের আনুগত্যের ধারণাও অনেকে সঠিকভাবে পোষণ করতে পারতো না। শহরের অধিবাসীরা ছিলো এর উল্টো। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার মুকাবিলায় অন্য সব ব্যাপারকে নগণ্য বলে মনে করতো। এর উপর কোনো আঁচড় আসতে দিতে তারা চাইতো না। স্বাধীনতা ছিলো তাদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ। এ স্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দেখলে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করে তা সংরক্ষণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলো। স্বাধীনতার এ আবেগ উচ্ছ্বাস দীর্ঘদিন যাবত ইয়েমেনবাসী ও উত্তর এলাকার লোকদের জন্য শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

প্রাচ্যবিদরা আরো বলেন, শহুরে ও গ্রামীন জীবনের সামাজিক রীতি, জীবন ধারণের পদ্ধতি এবং স্বভাব-চরিত্রের পার্থক্যের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আগেই একটা উষ্মা ভাবের উদ্রেক হয়। ঈমানদারদের সামনে তাওহীদের আকীদা পেশ করার পর পৌত্তলিকতাকে মিটিয়ে ফেলাই ছিলো এর প্রথম উদ্দেশ্য। ইসলামী শিক্ষার প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, আরবের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাওহীদের দাওয়াত হয়ে পড়েছিলো সম্প্রচারিত। কিন্তু সাথে সাথে আরবরা তাওহীদের এ আকীদা-বিশ্বাসকে আরবের রাজনৈতিক ঐক্যে পরিগণিত করার আশংকা পোষণ করতো। যদি তাই হয় তাহলে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে।

www.pathagar.com

এ ধারণার কারণেই ইয়েমেন এবং আরো কিছু এলাকা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলো। ব্যক্তি স্বাধীনতা বহাল রাখার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালাতে শুরু করলো।

ধর্ম ত্যাগের বিদ্রোহে বাইরের হস্তক্ষেপ

প্রাচ্যবিদদের এ ধারণা সত্য হোক আর ভুল হোক, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই একথা অস্বীকার করা যাবে না। আরবের এ ধর্ম ত্যাগের কলহে ও বিদ্রোহে বাইরের অদৃশ্য শক্তির হাত ছিলো। ইরান ও রোমের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌছলে তারা দিন দিনই ইসলামের প্রভাব -প্রতিপত্তি বেড়ে যেতে দেখলো। তাই তারা ইসলামের এ বিজয় প্লাবণ তাদের দেশের দিকে প্রবাহিত হয়ে যাবার আগেই আরবদের মধ্যে একটি বড় ধরনের বিরোধ, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবার মধ্যে নিজেদের কল্যাণ দেখতে পেলো। তাই এ নতুন দীনের বিরুদ্ধে আরবদেরকে স্বজাতীয় মুসলমানদের সাথে লড়াইতে উস্কিয়ে দিলো তারা।

এ কলহের বাণীবাহকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করলো। তাঁর মৃত্যুতে তাদের সাহস হিম্মত আরো বেড়ে গেলো। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তারা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে বেশ নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে ফেললো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কিভাবে এ কলহের মুকাবিলা করলেন। আরবের ঐক্য কিভাবে ফিরিয়ে আনলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিকে আবার মযবুত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। এসব কথার জবাব আগত অধ্যায়গুলোতে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৪

উসামার যুদ্ধ যাত্রা

প্রথম খলিফার প্রথম নির্দেশ

আরব গোত্রগুলোর বিদ্রোহ বিরোধের পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশ অবগত ছিলেন। তদ্রূপ অবগত ছিলেন আনসার ও মুহাজিরগণ সকলেই। এ সময়ে মুসলমানদের সামনে একটি প্রশ্নই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো, ধর্ম ত্যাগের বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে ; না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করে তাঁর প্রস্তুত করা উসামার বাহিনীকে তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমান্ত হিফাযতের জন্য পাঠানো হবে। পরিস্থিতি খুব নাজুক হলেও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সব সমস্যা ও বিপদকে উপেক্ষা করে বাইয়াতের পর পরই উসামার সেনাবাহিনীকে তার লক্ষ্য পথে রওনা হয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

উসামার বাহিনীতে মুহাজির ও আনসারদের বয়স্ক ও পরম সম্মানিত অনেক সাহাবীও ছিলেন। এদের সকলকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উত্তর সীমান্তে রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করেছিলেন। মুতা ও তাবুকের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসলমান ও ইহুদীদের উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া মতবিরোধ এবং ইহুদীদের কলহের কারণে সম্রাটের তরফ থেকে মুসলমানদের উপর হামলার আশংকা করলেন। এসব যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলীর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশংকা আরো বেড়ে গেছে। মুতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিযুক্ত তিনজন নেতা, যায়েদ বিন হারেসা, জাফর বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিম বাহিনীকে রোমীয়দের অবরোধ থেকে উদ্ধার করে এনে নিরাপদে মদীনায় নিয়ে আসেন। যদিও তারা বিজয়ী হননি তথাপি এ মুষ্টিমেয় বাহিনীকে রোমের এত বিরাট বাহিনীর অবরোধ থেকে নিরাপদে বের করে আনাই ছিলো এক বিরাট সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ বিজয়ের কাজ।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে সাথে নিয়ে তাবুকের দিকে রওনা হন। কিন্তু শত্রু পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে এসে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে সাহস পেলো না। তারা সিরিয়ার ভিতরে লুকিয়ে থেকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকাই শ্রেয় মনে করলো। এসব যুদ্ধের কারণে মুসলমানদের ব্যাপারে রোমীয়দের মনোভাব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। তারা আরব সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলো। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসামাকে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে সিরিয়ার দিকে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর হেদায়াত

হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন বিশ বছর বয়সের একজন যুবক। যুবকদেরকে দীনের খেদমতের জন্য উৎসাহ প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য তিনি উসামাকে সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। আর এ ছাড়াও উসামা নিজে যেনো সীমান্তে মুতার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত পিতা যায়েদ বিন হারেসার প্রতিশোধও গ্রহণ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামাকে ফিলিস্তিনের 'বালকা' আর 'দারুসের' সীমান্তে পৌঁছে শত্রুর উপর হামলা করার জন্য এবং শত্রুদের নাকের ডগায় পৌঁছা পর্যন্ত খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করার নির্দেশ দান করেন। বিজয় লাভের সাথে সাথেই বিলম্ব না করে মদীনায় ফেরত আসার নির্দেশও তিনি তাঁকে দান করেছিলেন।

উসামার প্রতি রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা

বাল্যকাল থেকেই হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয় ছিলেন। হুদাইবিয়ার পরের বছর তিনি ওমরা পালনের জন্য মক্কা যেতে উসামাকে উটের পেছনে বসিয়ে সাথে করে নিয়েছেন। এ অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায়ও প্রবেশ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই উসামা শৌর্যবীর্যে সাহসে হিম্মতে কারো চেয়ে কম ছিলেন না। ওহোদের যুদ্ধের সময় উসামা ছিলেন বেশ ছোট। ছোটদের যুদ্ধে আনার অনুমতি ছিলো না। মদীনা হতে সৈন্যবাহিনী রওনা হয়ে এলে মধ্য পথে উসামা এসে বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু কম বয়স হবার কারণে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ, কীর্তিগাথা, অবদান ও দৃঢ়তার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

উসামার অধিনায়কত্বে আপত্তি

হযরত উসামার উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ উসামার অধিনায়কত্বের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন। তারা বলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ মহাসম্মানিত ও বয়স্ক সাহাবীগণ যে বাহিনীতে বিদ্যমান আছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অচ্ছেদ্য ভালোবাসা ও উসামার বাহাদুরী স্বীকৃত হলেও একটি ছোট ছেলের উপর এতবড় বাহিনীর সেনাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু শয্যায় এসব-কানাঘুষাগুলো তাঁর কানে পৌঁছেছিলো। এ সময় উসামার বাহিনী 'জারুক' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি চলছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে তাঁকে গোসল করাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাত

www.pathagar.com

মশক পানি দিয়ে গোসল করাবার পর তাঁর জ্বর ছেড়ে গেলো। তিনি মসজিদে তাশরীফ আনলেন। মেম্বরের উপর উঠে হামদ সানা পড়ে ওহোদের শহীদদের জন্য দোয়া করলেন। এরপর বললেন ঃ

"হে লোকেরা ! উসামার বাহিনীকে যাত্রা শুরু করতে দাও। তোমরা তার সেনাপতিত্বের উপর আপত্তি তুলেছো। এর আগে তার পিতার অধিনায়কত্বেও তোমাদের আপত্তি ছিলো। কিন্তু এর পরেও সে অধিনায়কত্ব পাবার উপযুক্ত এবং তার পিতাও উপযুক্ত ছিলো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুখ আবার যখন বেড়ে গেলো, উসামার বাহিনী তখন 'জরকেই' অবস্থানরত ছিলো। উসামা নিজেই বলেন ঃ

"যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি ও আমার কয়েকজন সাথী মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর অবস্থা ছিলো নিতান্ত খারাপ। কথা বলতে কষ্ট হতো। তিনি আকাশের দিকে তাঁর হাত উঠিয়ে আবার আমার মাথার উপর রাখলেন। এতে বুঝতে পারলাম তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের দিন ভোরে উসামা তাঁর কাছে চলে যাবার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি এ জগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলে উসামা তার বাহিনীসহ 'জারফ' থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন-কাফনের শেষ কাজে উসামা আহলে বাইয়াতের সাথে শরীক ছিলেন। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম 'শুকরান' রাসূলের পবিত্র দেহে পানি ঢেলেছেন আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু গোসল করিয়ে দিচ্ছিলেন।

বাইয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন হযরত উসামাকে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন, তখনও আবার উসামার অধিনায়কত্বে আপত্তি উত্থাপনকারীদের মুখ নড়ে উঠলো। তারা এমন কোনো অজুহাত খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো যাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বাহিনী প্রেরণ করতে অথবা অন্ততঃ উসামাকে সেনাপতি নিয়োগ করা হতে বিরত থাকেন। মুহাজির ও আনসারদের মতভেদ, আরব গোত্রসমূহের বিদ্রোহকে তারা তাদের আপত্তির যুক্তি হিসাবে দাঁড় করালেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে তারা আরজ করলেন, বর্তমান সময়টা মুসলমানদের জন্য খুবই নাজুক ও বিপজ্জনক। চারিদিকে বিদ্রোহের দাবদাহ জ্বলছে। এ সময় একটি বাহিনী সিরিয়ায় পাঠিয়ে মুসলমানদের দলবদ্ধতাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা সমীচীন হবে না। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু শুনতে চাইলেন না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি বললেন ঃ

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি। বনের বাঘও আমাকে ধরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে যদি আমি স্থির নিশ্চিত হই। তারপরও উসামার ঐ

www.pathagar.com

বাহিনীকে যুদ্ধ যাত্রার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আমি পারবো না। যে বাহিনীকে রওনা হয়ে যাবার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে তো আমি ফিরিয়ে রাখতে পারবো না। মদীনায় আমার মতের সাথে একজন লোক পাওয়া না গেলেও আমি অবশ্য অবশ্যই উসামাকে পাঠাবো।"

অন্য আর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে—উসামা তাঁর ব্যাপারে মানুষের আপত্তি দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলে বাহিনী প্রেরণের আদেশ রহিত করে দিন, তাহলে উত্থিত ফেতনা ও কলহ দমনে এ বাহিনীকে কাজে লাগলো যাবে। ধর্মত্যাগীরাও মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।" আনসাররা এসে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একান্তই বাহিনী পাঠাতে চাইলে তাঁকে বলুন তিনি যেন এমন একজন লোককে সেনাপতি করুক, যার বয়স উসামার চেয়ে বেশী হবে।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব প্রস্তাব নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে প্রথম উসামার কথা পেশ করলেন। উত্তরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"জঙ্গলের হিংস্র কুকুর আর বাঘও যদি মদীনায় প্রবেশ করে আমাকে শিকার করে নিয়ে যায়, তাহলেও আমি ও কাজ করা হতে বিরত থাকতে পারবো না, যে কাজ করার নির্দেশ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং জারী করেছেন।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসম্মতি

এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আনসারদের প্রস্তাব পেশ করলেন। এ প্রস্তাব শুনেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশ রাগান্বিত স্বরে বললেন ঃ

"হে খাত্তাবের পুত্র ওমর ! উসামাকে সেনাপতি বানিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং। তোমরা আমাকে তাকে পদচ্যুত করার জন্য বলছো।"

এ উত্তর শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু লজ্জিত হয়ে নতশিরে ফিরে আসেন। অপেক্ষমান লোকেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে ওমর রুষ্টচিত্তে বললেন ঃ

"আমার কাছ থেকে তোমরা এখনি চলে যাও। শুধু তোমাদের জন্য আমাকে এখন খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধমক খেয়ে আসতে হয়েছে।"

www.pathagar.com

এসব ঘটনা থেকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত অবলম্বিত মূলনীতির এক আলোক রশ্মি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা তাঁর কাছে যখন তাঁর পিতার মিরাসের দাবী জানাতে এসেছিলেন, সেখানেও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ একই নীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"আল্লাহর কসম, যে কাজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখেছি, সে কাজ করাই আমার উপর ফরয। আমি সে কাজই করবো এর থেকে একবিন্দুও এদিক ওদিক আমি করবো না।"

উসামার বাহিনী প্রেরণের সময়ও তিনি এ একই দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ

লোকজনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু উসামার বাহিনী রওনা হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন, যারা উসামার বাহিনীতে ছিলেন তাদের কেউ যেনো পেছনে পড়ে না থাকেন। মদীনা হতে তাড়াতাড়ি 'জারক' গিয়ে যেন সকলেই উসামার বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। তিনি বললেন ঃ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমি জানি না তোমরা কি আমার উপর এমন এক বোঝা চাপাবে, যা বহন করার শক্তি শুধু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলো। আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বলোক থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। সকল বিপদ থেকে তাঁকে হিফাযত করেছেন। আমি তো শুধু তাঁর অনুসারী। কোনো নতুন জিনিস আমি তোমাদের কাছে পেশ করিনি। যদি আমি সত্যের পথে সঠিক থাকি আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি পথ হারা হই, আমাকে পথ দেখাবে।"

এ হলো প্রথম খলিফার রাজনৈতিক দর্শন। এ দর্শন থেকে তিনি কখনো এক চুলও সরে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করেছেন তিনি সকলের চেয়ে বেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু আন্তরিকতা ও সুহৃদ্যতার যে প্রমাণ দিয়েছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর যে অটুট ঈমান ছিলো দুনিয়ার কোনো শক্তিই তা থেকে তাঁকে নড়বড়ে করতে পারেনি। তাঁর সাথে হৃদয় ও আত্মার যে সম্পর্ক ছিলো তার নজীর বিশ্বে আর একটিও নেই।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু পূর্ণ ঈমানদারীর সাথেই তাঁর আনুগত্য করতেন। আর এ ঈমান ও ইখলাসে তিনি যতটুকু উন্নতি সাধন করেছেন, বলা যায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু কি আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু না আর কেউ, এতটুকু দেখাতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি

'জারফ' পৌঁছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকদেরকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাব শুনালেন, তখন খলিফার নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জারফ আসলেন। নিজের উপস্থিতিতে বাহিনীকে বিদায় দিলেন। যাত্রার সময় লোকেরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন—উসামা ঘোড়ায় চড়ে চলছেন, আর আল্লাহর রাসূলের খলিফা তার সাথে পায়ে হেঁটে চলেছেন। মানুষের মনে উসামার প্রতি মর্যাদা ও তাজিমের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য তিনি তা করছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, নেতার সব হুকুম কোনো আপত্তি ছাড়া তামিল করতে হয়।

উসামা বড় লজ্জা অনুভব করলেন। কারণ, তিনি যাচ্ছেন ঘোড়ায় চড়ে আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাথী, খলিফাতুল মুসলিমিন, মুসলমানদের সবচেয়ে মর্যাদাশালী ব্যক্তি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে চলেছেন। তিনি বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা ! আপনিও ঘোড়ায় চড়ুন। নতুবা আমি নেমে যাবো।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! তুমি নামবে না। আর আমিও ঘোড়ায় চড়বো না। যদি সামান্য কিছু সময় আল্লাহর পথে গিয়ে পায়ে কিছু ধূলা-বালু লাগে তাতে অসুবিধা কোথায় ?"

সামরিক বাহিনী রওনা হয়ে যাচ্ছেন এমন সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামাকে বললেন ঃ

"তুমি যদি চাও তাহলে আমার সাহায্যের জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেখে যাও।"

উসামা খুশী হয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন।

বাহিনীর উদ্দেশ্যে উপদেশ

উসামাকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসার সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন ঃ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমরা থামো। আমি তোমাদেরকে দশটি বিষয়ে নসিহত করছি এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখো—খেয়ানত করো না, ওয়াদা ভঙ্গ করো না, চুরি করো না, নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটো না, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করো না, খেজুরের গাছ কেটো না ও আগুনে পুড়িয়ে দিও না। ফলের গাছ

www.pathagar.com

কেটো না, খাবার প্রয়োজন ছাড়া কোনো ভেড়া বা উট যবেহ করো না। তোমরা এমন লোকও দেখতে পাবে যারা তাদের জীবনকে গীর্জার মধ্যে ইবাদাতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে। রাত-দিন তারা ওখানে বসে বসে ইবাদাত করে। তাদেরকে তাদের সে অবস্থায় ছেড়ে দেবে। তোমরা এমন লোকের কাছে যাবে যারা তোমাদের জন্য প্লেটে করে বিভিন্ন রকমের খাবার আনবে। যখনই খেতে শুরু করবে, আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে। এমন লোকের সাথে তোমাদের দেখা সাক্ষাত হবে যারা মাথার মধ্যভাগ তো কামিয়ে ফেলবে, কিন্তু চারিদিকে বড় বড় জট লটকিয়ে রাখবে। এদেরকে তরবারী চালিয়ে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর নামে নিজেদের হিফাযত করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে পরাজয় ও বিপদাপদ হতে রক্ষা করুন।"

উসামাকে তিনি এ উপদেশ দিলেন ঃ

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে যা যা করতে নির্দেশ করেছেন, তার সবই তুমি পালন করবে। 'কাজায়া' থেকে যুদ্ধ শুরু করবে। এরপর আবেল যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনে যেনো কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে।"

বালকার দিকে বাহিনীর যাত্রাভিযান

এসব উপদেশ দান করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। উসামা রওনা হয়ে গেলেন। সময়টা ছিলো মে মাস। অসহ্য গরমের মৌসুম। তপ্ত বালুকাময় মরুপথ অতিক্রম করে বিশ দিন পর তিনি বালকায় গিয়ে পৌছলেন। এ বালকার কাছেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। মুতার যুদ্ধেই উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা যায়েদ বিন হারেস ও তার দু'জন সাথী জাফর বিন আবু তালেব এবং আবদুল্লাহ বিন রাওহা শহীদ হয়েছিলেন। উসামা তাঁর বাহিনীকে ওখানে থামালেন। বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে কাজায়া গোত্রের উপর হামলা করার জন্য পাঠালেন। এখানে মুসলমানরা বিপুল বিজয় লাভ করলেন। অসংখ্য রোমক সৈন্য নিহত হলো। প্রচুর গনিমাতের মাল লাভ হলো। হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে তার পিতার শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

আক্রমণ সংক্রান্ত যেসব হেদায়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামাকে দান করেছিলেন, তিনি হুবহু তা পালন করে চলেন। যেখানে যাবার জন্য ইরশাদ করেছেন, সেখানেই গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ অনুযায়ী শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনার আগ পর্যন্ত রোমীয়রা কিছু জানতে পারেনি। বিজয়ের সাথে সাথে তিনি মদীনার দিকে রওনা হলেন।

উসামার সফল প্রত্যাবর্তন

শত্রুদের উপর বিজয়ের ফলে হযরত উসামার মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। যারা এক সময় উসামার নিয়োগে আপত্তি উঠিয়েছিলো তারা এখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

www.pathagar.com

অত্যন্ত গৌরবের সাথে তারা এখন উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাঁর পিতার গুণ, শৌর্যবির্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বেড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা আজ তারা বার বার স্মরণ করতে লাগলো। রাসূলের কথা, "উসামা আমেরিয়াতের উপযুক্ত, তাঁর পিতাও আমেরিয়াতের উপযুক্ত ছিলেন।"

এ অভিযানে উসামা সীমান্ত হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট মনে করলেন। পেছনের দিক থেকে ধাওয়া করে রোম সীমান্তে প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আরো বেশী বিজয়লাভের চেষ্টা তিনি করেননি। কারণ, তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো আরব সীমান্তকে রোমীয় হামলা থেকে রক্ষা করা। মুসলমানদের দুর্বল পেয়ে মদীনা হতে বহিষ্কৃত ইহুদীদের প্রতিশোধের বাহানা ধরে আরব সীমান্তে প্রবেশ করে অত্যাচার চালাতে তাদেরকে সুযোগ না দেয়া।

এখন অবস্থার বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক হবার কারণে রোম ছিলো একটা বিরাট শক্তির মালিক। এ সত্য সম্পর্কে মুসলমানরাও অবহিত ছিলেন পরিপূর্ণরূপে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রোমের হেরাকলের কাছে দাহিয়া কালবীকে পাঠিয়েছিলেন। তখন ছিলো চরম উন্নতি ও উৎকর্ষের সময়। দাহিয়া কালবী সে সময় রোমের সার্বিক অবস্থা, শক্তিমত্তা ইত্যাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য আরোপ করেন। তাছাড়া এ বছরই ইহুদীরা খায়বার, ফিদাক এবং তাইমায়ে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে চলে যায়। তাদের মন প্রতিশোধের বহ্নি জ্বালায় ছিলো ভরপুর। ফিলিস্তিন গিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমীয়দের কাছে বিষোদগার ছড়াতে লাগলো যে—"ইরানের মতো বিরাট শক্তির উপর তোমরা যখন বিজয় লাভ করেছো, তখন মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করাও তোমাদের জন্য কঠিন কিছু নয়।"

এ অবস্থায় বাহ্যত এ কাজ অধিকতর সহজ হতো যদি উসামা সীমান্ত বিজয়ের পর রোমে প্রবেশ করতেন। তাহলে যে কাজ দু' বছর পর শুরু হয়েছে তা সে আক্রমণের সময়ই শুরু হয়ে যেতো।

উসামার বাহিনীর অভ্যর্থনা

হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সৌভাগ্যবান বিজয়ী বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্ত হতে মদীনার কাছে এসে পৌছলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্মানিত একদল মুহাজির ও আনসার নিয়ে উসামাকে এক বিরাট অভ্যর্থনা জানান। মুসলমানদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। মদীনায় পৌছে উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে শুকরানা নামায আদায় করেন। চল্লিশ দিন—কোনো কোনো বর্ণনায় সত্তর দিন পর উসামা মদীনা ফিরে আসেন।

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ উসামার এ অভিযানের গুরুত্বকে খাটো করে এটাকে একটা সাধারণ সীমান্ত অভিযান বলে অভিহিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। প্রাচ্যবিদ

www.pathagar.com

'ফোকা' ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে উসামা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"ধর্মত্যাগীদের উৎপাতে মুসলমানরা যে ব্যতিব্যস্ততার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার প্রেক্ষিতেই উসামার বিজয় তাদের কাছে একটা বিরাট গুরুত্ব লাভ করে। অথচ পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সিরিয়া যুদ্ধগুলোর 'সূচনা' প্রমাণিত হওয়া ছাড়া উসামার বিজয়ের আর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিলো না। এ অভিযানে উসামার অবদান শুধু এতটুকু যে, তিনি কোনো কোনো গোত্রের উপর অতর্কিতে হামলা করে কোনো বড় সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে গানিমাতের সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরেছেন। এরপরও মুসলমান, বিদ্রোহী আরব এবং রোমের এ তিনটি পক্ষের উপর এর বেশ প্রভাব পড়েছিলো। উসামা বাহিনীর প্রেরণের কথা শুনে বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীরা বলেছিলো, "এ বাহিনী প্রেরণের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে মনে হয় যে মুসলমানরা খুবই শক্তিশালী। শক্তি না থাকলে তারা এ অবস্থায় বাইরে পাঠাতে সাহস পেতো না—যেখানে সমগ্র আরব তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।"

ইসলামী বাহিনীর আগমনের কথা শুনে হেরাক্লও ভীত হয়ে পড়েছিলো। একটা বিরাট বাহিনী তাদের মুকাবিলা করার জন্য বালকায় সে পাঠিয়েছিলো। এসব ঘটনা স্পষ্টত একথার প্রমাণ বহন করে, এ যুদ্ধের কারণে রোমবাসী, ধর্মত্যাগী আরব গোত্রসমূহ, উভয়েই মুসলমানদের দুর্দমনীয় শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলো। এ জন্যই 'দাওমাতুল জান্দল' ছাড়া আরবের উত্তর এলাকার বসবাসকারীরা মদীনার উপর আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করেছে। অথচ এর আগে মদীনায় হামলা পরিচালনা করে মুসলমানদেরকে রোম সীমান্তে হামলা করার সাধ মিটিয়ে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা তাদের ছিলো।

তারপরও উত্তর আরব ছাড়া আরবের আর কোনো অংশের অবস্থাই এমন ছিলো না। এর আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ ভাগেই বিদ্রোহের দাবানল আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং কয়েকটি গোত্রে নবুয়াতের দাবীদারও জন্ম নিয়েছিলো। তাঁর অসীম সতর্কতা ও বিচক্ষণতা ও মুসলমানদের তরফ থেকে দুর্দান্ত প্রতাপ ও শক্তির প্রকাশ ঘটার কারণে যদি এসব গোত্র ও 'ভণ্ড নবীরা' ভীতসন্ত্রস্ত না হতো, তাহলে তাঁর জীবদ্দশায়ই চারিদিক থেকে বিদ্রোহের দাবদাহ জ্বলে উঠতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে বিদ্রোহীদের সাহস বেড়ে গিয়েছিলো। তারা তাদের এ বিপজ্জনক ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যে বলতে লাগলো। এ সময় মুসলমানরা কম জনশক্তি ও বিরাট শত্রু পক্ষের জন্য চিন্তিত ছিলো। এ নাজুক অবস্থায় যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ না ঘটতো এবং মযবুত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচিত না হতো, তাহলে হয়তো মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকতো না।

www.pathagar.com

৫

যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ

উসামা বাহিনী সিরিয়া যাত্রার পথে থাকতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকেই এতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এ আগুন সবচেয়ে বেশী তীব্রভাবে জ্বলে উঠেছিলো ইয়েমেন দেশে। অবশ্য ইয়েমেনে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলকারী আসওয়াদ উনসিকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। বনি হানিফায় মুসাইলামা ও বনি আসাদে তোলাইহা নবুয়াত প্রাপ্তির দাবী জানিয়ে হাজার হাজার লোককে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলো। লোকেরা বলাবলি শুরু করেছিলো ঃ

> "আসাদ ও গাতফানের মিত্র গোত্রগুলোর নবী আমাদের কাছে কুরাইশদের নবীর চেয়েও বেশী প্রিয়। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোলায়হা এখনো জীবিত।"

মদীনায় বিদ্রোহের খবর

বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্রোহের খবর আসতে শুরু করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "সব এলাকায় আমাদের নিযুক্ত প্রশাসকদের কাছ থেকে ঘটনার পূর্ণ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

অল্পদিনের মধ্যেই সব জায়গা থেকে দ্রুত রিপোর্ট আসা শুরু হলো। এসব রিপোর্টে জানা গেলো, বিদ্রোহীদের হাতে শুধু দেশই বিপদগ্রস্ত নয় বরং ধর্মত্যাগীদের সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে তাদের জীবনও বিপন্ন। এ অবস্থায় বিদ্রোহীদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে দমন করা এবং যে কোনো মূল্যে নাজুক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা ছাড়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে আর কোনো বিকল্প ছিলো না। এ অরাজক অবস্থা ও বিদ্রোহের সুযোগে কোনো কোনো সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবেই ইসলাম থেকে সরে পড়েছিলো। আবার কোনো কোনো গোত্র ইসলাম পরিত্যাগ করেনি সত্য কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসলো।

এসব সম্প্রদায়ের কিছু লোক ছিলো যারা জীবনের চেয়েও বেশী মূল্য দিতো ধন-সম্পদকে। আল্লাহর পথে কিছু খরচ করা তাদের কাছে ছিলো খুবই কষ্টকর কাজ। তাদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মদীনার নির্বাচিত খলিফার যাকাত আদায় করার কোনো অধিকার নেই। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে ঘোষণা করলো—"না তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমীর হিসাবে মানে, আর না তাঁর নির্দেশিত হুকুম পালন করাকে আবশ্যক মনে করে।"

www.pathagar.com

মদীনার আশেপাশের গোত্র আবাস ও জুবয়ান যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুসলমানদের পক্ষে এসব গোত্র হতে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উসামার বাহিনী দেশের বাইরে চলে যাবার পর যুদ্ধ বিশারদ খুব অল্প সংখ্যক লোকই তখন মদীনায় অবশিষ্ট ছিলেন। কাজেই এ অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটাও চাট্টিখানি কথা ছিলো না। মুসলমানদের জন্য এ সময় দু'টি পথ খোলা ছিলো। প্রথম পথ যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে যাকাত দিতে বাধ্য করার চেষ্টা না করা। নমনীয়তা ও ভদ্রতার সাথে আচরণ করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এদেরকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করা। আর দ্বিতীয় পথ এদের সাথে যুদ্ধ করা। দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করলে শত্রু সংখ্যা অবশ্যই বেড়ে যাবে। মুসলিম বাহিনী দেশের বাইরে থাকার কারণে এ বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটাও সহজ ব্যাপার ছিলো না।

সাহাবীদের সাথে পরামর্শ

এ নাজুক পরিস্থিতিতে যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু বড় বড় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ অধিক সংখ্যক সাহাবী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান পোষণকারী মানুষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করলেন। বরং তাদেরকে সাথে নিয়ে ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যোমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার মত দিলেন। এ মতের বিপক্ষেও কিছুসংখ্যক লোকের অভিমত প্রকাশ পেলো। আলোচনা দীর্ঘক্ষণ ধরে চললো। সর্বশেষ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। যাকাতের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্বপক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করে শক্তি দিয়ে হলেও তাদেরকে যাকাত পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, তিনি অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে বললেন ঃ

> "আল্লাহর কসম ! যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি রশিও যাকাত হিসাবে পরিশোধ করতো, তারা যদি আজ তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি এ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খানিকটা গরম হয়ে উঠলেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে মত প্রকাশ করে তিনি বললেন ঃ

> "আমরা তাদের সাথে কিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারি, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলেছেন, আমাকে তখনই মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যখন কোনো লোক কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" মুখে উচ্চারণ না করবে। যে ব্যক্তি এ কালেমা

www.pathagar.com

মুখে বলবে তখন তার জীবন ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হবে মুসলমানদের। অবশ্য তার উপর যা ফরয হবে তা পরিশোধের জন্য তার কাছে দাবী জানাতে হবে। তবে তার নিয়াতের হিসাব আল্লাহ স্বয়ং তার থেকে নেবেন।"

কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো না। তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী লোকদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। কারণ, যাকাত হলো ধন-সম্পদের 'হক'।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের দায়িত্বে যে 'হক' আসবে তা সব অবস্থাতেই তার কাছ থেকে আদায় করার জন্য চাইতে হবে।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ জবাব শুনে আমার বিশ্বাস জন্মিলো, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিনা খুলে দিয়েছেন।"

এ ঘটনার সাথে মিলে যায় এমন একটি ঘটনা যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও ঘটেছিলো। তায়েফ থেকে সাকিফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসে সাথে সাথে আবেদন জানালো, তাদেরকে নামায থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আবেদন মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ

"ঐ দীনে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, যে দীনে নামায নেই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করে চলা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে মনে করতেন। আর তিনিও একথাই বলেছেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! আমি নামাযে ও যাকাতে পার্থক্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"

শত্রু গোত্রের প্রতিনিধি দল

মদীনার চারিদিকে বসবাসকারী বিদ্রোহী গোত্রগুলোর আবাস, জুবিয়ান, বনু কিনানা, গাতফান এবং ফাজারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করে মদীনার কাছে অবস্থান নিলো। গোত্রগুলো দু' ভাগে বিভক্ত ছিলো। এক ভাগ রাবজার কাছে আবরাক নামক স্থানে, আর অপর ভাগটি জুলকিসসায় জুমহালার কাছে নাজদের সড়কে অবস্থান গ্রহণ করলো। এ বাহিনীর নেতারা প্রথমতঃ তাদের

www.pathagar.com

একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠালো। ঐখানে পৌঁছে তারা কোনো লোকের মাধ্যমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পয়গাম পাঠালো, তারা নামায আদায় করতে প্রস্তুত। তাদেরকে অবশ্য যাকাত থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আগে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যে জবাব দিয়েছিলেন, তাদেরকেও এ একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ তারা যদি যাকাতের মালের একটি রশিও যাকাত হিসাবে পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তাহলে তিনি তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরবেন।

প্রতিনিধি দলের ফেরত

প্রতিনিধি দল নিরাশ হয়ে তাদের বাহিনীর কাছে ফিরো এলো। কিন্তু মদীনায় অবস্থানের সময় তারা লক্ষ্য করলো এবং বুঝতে পারলো, এ সময় মদীনার অবস্থা খুবই দুর্বল। এ অবস্থায় তারা মদীনাকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপদেশ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সূক্ষ্মদর্শি চোখ এ প্রতিনিধি দলের মনের গোপন অভিসন্ধি আঁচ করে ফেললেন। তাদের ফেরত চলে যাবার পরই মদীনাবাসীকে একত্রিত করে তিনি বললেন ঃ

> "তোমাদের চারিদিকে শত্রু সেনা ঘাঁটি বানিয়ে অবস্থান নিয়েছে। তারা তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। বলা যায় না কোন্ সময় তারা তোমাদের উপর হামলা করে বসে। এক মঞ্জিল দূরে তাঁবুতে বাস করছে তারা। তাদের আশা ছিলো, তোমরা তাদের শর্ত মেনে নেবে। কিন্তু এখন আমরা তাদের শর্ত মানতে অস্বীকার করেছি। তাই তারা অবশ্যই তোমাদের হামলা করার প্রস্তুতি নিবে। তোমরা নিজেরাও নিজেদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করো।"

এরপর তিনি হযরত আলী, জুবাইর, তালহা এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে ডেকে পাঠালেন। তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছোট দল দিয়ে বাইরের রাস্তাগুলোর উপর অবস্থান গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলেন। অন্যান্য সকলকে মসজিদে নববীতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হুকুম দিলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনের প্রথম ঘটনা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ধারণা যথার্থ ছিলো। তিন দিনের মধ্যেই যাকাত অস্বীকারকারীরা মদীনার উপর হামলা করে বসলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো খলিফা থেকে তাদের দাবী আদায় করে তবে ছাড়বে।

মদীনার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া গোয়েন্দারা যাকাত অস্বীকারকারীদের বাসনা সম্পর্কে আলী, জুবাইর, তালহা ও ইবনে মাসউদকে সহ অন্যান্য সকলকে অবহিত

www.pathagar.com

করলো। তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ খবর পৌঁছালেন। তিনি প্রত্যেককে তাদের স্ব স্ব স্থানে অবস্থান নিয়ে শহরের বড় বড় প্রবেশ পথগুলোকে সতর্কতার সাথে রক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। নিজেরা উটে আরোহণ করে মসজিদে নববীতে এসে এখানকার একত্রিত লোকজনকে সাথে নিয়ে তাদের মুকাবিলা করার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যান যারা রাতের অন্ধকারে মুসলমানদের উপর হামলা করতে চায়।

মুসলমানদের তরফ থেকে কেউ এদেরকে প্রতিরোধ করতে আসতে পারে এমন ধারণাও এসব গোত্রাধিপতিদের মনে উদয় হয়নি। কারণ, তারাতো তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মদীনায় দুর্বলতার রিপোর্ট পেয়েছে। কিন্তু যখন তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ উল্টো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের উপর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে দিলেন, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক। দিশেহারা হয়ে পালাতে লাগলো। 'জিহাসা' পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পেছন থেকে ধাওয়া করে নিয়ে গেলো।

মদীনা আক্রমণ করতে আসার সময় হামলাকারীরা ওদের বড় বড় বাহাদুর ও সাহসী লোকদেরকে সাথে করে নিয়ে আসেনি। তাদের ধারণা ছিলো মদীনায় এখন লোকজন নেই। মদীনা অরক্ষিত। কিন্তু মুসলমানদের তাড়া খেয়ে তারা যখন ফিরে গেলো, তখন বাহাদুররা অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে আসলো। যুদ্ধ শুরু হলো। সারা রাত যুদ্ধ চললো। কিন্তু কোন পক্ষই বিজয়ের ভাগ্য ছিনিয়ে নিতে পারলো না। অবশেষে বিরোধী পক্ষ মুসলমানদেরকে আটক করার জন্য তাদের উটের ঘাড়ে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। উটগুলো যেহেতু যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না, তাদের কৌশল বুঝতে পারেনি। ভয়ে উটগুলো মদীনার দিকে পালাতে লাগলো। আরোহীসহ তারা শহরে এসে প্রবেশ করলো।

মুসলমানরা চলে যাওয়াতে আবাস, জুবিয়ান ও তাদের মিত্ররা আনন্দে দিশেহারা। এ অবস্থাকে তারা তাদের বিজয় ও মুসলমানদের পরাজয় ভেবে 'জুলকিসসার' শিবিরে অবস্থান গ্রহণকারী লোকদের কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। এ অবস্থায় জুলকিসসার লোকেরা তাদের কাছে পৌঁছে গেলো এবং শলা-পরামর্শ করলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো, যে পর্যন্ত মুসলমানরা নাকে খত লাগিয়ে তাদের দাবী মেনে না নিবে ততদিন তারা ফিরে যাবে না।

এদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও সকল মুসলমানরা এ রাত দু' চোখ বন্ধ করতে পারেনি। শত্রু মুকাবিলায় তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাতের তৃতীয়াংশে মুসলমানরা সকলকে সাথে নিয়ে আবার শত্রুর দিকে রওনা হলো। শত্রু পক্ষের কেউ যেনো আক্রমণের খবর জানতে না পারে। এ জন্য আগের মত তারা কড়া সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। ভোর হলে দেখা গেলো মুসলমানরা এবং শত্রু গোত্রগুলো একই ময়দানে অবস্থানরত। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণ যুদ্ধ

www.pathagar.com

প্রস্তুত অবস্থায়। আর শত্রু পক্ষ প্রশান্তির সাথে আরামে-আয়েশে অলস বিমূঢ় সময় কাটাচ্ছে। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ মুসলমানদের জন্য আর কি হতে পারে ? তারা নির্দ্বিধায় ওদের বুকের উপর তরবারী চালাতে শুরু করলো। আকস্মিক আক্রমণে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আধো জাগাবস্থায় তারাও যুদ্ধ শুরু করলো। সূর্যোদয়ের সাথে প্রচণ্ড হামলার চাপ সহ্য করতে না পেরে শত্রু সেনা ময়দান ছেড়ে পালাতে লাগলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জুলকিসসা পর্যন্ত তাদেরকে পিছু পিছু ধাওয়া করলো। এদের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই ভেবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ময়দানে ফিরে এলেন। নোমান বিন মাকরান ও সালার মায়মিনাককে কিছু লোকসহ যুদ্ধের ময়দানে রেখে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

জুলকিসসা ও বদরের যুদ্ধের সাদৃশ্য

এ ঘটনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ়তা স্থিরতার যে নিদর্শন দেখিয়েছেন, তাতে মুসলমানদের মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যুদ্ধসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালের এ লড়াই অনেকটা বদরের যুদ্ধের মতো। বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন শত তেরজন। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিলো এক হাজারেরও উপরে। আজকের এ ঘটনাতেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো খুবই অল্প। অন্যদিকে আবাস, জুবিয়ান ও গাতফান গোত্রের বিরাট দল মুসলমানদের উপর হামলা করেছিলো। বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ বিস্ময়কর ঈমানের পরিচয় দিচ্ছিলেন। আর এজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয় দান করেছেন। এ ব্যাপারেও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তার সাথীরা ঈমানে কামেলের প্রমাণ দিয়েছেন। দুশমনদের উপর বিজয় লাভ করেছেন। বদরের যুদ্ধে যেভাবে সুদূর প্রসারী ফল বহন করে এনেছে তেমনি এ যুদ্ধেও মুসলমানদের ইসলামের ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দৃঢ়তা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঈমান ও দৃঢ়তা নতুন করে কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কারণ, তাঁর জীবন ইসলামের প্রথম দিন থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে রেখেছিলেন। প্রতি ক্ষেত্রে তিনি শপথের এ দাবী আদায় করেন। আর তার গোটা জীবনটাই একথার সাক্ষ্য বহন করে। কোনো বাধা-বিপত্তিই তাঁকে তাঁর এ উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। এ অবস্থায় আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফজনতি ব্যাপার শত্রুদের সাথে কোনো রকম একটা মীমাংসা করে নেয়া তাঁর পক্ষে কি সম্ভব ছিলো ? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দৃষ্টির সামনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি কাজই ছিলো বইয়ের খোলা পাতা। যখনই কোনো দিক থেকে আল্লাহর নির্দেশের বাইরে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

শিক্ষার বিপরীতে কোনো কাজ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হতো, তখনই আবু তালিবের দরখাস্তের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ কথা তার মনে উদয় হয়ে যেতো।

"আল্লাহর কসম ! যদি এ লোকেরা সূর্যকে আমার ডান হাতে, চাঁদকে আমার বাম হাতে তুলে দেয় ; আর চায় আমি ঐ কাজ ছেড়ে দেই, যে কাজ করার দায়িত্ব আল্লাহ আমার উপর অর্পণ করেছেন। তারপরও আমি তা পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমি হয় তাদেরকে আমার পথে আনবো অথবা আমার প্রচেষ্টায় প্রাণ উৎসর্গ করবো।"

উসামার বাহিনী পাঠাবার সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের সময়সহ সকল সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ মযবুত ঈমানদারীর পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি মৃত্যুর পরওয়াও তিনি কোনো দিন করেননি। এ সত্য ঈমানের মুকাবিলায় দুনিয়ায় যে কোনো আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাস তাঁর কাছে ছিলো তুচ্ছ। এসব ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছে।

সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণ

যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ না করার পরামর্শ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ অনেক বড় বড় সাহাবাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা গ্রহণ করেননি। কারণ, আরবের এসব গোত্রের লোকেরা কিছুদিন আগেও মূর্তিপূজা করতো। জাহেলিয়াতের যুগ খতম হয়েছে তাও সামান্য কিছুদিন পূর্বে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি দীনের এ ফরয কাজগুলোর ব্যাপারে আরব গোত্রগুলোর রহিতকরণ প্রস্তাবে সম্মত হতেন, তাহলে তোলাইহা, মুসাইলামা এবং অন্যান্য সকল কল্পিত নবীরা তখনই প্রচার -প্রপাগাণ্ডা শুরু করে দিতো যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম ছিলো না। যদি তা না হবে তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব ব্যাপারে সমঝোতা করবে কেন ? আরব গোত্রগুলোর উপর এসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডার বেশ প্রভাব দেখা দিতো। ফলে সকলে মিথ্যা ও ভণ্ড নবীদের সাথে গিয়ে ভীড় জমাতো— যারা এখনো ঈমান আনেনি এবং তাদের আনুগত্যও স্বীকার করেনি। জুলকিসসার লজ্জাস্কর পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে পরাজিত বনী জুবিয়ান ও বনী আবাসের মুশরিকরা তাদের হাতের কাছের সকল মুসলমানদেরকে হত্যা করে ফেললো। কিন্তু এর প্রভাব উল্টো হলো। কারণ, ঐসব গোত্রের যারা এখনো দীনের উপর কায়েম আছে। তারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসে আরো মযবুত হয়ে গেলো। তারা ইতস্ততঃ হীনভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাদের যাকাত পেশ করতে লাগলেন। তারা সমস্ত আস্থা ও ঘটনা বিশ্লেষণে বুঝতে পারলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর মযবুত ঈমানের কারণে এসব ধর্মত্যাগীদের উপর নিসন্দেহে বিজয় লাভ করবেন। দীনে হকই প্রতিষ্ঠিত থাকবে ও বিশ্বের দরবারে ইসলামই সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করবে। আর এ পরাজিত শত্রুরা

www.pathagar.com

দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের উপর যে প্রতিশোধ নিলো তা তাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে পারবে না। আর তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের বড় মূল্য আদায় করতে হবে অবশ্যই।

সন্দেহের অবকাশ ছিলো কোথায় ? সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ অসহায় গরীব মুসলমানদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত শুধু সময়ের অপেক্ষায় বসেছিলেন। উসামা বাহিনীর শুধু ফিরে আসার অপেক্ষায়। যেসব চিহ্নিত মুশরিকরা মুসলমানদের রক্তে তাদের হাতকে রঞ্জিত করেছে তাদের একজনকেও এ দুনিয়ার আলো বায়ুর সাধ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

বাইরের মুসলমানদের যাকাত আদায়

জুলকিসসার বিজয়ের পর যারা ইসলামে অটল রয়েছে। তারা দলে দলে মদীনায় এসে যাকাত আদায় করতে লাগলো। বনী 'তামিম' গোত্রের সর্দার 'সাফওয়ান' ও 'বনী তায়' এর সর্দার 'আদি বিন হাতেম তায়ী' সর্বপ্রথম যাকাত পরিশোধের জন্য মদীনায় আসলেন। মদীনাবাসীরা তাদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে ভিতরে আবার কেউ কেউ তাদের এ আগমনকে বিপদের কারণ বলেও সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আবু বক্র রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, 'সন্দেহ নেই'। এরা বিপদর নয় বরং শুভ সংবাদের বাণীবাহক। এরা শত্রু নয়, সাহায্যকারী।

এটা ছিলো মুসলমানদেরকে সাহস ও হিম্মত যুগিয়ে উৎসাহিত করে রাখার সময়। চারিদিক থেকে বিপদের যে কালো মেঘ চেপে আসছিলো তাতে মুসলমানদের শক্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিলো স্বাভাবিকভাবেই।

এ সময়ের রূপরেখার একটা চিত্র তুলে ধরে ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আমরা এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলাম, যদি এ সময়ে আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য না করতেন তাহলে আমাদের ধ্বংস ছিলো অনিবার্য। আমাদের সকল মুসলমানদের সর্বসম্মত রায় ছিলো, যাকাতের উটের জন্য আমরা অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো না। আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে আমরা আমাদের পরিপূর্ণ বিজয় সাধন করবো কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের কাছে তিনি শুধু দু'টো শর্ত পেশ করলেন, তিনটি নয়। প্রথম, তারা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা কবুল করে নেবে। যদি তাতে রাজী না হও, তাহলে বহিষ্কার অথবা যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা কবুল করার অর্থ হলো, তাদের স্বীকার করে নেয়া তাদের নিহতরা দোযখী আর আমাদের নিহতরা জান্নাতী হবেন। তারা আমাদের নিহতদের রক্তপণ আদায় করবে। আমরা তাদের কাছ থেকে যে গানিমাতের মাল অর্জন করেছি তা ফেরতের দাবী করতে পারবে না। আর যে

www.pathagar.com

মাল তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে তা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। বহিষ্কারের সাজা ভোগ করার অর্থ হলো—পরাজিত হবার পর তাদের স্ব স্ব এলাকা হতে বেরিয়ে যাবে। দূরে দূরান্তরে কোথাও গিয়ে বসবাস করবে।"

সিরিয়া হতে উসামার প্রত্যাবর্তন

বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানরা যাকাতের মাল নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। এ সময় উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী রোম হতে বিজয়বেশে ফিরে এলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও বড় বড় সাহাবীগণ জারফ নামক স্থানে পৌঁছে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। জনগণও অত্যন্ত আনন্দ-আহলাদের সাথে তাদের স্বাগত জানালেন। মদীনায় আগমনের পর চারিদিকে আনন্দ-গীত ধ্বনিত হতে শুরু করলো। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে যে পতাকা তার হাতে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তা মসজিদে নববীতে উড্ডীন করে দিলেন। শুকরানা নামায আদায় করলেন।

পুনরায় যুদ্ধ

অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন। শত্রুপক্ষকে প্রস্তুতির কোনো সুযোগ না দিয়ে উপর্যোপুরি আক্রমণ চালিয়ে তাদের পূর্ণ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিতে হবে। আপাতত তিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে বিশ্রাম নেয়ার হুকুম দিলেন। যারা আগেও জুলকিসসার যুদ্ধে শরীক ছিলেন তাদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন। লোকেরা আবেদন জানালেন। এখন কোথাও গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করে না ফেলতে। কারণ, আল্লাহ না করুন তাঁর যদি কিছু হয় তাহলে ইসলামী সালতানাতের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়বে। অন্য কাউকে তার স্থানে সেনাপতি বানিয়ে দিলে আল্লাহ না করুন তার কিছু হলেও মুসলিম মিল্লাতের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো কাজের সংকল্প করলে তা পরিপূর্ণ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না। এসব কথা শুনে তিনি বললেন ঃ

আল্লাহর কসম ! অবশ্য অবশ্যই আমি পেছনে থাকবো না। বরং তোমাদের সাথে সাথে থেকে তোমাদের হিম্মত ও সাহস জোগাবো। মদীনা হতে রওনা হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবরক নামক স্থানে পৌঁছলেন। জুলকিসসার কাছেই ছিলো এ জায়গাটি। ওখানে বনী আবাস, জুবিয়ান ও বনী বকরের সাথে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। শত্রু সেনা পরাজিত হলো। মুসলমানরা তাদের এ এলাকা হতে বের করে দিলো। আবরকের মালিক ছিলো বনী জুবিয়ান। ওদের ওখান থেকে বের করে দেবার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ জায়গাটিকে মুসলমানদের জায়গা বলে ঘোষণা দিলেন। ভবিষ্যতে বনী জুবিয়ান গোত্র আর এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ পাক এটাকে মালে গানিমাত হিসাবে আমাদেরকে দান করেছেন। বস্তুত এরপর থেকেই এ জায়গা মুসলমানদের মালিকানায় এসে গেলো।

www.pathagar.com

অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসলে 'বনু সায়ালাবা' ঐ জায়গাটিতে বাস করতে চাইলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি দেননি।

এভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের পরাজয় পরিপূর্ণ হলো। মদীনাবাসী অপরিসীম আনন্দিত হলো। একেতো উসামা বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের কারণে শহরে বাইর থেকে হামলা হবার সম্ভাবনা রইলো না। অপরদিকে গানিমাত ও যাকাত একাধারে আসা শুরু হবার কারণে মুসলমানদের সচ্ছলতা আসতে লাগলো।

পরাজিত গোত্রগুলোর আচরণ

আবাস, জুবিয়ান, গাতফান, বনী বকর এবং মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলোর উচিত ছিলো তাদের হঠকারিতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা। ইসলামের ফরয কাজগুলো পালনের অঙ্গীকার করা। মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। বুদ্ধিরও দাবী ছিলো এটাই। আর সংঘটিত ঘটনাবলীও এ দাবীরই সমর্থন করে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের সর্বশক্তি খর্ব করে দিয়েছিলেন। রোম সীমান্তের বিজয়ের কারণেও মদীনাবাসীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বেড়ে গেলো। মুসলমানদের শক্তিও বৃদ্ধি পেলো অনেক। বদরের যুদ্ধসহ প্রাথমিক যুগের যুদ্ধের সময়ের মতো এরা এখন দুর্বল নয়। এখন মক্কা এবং তায়েফবাসীও তাদের সাথে আছে। এই উভয় শহরের নেতৃত্বও এখন আরবের ব্যাপারে ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত। এরপরও এসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনেক মুসলমান ছিলো যাদেরকে বিদ্রোহীরা তাদের দলে মিশাতে পারেনি। এভাবে তাদের অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে গেলো।

কিন্তু মুসলমানদের শত্রুতা তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছিলো। কল্যাণ-অকল্যাণের অনুভূতি তারা হারিয়ে বসেছিলো। নিজের বাড়ী ঘর ছেড়ে দিয়ে তারা বনী আসাদ গোত্রের মিত্র তোলাইহা বিন খোয়াইলাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলো। তাদের মধ্যে যেসব মুসলমান বিদ্যমান ছিলো তারা তাদেরকে তাদের ইচ্ছা-আকাংখা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। এরা ওখানে পৌছার দরুন তোলাইহা ও মুসাইলামা কাজ্জাবের শক্তি বেড়ে গেলো। তারা ইয়েমেনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। এ অবস্থা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়েমেনের সকল অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে না আসা পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদি এসব গোত্র বুদ্ধি দ্বারা তাড়িত হতো তাহলে তোলাইহা সহ অন্যান্য ধর্মত্যাগীদের এতটা শক্তি ও অগ্রগতি সাধিত হতো না। এবং অতি তাড়াতাড়ি গোটা আরব ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারতো। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো অন্য রকম। তাই বিরোধীদের আরো অবকাশ দেয়া হলো। এ সুযোগে তারা তাদের দলকে আরো মযবুত করে নিক।

ইসলামের সাথে এ গোত্রগুলোর শত্রুতা ও ঘৃণার মূল কারণ ছিলো এটাই। একথা প্রথমেই আমি উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ গোত্রীয় জাতীয়তা আমরা কারো কথা আধিপত্য

www.pathagar.com

মানতে পারি না। এরা যখন মদীনা হামলা করতে ব্যর্থ হলো বরং উল্টো তাদের সেই নিজেদের বস্তি হতে বের হতে হলো তখন এ বদ্দু মূর্খ লোকেরা বিজয়ী শক্তির কাছে মাথা নত করতে ও তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পসন্দ করলো না। এ খেয়ালের বশবর্তী হয়েই তারা বনী আসাদ ও তোলাইহার সাথে গিয়ে একত্রিত হলো। তারা মনে করেছিলো ওদের সাথে একত্রিত হয়ে তারা শোচনীয় পরাজয়ের দাগ মুছে ফেলতে পারবে।

কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সকল প্রকার গোত্রীয় জাতীয়তার বিষবাষ্প থেকে দূরে ছিলেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো একটাই, আর তাহলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কায়েম করা পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। তিনি তাঁর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য লাভের কাজে ওয়াকফ করেছেন। বাইয়াতের দিন তিনি এ নীতির ঘোষণাই দিয়েছিলেন। আর তাঁর খেলাফতকালে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিনি এ নীতিই পালন করে চলেছেন।

www.pathagar.com

৬

ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু আবাস, জুবিয়ান, বকর এবং তাদের মদদগার গোত্রগুলোকে পরাজিত করে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এ বহিষ্কৃতরা বাজাখা পৌছে তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ আসাদীর সাথে একত্রিত হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ঘোষণা জারী করেছিলেন, যেহেতু এ সকল বস্তি গানিমাত হিসাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন, তাই এগুলো ওদেরফেরার বাসিন্দাদের হাওলা করা হবে না। তাই তিনি আবরাক ও বারজা নামক স্থানের আশেপাশের সব ভূমি ও মাঠ-ময়দান মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে মদীনায় চলে আসেন। এখন ধর্মত্যাগের এ বিরাট ফেতনার দমনই হলো তাঁর প্রধান কাজ। কারণ, এ বিদ্রোহ আরবের সর্বত্র দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মুসলমানদের জন্য একটা বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। যাকাত অস্বীকারকারীদের ন্যায় ধর্মত্যাগীদেরও যে কোনো মূল্যে শোচনীয় পরাজিত করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সংকল্পবদ্ধ হলেন। তাদের সাথে কোনো সন্ধি করা চলবে না।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

মদীনায় ফিরে এসে ভালভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করার পর উসামা বাহিনীকে সাথে নিয়ে মদীনা হতে বের হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জুলকিসসা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এখানে এগারটি পতাকা বানালেন। বাহিনীকে এগার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন নেতা নির্বাচন করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক দলকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। যাবার পথে যেসব গোত্র পড়বে তাদের সব মুসলমানকে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবারও নির্দেশ জারী করলেন।

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠাবার সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিরোধীদের দল, শক্তি, জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের দিকে বাহিনী পাঠিয়েছেন। এ মানদণ্ড অনুযায়ী হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে তোলাইহা বিন খোয়াইলাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বনী আসাদের কাছে পাঠালেন। তাঁকে হুকুম দিলেন, তোলাইহার সাথে যুদ্ধ শেষে বাতাহ গিয়ে বনী তামিমের সর্দার মালিক বিন নুবিরার সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

বনী আসাদ ও বনী তামিম ছিলো মদীনার নিকটবর্তী ধর্মত্যাগী গোত্র। এ জন্য এখান থেকেই যুদ্ধ শুরু করে তাদেরকে পরাস্ত করে অন্যান্য গোত্রের উপর এর প্রভাব ফেলার প্রয়োজন ছিলো। তাহলে সহজে এদেরকেও পদানত করা যাবে। এসব

www.pathagar.com

শক্তিশালী গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কমাণ্ডারের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা খালিদের ছিলো।

ইকরামা বিন আবু জাহেলকে দ্বিতীয় পতাকা দেয়া হলো। ইয়ামামায় বনু হানিফার সর্দার মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের দেয়া হলো।

তৃতীয় পতাকা দেয়া হলো সোরাহবিল বিন হাসানাকে। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো প্রথমে মুসাইলামার বিরুদ্ধে ইকরামাকে সাহায্য করতে। সেখান থেকে অবসর পাবার পর ওমর বিন আসকে সাহায্য করার জন্য কাজায়া চলে যেতে।

ইকরামা ও সোরাহবিল ইয়ামামায় বিজয় লাভ করতে পারেননি। খালিদ বিন ওয়ালিদই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি আকরাবার যুদ্ধে মুসাইলামাকে হত্যা করে বনু হানিফার কোমর ভেঙ্গে দিলেন।

চতুর্থ পতাকা দিলেন মুহাজির বিন আবু উম্মিয়া মাখজুমীকে। তিনি ইয়েমেনে আসওয়াদে উনসির বাহিনী ওমর বিন মা'দি কারব জোবায়দি, কয়েস বিন মাকসুহ মুরাদী এবং তার সাহায্যকারীদের সাথে যুদ্ধ করলেন। এখান থেকে অবসর হলে কান্দাহ ও হাজরামাওত গিয়ে আশআস বিন কয়েস এবং তার সাথী মুরতাদদের সাথে লড়বেন।

পঞ্চম ঝাণ্ডা সুয়াইদ বিন মুকরেন উসিকে দিয়ে তাঁকে ইয়েমেনের তেহামায় যাবার নির্দেশ দিলেন।

ষষ্ঠ ঝাণ্ডা দিলেন আলা বিন হাজরামীকে। বাহরাইনে হাতান বিন যাবিয়া ও বনু কয়েস বিন সালাবার মুরতাদদেরকে নির্মূল করা ছিলো তাঁর দায়িত্ব।

সপ্তম ঝাণ্ডা দিলেন হোমাইয়ের হোজায়ফা বিন মুহসিন গিলগানিকে। আম্মানের নবুয়াতের দাবীদার জুততাক লফিত বিন মালিক এজদির সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হলো তাঁকে।

অষ্টম ঝাণ্ডা আরকাজা বিন হারখামাকে দিয়ে তাকে মোহরা পাঠানো হলো।

দক্ষিণ দিকে এতবেশী বাহিনী প্রেরণের কারণ হলো, ওদিকেই ধর্মত্যাগের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো বেশী। এখানকার মুরতাদদের দমনের জন্য বেশী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিলো। এর বিপরীত উত্তর দিকে পাঠানো হয়েছিলো তিনটি বাহিনী।

প্রথম বাহিনী ওমর বিন আসের নেতৃত্বে কাজায়ায় যুদ্ধের জন্য রওনা হলো। দ্বিতীয় বাহিনী মায়ান বিন হাজেজ সালমীর তত্ত্বাবধানে বনী সেলিম ও হাওয়াজেনের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য রওয়ানা হলো। তৃতীয় বাহিনী খালিদ বিন সাঈদ বিন আসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়া সীমান্তে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠানো হলো।

মদীনার হিফাযতের জন্য যেসব সৈন্য রেখে গেলেন তাদের সংখ্যা ছিলো বাইরে রওনা হয়ে যাবার সৈন্যদের থেকে অনেক কম। কারণ, তাৎক্ষণিক হামলার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

মদীনায় বেশ কম। যাকাত অস্বীকারকারীদের দমনের পর সেখানকার বাসিন্দারা বেশ শান্তিতে জীবনযাপন করছে। মদীনায় হামলা করার হিম্মত আর কারো রইলো না। চারিদিকেই মুসলমানদের বিজয়ের পর বিজয়ের সংবাদে তাদের প্রতাপ গোটা আরবেই ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের বাহাদুরীর ডংকা সকল গোত্রকে মাত করে দিয়েছে।

মদীনায় অবস্থানের কারণ

এসব বাহিনী প্রেরণের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় ফিরে আসলেন এবং স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস করতে শুরু করলেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণ, এ শহর এখন মুসলমানদের সামরিক হেড কোয়ার্টার হিসাবে পরিণত হয়েছে। সামরিক বাহিনীর আগমন-নির্গমন ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় নির্দেশ এখান থেকে জারী হতো। অতএব স্থায়ীভাবে খালিফাতুল মুসলিমীনের দারুল খেলাফায় থাকা জরুরী হয়ে পড়েছে। তা না হলে বিজয়ের ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তো। আর বিরোধী বিদ্রোহীদের মুকাবিলায় মুসলমানরা যে বিজয় লাভ করেছেন তা করা অবশ্যই সম্ভব হতো না।

বাহিনী প্রেরণের সময় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে হুকুম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিপাহসালারদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, তাহলো কোনো সিপাহলার বিজয় লাভ করার পর দারুল খিলাফত থেকে অনুমতি লাভের আগে কোনো দিকে রওনা হতে পারবে না। কারণ, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণায় প্রশাসন যন্ত্র আর সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগসূত্র ও ঐক্য বিদ্যমান থাকা খুবই প্রয়োজন।

মুহাজিরদের নেতৃত্বের কারণ

এ সময় কোনো কোনো আনসার ভাবতে লাগলেন, সামরিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব সবখানেই মুহাজিরদের হাতে। কোনো আনসারকেই নেতৃত্বের পতাকা বহন করার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়নি। এটা ছিলো নিছক একটা ভুল ধারণা। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা ছিলো মদীনাবাসী নিজ শহরের হিফাজত ও সংরক্ষণ স্বয়ং নিজেরা করবে। কেননা মদীনা সম্পর্কে মদীনাবাসীরাই সবচেয়ে বেশী ওয়াকেফহাল। আর অপরের তুলনায় তারাই ভালভাবে এ শহরের সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। সাকিফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের মনোভাব ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ওদেরকে নিয়োজিত করেননি। তারা বাইরে গিয়ে আবার না বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড্ডীন করে বসেন—তাদের কারো কারো এ ধারণা ছিলো নিরেট ভুল।

ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আনসারদেরকে পাঠানো হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাল করে জানতেন, আল্লাহর প্রতি অটুট ঈমান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর ভালবাসায় আনসারগণ মুহাজিরদের চেয়ে কোনো দিকেই কম ছিলেন না। তাই আনসারদের তরফ থেকে এমন আশংকার কথা তাঁর মনে কিভাবে উদিত হতে পারে?

www.pathagar.com

যদি আনসারদের ব্যাপারে একথা সত্য হয় তাহলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু, জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত বড় বড় মর্যাদাশালী সাহাবাদের ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে ? তাদেরকেও সে সময় মদীনার বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। তাদের তরফ থেকেও কি বিদ্রোহ করার আশংকা ছিলো ? আসলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ এসব প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাহাবাগণ ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মন্ত্রী বা পরামর্শ সভা। দারুল খোলাফায় তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করতেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শের আলোকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভিতকে মযবুত করতেন।

জাতীয়তার ঊর্ধে আবু বকর

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনসারদেরকে ভয় করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কারণ, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সখ করে ও নিজ ইচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। বরং এ ভারবাহী বোঝা ও খেলাফতের দায়িত্ব আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার বিচারের নিরেখেই মদীনার বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান সাহাবীগণ তাঁকেই খলিফা নির্বাচন করেছেন। তিনি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে তারা রাজী ছিলেন না। আড়াই বছরের খেলাফতের জীবনে যেসব ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে তা দিবালোকের মত সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধু আল্লাহর রাহে কুরবানী করেই খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন। বাইয়াত অনুষ্ঠানের পর প্রথম ভাষণেই তিনি বলেছিলেন ঃ

> "হে মানুষেরা ! আমাকে খলিফা তো বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি এটাকে পসন্দ করি না। আল্লাহর কসম ! আমার এখনো প্রবল ইচ্ছা যে, এ গুরু দায়িত্ব তোমাদের কেউ গ্রহণ করুক।"

> এভাবে আরো এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ
>
> "দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন শাসকগণ।"
>
> একথা শুনে লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ

> "হে লোকেরা ! তোমাদের কি হলো ? তোমরা আপত্তিও জানাচ্ছ আবার তাড়াতাড়িও করছো। কোনো ব্যক্তি যখন শাসক হয়, সে অন্যের ধন-সম্পদও কুক্ষিগত করতে চায় কিন্তু তার অবস্থা রেতের মত ধোঁকা। বাহ্যিকভাবে মনে হবে খুব আনন্দিত কিন্তু মূলত তারা হলো খুবই চিন্তিত ও বিমর্ষিত।"

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু যে জায়গায় থাকতেন তা ছিলো একটি মামুলী ও গ্রামীণ ধরনের জায়গা। তিনি ইচ্ছা করলে খেলাফতের পর তাঁর অবস্থা ভালো করে নিতে পারতেন। কিন্তু খেলাফতের গোটা সময়ে তার ঘর-বাড়ী একদম

www.pathagar.com

আগের মতোই ছিলো। এত কোনো পরিবর্তন আসেনি। এভাবে মদীনার বাড়ীও আগের অবস্থায় পতিত ছিলো। খলিফা নির্বাচিত হবার পর ছয় মাস পর্যন্ত তিনি পায়ে হেঁটে 'সাখ' থেকে মদীনায় আসা-যাওয়া করতেন। কদাচিত তিনি ঘোড়া ব্যবহার করতেন। খেলাফতের আগে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কাপড়ের ব্যবসা করতেন। খেলাফতের কাজ যখন বেড়ে গেলো শাসনকার্যের দায়িত্ব আরো বেশী হয়ে গেলো তখন নিজস্ব ব্যবসার জন্য সময় দেয়া তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। এজন্য জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা এক সাথে চলতে পারে না। যেহেতু জনসাধারণের দেখাশুনা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। তাই আমার পরিবার-পরিজনের খুব মামুলী ধরনের জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু ভাতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। বস্তুত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন চলতে পারার মতো ভাতা তাঁকে দেয়া হলো। কিন্তু ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি আত্মীয়স্বজনকে ডেকে এনে তার একটি নির্দিষ্ট জমি বিক্রি করে বাইতুলমাল থেকে গ্রহণ করা এ যাবতকালের সব ভাতা ফেরত দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওমর খলিফা হলে সে ভাতার অংক তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন ঃ

> "আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তুমি তোমার স্থলাভিষিক্তের উপর অনেক বড় বোঝা চাপিয়ে গেলে।"

এত উচ্চ চরিত্র এবং অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে ব্যক্তির নৈতিকতা, তাঁর কিসের ভয়। আর কার সাধ্য আছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তার মুখ খুলে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সঠিক রায়, সত্যবাদিতা, ঈমান ও ইখলাস, কুরবানী ও ইছারের নজীরহীন অনুভূতির জন্য শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয় গোটা আরব জাহানে তিনি ছিলেন মহাসম্মানিত ব্যক্তি। চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য যদিও তাঁর জীবনে সর্বাবস্থায়ই ছিলো কিন্তু খেলাফতের দায়িত্ব আসার পর এসব গুণ যেন বহুগুণে বেশী বিকশিত হতে লাগলো। এসব দেখে কেউই তাঁর নিখুঁত উদ্দেশ্য ও উন্নত ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। আর না তাঁর হুকুম পালনে কারো কাছ থেকে ইতস্তত ভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ

খালিদ বিন ওয়ালিদকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যে বাহিনীর কমাণ্ডের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন সেটা ছিলো শক্তিশালী বাহিনী। এ বাহিনীতে মুহাজির ও আনসারদের নির্বাচিত মানুষ ছিলেন। এদের নির্বাচন করেছিলেন স্বয়ং খালিদ। অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এসব মহামান্য লোকেরা ধর্মত্যাগের যুদ্ধে কি কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন। ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধে তারা কি ভূমিকা রেখেছেন তা কোনোদিন ভুলা যাবে না।

www.pathagar.com

এসব বাহিনীর সফলতার মূল রহস্য নিহিত ছিলো হযরত খালিদের দক্ষ সেনাপতিত্বের মধ্যে। খালিদের যুদ্ধের কলা-কৌশল ও পারদর্শিতা কারো অজানা নয়। সেকান্দরে আজম, চেঙ্গিস খান, জুলিয়াস সিজার, হানিবল, নেপোলিয়ান বোনা পার্টের ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক না কেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের ব্যক্তিত্বের সামনে এরা ছিলেন নগণ্য। তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা। সকল বিপদাপদকে উপেক্ষা করে শত্রু ব্যূহ ভেদ করে বাহিনীতে ঢুকে পড়া ছিলো তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান ও কৌশলে তাঁর দ্বিতীয় কেউ ছিলো না। শত্রুপক্ষের প্রতিটি চাল ও তাদের পরিকল্পনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো। বিরোধীদের যে কোনো গতিবিধি তাঁর থেকে গোপন রাখতে পারা যেতো না। প্রতিটি মুসলমান খালিদের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে খালিদকে রোমীয়দের হাজার হাজার সৈন্যের অবরোধ থেকে মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনাকে বাহাদুরীর সাথে বের করে নিয়ে আসার জন্য 'সাইফুল্লাহ' খিতাবে ভূষিত করেন। জীবনে কোনোদিন তিনি পরাজয় বরণ করেননি। বিজয়ের বর মাল্য গলায় পরতে পরতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও খালিদ সাইফুল্লাহ কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের পাশে পাশে থেকে তিনি মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছেন। আপাদমস্তক সৈনিক হবার কারণে তাঁর স্বভাব চরিত্রে শুষ্কতা, রুক্ষতা, ক্ষীপ্রতা ও সাহসিকতার মতো গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। শত্রু সৈন্য সামনে দেখতে পেলেই তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সর্বদাই আল্লাহর ফযল ও রহম তাঁর সাথে ছিলো। নতুবা তাঁর দ্রুততা ও ক্ষীপ্রতা তাঁকে কখনো বেশ বিপদগ্রস্তও করে তুলতে পারতো। শত্রু পক্ষের সংখ্যাধিক্য ও বিপুল অস্ত্রশস্ত্র কখনো তাঁকে ভীতবিহ্বল করে তুলেনি। 'হুদাইবিয়ার সন্ধির' পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ওমরাতুল কাযা' করার জন্য মক্কায় গমন করলে খালিদ মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে মক্কা ছেড়ে চলে যান। এরপর অতি বিস্ময়করভাবে আল্লাহ তাঁর হৃদয়ের উপর পড়ে থাকা অন্ধকারের পর্দা উঠিয়ে দিলে তাঁর হৃদয় ঈমানের আলোকে ঝলমল করে উঠে। ওমরা শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় গমন করার পর খালিদ মক্কায় ফিরে আসেন। একদিন তিনি কুরাইশদের এক সম্মেলনে প্রকাশ্যভাবে বললেন—"এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদুকরও নন, আর কবিও নন। তাঁর কালাম নিশ্চয়ই আল্লাহর কালাম। তার কথা মেনে চলা ছাড়া কুরাইশদের আর কোনো গতি নেই।"

খালিদের মুখে একথা শুনে কুরাইশদের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তারা ভাবতেও পারছিলো না যে, খালিদের ঝোঁকপ্রবণতা ইসলামের দিকে ফিরে গেছে। ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং খালিদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হলো। কিন্তু স্বভাবের উল্টো সেদিন তিনি কঠোরতা ও রুক্ষতার ভাব দেখালেন না। এ মজলিসে আবু

www.pathagar.com

সুফিয়ান উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনা শুনে তাঁকে ডেকে এনে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা কি সত্য।" উত্তর দিলেন খালিদ, হ্যাঁ। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর ঈমান এনেছি। একথা শুনে আবু সুফিয়ানের খুব রাগ হলো। সে বললো, "লাত ও উজ্জার কসম ! যদি তাই হয় তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগেই আমি ব্যাপারটা তোমার সাথে বুঝে নেই।" উত্তরে খালিদ বললেন, "ইসলাম সর্বাবস্থায় সত্য। কোনো মানুষ তাকে যত খারাপই জানুক।"

ইসলাম কবুল করার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় চলে এলেন। সমরবিদ হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে তিনি বেশ মর্যাদার অধিকারী হলেন। সারাটা জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে কাটাবার পরও তাঁরা তাঁকে মর্যাদার চোখে দেখতে লাগলেন। মুতার যুদ্ধের পর তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' খেতাব দিলে এ মর্যাদা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। পরবর্তী জীবনে তাঁকে প্রদত্ত এ খেতাবের পূর্ণ যোগ্যতা তিনি প্রমাণ করেছেন। ইরাক ও সিরিয়ার বিজয় তার মাধ্যমেই হয়েছে। তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর হাতেই পদানত হয়েছে। তাঁকে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই ধর্মত্যাগীদের মুকাবিলায় সবচেয়ে বড় বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়েছিলো।

ধর্মত্যাগীদের প্রতি শেষ আহ্বান

সেনাবাহিনী প্রেরণের পূর্বে শেষ সুযোগ হিসাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মত্যাগীদের পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ও সুখে শান্তিতে বসবাস করার আহবান জানালেন। আরবের বিভিন্ন এলাকায় তিনি বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠালেন। এ চিঠিগুলোতে তিনি হামদ ও সানার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'রিসালাত' এবং তার 'বশির' ও 'নাজির' হবার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, যে কাজের জন্য তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে তা পুরো হবার পর আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের কথা উল্লেখ করে তিনি চিঠিতে একথাও লিখেন ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ

"হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর অন্যান্য লোকরাও।"

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ ـ

"হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি তোমার আগে কাউকে চিরদিনের জীবন দান করিনি। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর অন্যান্যরা জীবিত থাকবে এটা কি সম্ভব ?"

www.pathagar.com

وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ـ وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ـ(ال عمران : ١٤٤)

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ! তাঁর আগেও রাসূল এসে অতিবাহিত হয়েছেন। যদি অন্যান্য রাসূলদের মতো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুমুখে পতিত হন অথবা তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়, তাহলে কি তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে ? আর যে পিছনে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। আর অচিরেই আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের কল্যাণকর প্রতিফল দান করবেন।"

ধর্মত্যাগীদের নামে চিঠি

ধর্মত্যাগীরা বলতো, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্য নবী হতেন, তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন না"—কুরআনের আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে তিনি তাদের এ ফেতনার যুক্তি খণ্ডাতে চেয়েছেন। এ আয়াত ছাড়াও তিনি লিখলেন ঃ

"আমি জানতে পারলাম, তোমাদের কেউ মুসলমান হবার এবং ইসলামের আহকামের উপর আমল করার পর মূর্খতা ও শয়তানের ধোঁকায় দীনে হক ছেড়ে দিয়েছো। তোমাদের কাছে আমি মুহাজির, আনসার ও তাবেয়ীনদের সৈন্য পাঠাচ্ছি। আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন তোমাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান না জানিয়ে যুদ্ধ শুরু না করে। যে ব্যক্তি এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামকে স্বীকার করে নিয়ে বিরোধিতা পরিহার করবে, নেক আমল করবে, তার জীবন রক্ষা পাবে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত অস্বীকার করবে, ফাসাদ রটাবে তার সাথে হবে যুদ্ধ। তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য সে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। এদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের নারী ও শিশুদেরকে গ্রেফতার করা হবে। কারোর কাছ থেকেই ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কবুল করা হবে না। এসব কথার উপর চিন্তা-ভাবনা করে যারা ঈমান আনবে—ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে যথারীতি ধর্মত্যাগের উপর কায়েম থাকবে। সে অবশ্যই আল্লাহকে অপারগ অক্ষম করতে পারবে না। আমি দূতকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি, সে যেনো সাধারণ সমাগমে আমার চিঠি পড়ে শুনিয়ে দেয়। ইসলাম গ্রহণ করার প্রতীক চিহ্ন হলো— আযান।"

এ কারণেই মুসলিম বাহিনী ধর্মত্যাগীদের বস্তির কাছে পৌঁছে আযান দিলে প্রতি উত্তরে বস্তির তরফ থেকেও আযানের আওয়াজ শুনা যেতো। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনী এদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো না। যদি আযানের শব্দ শুনা না যেতো তাহলে শেষ প্রমাণ হিসাবে আবার আযান দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিতো।

www.pathagar.com

হেদায়াতের প্রচেষ্টা

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু আরবের চতুর্দিকে, দূতদের মাধ্যমে এ চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। যারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগছিলো তাদেরকে সুযোগ দেয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। অনেকে এ কারণেই ধর্মত্যাগীদের সাথে যোগ দিয়েছে, তারা যদি ইসলামে কায়েম থাকে তাহলে তাদেরকে মুরতাদদের হাতে অনেক যুলুম নিপীড়ন ভোগ করতে হবে। এখন তারা তাদেরকে দু'টি শক্তির মধ্যে বিরাজমান দেখলেই পুনরায় হয় ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা অন্তত ধর্মত্যাগীদের মর্যাদার সহযোগিতা হতে বিরত থাকবে। এ কারণেই তাদের জীবন বেঁচে যাবে।

এ চিঠির মর্ম শুনে অনেক ধর্মত্যাগীদের হিম্মত টুটে গেলো। তারা মুসলমানদের মুকাবিলা করার খেয়াল ছেড়ে দিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ পলিসি মুসলমানদের জন্য অনেক ফায়দা বয়ে আনলো। এতে কোনো রকমের দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। মুরতাদদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের দিকে ঝুঁকানো, আর এতেও কাজ না হলে সন্ধির কোনো পথ বেছে নেয়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উদ্দেশ্য ছিলো না। চিঠির প্রতিটি ছত্র ও শব্দ অত্যন্ত মার্জিত রুচির পরিচায়ক ছিলো। আর যে ধমক চিঠিতে দেয়া হয়েছে তাও ফাঁকাবুলি ছিলো না। চিঠির আবেদনে কাজ না হলে ধমক অনুযায়ীই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু স্থির নিশ্চিত ছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখে দিয়েছেন—সেনাবাহিনীকে হুকুম দিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ তারা প্রথমতঃ ধর্মত্যাগীদের পুনরায় ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাবে। যদি তা কবুল করে তবে তাদের অতীত অপরাধ মার্জনা করা হবে। আর অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর এ যুদ্ধ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত চলবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের উপর অর্পিত 'হক' সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর ঐসব হক সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া হবে যা তার দায়িত্বে বর্তাবে। তারপর তার থেকে যা নেবার তা নেবে আর তাকে যা দেবার তা দেবে। তাকে মোটেই সময় দেয়া যাবে না। যে ব্যক্তি এ আহ্বান মানবে তার উপর কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। আর যে ব্যক্তি মুখে একথাটি স্বীকার করে মনের বিরোধিতা গোপন করে রাখবে তার হিসাব আল্লাহর কাছে হবে। আর যে ব্যক্তি এ আহ্বান অস্বীকার করবে, যেখানে পাবে তার সাথে লড়াই করবে। তাকে হত্যা করা হবে। ইসলাম ছাড়া আর কিছুই তার থেকে গ্রহণ করা যাবে না। হত্যা করার জন্য তরবারি ও আগুন—দু'টোই ব্যবহার করা যাবে।

সর্বোত্তম রাজনীতির নিদর্শন

এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যে নীতি অবলম্বন করেন তা উত্তম রাজনীতির নিদর্শন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন কোমল প্রাণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এ সময় এতো কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করলেন ? মূলত তিনি ছিলেন আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ জন্য এসব ব্যাপারে কোনো নরম নীতির প্রশ্নই তার মনে জাগেনি। একথা

www.pathagar.com

সত্য যে নরম দিলের মানুষ কঠোর হতে পারে না। কিন্তু তাদের আকীদা-বিশ্বাসে যখন আঘাত হানে তখন তাদের কঠোরতারও সীমা-পরিসীমা থাকে না। মানব প্রকৃতিতে একটা সীমা পর্যন্ত কঠোরতা ও কোমলতা উভয়ই বিদ্যমান থাকে। যখন কোনো ঘটনা এ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার প্রতিক্রিয়াও একেবারেই বিপরীত আকার ধারণ করে। কারো কারো স্বভাব-প্রকৃতিতে কঠোরতার রূপ প্রকাশ পায় বেশী। তাকে দেখেও মনে হয় না যে, এ ব্যক্তি কোমল হতে পারে। তারই বিপরীত কোনো ব্যক্তি এত কোমল হন যে, তাকে দেখে মনেও হয় না কঠোরতা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু এরপরও কখনো কখনো এমন নজীর পাওয়া যায়—যার মধ্যে কোনো সময়ই কঠোরতার আশা করা যায় না ; তিনিও চরম সীমায় কঠোর হয়ে যান। আর যার মধ্যে কোমলতার প্রত্যাশা ছিলো না, তিনি চরম কোমল প্রাণের পরিচয় দেন। এর কারণ একটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কঠোর, কোমল এ দু'টিরই সীমা নির্ধারিত। কোনো ঘটনার সময় এ সীমা পার হয়ে গেলেই তখন তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বেশ কঠোর আকার ধারণ করে।

উসামার সেনাবাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠাবার সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কঠোর মনোভাবের পরিচয় কি কেউ কখনো জানতো ? সকল বড় বড় ও মর্যাদাবান সাহাবা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনার বাইরে থাকার পরও মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার মতো কঠোরতা অবলম্বন করতে পারার ধারণাও কি কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সম্পর্কে করেছিলেন ? শুধু এসব নয়, পরবর্তী ঘটনাবলীও প্রমাণ দিচ্ছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বভাবের মধ্যে কোমলতা ও বিনয়ের স্রোত বয়ে যেতো, বিরোধীদের মুকাবিলায় তিনি আবার অসম্ভব ধরনের কঠোর হয়ে যেতেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এবং ঈমানের সাথে কোনো আপোষ করতে না পারার মনোভাবই ছিলো তাঁর কঠোরতা ও কোমলতার মূল মানদণ্ড। এ জন্যই যখন কেউ ঈমান আকীদার প্রশ্নে, বুঝে হোক আর না বুঝে, আপোষ মনোভাব দেখান, তিনি তা সহ্য করতে পারেন না। পূর্ণ দৃঢ়তা ও হিম্মতের সাথে দীনে বাধাদানকারীর মুকাবিলায় তিনি বেঁকে বসেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যে পর্যন্ত যাকাত অস্বীকারকারী ও ধর্মত্যাগীদেরকে সত্যের দিকে পুনরায় আনা না যাবে অথবা এদের মূলোৎপাটন করা না যাবে ততোদিন তিনি নিশ্চুপ বসে থাকবেন না। যদি এ ব্যাপারে একান্ত তাকে লড়তে হয় তাহলেও তিনি লড়ে যাবেন।

ধর্মত্যাগের যুদ্ধগুলোর গুরুত্ব

ধর্মত্যাগীদের সাথে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা ইসলামের সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধসমূহের মধ্যে পরিগণিত। এসব যুদ্ধে যদি মুসলমানরা বিজয় লাভ করতে না পারতেন, তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরবে আবার পুরাতন জাহেলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো যার মূলোৎপাটনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করেছেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর দীনই বিজয়ী রাখা আল্লাহর

www.pathagar.com

ইচ্ছা। তাই অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামের সকল শত্রুর সাথে মুকাবিলা করেন। তাদেরকে আবার ইসলামের ছায়াতলে আসতে বাধ্য করেন। গোটা ইসলামের ইতিহাসে এমন মযবুত ঈমান ও দৃঢ় সংকল্পের কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দুনিয়াকে দেখিয়েছেন।

---

www.pathagar.com

৭

তোলাইহা ও বাজাখার যুদ্ধ

আবাস, জুবিয়ান, বনু বকর এবং তাদের সাহায্যকারীরা, যারা মদীনা আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলো। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তারা তোলাইহা বিন খুয়াইলাদের সাথে একত্রিত হলো। এছাড়াও মদীনার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব কোণে বসবাসকারী গাতফান, সলিম ও বেদূঈন গোত্রসমূহ তোলাইহার মিত্রতে পরিণত হলো। এসব গোত্রগুলোও ওয়াইয়েনা বিন হাসানের সূরে বলছিলো, "মিত্র গোত্র আসদ ও গাতফানের নবী আমাদের কাছে কুরাইশদের নবী হতে বেশী প্রিয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তোলাইহা জীবিত।"

এরা জানতো, আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু অবশ্যই এদের উপর আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু এ জন্য তারা কোনো পরওয়া করেনি। যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুতি নিতে লাগলো। মদীনার হুকুমাতকে তারা কেন সমর্থন করবে, যাকাতের মতো জরিমানা কেন তারা পরিশোধ করতে যাবে ? নিজেদের স্বাধীনতা কেন তারা হারাবে ? এসব জিদের বশবর্তী হয়েই তারা তোলাইহার বাহিনীতে এসে যোগদান করলো।

প্রথমত তোলাইহা সামিরায় বাস করতো। ওখান থেকে সে বাজাখায় এলো। তার দৃষ্টিতে লড়াইয়ের জন্য তুলনামূলকভাবে বাজাখাই উত্তম জায়গা।

তোলাইহার নবুয়াতের দাবী

তোলাইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর নবুয়াতের দাবী করেনি। বরং আসওয়াদে উনসি ও মুসাইলামার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ জীবনেই সে এ দাবী করে বসেছিলো। তোলাইহা তার দু' সতীর্থের উল্টো আরববাসীকে পুনরায় মূর্তি পূজার দিকে আহ্বান জানায়নি। কারণ, মূর্তি পূজাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে চিরতরে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রথা চালু করার আর কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিলো না। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত আরবের সকল প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। আর মানুষের মনেও তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো। এ প্রথা হতে বেঁচে থাকতে হবে। নবুয়াতের দাবীদাররা একথা প্রচার করতে শুরু করেছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেভাবে অহী নাযিল হয়, সেভাবে তাদের উপরও অহী নাযিল হয়। তাদের কাছেও আসমান থেকে ফেরেশতা আসে যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেও আসে। কুরআনের আয়াতের মতো কিছু আয়াতও তাদের কেউ কেউ বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কিন্তু টুটা-ফাটা যা কিছু তারা বানাতে সমর্থ হয়েছে তা-ই তারা আসমান থেকে অহী হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছে বলে

www.pathagar.com

ঘোষণা করতো। তাদের তথাকথিত অহীর ভাষার প্রতি হালকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এদের গোমর ফাঁক হয়ে যায়। স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে, এ নবুয়াতের দাবীদাররা কিভাবে এসব ভিত্তিহীন খোঁড়া কথাগুলোকে আসমান হতে নাযিল হওয়া অহী নাম দিয়ে মানুষের সামনে পেশ করেছে। আর মানুষদেরও কি ধরনের রুচিবোধ তারা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বেহুদা কথাবার্তাকে আল্লাহর অহী মনে করে বিশ্বাস করেছে। নমুনা হিসাবে নীচে তাদের এ অহীর একটি অংশ পেশ করা হচ্ছে, যা তোলাইহার উপর অহী হিসাবে নাযিল হতো বলে সে দাবী করতো ঃ

وَالْحَمَامُ وَالْيَمَامُ وَالصُّرْدُ الصَّوَّامُ قَدْ صَمِنَ قَبْلَكُمْ بِأَعْوَامٍ لِيَبْلُغَنَّ مَلِكُنَا الْعِرَاقَ وَالشَّامَ -

ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাহেলিয়াতের যুগে যাদুকররা ছন্দায়ীত ও, লালিত্যময় ভাষা বানিয়ে বানিয়ে মানুষের কাছে পেশ করে তাদের চিত্ত জয় করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতো। এসব কথা বলে বলে কুরাইশরাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করতো। তারা বলতো এ ব্যক্তি যাদুকর। সুন্দর সুন্দর ছন্দময়, লালিত্যময়, যাদুকরী ভাষা ব্যবহার করে প্রভাব ছড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এ সত্য আরববাসীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানানো কোনো কথা নয় বরং তার মোজেযা। জ্বিন ও মানুষ কারো পক্ষেও এ কুরআনের নজীর পেশ করা সম্ভব নয়। তোলাইহা, আসওয়াদে উনসিরা ছিলো যাদুকর। অন্যান্য যাদুকরের মতো তারা কিছু ছন্দময় ভাষা বানিয়ে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে দাবী করেছে। অথচ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও এসব কথা শুনতে পারতো না। কোনো সচেতন ব্যক্তি এ ভাষাকে সহ্য করতে রাজী ছিলো না। বিস্ময়ের ব্যাপার, এসব হাসি ও বেহুদা কথাবার্তা শুনার মানুষ কিভাবে এ মিথ্যা নবীদের ফাঁদে আটক হয় আর এগুলোকে কালামে এলাহী বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

তোলাইহার পেশকৃত তালীমের অধিকাংশই আমাদের অজানা। ইতিহাস থেকে জানা যায় সে তার শিষ্যদেরকে নামাযে রুকূ-সিজদা করতে নিষেধ করতো। সে বলতো, তোমাদের মুখমণ্ডল মাটির সাথে ঘেঁষাঘেষি করা অথবা তোমাদের পিঠ দিয়ে কামান বানানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, সে এসব পদ্ধতি ঈসায়ী ধর্মমত থেকে গ্রহণ করেছে। তোলাইহা মুসাইলামাসহ অন্যান্য ভণ্ড নবীদের পেশকৃত শিক্ষা তৎকালে সংরক্ষিত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি বলেই তার অধিকাংশই আজ অজানা। তারপরও যা কিছু পাওয়া যায় তার থেকে দীনে ইসলামের যথার্থতার প্রমাণই পাওয়া যায় বেশী।

প্রত্যেকেই জানে প্রথম যুগে কুরআনে কারীম ছাড়া—যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে একত্র করা হয়েছিলো—আর কোনো কিছুই সংকলিত করে রাখা হয়নি। হিজরী প্রথম শতাব্দীর পরে হাদীস সংকলন কার্যকর

www.pathagar.com

হয়েছে। এ বাস্তবতার নিরিখে আশ্চর্যের কিছু নয়, তোলাইহা ও অন্যান্য ভণ্ড নবীদের যেসব বর্ণনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তা হাত পা হীন খোঁড়াই হবে—বিশেষ করে যেসব বর্ণনা ঐ কালের আরবী ধরন-পদ্ধতি তামাদ্দুন-তাহজিবের বিপরীত এবং সে সময়ের ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির সাথে মোটেও মিল নেই।

মিথ্যা নবীদের দমন ও জাররারের অভিযান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই তোলাইহা বনী আসাদ গোত্রে, আসওয়াদে উনসি ইয়ামেনে নবুয়াতের দাবী উত্থাপন করে বসলো। তাই তিনি জাররার বিন আজওয়ারকে বনী আসাদ গোত্রের মুসলমান শাসকের কাছে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, মিথ্যা নবীদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। এ নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা 'ওয়ারদাত' নামক স্থানে ও তোলাইহা তার সাথীদেরকে নিয়ে 'সামিরায়' অবস্থান নিলো।

যুদ্ধের বিভিন্ন ময়দানে নিজেদের বিজয়ের খবর শুনে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বাড়তে ও ভণ্ড নবীর ভক্তদের সংখ্যা কমতে লাগলো। অবশেষে জাররার তোলাইহার সাথে লড়াই করার জন্য সামিরার দিকে অভিযান চালালেন। তোলাইহাকে হত্যা করে একক সুনাম অর্জন করার জন্য একজন মুসলিম সৈনিক আগে থেকে বের হয়ে গিয়ে তোলাইহার ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সে তোলাইহাকে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলেন। কিন্তু তরবারী হাত থেকে ছুটে যাবার কারণে তোলাইহা জীবনে বেঁচে গেলো। এ অবস্থা দেখে তোলাইহার তোষামোদকারীরা বলতে শুরু করলো—তাদের নবীর উপর অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত কার্যকর হয় না।

তোলাইহার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে—এ সময় মদীনা হতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলো। এতে মুসলমানদের মধ্যে কিছু হতাশা দেখা দিলো। তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগলো। কিছু কিছু লোক মুসলিম বাহিনী হতে বের হয়ে তোলাইহার বাহিনীতে যোগ দিলো।

উআইনাহ ও তোলাইহার ঐক্য

আবাস ও জুবিয়ান ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের লোকজন তোলাইহার সাথে এসে মিলে গেলে তার শক্তি বৃদ্ধি পেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই 'বনু আসাদ', 'গাতফান' ও 'তায়ী' পরস্পর পরস্পরের মিত্র ছিলো। কিন্তু পরে কিছু রেষারেষীর জিদ ধরে আসাদ ও গাতফান, তায়ী গোত্রের বিরুদ্ধে চলে গেলো। তারা 'তায়ী' গোত্রের লোকজনকে তাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলো। ফলে আসাদ ও গাতফানের মধ্যেও সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহর মত্যুর পর ওআইনিয়া বিন হাসান ফাজাজী গাতফান গোত্রের লোকজনদেরকে একত্র করে বললো, "যখন থেকে আমাদের ও বনী আসাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো, আমরা বরাবরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছি। এখন আমাদের পুরোনো বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবনের ও তোলাইহার আনুগত্যের শপথ করছি। আল্লাহর

১০—

www.pathagar.com

শপথ নিজেদের মিত্র গোত্রের নবীর অনুসারী হওয়া কুরাইশদের নবীর অনুসারী হতে অতি উত্তম। এরপর আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে। আর তোলাইহা জীবিত।

ওয়াইনাহর জাতি তার বক্তব্যকে সমর্থন জানালো। তারা তোলাইহার আনুগত্য করার কথা ঘোষণা করলো। এভাবে ধর্মত্যাগীদের শান-শওকাত বেড়ে গেলো। সেসব গোত্রে যারা মুসলমান ছিলেন তারা পালিয়ে এলেন মদীনায়।

ধর্মত্যাগীদের প্রতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুঁশিয়ারী

উপরে উল্লেখিত গোত্রগুলো বাজাখায় একত্রিত হয়ে ধর্মত্যাগের কথা ঘোষণা করলো। মদীনার হুকুমাতকে অস্বীকার করলো। অন্যান্য গোত্রের ন্যায় এদের সাথেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লড়াইয়ের ঘোষণা দিলেন। তাদেরকে একটি চিঠির মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দিলেন। তারা যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে লড়াই করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তোলাইহার পরে নুওয়াইরার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ আসলো খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতি। তিনি বস্তুত সে বস্তিগুলোর দিকে রওনা হলেন। এরই মধ্যে 'তায়ী' গোত্রের সর্দার আদি বিন হাতেম তায়ী যাকাতের মাল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, নিজের গোত্রের কাছে গিয়ে মুরতাদদেরকে ভয় দেখাও। তারা যদি ধর্মত্যাগে অটল থাকে, তাহলে তাদের পরিণাম হবে খুবই খারাপ। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ তাৎক্ষণিকভাবে বাজাখা অভিযানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে 'উজা'র দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মানুষ ভাবলো তারা খায়বারের দিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে আরো অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে বাজাখার দিকে অভিযান চালাবে।

আদির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হেদায়াত মুতাবেক নিজের গোত্রের কাছে পৌঁছে আদি তাদেরকে অনেক বুঝালেন। তাদের পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা আদির কথা শুনলো না। তারা বললো ঃ

আমরা কখনো আবুল ফাসিলের[১] আনুগত্য স্বীকার করবো না।

একথা শুনে আদি বললো ঃ

"তোমাদের দিকে এমন এক বাহিনী অভিযান চালিয়ে আসছে। যারা তোমাদের উপর কোনো করুণা করবে না। হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপক হবে। কারো জন্য কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। আমি তোমাদেরকে আমার সাধ্যমত বুঝালাম। এখন তোমরা বুঝ তোমাদের করণীয়।"

---

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীরা ঠাট্টা করে তাঁকে আবুল ফাসিল নাম দিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আদি বিস্তারিতভাবে মুসলমানদের শক্তি সাহস ও বাহাদুরীর কথা তাদেরকে জানালেন। আরো বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সকল বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তাই হঠকারিতা হতে বিরত থাক। ইসলাম কবুল করো। নতুবা তোমাদের পরিণাম খুবই করুণ হবে।

আদির কথায় কোনো সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ ছিলো না। কারণ, তিনি ঘটনা নিজ চোখে দেখে এসেছেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা হতে শত শত মাইল দূরে রোম সীমান্তে সেনাবাহিনী পাঠিয়েও আবাস ও জুবিয়ান এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলোকে পরাজিত করে দিয়েছেন। তিনি আরো জানতেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ শৌর্যবির্যে ও বাহাদুরীতে কিংবদন্তীর নায়ক। আর এরা কোনোদিন তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না।

বনু তায়ীর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ

আদির কাছে এসব কথা শুনে বনু তায়ী পরস্পর পরামর্শ করলো। তারপর আদির উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসস্থাপন করে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতে তার নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই। বরং জাতীয় স্বার্থই তার কাছে বড়—একথা তারা বুঝতে পেরে আদিকে বললো ঃ

> "আমরা আপনার পরামর্শ গ্রহণ করেছি। আপনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে আমাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত রাখুন। এ সুযোগে আমাদের ঐ ভাইদেরকে ফিরিয়ে আনি যারা ইতিপূর্বে বাজাখায় তোলাইহার বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছে। কারণ, আমরা যদি খোলাখুলি তোলাইহার বিরোধিতা করি তাহলে আশংকা আছে সে আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করে ফেলবে।"

নিজ জাতির এসব কথা শুনে আদি খুশী হলেন। তাড়াতাড়ি তিনি 'সাখে' পৌছে খালিদ বিন ওয়ালিদকে বললেন ঃ

> "তিনদিন পর্যন্ত এখানে আপনি যাত্রা বিরতি করুন। এ সময়ে আপনার কাছে পাঁচশত জানবাজ বাহাদুর এসে জমা হবে। শত্রুর মুকাবিলায় তারা আপনার জন্য খুবই উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে। তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে তাদের জ্বলে যাবার দৃশ্য দেখার চেয়ে এখানে তিন দিন অপেক্ষা করা আমাদের জন্য অনেক উত্তম।"

কোনো কথাই খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে গোপন ছিলো না। যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, যদি 'তায়ীর' জোয়ানরা তোলাইহার পক্ষ ত্যাগ করে, তাহলে তার বেশ শক্তি হ্রাস পাবে। মুসলমানদের জন্য তা হবে খুবই উত্তম। সুতরাং বনু তায়ীর দিকে অভিযান শুরু করা হতে তিনি তিন দিন বিরত রইলেন। আদি আবার তাঁর গোত্রের কাছে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে জানলেন, তার গোত্রের লোকেরা তোলাইহার বাহিনীতে তাদের নিজ লোকদের কাছে

www.pathagar.com

পয়গাম পাঠিয়ে দিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে ওখান থেকে ফিরে আসার জন্য। কেননা মুসলিম বাহিনী তোলাইহার উপর আক্রমণ করার আগে তার গোত্রের উপর আক্রমণ রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই তারা যেনো ফিরে আসে ও তার হামলাকে প্রতিরোধ করে।

এ খবর পাবার পর তোলাইহার মনে কোনো সন্দেহ হলো না। তাই বনী তায়ীর লোকদেরকে আনন্দচিত্তে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে অনুমতি দিয়ে দিলো। নিজ গোত্রে পৌঁছে গোত্রের লোকদের সাথে তাদের দীর্ঘ আলাপ হলো। আদির কথায় তারা একমত হলো। সুতরাং তারা পুনরায় ইসলাম কবুল করে আদির নেতৃত্বে খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

খালিদ এবার 'উনসর' অভিযানের ইচ্ছা করলো। সেখানে 'জাদিলা' গোত্রের সাথে তাঁর লড়াই করার ইচ্ছা ছিলো। আদি এখানেও হস্তক্ষেপ করে বললেন ঃ

> "তায়ী গোত্র একটি পাখীর মতো। আর জাদিলা হলো এর পালক মাত্র। আপনি আমাকে কিছুদিনের সময় দিন। সম্ভবত আল্লাহ যেভাবে গাওসকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে জাদিলাকেও বাঁচিয়ে দেবেন।"

খুশী হয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আদির প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। তাকে জাদিলার দিকে যাবার অনুমতি দিলেন। ওখানে তিনি জাদিলার লোকজনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার ইসলাম গ্রহণে রাজী করালেন। এরপর জাদিলার এক হাজার আরোহী সৈনিক নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌঁছলেন। ঐতিহাসিকরা আদির এ প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তায়ী' গোত্র আদির চেয়ে উত্তম নেতা, বুদ্ধিমান মানুষ ও বরকতপূর্ণ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত জন্ম দেয়নি। এ গোত্রের তিনিই হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি।

মুকাবিলার জন্য তোলাইহার উপর চাপ

'তায়' ও 'জাদিলা' গোত্রের পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ বাজাখায় তোলাইহার কানে পৌঁছলো। এ খবর শুনে সে ভীত হলো। তার সব আশার গুড়েবালি। কিন্তু এরপরও সে হিম্মত করে মুসলমানদের মুকাবিলা করার ঘোষণা করলো। সম্ভবত তোলাইহা এ অবস্থায় তার সংকল্প হতে বিরত থাকতো। কিন্তু উআইনা বিন হাসান তাকে এ কাজ করতে দেয়নি। তার প্রায় সাত শত ফাজারা সৈনিক তোলাইহার বাহিনীতে মওজুদ ছিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে উআইনার ভীষণ শত্রুতা ছিলো। মদীনার হুকুমাতের উপর কার্যকরীভাবে আক্রমণ চালানো ছিলো তার ইচ্ছা।

উআইনা হলো ঐ ব্যক্তি, যে আহযাবের যুদ্ধে বনী ফাজারার সরদার ছিলো। এ যুদ্ধের সময় বনী কুরাইজার সাথে যোগসাজশে কাফেরদের তিন বাহিনী মিলে যখন মদীনার উপর তীব্র আক্রমণ চালাবার ইচ্ছা করলো, তখন এক বাহিনীর সেনাপতি

www.pathagar.com

ছিলো এ উআইনা। আহযাব যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পরও উআইনা মদীনা আক্রমণ করায় সংকল্পবদ্ধ ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহর থেকে বের হয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে এ আক্রমণ রোধ করলেন। তারাও পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য হয়। এটাকে 'জিকারদ' এর যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যদিও পরে অবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় ; কিন্তু তার হৃদয় ও মন সবসময়ই ইসলামের বিরোধিতা, হিংসা ও বিদ্বেষে ভরপুর ছিলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হুকুমাতকে মানবে না বলে ঘোষণা করে বসলো।

এ অবস্থায় জাদিলার একটি বিরাট বাহিনী বের হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোলাইহা নবুয়াতের দাবী হতে ফিরে থাকতে পারেনি। সে জানতো, যদি সে এ দাবী প্রত্যাহার করে তাহলে উআইনা তার শত্রুতে পরিণত হবে। তার চারিপাশের গোত্রসমূহ তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। তখন তার জীবন হয়ে উঠবে বিপন্ন। তাই মুসলমানদের মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করাই সে সমীচীন বলে মনে করলো। দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হতে যায়।

তোলাইহার বিরুদ্ধে অভিযান

'তায়ী' গোত্রের দু'টি শাখাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেবার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তোলাইহার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিলেন। উকাশা বিন মাহসিন ও সাবিত বিন আকরাম আনসারীকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আগে আগে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এ দু' ব্যক্তি আরবের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের শৌর্যবীর্য ছিলো প্রবাদ বাক্যের মতো। পথে তাদের সাথে তোলাইহার ভাই 'হেবালের'[১] সাথে দেখা হলো। তারা হেবালকে হত্যা করে ফেললো। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে তোলাইহা তার অপর ভাই সালমাকে সাথে করে তাদের খোঁজে বের হয়ে গেলো। অবশেষে তারা দু'জন তাদেরকে ধরে ফেললো। সালমা সাবেতকে মুকাবিলা করার জন্য সুযোগ না দিয়েই শহীদ করে ফেললো। আর উকাশা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তোলাইহার মুকাবিলা করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। উপায়ান্তর না পেয়ে তোলাইহা তার ভাই সালমার সাহায্য চাইলো। দু' ভাই একত্রে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত উকাশাকেও শহীদ করে ক্যাম্পে চলে গেলো।

মুসলমানদের উদ্বিগ্নতা

খালিদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। পথে লোকেরা তাদের দু'জনের লাশ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখলো। এ দেখে বাহিনীর মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিলো। এ অবস্থা দেখে সৈনিকদের উদ্বিগ্নতা দূর হওয়া পর্যন্ত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শত্রুর দিকে আদৌ অগ্রসর হওয়া ঠিক মনে করলেন না। তিনি

---

১. এটা হলো কামিল বিন কাসিরের বর্ণনা। কিন্তু তিরবী ও কামূসে উল্লেখ আছে যে, হিবাল ছিলো সালমাহ বিন খোয়াইলাদের পুত্র। অর্থাৎ তোলাইহার ভাই নয় ভাতিজা।

www.pathagar.com

বাহিনী থামিয়ে দিলেন। শত্রুর মুকাবিলায় ভালো ফল পাবার জন্য খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহিনীকে আরো বেশী সুসংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। বস্তুত তিনি তার বাহিনী সহকারে 'তায়' আসলেন। আদির সহযোগিতায় বাহিনীতে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। মুসলমান সৈনিকরা যখন দেখলো তাদের সংখ্যা ও শক্তি বেড়ে চলছে, আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। অবশেষে খালেদ এদেরকে নিয়েই বাজাখা পৌছলেন।

বনু তায়ীর দুঃখ প্রকাশ

তোলাইহার সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কয়েস ও বনু আসাদ তৈরি হয়েছিলো। বনী তায়ীর কিছু লোক খালিদের কাছে আবেদন জানালো, তাদেরকে বনু আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে। কেননা তারা তাদের মিত্র গোত্র। অবশ্য তারা কয়েসের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দান করে। খালেদ বললেন ঃ

> "শান-শওকত, শক্তি ও ক্ষমতার দিক দিয়ে কয়েস গোত্রও বনু আসাদ গোত্র থেকে কম নয়। কিন্তু যে কোনো গোত্রের সাথে তোমরা লড়াই করো বা না করো, এটা তোমাদের খুশী।"

কিন্তু আদি অত্যন্ত ঈমানদারীর আবেগ প্রকাশ করে বললেন ঃ

> "আল্লাহর কসম ! মিত্র গোত্র হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বনু আসাদ গোত্রের মুকাবিলা করা হতে কেউ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যখন ইসলামের শত্রুদের সাথে চলে গেলো তখন তারা মিত্র নয়। আমার গোত্রও যদি ইসলামের বিরোধিতা করে তার সাথে আমি লড়বো।"

একথা শুনে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

> "এক পক্ষের সাথে লড়াই করাও জিহাদই। তুমি তোমার গোত্রের রায়ের বিরোধিতা করো না। বরং তারা যেভাবে খুশী থাকে তুমি সেভাবে কাজ করো। এবং সে গোত্রের সাথেই তোমরা লড়াই করো যাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমার গোত্র পসন্দ করে।"

সুতরাং 'তায়ী' গোত্র কয়েস গোত্রের সাথে আর বাকী মুসলমানরা বনু আসাদ গোত্রের সাথে লড়াই করেছে।

তোলাইহার যুদ্ধ ও তার পলায়ন

তোলাইহার সৈন্যবাহিনীর কামান পরিচালনা করছিলো স্বয়ং উআইনা বিন হাসান। আর লোকদেরকে প্রতারণা ও ধোঁকা দেয়ার জন্য ক্যাম্পে কম্বল মুড়ে অহী প্রাপ্তির ভানে বসে অপেক্ষা করছিলো তোলাইহা। যখন যুদ্ধ তুঙ্গে উঠলো আর উআইনাও খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসলমানদের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে অবগত হলো, তোলাইহার কাছে এসে উআইনা জিজ্ঞেস করলো ঃ

www.pathagar.com

"জিবরাঈল কি আপনার কাছে কোনো অহী নিয়ে এসেছে কিনা ?"

তোলাইহা উত্তর দিলো ঃ "এখনো আসেনি।"

"উআইনা এবার ঝাঝালো স্বরে বললো, "আর কখন আসবে ?"

তোলাইহা বললো ঃ "আমার আবেদন তো মালায়ে আ'লা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এখন দেখো কি জবাব আসে।"

এরপর সে আবার যুদ্ধের ময়দানে আসলো। যুদ্ধ শুরু করলো। সে যখন দেখলো খালিদের বাহিনী তাদের বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলেছে এবং যে কোনো মুহূর্তে পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে নিতে হবে। তখন পেরেশান হয়ে সে আবার তোলাইহার কাছে দৌড়িয়ে গেলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ

"এখনো কোনো অহী নাযিল হয়নি ?"

তোলাইহা জবাব দিলো ঃ "হ্যাঁ, হয়েছে।"

সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "কি হয়েছে ?"

তোলাইহা জবাব দিলো ঃ নাযিল হয়েছে ঃ

ان لك رحًا كرحاه وحديثا لاتنساه

"তোমার কাছে ঐ চাক্কি আছে, যা মুসলমানদের কাছে আছে। আর তোমার স্মরণও এমন যা তুমি কোনোদিন ভুলতে[১] পারবে না।"

একথা শুনে উআইনা নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো ঃ

قد علم الله ان سيكون حديثا لاتنساه

"শীঘ্রই এমন ঘটনা সংঘটিত হতে যাচ্ছে, যা তুমি কোনোদিন ভুলতে পারবে না।"

এরপর উআইনা তার জাতির কাছে এলো এবং চীৎকার করে বললো ঃ

"হে বনু ফাজার ! তোলাইহা হলো মিথ্যুক। তাকে ত্যাগ করো। পালিয়ে গিয়ে আপন আপন জীবন বাঁচাও।"

একথা শুনার সাথে সাথে বনু ফাজারাহ পালাতে শুরু করলো। অবশিষ্ট্য সৈন্য তোলাইহার চারিদিকে জমা হলো। তারা জিজ্ঞেস করলো এখন আপনি আমাদের কি হুকুম দিচ্ছেন। তোলাইহা আগে থেকেই নিজের জন্য একটি ঘোড়া, নিজের স্ত্রী নাওয়ারের জন্য একটি উটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। মানুষের এ উদ্বিগ্নতা দেখে সে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেলো। স্ত্রীকে উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে একথা বলতে বলতে পালাতে লাগলো ঃ

১. আরববাসীরা যুদ্ধকে চাক্কি হিসাবে বলে থাকে। তোলাইহার উদ্দেশ্য ছিলো তোমাদের জন্য যেমন কঠিন যুদ্ধ চলছে তাদের জন্যও তেমন কঠিনই। যেমন মুসলমানরা তোমরাও এ যুদ্ধের ঘটনা ভুলতে পারবে না।

www.pathagar.com

"যে আমার মতো পরিবার-পরিজন নিয়ে পালাতে পারবে, সে যেন পালিয়ে যায়।"

পুনরায় তোলাইহার ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে শক্তি তোলাইহা সঞ্চয় করেছিলো তা ধূলিস্মাত হয়ে গেলো। তার নবুয়াত প্রাপ্তির দাবীও নিঃশেষ হয়ে গেলো। পালিয়ে সে সিরিয়ায় চলে গেলো। ওখানে বনু কালব গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ওখানে গিয়ে জানলো, যেসব বিদ্রোহী গোত্র এর আগে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলো তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। তাই সে নিজেও আবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। কিছুদিন পর ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলো। মদীনার কাছ দিয়ে যাবার সময় কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ খবর জানালে তিনি বললেন ঃ

"এখন আমার আর কিছু করার নেই। তার সাথে কোনো গোলযোগ বাঁধিয়ে দিও না। আল্লাহ তাকে হেদায়াত করে দিয়েছেন।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবার পর তোলাইহা বাইয়াত গ্রহণের জন্য এলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তুমি উকাশা এবং সাবিতের হত্যাকারী ? আমার মন তোমার উপর প্রসন্ন হতে পারবে না।"

সে জবাব দিলো ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! এ দু'জন সম্পর্কে আপনার কি চিন্তা থাকতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে আমার হাতে মর্যাদার উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছেন (শাহাদাত দিয়েছেন)। কিন্তু আমাকেও তাদের হাতে অপমান অপদস্থ করেননি।"

একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত নিলেন এবং তাকে বললেনঃ

"হে দাগাবাজ ! তোমার যাদুকরীর কি হলো ?"

সে জবাব দিলো ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! তা শেষ হয়ে গেছে। তবে হাঁ কখনো কখনো দু' একটি ফুঁ মেরে নেই।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বিদায় নিয়ে সে নিজের জাতির কাছে ফিরে এলো। ওখানেই বসবাস শুরু করলো। ইরাকের যুদ্ধসমূহে সে ইরানের মুকাবিলায় বেশ কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছিলো।

উআইনা বিন হাসান যুদ্ধের ময়দান হতে পালাবার পর নিজের গোত্র বনু ফাজারায় পৌঁছে গেলো। সে ঘোষণা করে দিলো। তোলাইহা মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ। নিজের বাহিনীকে মুসলমানদের করুণার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

অন্যান্য ধর্মত্যাগীদের দমন

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাজাখার উৎসমুখে পূর্ণ এক মাস অবস্থান করলেন। এ সময়ে তিনি মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য অন্যান্য ধর্মত্যাগীসহ উম্মে দামালের দলে ভিড়ে যাওয়া বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন। যেসব ধর্মত্যাগীদের হাত নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে—খুঁজে খুঁজে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে হত্যা করেন। আর তাদের অনেক নেতা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তাদের মধ্যে কুবরা বিন হিরা, কুজরাতুস সালমা, আবু শাজরাহ বিন আবদুল ওজ্জা প্রভৃতি শামিল ছিলো। তাদের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারা আটক ছিলো।

অবশিষ্ট ধর্মত্যাগী গোত্র

উম্মে জামাল ও তোলাইহার পালিয়ে যাওয়া সৈনিকদের অবস্থা বর্ণনা করার আগে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজনবোধ করছি যে, বনি আসাদের গোত্রের মতো তোলাইহার গোত্রের যারা পুনরায় ইসলাম কবুল করেনি তাদের পরিণতি কি হলো? তোলাইহা 'মিথ্যাবাদী' প্রমাণিত হবার পর তাদের বিবেক কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার জন্য সাড়া যোগায়নি? ব্যাপার হলো, যদিও সে সময় গোটা আরবকে রাসূলের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু এরা অনাবিল মনে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এদের অনেকের কাছে মূর্তিপূজা একটা অনভিপ্রেত কাজ মনে হওয়ায় তা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করা শুরু করলো। কিন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দ্বিতীয় যে ফরয কাজ আরোপ করলেন, তা তাদের কাছে কষ্টকর হয়ে পড়লো। তাদের স্বাধীন মেজায এ ফরয কাজ গ্রহণ করতে রাজী ছিলো না। তাই তারা এর থেকেই মুক্তিলাভ করতে চাইলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকাল আসার পর এসব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। কারণ, ধন-সম্পদের আকর্ষণ তাদের মনে সকল জিনিসের চেয়ে বেশী ছিলো। এভাবে নামাযসহ তারা অন্যান্য ফারায়েয থেকেও অব্যাহতি লাভ করতে চাইলো।

ইসলামের আরোপিত ফরয কাজগুলোর শৃংখল হতে মুক্তি পাবার মানসেই তারা তোলাইহা ও মুসাইলামার নবুয়াতের দাবীর সমর্থন যুগিয়েছে। সুতরাং তোলাইহার পালিয়ে যাওয়া এবং পরে আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরও তারা ইসলামী হুকুমাতের আনুগত্য করতে পারেনি। অন্যত্র গিয়ে তারা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি চালাতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিলো সংগ্রামে অবশেষে তারাই বিজয়ী হবে। ইসলামের অনুশাসনে এত কড়াকড়ি আরোপকে শিথিল করতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাজী করাতে পারবে।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার আরো একটি কারণও বিদ্যমান ছিলো। তা ছিলো বেদুঈনদের আত্মস্বার্থের সাথে জড়িত। বেদুঈন গোত্র ও মুহাজির-আনসারদের

www.pathagar.com

পুরানো ঝগড়া-বিবাদ তখনো চলে আসছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয় লাভের পর তারা তার কাছে মাথা অবনত করে দেয়। সব হুকুম মানতে প্রকাশ্যে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু এসব তারা করেছে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে। কারণ তারা আজ বিজিত। যখন তারা কিছু সুযোগ ও স্বাধীনতা পেলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। চিন্তা-ভাবনায় এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করলো না। খন্দকের যুদ্ধের কথা তাদের মনে আছে। যদি একটি ঝড়ো হাওয়া এসে কাফেরদের সকল পরিকল্পনা বানচাল করে না দিতো। তাহলে মদীনা নিজের ফটক কাফেরদের জন্য খুলে দেবার উপক্রম ছিলো।

বাহ্যত এরা ইসলাম গ্রহণ করে চুপ করে দেখছিলো, কি ঘটতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। আর কি ? তারা ধর্ম ত্যাগ করলো। গোটা দেশে ঝগড়া-বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের দমনের উদ্দেশ্যে ইসলামী বাহিনী পৌঁছার আগে মধ্যবর্তী সময়ের সুযোগে তারা নিজেদেরকে সংগঠিত ও মযবুত করে নিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো ভাগ্য তাদের পক্ষে থাকবে। আবার তারা রাসূলের সময় হারিয়ে ফেলা স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ফিরে যেতে পারবে। যদি প্রতিটি গোত্র তাদের স্ব স্ব অবস্থানে দৃঢ় ও মযবুত থাকতো, তাহলে অবশ্যই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। আর এত সহজে ধর্মত্যাগীদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেন না। কিন্তু আদি বিন হাতিমের প্রচেষ্টার ফলে 'তায়ী' গোত্রের দু'টি শাখাই তোলাইহা হতে পৃথক হয়ে মুসলমানদের সাথে একত্র হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে তোলাইহার পায়ের নীচের মাটি সরে গেলো। এ ভীতি বিহ্বলতা, এ দুশ্চিন্তা তার পরাজয় বরণ করা ও পালিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তোলাইহার পালাবার পর উআইনাও তার গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নিলো। এ সময় তোলাইহার পক্ষীয় বনু আমের বাজাখার একটু দূরে অবস্থান করে কোন্ পক্ষের ভাগ্যে বিজয় আসে, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। বনু আসাদ ও কয়েসকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পরাজিত করে দিলেন, তখন বনু আমের গোত্র পরস্পর পরামর্শ করে বসে সিদ্ধান্ত নিলো, এখন মুসলমান হয়ে যাওয়াই তাদের জন্য উত্তম। সুতরাং তারাও আসাদ, গাতফান এবং তায়ী গোত্রের মত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ইসলামে প্রবেশ করলো।

হত্যাকারীদের উপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কঠোরতা

গাতফান, হাওয়াজেন, সলিম এবং তায়ীর লোকদেরকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ শর্তে জীবন ভিক্ষা দিলেন যে, তারা ঐ লোকদেরকে ধরিয়ে দেবে, যারা গরীব মুসলমানদেরকে ধর্মত্যাগের ফেতনার সময় জঙ্গলে আটকিয়ে রাখার পর হত্যা করেছে। সুতরাং তাদেরকে যখন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি এর থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য নেতাদের ছাড়া বাকী সব

www.pathagar.com

লোকদেরকে হত্যা করে ফেললেন। তাদের লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন এবং তিনি কোররা বিন বোহায়রা, উআইনা বিন হাসানসহ অন্যান্য সরদারকে বেড়ি পরিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠালেন ঃ

"বনু আমের ধর্মত্যাগ করার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু আমি ওদের জীবন ভিক্ষা ততক্ষণ পর্যন্ত করিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ওদেরকে আমার কাছে সমর্পণ না করেছে, যারা গরীব মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলো। আমি এমন সব লোকদেরকে হত্যা করে দিয়েছি। এ চিঠির সাথে কোররা বিন হোবায়রা এবং তার সাথীদেরও পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তুষ্টি

মুসলমানদের হত্যার অপরাধে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে মোটেই কোনো করুণার সৃষ্টি হয়নি। তিনি ইসলামের শত্রু, রাসূলের শত্রুদেরকে এ শাস্তিরই উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জবাবে লিখলেন ঃ

"আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন। তোমার প্রতি আমার উপদেশ, তুমি সবসময় তোমার কাজে আল্লাহকে ভয় করবে। সবসময় তাকওয়ার পথে চলবে। আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন, যারা আল্লাহকে ভয় করেন, তাঁর বান্দাদের উপর ইহসান করেন। আল্লাহর পথে সামনে অগ্রসর হয়ে কাজ করবে। কোনো সময় অলসতা, অবহেলা প্রদর্শন করবে না। মুসলমানদের হত্যাকারীকে হাতের নাগালে পেলেই হত্যা করবে। আর অন্যান্যদের ব্যাপারেও—যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা আর বিদ্রোহ করেছে, তাঁর নির্দেশের বরখেলাপ করেছে—যদি তাদেরকে হত্যা করা সঠিক মনে করো, তাহলো তোমাকে তা করার অনুমতি দেয়া হলো।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পেয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের উপর প্রভাব বিস্তার করার কৌশল অবলম্বন করতে লাগলেন। বস্তুত তিনি প্রায় এক মাস পর্যন্ত বাজাখার উৎসমুখে অবস্থান গ্রহণ করে ধর্মত্যাগীদেরকে বেশ কাবু করে ফেলেন।

ধর্মত্যাগীদের প্রতি আবু বকরের অনুকম্পা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো যুদ্ধের ময়দান হতে মদীনায় ফেরত আসা কয়েদীদের সাথে কঠোর ব্যবহার করেননি। উআইনা বিন হাসান মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রু ছিলো। সে তোলাইহার বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কোররাহ্ বিন হোবায়রার সাথে গ্রেফতার হয়ে সেও মদীনায় এসেছে। রশি দ্বারা তার হাত বাঁধা ছিলো। মদীনার ছেলেরা তাকে খেজুরের ডাল দিয়ে মারতো আর বলতো ঃ

"হে আল্লাহর দুশমন ! তুমিই কি ঈমান আনার পর আবার কাফের হয়ে গেছো।"

www.pathagar.com

উআইনা জবাব দিতো ঃ

"আমি তো কখনো আল্লাহর উপর ঈমানই আনিনি।"

কিন্তু এরপরও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কিছু না বলে ক্ষমা করে দিলেন।

কোররা বিন হোবাইরা

কোররা বিন হোবাইরা ছিলো বনু আমের গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ওমান হতে মদীনায় ফিরার সময় ওমর বিন আস পথে তার কাছে অবস্থান নেন। এ সময় বনু আমের ধর্মত্যাগের জন্য জোর তদবির চালাচ্ছিলো। ওমর বিন আস ওখান থেকে রওনা হবার সময় কোররা পৃথকভাবে তাকে ডেকে বললো ঃ

"আরবরা তোমাদেরকে জরিমানা (যাকাত) দিতে অবশ্যই রাজী হবে না। যদি তোমরা তাদের সম্পদ তাদের কাছে রাখতে দাও এবং তাদের উপর যাকাত ধার্য না করো, তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনবে ও তোমাদের আনুগত্য করতে রাজী হবে। তোমরা যদি তা অস্বীকার করো, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"

একথা শুনে ওমর বিন আস বললেন ঃ

"হে কোররা ! তুমি কি কাফের হয়ে গেলে ? আর আমাকে আরবের ভয় দেখাচ্ছো ?"

কোররা গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসলে তাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হাজির করা হলে সে বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা। আমি তো মুসলমান। ওমর বিন আস আমার সাক্ষী। তিনি মদীনায় ফেরার পথে আমাদের গোত্র হয়েই এসেছিলেন। তাঁকে আমি আমার কাছেই রেখেছি। আতিথেয়তা করেছি।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর বিন আসকে ডেকে পাঠালেন। কোররার দাবীর সত্যতা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। ওমর বিন আস পূর্বাপর সব ঘটনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুলে বলতে শুরু করলেন। যাকাতের প্রসঙ্গ আসলো, কোররা বললো ঃ

"ওমর বিন আস ! ও প্রসঙ্গটা বাদ দাও।"

ওমর বিন আস বললেন ঃ

"কেন তা বলবো না ? আল্লাহর কসম, আমি সব কথাই খুলে বলবো।"

সব কথা শেষ হবার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুচকি হেসে কোররার জীবন ভিক্ষা দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আলকামা বিন আলাসা

ক্ষমা বা মাফ করে দেয়ার নীতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোনো দুর্বলতা ছিলো না। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি কাজ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ালে সে সময় আর তিনি কোমলতা বা দুর্বলতা বিন্দুমাত্রও দেখাতেন না। একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

বনী কালবের আলকামা বিন আলাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু সে আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ই ইসলাম ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সে তার গোত্রে ফিরে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে খবর পৌঁছলে তিনি কা'কা বিন ওমরকে তার মুকাবিলা করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু সংঘর্ষ বাঁধার আগেই আলকামা ভেগে গেলো। তার স্ত্রী ও কন্যাগণ এবং অন্যান্য সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করে। তারা আলকামার সাথে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করলো। পরে আলকামাও তাওবা করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে হাজীর হলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার তাওবাকে মেনে নিয়ে তাকে জীবন ভিক্ষা দিয়ে দিলেন। কারণ, সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু কোনো মুসলমানকে হত্যা করেনি।

ফোজায়াহ আইয়াস

এর বিপরীত তিনি আবার ফোজায়াহ আইয়াস বিন আবদে ইয়ালিলের ওজর আপত্তি গ্রহণ করেননি। তাকে জীবন ভিক্ষাও দান করেননি। এ ব্যক্তি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এসে আরয করলো। আপনি আমাকে হাতিয়ার দিন। ধর্মত্যাগী যে গোত্রের সাথে আপনি আমাকে যুদ্ধ করতে বলবেন আমি যুদ্ধ করবো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে কিছু হাতিয়ার দিয়ে একটি গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কোজায়াহ সে অস্ত্র সলিম, আমের ও হাওয়াযেন গোত্রের মুসলমান এবং মুরতাদ উভয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলো। কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে ফেললো। এসব ঘটনা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তারিক বিন হাযেজকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ ফোজায়ার মুকাবিলার জন্য পাঠালেন। যুদ্ধে ফোজায়াহ গ্রেফতার হলো। তারিফা তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। এ ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে, ফোজায়াহ যদি মুসলমানদেরকে হত্যা না করতো, তাহলে এত ভয়াবহ শাস্তি তাকে দেয়া হতো না। অবশ্য পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কাজ করার জন্য দুঃখ করেছেন।

আবু শাজারাহ

এ প্রসঙ্গে আবু শাজারাহ বিন আবদুল উজ্জার ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, উআইনা, কোররা এবং আলকামার ঘটনার সাথে এ ঘটনারও মিল আছে।

www.pathagar.com

বিখ্যাত মহিলা কবি খুনসার ছেলে ছিলো এ আবু শাজারাহ। মায়ের মতো সে নিজেও কবি ছিলো। মুরতাদদের সাথে মিলে গিয়ে কবিতা রচনা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষদেরকে উত্তেজিত করতো। যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতো। তার একটি কবিতা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

فرويت رمحى من كتيبة خالد وانى لارجو بعدها ان اعمرا

"আমি আমার নেজাকে খালিদের সৈনিকদের রক্তে রঞ্জিত করেছি এবং আশা করি ভবিষ্যতেও আমি এভাবে করতে থাকবো।"

কিন্তু সে যখন দেখলো খালিদের বিরুদ্ধে তার কবিতার আবেদনে কোনো অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তখন সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকেও জীবন ভিক্ষা দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত যুগে আবু শাজারাহ একবার তাঁর দরবারে হাজির হলো। তিনি সে সময় গরীবদের মধ্যে যাকাতের মাল বণ্টন করছিলেন। এ দেখে আবু শাজারাহ বললো ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকেও কিছু দান করুন। কারণ, আমি অভাবী।"

ওমর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

সে আবু শাজারাহ জেনে ওমর বললো ঃ

"হে আল্লাহ্র দুশমন ! তুমি কি সে ব্যক্তি নও যে বলেছিলো ঃ

فرويت رمحى من كتيبة خالد وانى لارجو بعدها ان اعمرا

তিনি তাকে দুররা মারার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে পালিয়ে গিয়ে তার গোত্র সলিমে চলে এলো।

উম্মে জুমালের আবির্ভাব

মানুষ শুনতে পেলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মত্যাগীদের যারা আবার ইসলাম গ্রহণ করছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তখন তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেলো। তোলাইহার সাহায্য করেছে যারা, তারা ধীরে ধীরে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করলো। কিন্তু গাতফান, তায়ী, সলিম ও হাওয়াজেনের কিছু লোক যারা বাজাখার যুদ্ধে খালিদের বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়েছিলো। তারা পালিয়ে গিয়ে উম্মে জুমাল সালমা বিনতে মালেকের কাছে পৌছলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার পক্ষ হয়ে তারা যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে দেবে, কিন্তু পিছু হটবে না বলে অঙ্গীকার করলো।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা এতো উত্তেজিত ছিলো যে, অতীতের কোনো পরাজয় তাদেরকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ক্ষমাও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেনি। আবার তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য

www.pathagar.com

একত্রিত হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত না হতো, তাহলে তোলাইহার শোচনীয় পরাজয় ও কাপুরুষোচিত পলায়ন এবং সে ডাহা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর আনুগত্য মেনে নিতো। উম্মে জামালও মুসলমানদের ব্যাপারে এতো বিদ্বেষ ও উষ্মা পোষণ করতো যে, সময়ের গতি অনেক দূর পর্যন্ত অতিবাহিত হবার পরও তা সে ভুলে যেতে পারেনি। এ জন্যই বাজাখার পরাজয় বরণকারী সৈনিকরা উম্মে জুমালের কাছে একত্রিত হওয়া এবং তাদের নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নেবার জন্য চেষ্টা চালানো ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার।

উম্মে জুমাল ছিলো উম্মে 'কারফার' কন্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ই তাকে হত্যা করা হয়েছে। এর হত্যার ঘটনা হলো, যায়েদ বিন হারেছা বনী ফাজারার কাছে গেলে ওয়াদিল কোররায় বনী ফাজারার সাথে এ সংঘর্ষ ঘটে। তারা যায়েদের সঙ্গীদেরকে হত্যা করে। যায়েদও আহত হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। যায়েদ সুস্থ হয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী সহ তাঁকে আবার ফাজারার লোকের কাছে পাঠালেন। এবার যায়েদ বিজয় লাভ করেন। বনী ফাজারার অধিকাংশ মানুষ হয় নিহত হয়েছে, আর না হয় মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। এ গ্রেফতারকৃত লোকদের মধ্যে উম্মে কারফা ফাতেমা বিনতে বদরও ছিলো। যেহেতু সে গোত্রের লোকদেরকে উস্কিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য তৈরি করেছে। এ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর তার কন্যা উম্মে জুমালকে ক্রীতদাসী করা হলো। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আনহার অংশে এলো এ উম্মে জুমাল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আনহা তাকে মুক্ত করে দিলেন।

কিছুদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আনহার কাছে থাকার পর উম্মে জুমাল নিজ গোত্রের কাছে এসে গেলো। মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা তার মনে জ্বলছিলো। সে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছে। আর এ সুযোগ সে পেয়ে গেলো ধর্ম ত্যাগের কলহের মাধ্যমে। উম্মে জুমাল বাজাখার পরাজিত বাহিনীর সাথে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য ময়দানে নেমে আসলো।

তার মা উম্মে কারফা ছিলো তার গোত্রের মর্যাদাশালী ও প্রতিভাশালী মহিলা। সে ছিলো উআইনা বিন হাসানের চাচী ও মালিক বিন হোজাইফার স্ত্রী। তার ছেলেরাও বনি ফাজারার সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতো। তার কাছে ছিলো একটি জঙ্গি উট। এ উটে আরোহণ করে সে অন্য গোত্রের সাথে লড়াই করার জন্য বাহিনীর অগ্রভাগে থাকতো। তার মৃত্যুর পর এ উটের মালিক হলো উম্মে জুমাল।

মান-সম্মান ও প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে উম্মে জুমালও তার মায়ের সমপর্যায়ের ছিলো। মার মতো জাতির মধ্যে তারও আসন ছিলো নেতৃত্বের। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ও খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর কাছে পরাজিত ও পালিয়ে আসা সৈনিকরা এখন উম্মে জুমালের দলে এসে ভীড়লো। উম্মে জুমাল তাদেরকে নিয়ে সাহসে ভর করে আবার খালিদের সাথে মুকাবিলা করে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলো।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে মানুষ এসে তার সামনে জড়ো হলো। এতে তার শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘটনা জানতে পেরে বাজাখা হতে তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য রওনা করেন।

উম্মে জুমালের পরাজয় বরণ

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উম্মে জুমালের সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন। যুদ্ধ শুরু হলো। উটের উপর আরোহণ করে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়ে নিজ পক্ষকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে উম্মে জুমাল। মুরতাদরাও জীবনের বাজি লাগিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে। উম্মে জুমালের উটের চারিপাশে আরো একশত উট ছিলো। এসব উটে আরোহণ করে বড় বড় বাহাদুররা উম্মে জুমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে।

মুসলিম অশ্বারোহীরা উম্মে জুমালকে ঘায়েল করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে এগুতে পারছেন না। পুরো একশ' সৈন্যকে হত্যা করার পর তারা উম্মে জুমালের উটের কাছে পৌঁছে উটের পা কেটে দিয়ে তাকে নীচে নামিয়ে হত্যা করে ফেললেন। উম্মে জুমালের এ পরিণতিতে তার বাহিনী সব শক্তি-সাহস হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাণপণ দৌঁড়িয়ে তারা পালাতে লাগলো। এভাবে এসব বিদ্রোহের আগুন নিভে যায় এবং আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকের ধর্মত্যাগের কলহের অবসান ঘটে।

দক্ষিণাঞ্চলের ধর্মত্যাগীরা

যে বাহাদুরী ও শৌর্যবির্যের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তর-পূর্ব আরবের বিদ্রোহকে দমন করেছেন তার দাবী ছিলো অন্যান্য অংশ এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ইসলামী হুকুমাতের বিরোধিতা হতে বিরত থাকা। তারা অবশ্যই দেখেছিলো যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রেরিত বাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় ও মদীনার রাজধানী হতে শত শত মাইল দূরে যেতে এবং শত্রুদেরকে দমন করতে একটুও দ্বিধা করেনি। খালিদের বিজয় এবং তোলাইহার পরিণতির খবরও তারা জেনে গিয়েছিলো। এরপরও মুসলমানদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। আসলে তাদের ধারণা ছিলো যদি কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করে কামিয়াব হতে পারেন, তাহলে অন্য গোত্রের লোক এ দাবী জানিয়ে কামিয়াব হবে না কেন? এসব ধর্মত্যাগী ও নবুয়াতের দাবীদাররা বুঝতেই পারেনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, জাতিকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করা। নিজের প্রতাপ-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা দখল অথবা কোনো প্রকার পুরস্কার পাওয়া তার উদ্দেশ্য ছিলো না। তাওহীদের তাবলিগ করার কারণে তাঁকে দীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত কঠিন নিগ্রহ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। বয়কট করেছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। সর্বশেষ তাঁকে স্বদেশ ভূমি হতে মদীনায় হিজরাত করে চলে আসতে হয়েছে। মদীনায় তারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। বারবার মদীনায় সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। এতোসব

www.pathagar.com

কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদম্য প্রচেষ্টার পর সুফল লাভ করেন। আরবের অধিকাংশ লোক তার আনুগত্য মেনে নিতে শুরু করে। ভণ্ড নবীদের দৃশপট থেকে এতোসব সত্য কথা আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। তারা ভেবেছিলো, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতির ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও সফলতা লাভ করতে পারে, তাহলে তারা কেন সফলতা লাভ করতে পারবে না। এদিকে তাদের জাতির সব লোকই তাদের সাথে আছে। কিন্তু তাদের স্মরণ ছিলো না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে দীনে হকের দিকে ডাকতেন। আর মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদারদের গোটা ব্যাপারটাই অসত্য, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির ভিত্তির উপর ছিলো রচিত। আর এ অসত্য ভিত্তির উপর তাদের কামিয়াবী কেমন করে সম্ভব ?

উত্তর-পূর্ব কোণ হতে অবসর হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দক্ষিণ দিকের বিদ্রোহের দিকে মনোনিবেশ করেন। তারা এখনো ধর্মত্যাগের অবস্থায়ই কায়েম আছে। কোনো অবস্থায়ই তারা ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এদের থেকে দায়িত্ব মুক্তি পাবার ও এদেরকে সত্য দীনের উপর ফিরিয়ে আনার জন্য আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন অলিদকে বাজাখার মদয়ান থেকেই বাতাহ এবং ওখান থেকে ইয়ামামা যাবার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।

১১—

www.pathagar.com

৮

সাজাহ্ ও মালিক বিন নুবিরা

বনু আমের ও তাদের বাসস্থান

আরবের দক্ষিণাঞ্চলে বনী আমের গোত্রের কাছেই অবস্থিত ছিলো বনী তামিম গোত্র। এসব গোত্র মদীনা হতে পারস্য উপসাগরের পূর্ব দিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। আর দক্ষিণ পূর্বদিকে তাদের সীমা ফোরাত উপকূলের মোহনা পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিলো। জাহেলিয়াত এবং ইসলাম এ উভয়কালেই আরবের কাছে বনী তামিমের একটা মর্যাদার স্থান প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এখানকার লোকজন বীর এবং দানশীল হিসাবে খ্যাত। কবিতা, ভাষা জ্ঞানেও তারা অন্যদের চেয়ে কম ছিলো না। সুতরাং এ গোত্রের শাখা-প্রশাখা বনী হান্‌জাল, দারাম, বনী মালেক, বনী ইয়ারবুর কৃতিত্ব ইতিহাস এবং সাহিত্যের বই-পুস্তকে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

যাকাতদানে অস্বীকৃতি

যেহেতু এসব গোত্র ফোরাত নদ ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বসতিস্থাপন করেছিলো। এজন্য ইরানীদের সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিলো। এরা অধিকাংশই ছিলো কবর পূজারী। যদিও এদের অনেকে আবার খৃষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে। অন্যান্য গোত্রের মতো এরাও মুসলমানদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব গ্রহণে তৈরি ছিলো না। এ কারণেই রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব গোত্র হতে জিযিয়া উসূল করার জন্য নিজের লোকদেরকে পাঠালে সকলের আগে বনী তামিম গোত্রই জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে। আর বনুল আম্বর তো তরবারী ও নেজা নিয়ে জিযিয়া আদায়কারীর অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উআইনা বিন হাসানকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি এ গোত্রগুলোকে শক্তিপ্রয়োগে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করলেন। কিছুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করে সাথে নিয়ে এলেন। এ কারণে এ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরাখানায় ছিলেন। তারা উচ্চস্বরে তাদের মান-মর্যাদা, বংশ-গৌরবের দোহাই দিয়ে হুনাইনের ঘটনার উল্লেখ করে নিজেদের কয়েদীদের ফিরিয়ে দেবার দাবী জানায়। এদের গলার শব্দ শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন। তারা বললো, "আমরা আপনার সাথে ফখর ও গৌরবের মুকাবিলা করতে এসেছি।" তারা যখন দেখলো, মুসলমানদের প্রবক্তা তাদের প্রবক্তার চেয়ে অধিক সাহিত্যের লালিত্যে পারদর্শি, মুসলমানদের কবি তাদের কবির চেয়ে অধিক যাদুকরী বর্ণনায় প্রাজ্ঞ এবং মুসলমানদের আলোচনা তাদের আলোচনার চেয়ে বেশী মধু দিতে পারে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের

www.pathagar.com

কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। আর তারাও তাদের ভাই-বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে মহানন্দে বাড়ী চলে গেলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী তামিমের বিভিন্ন শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করলেন। এদের মধ্যে বনী ইয়ারবুর সরদার মালিক নুবিরাও ছিলো। এসব প্রশাসকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর শুনলে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এখন কি তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে যাকাত পাঠাবে কিনা। এ মতভেদ প্রকট আকার ধারণ করলো তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বেধে যাবার উপক্রম হলো। এক পক্ষ মদীনার নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখতে রাজী ছিলো। আর অন্য পক্ষ এতে সম্মত ছিলো না। এরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে যাকাত পাঠাতে অস্বীকার করলো। মালিক বিন নুবিরা এই পক্ষে ছিলো।

সাজাহর তামিমে আগমন

প্রশাসকদের এ মতভেদ এখনো বিদ্যমান। এরই মধ্যে সাজাহ বিনতে হারিস ইরাকের এলাকা আল জাযিরা হতে তার নিজের গোত্র তোগলব সহ ওখানে পৌঁছলো। তোগলব ছাড়াও তাঁর সাথে ছিলো রাধয়া, নামর, আয়াদ এবং শায়বান গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি সৈন্য বাহিনী। সাজাহর সম্পর্ক ছিলো প্রকৃতপক্ষে বনী তামিমের শাখা বনু ইয়ারবু'র সাথে। কিন্তু মাতৃকুল ছিলো ইরাকের তোগলব গোত্রে। তার বিয়েও হয়েছিলো তোগলব গোত্রেই। সে ওখানেই থাকতো। সাজাহ বেশ ধীশক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমতী মহিলা। সে যাদুবিদ্যা জানতো বলেও দাবী করতো। নেতৃত্ব দেবার ও দল পরিচালনার ব্যাপারেও সে পারদর্শী ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর খবর পেয়ে সে আশেপাশের সব এলাকায় সফর করে মদীনার উপর আক্রমণ চালাবার জন্য লোকজনকে অনুপ্রাণীত ও একত্রিত করতে লাগলো।

সাজাহর আগমনের উদ্দেশ্য

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন এবং তাদের ধারণায় ঠিকই বলেন, সাজাহ প্রকৃতপক্ষে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি অথবা তার যাদুবিদ্যার প্রসারতা ঘটাবার জন্য উত্তর ইরাক থেকে আরবে আসেনি। বরং সে মূলত এসেছিলো ইরাকের ইরানী প্রশাসকদের উস্কানীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার করতে। এ সুযোগে ইরান তাদের পতনের পথ রুদ্ধ ক্ষমতা প্রতিপত্তি শামলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে। কারণ, এ সময়ে ইয়েমেনে ইরানীদের নিযুক্ত প্রশাসক 'বুদহান' ইসলাম গ্রহণ করার পর ইরানীদের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে চলে যাচ্ছিলো।

উল্লেখিত ইতিহাসবিদগণ তাদের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন ঃ সাজাহ ছিলো একজন মহিলা। সে নবুয়াত দাবী করে বসে। আর এ ধরনের সতর্ক, ধীশক্তি সম্পন্না, বুদ্ধিমতি নারীরাই অধিকাংশ সময় গোয়েন্দাগিরি, লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলা, ফুসলিয়ে আনা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হয়। তার সাথেও এ কাজই হয়েছে। ঝগড়া,

www.pathagar.com

কলহ ও বিদ্রোহের আগুন জোরেশোরে জ্বলে উঠা পর্যন্তই সে আরবে ছিলো। তার উদ্দেশ্য যখন পূরণ হয়ে গেলো, তখনই সে ইরাকে ফেরত চলে এলো। বাকী জীবন সে এখানেই কাটিয়ে দেয়।

ইরানের ষড়যন্ত্র দেখে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তারা সাজাহকে আরবের ফেতনা-ফাসাদ, কলহ-বিবাদ বিস্তার করার হাতিয়ার হিসাবেই এখানে এনেছিলো। আরবে ইরানী বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করার স্থলে এ সতর্ক নারীকে ব্যবহার করে স্বয়ং আরবেই পরস্পরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখে তাদের শক্তি নিশেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেও এ কাজ করে থাকতে পারে। তাহলে তারা বিনা আয়াসেই আরব উপদ্বীপে আবার তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

বনী তামিমের কার্যক্রম

এসব কার্যকারণের সাথে জড়িত হয়ে সাজাহ আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করলো। বনু তামিম গোত্রেই প্রথম যাওয়া ছিলো তার জন্য স্বাভাবিক। সে সময় বনী তামিমের কি অবস্থা ছিলো তা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। বনু তামিমের এক অংশ যাকাত দিতে ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফার আনুগত্য করতে রাজী ছিলো। আর এক অংশ এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে। এছাড়াও আর একটা তৃতীয় পক্ষ ছিলো যারা বুঝতে পারছিলো না কি করা ঠিক ও কি করা ঠিক হবে না।

এ মতবিরোধের চরম পর্যায়ে বনু তামিম নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করে দিলো। এ সময়েই তারা সাজাহর আগমনের সংবাদ জানতে পারলো। তারা একথাও জানলো, সাজাহ মদীনায় গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। এরপর এ মতবিরোধ আরো বেড়ে গেলো।

এ পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সাজাহ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলছে। সে তার বিরাট বাহিনী নিয়ে আকস্মিকভাবে বনু তামিমে পৌছে যাবে। এখানেই সে তার নবুয়াতের ঘোষণা দেবে। তার উপর ঈমান আনার জন্য সকলকে আহ্বান জানাবে। গোটা গোত্র একমত হয়ে তার সাথে যোগ দেবে। উআইনার মতো বনু তামিমও তার ব্যাপারে বলতে শুরু করবে, ইয়ারবুর মহিলা নবী কুরাইশদের নবী হতে উত্তম। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আমাদের সাজাহ জীবিত। এরপর বনু তামিমকে সাথে নিয়ে সাজাহ মদীনার দিকে রওনা দেবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করবে এবং মদীনা দখল করে ফেলবে।

সাজাহ ও মালিক বিন নুবিরা

সাহাজ তার সৈন্য নিয়ে ইয়ারবুর সীমান্তে পৌছে থেমে গেলো। গোত্রের সরদার মালিক বিন নুবিরাকে ডেকে এনে সন্ধি করতে ও মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য আহ্বান জানালো। মালিক বিন নুবিরা সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলো। কিন্তু সাহাজকে মদীনা আক্রমণ হতে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দিলো এবং বললো, মদীনা গিয়ে

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করার চেয়ে উত্তম হবে নিজের গোত্রের বিরোধী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়া। সাজাহ নিজেও এ প্রস্তাব সমর্থন করলো এবং বললো ঃ

"যা তোমার ভাল মনে হয় তাই করো। আমি তো বনী ইয়ারবুর একজন নারী মাত্র। যা তুমি বলবে তাই আমি করবো।"

মালিক বিন নুবিরার বৈশিষ্ট্য

সাজাহ তার মত থেকে হঠাৎ করে কেন ফিরে গেলো এবং মালিক বিন নুবিরার প্রস্তাব দ্বিধাহীনভাবে মেনে কেন নিলো, ইতিহাসের পাতা থেকে তা জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, মালিক ছিলো তার গোত্রের একজন মহাসম্মানিত ও প্রভাবশালী লোক, উন্নতমানের একজন অশ্বারোহী বীর এবং বিখ্যাত কবি। তার মাঝে ভয়ংকর অহংকার ছিলো। মাথার জুলফি লম্বা লম্বা ছিলো। দেখতে ছিলো বড় সুন্দর। অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও হাসিমুখ, চলা-ফেরায় ছিলো অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচার। তার সহোদর মোতাম্মিম বিন নুবিরা যদিও কবিত্বের দিক দিয়ে তার সমপর্যায়েরই ছিলো কিন্তু দেখতে শুনতে দু'জনের মধ্যে ছিলো আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মালিক ছিলো অত্যন্ত সুন্দর চেহারার লোক। আর মোতাম্মিম বিন নুবিরা ছিলো একেবারেই তার বিপরীত-কুৎসিত ও কানা মানুষ। একবার আরবের এক গোত্র হামলা করে মোতাম্মিমকে গ্রেফতার করে তাদের গোত্রে নিয়ে রসি দিয়ে বেঁধে রাখলো। খবর পেয়ে মালিক বিন নুবিরা উটে আরোহণ করে এ গোত্রে এসে হাজির। তাদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন কথাবার্তা বলে এমনভাবে ওদের মন কেড়ে নিলো যে, তারা তার ভাই মোতাম্মিমকে কোনো পণমূল্য ছাড়াই ছেড়ে দিলো। জাহেলিয়াতের যুগে বনু তোগলবরাও মোতাম্মিমকে একবার গ্রেফতার করেছিলো। মালিক পণমূল্য আদায় করার জন্য সেখানে গেলো। বনু তোগলব তার চেহারা-সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো। সেখানেও মালিক তার আলাপ জমিয়ে তাদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। তারাও তার ভাইকে মুক্তি দিতে কোনো পণমূল্য রাখতে অস্বীকৃতি জানালো। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মুক্তি দিলে সে তার গোত্রে এসে গেলো। এভাবে সাজাহও সম্ভবত মালিকের বাচনভঙ্গি ও পৌরুষ চেহারা ও সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলো এবং তার কথামত মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা পরিহার করলো।

সাজাহ মালিক ছাড়াও বনু তামিম গোত্রের অন্যান্য নেতাদেরকেও সন্ধির আহ্বান জানায়। কিন্তু ওয়াকি ছাড়া তার এ প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করেনি। এ কারণে সাজাহ, মালিক ও ওয়াকিকে নিয়ে অন্যান্য সরদারদের উপর হামলা চালালো। ভীষণ যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অসংখ্য সেনা নিহত হলো এবং পরস্পর পরস্পরের অনেক লোক গ্রেফতার করলো। কিন্তু কিছুদিন পরই মালিক ও ওয়াকি উভয়েই বুঝতে পারলো যে, তারা এ রমণীর অনুসরণ করে ভুল করেছে। তাই তারা অন্যান্য সরদারদের সাথে একটা মীমাংসা করে উভয়ের গ্রেফতারকৃতদের মুক্ত করে দেয়। এভাবে বনু তামিম গোত্রে একটা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

সাজাহর পরাজয়

বনী তামিমের মীমাংসার পর আর এখানে সাজাহর চিড়া পানিতে ভিজ ছিলো না। তাই সে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলো। নাবাজের বস্তিতে পৌঁছলে আউস বিন খাজিমার সাথে তার টক্কর লাগলে সাজাহ পরাস্ত হলো। মদীনার দিকে কখনো আর অগ্রসর হবে না—এ মযবুত অঙ্গীকার আদায় করে তবে আউস বিন খাজিমা তাকে ফিরে যেতে অনুমতি দিলো।

এ ঘটনায় উপদ্বীপবাসীদের বাহিনীর সরদার এক জায়গায় একত্র হয়ে সাজাহকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"মালিক এবং ওয়াকি তাদের গোত্রের সাথে আপোষ মীমাংসা করে নিয়েছে এখন আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন ? তারা আর আমাদেরকে তাদের ভূমির উপর দিয়েও অতিক্রম করতে দিবে না। তাদের সাথেও আমরা এ অঙ্গিকার করেছি। মদীনা যাবার পথও আমাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আপনি বলুন আমরা কি করবো ?"

সাজাহ জবাবে বললো ঃ

"মদীনা যাবার পথ যদি রুদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও কোনো চিন্তার কারণ নেই। তোমরা ইয়ামামার দিকে যাত্রা করো।"

একথা শুনে তারা বললো ঃ

"শান-শওকতের দিক থেকে ইয়ামামাবাসী আমাদের চেয়ে অগ্রসর, আর মুসাইলামার ক্ষমতাও আমাদের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।"

এক বর্ণনায় একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, তার সেনাবাহিনীর নেতারা ভবিষ্যত পদক্ষেপ সম্পর্কে সাজাহকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো ঃ

عَلَيكُم بِاليمامه ، ودفوادفيف الحمامه ، فانها غزوة صرامه لايلحقكم بعدها ندمه .

"ইয়ামামায় চলো। কবুতরের মত তীব্র গতিতে তাদের উপর ঝাপটা মারো। ওখানে একটা বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এরপর আর তোমাদের লড়তে হয়তো হবে না।"

এ ছন্দময় লালিত্যময় ভাষা শুনে তারা একে অহী মনে করতে লাগলো। এ হুকুম মানা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলো না।

এখন প্রশ্ন ওঠে অবশেষে কোন্ উদ্দেশ্যে সাজাহ্ ইয়ামামার দিকে যাত্রার ইচ্ছা করলো। যখন তাকে তার নিজ গোত্র বনু তামিমের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। মদীনার দিকে যাত্রার পথে আউস বিন খাজিমার কাছেও পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

তার সেনাবাহিনীতে একথা বলার জন্য কি এমন কোনো লোক ছিলো না যে, এতসব পরাজয় দেখার পর তাকে ইয়ামামার দিকে না যাবার পরামর্শ দিতে পারতো ? এসব কুসংস্কারপূর্ণ হাসির কথাবার্তাকে তারা অহী হিসাবে মেনে নিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তার আনুগত্য করতো এবং তার হুকুম পালনে কোনো প্রকার ত্রুটি করতো না।

সাজাহ ও মুসাইলামার বিয়ে

সত্য বলতে গেলে বলতে হয়, সাজাহর গোটা ব্যাপারটাই কতকগুলো বিস্ময়ের সমাহার। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, যখন সাজাহ ইয়ামামা পৌঁছলো তখন মুসাইলামা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। সে ভাবলো, যদি সে সাজাহর বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তো তার বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে। ইসলামী বাহিনী তাদের উপর হামলা চালাবে। আশেপাশের গোত্রগুলো তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করবে। এ ভেবে মুসাইলামা সাজাহর সাথে একটা আপোষ রফার ইচ্ছা পোষণ করলো। তার জন্য প্রথম প্রথম কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দিয়ে প্রস্তাব করলো। সে স্বয়ং তার সাথে দেখা করতে চায়। সাজাহ নিজের বাহিনীসহ এক লেকের পাড়ে থাকতো। সে মুসাইলামাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলো। মুসাইলামা বনু হানিফার চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নিয়ে সাজাহর কাছে এলো। ক্যাম্পে পৌঁছে একান্তে সাজাহর সাথে খোশালাপ করলো। তাকে বললো, আরবের অর্ধেক ভূমির মালিক হলো কুরাইশরা বাকী জমির মালিক হলেন আপনি। এরপর মুসাইলামা ছান্দিক স্বরে সাজাহকে কিছু কথা শুনালো। এতে সে প্রভাবিত হয়ে পড়লো। প্রতি উত্তরে সাজাহও তাকে লালিত্য পূর্ণ ভাষায় কিছু কথা শুনালো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এ সাক্ষাতকার চললো। মুসাইলামা খোশ আলাপ ও চালবাজীতে সাজাহর মন জয় করে ফেললো। সাজাহকে স্বীকার করতেই হলো মুসাইলামা সবদিক দিয়েই তার চেয়ে উন্নত ও সফলকাম।

পুরোপুরিভাবে সাজাহকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তাকে নিজের অনুরাগী বানাবার জন্য মুসাইলামা একটা পরিকল্পনা পেশ করে বললো। আমরা আমাদের নবুয়াতকে একত্রে মিলিয়ে ফেলি। এবং পরস্পর দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তুলি। সাজাহ আগ থেকেই তার আলাপ-আলোচনা ও আচার-আচরণের মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলো। এ প্রস্তাব সে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলো এবং মুসাইলামার সাথে তার ক্যাম্পে চলে গেলো। তিনদিন পর্যন্ত ওখানে থাকলো। এরপর নিজের ক্যাম্পে ফিরে এসে ঘোষণা করলো। সে মুসাইলামাকে সত্যের উপর পেয়েছে। তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে।

সাজাহর মোহরানা

লোকেরা সাজাহকে বিয়ের মোহরানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, সাজাহ বললো, “না, তাতো হয়নি।” তারা পরামর্শ দিলো, “আপনি ফেরত গিয়ে মোহরানা ঠিক করে আসুন। আপনার মতো ব্যক্তিত্বের জন্য মোহরানা ছাড়া বিয়ে হওয়া সমীচিন নয়।” সুতরাং সে আবার মুসাইলামার কাছে ফিরে গেলো এবং তাঁকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালো। মুসাইলামা তার সম্মানার্থে এশা ও ফযরের নামায সহজ করে দিলো।

www.pathagar.com

মোহরানার ব্যাপারে ফায়সালা হলো। মুসাইলামা তাকে ইয়ামামার জমির অর্ধেক আমদানি পাঠাতে থাকবে। সাজাহ আগামী বছরের অর্ধেক আমদানী তখনি তাকে অগ্রিম দিয়ে দেবার প্রস্তাব পেশ করলো। এ প্রস্তাব অনুযায়ী মুসাইলামা তাকে অর্ধেক বছরের আমদানীর অংশ দিয়ে দিলো তা নিয়ে সে জাজিরাতে ফেরত চলে গেলো। বাকী অর্ধেক বছরের আমদানী আদায় করে নিয়ে যাবার জন্য তার কিছু লোক বনু হানিফায় রেখে গেলো। সে এখানে থাকতে থাকতেই মুসলিম বাহিনী এসে ওখানে উপস্থিত হলো। মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করলো। সাজাহ তখনো বনু তোগলবেই বসবাস করছে। পরে আমীরে মুয়াবিয়া দুর্ভিক্ষের বছর তাকে তার গোত্র সহ বনী তামিমে পাঠিয়ে দেন। মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম অবস্থায় সে ওখানেই থেকে যায়।

এ হলো সাজাহর কাহিনী। বড় বিস্ময়কর কাহিনী। আরব উপদ্বীপ থেকে সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করার জন্য রওনা হলো কিন্তু মালিক বিন নুবিরার সাথে আলোচনার পর তার মত পাল্টে যায়। মদীনার উপর হামলা করার পরিবর্তে ইয়ামামার দিকে চলে যায়। ওখানে মুসাইলামার সাথে তার সাক্ষাত। তাদের মধ্যে বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই নিজের গোত্রে ফিরে আসে। বাকী জীবন এমনভাবে সে কাটায় যেনো জীবনে কোনো দিন ঘরেরও বাহির সে হয়নি, প্রথম স্বামী ছাড়া কারো সাথে তার কোনো বিয়েও হয়নি।

মুসাইলামার ব্যাপারটাও সাজাহর চেয়ে কম বিস্ময়ের নয়। সাজাহর সাথে যদি তার বিয়ের ঘটনা সঠিক হয়, তাহলে বুঝা যায় মুসাইলামা প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক। মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি আন্দাজ করার ব্যাপারে পারঙ্গম ব্যক্তি ছিলো। সে একদিকে চেয়েছিলো সাজাহ হতে নিষ্কৃতি পেতে। আর অপরদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর সাথে শক্তভাবে যুদ্ধ করতে। সে সাজাহকে মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে কৌশলে কাজ করে তাকে নিজ গোত্রের কাছে পাঠিয়ে দিলো। মালিক বিন নুবিরা ও মুসাইলামার সাথে যে ধরনের সম্পর্ক সাজাহর গড়ে উঠে তার প্রতি লক্ষ্য করলেও বুঝা যায় সাজাহ ছিলো একটি সুচতুর যাদুকর, ছন্দময়ী ভাষায় কথা বলার চমৎকার গুণ সম্পন্না মহিলা। কমনীয় প্রকৃতির মেয়েলী স্বভাবের পূর্ণ অধিকারী ছিলো। এদিকে মুসাইলামাও ছিলো একজন সতর্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রূপ-সৌন্দর্যের তেমন কোনো বাহার না থাকলেও মিষ্টি মিষ্টি কথায় মানুষের মন জয় করে নিতে পারতো। নারীর প্রতি তার আসক্তি ছিলো কম। নারীদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি তার কোনো মোহ ছিলো না। এ জন্যই তার শরীয়াতের আইন ছিলো, যে ব্যক্তির ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, পুত্রের জীবিত থাকা পর্যন্ত সে আর তার স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না। যদি ছেলে মরে যায় তাহলে সন্তান লাভের জন্য স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে। যার ছেলে থাকবে, স্ত্রীর কাছে যাওয়া তার জন্য হারাম।

মালিকের উদ্বিগ্নতা

যে সময় মুসাইলামা ও সাজাহর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ঘটছিলো, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় বাজাখার যুদ্ধে ধর্মত্যাগীদের পরাস্ত করে ইসলামী বাহিনীর

www.pathagar.com

ভিত্তি মযবুত করার কাজে ব্যস্ত। এ সময়ে উম্মে জুমালের সাথে যুদ্ধ ও তার নিহত হবার ঘটনা ঘটে গেছে। বাতাহায় মালিক বিন নুবিরা এসব খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। তার দিনের শান্তি ও রাতের আরাম হারাম হয়ে গেলো। সে যাকাত আদায় করা বন্ধ করে রেখেছিলো। সাজাহসহ বনু তামিম গোত্রের মুসলমানদের জীবন অতীষ্ট করে রাখার জন্য খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছিলো। সাজাহর বাহিনীর সহযোগিতা সত্ত্বেও তার বাহিনী বিরোধী গোত্রের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। যে ওয়াকী তার দক্ষিণ হাত ছিলো, মুসলমানদের সাথে মিলে গেছে এবং যাকাত দিয়ে দিয়েছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষাপটে মালিক পেরেশানে ছিলো। মুসলমানদের সামনে কি আত্মসমর্পণ করবে। না আগের মতো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যাকাত দিয়ে দেবে অথবা নিজের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, না ভবিষ্যতের মোড় কোন্ দিকে যায় তার প্রতিক্ষা করবে, এসব ঠিক করে উঠতে পারছিলো না।

খালিদের বাতাহা অভিযান

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসাদ, গাতফান এসব এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রগুলোকে দমন করে ফেলেছিলেন। সকল গোত্র আবার ইসলাম কবুল ও মদীনার বশ্যতা স্বীকার করলো। এসব দিক থেকে আর বিপদের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। কাজেই এবার তিনি বাতাহা গমন করে মালিক বিন নুবিরা এবং অন্যান্য দোদুল্যমান গোত্রগুলোর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করলো। আনসাররা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ইচ্ছার কথা জানতে পেরে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বললেন, খলিফাতুল মুসলিমীন আমাদেরকে বনু তামিমের দিকে যাবার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে এ হেদায়াত দিয়েছিলেন যে, তোমরা যখন তোলাইহাকে দমন করে অগ্রসর হবে এবং এলাকার লোকদেরকে আমাদের আনুগত্যশীল করবে, তখন অন্য আদেশ না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে।

কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কথা মানতে রাজী হলো না ঃ

"আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তোমাদের থেকে যা-ই বলে থাকুন না কেন, আমাকে কিন্তু তিনি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদের আমীর; সকল খবর আমার কাছে পৌছে। দরবারে খেলাফাত থেকে আমার কাছে কোনো নির্দেশ না এলেও, যদি আমি মনে করি শত্রুদেরকে কাবু করার জন্য কিছু নতুন সুযোগ হাতে এসেছে, তাহলে সেসব সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি অবশ্যই করবো। এভাবে আমি যদি মনে করি যে, আমাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাহলে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খলিফাতুল মুসলিমীনের তরফ থেকে কোনো হেদায়াত না থাকলে, আমি অবস্থার প্রেক্ষিতে যা সমীচীন মনে করি তা-ই করবো। মালিক বিন নুবিরার বাড়াবাড়ি দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই তার মুকাবিলায় অবশ্যই যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে আমার সাথে নিয়ে যাবার জন্য জেদ ধরবো না। যদি তোমরা যেতে না চাও, না যাও। আমি মুহাজির ও তাবেঈনদেরকে নিয়ে অভিযান চালাবো।"

www.pathagar.com

সুতরাং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আনসারদেরকে বাজাখায় রেখেই নিজে বাতাহার দিকে রওনা হলেন। পরে আনসাররা পরামর্শ করে পেছনে পড়ে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মালিক বিন নুবিরার উপর বিজয় লাভ করলে এ বিজয়ের ফসল থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাবো। আর আল্লাহ না করুন, যদি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোনো বিপদ এসে পড়েন, তাহলে লোকেরা বলবে খালিদের সাথীরা বিপদের সময় তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তাই একজন দূতের মাধ্যমে তারা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খবর পাঠালেন, তারাও তাঁর সাথে আসছেন। তাই যাত্রা যেনো আপাতত বন্ধ রাখেন। সুতরাং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আনসারদের অপেক্ষায় আরো কিছু সময় এখানে যাত্রা বিরতি করলেন।

জাতির সাথে মালিকের পরামর্শ

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহিনী নিয়ে বাতহা পৌঁছলে তিনি ময়দান খালি পেলেন। কেননা মালিক বিন নুবিরা নিজ জাতির লোকদেরকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে বলে দিয়েছে ঃ

> "হে বনু ইয়ারবু ! আমি আমার ওমারাদের কথা মানিনি। তারা আমাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনুগত্য করার পরামর্শ দিয়েছিলো। আমি এখন দেখেছি মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারি এমন অবস্থা আমাদের নেই। তাই আমি তোমাদের আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। তোমরা তা করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো। কেউ যেনো সন্দেহ করতে না পারে, তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও।"

নিজ গোত্রের লোকজনদের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার পর মালিক বিন নুবিরা নিজেও আত্মগোপন করলো।

বাতাহ পৌঁছে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ময়দান খালি পেয়ে তার বাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এদিকে ওদিকে পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন, "যদি মালিকের গোত্রের কাউকে পাও, তাদের কাছে প্রথম ইসলাম পেশ করবে। যদি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে আমার সামনে পেশ করবে। যে ব্যক্তি তার সামনে আসতে অস্বীকার করবে তাকে তখনই হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে আমীরদের প্রতি আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর হেদায়াত ছিলো—মুসলমানরা কোনো জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলে, সেখানে প্রথমে আযান দেবে প্রতিউত্তরে যদি নিকটবর্তী বস্তিসমূহ হতে আযানের আওয়াজ ভেসে আসে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। আর যদি আযানের শব্দ না আসে তাহলে তাদের মুকাবিলা করবে। এরপরেও যদি আবার ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তাদের যাকাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে। যাকাত দিতে স্বীকার করলে ভালো, তা না হলে হত্যা করে দেবে।

www.pathagar.com

মালিক বিন নুবিরার গ্রেফতারী

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রেরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের একটি দল মালিক বিন নুবিরাকে বনু ইয়ারবুর কিছুসংখ্যক লোকের সাথে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মুতাবেক যদি মালিক ও তার সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাদের ছেড়ে দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মালিককে হত্যা করে ফেললেন।

মালিক বিন নুবিরার মৃত্যু মদীনায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ অবস্থা বেশ কিছুদিন মদীনায় বিরাজ করে। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিলো তার কারণগুলোর মধ্যে মালিক বিন নুবিরার ব্যাপারটিও ছিলো একটা উল্লেখযোগ্য কারণ।

মালিকের হত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা

মালিক বিন নুবিরার হত্যা সম্পর্কে অনেক মতভেদ পাওয়া যায়। মালিক এবং তার সাথীদেরকে যারা গ্রেফতার করে এনেছে তাদের মধ্যেও মতভেদ। মালিক ও তার সাথীরা কি ইসলাম গ্রহণ করার কথা স্বীকার করেছিলো ? এবং তারা কি আযানের জবাব দিয়েছিলো ? কি দেয়নি ? আবু কাতাদাহ আনসারী নিজে মালিককে গ্রেফতারকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তিবরীতে নিজের বর্ণনা ঃ "আমরা রাতের বেলায় তাদের উপর হামলা চালাই। তারাও অস্ত্র ধরলো। আমরা বললাম ঃ "আমরা মুসলমান, জবাবে তারা বললো ঃ "আমরাও মুসলমান।" আমরা বললাম ঃ "যদি তোমরা মুসলমান হবে অস্ত্র ধরেছো কেন ?" তারা বললো ঃ "এ অস্ত্র তোমাদের মুকাবেলা করার জন্য নয়।" আমরা বললাম ঃ তোমরা যদি সত্যি সত্যিই মুসলমান হও, তাহলে অস্ত্র রেখে দাও।" সুতরাং তারা অস্ত্র রেখে দিলো। এরপর আমরা নামায পড়লাম তারাও আমাদের সাথে নামায পড়লো।"

এ পর্যন্ত সকলেই একমত। সামনে শুরু হয়েছে মতভেদ। আবু কাতাদাহ বলেন, এসব লোক যাকাতও পরিশোধ করার কথা স্বীকার করে। কিন্তু অন্যরা বলেন, না, তারা যাকাত দিতে স্বীকার করেনি। বরং যাকাত দেবে না বলে জেদ ধরেছিলো। সাথীদের এ মতপার্থক্যের কারণে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে কোনো চূড়ান্ত রায় দেয়া ছিলো মুশকিল। এক বর্ণনায় খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আপাততঃ মালিক ও তার সাথীদের গ্রেফতার করে রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বন্দীদের উপর করুণা করে হুকুম দিয়েছিলেন دافئوا اسراكم তোমরা বন্দীদের জন্য গরমের ব্যবস্থা করো। কিন্তু গরম বুঝাবার জন্য যে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন 'কেনানাহ' ভাষায় مدافاة (মোদাফাত) শব্দের অর্থ হত্যা করাও বুঝাতো। ঘটনাক্রমে যারা এসব

www.pathagar.com

কয়েদীদের পাহারায় নিযুক্ত ছিলো, তারা ছিলো কেনানাহর সাথে সম্পর্কশীল। ঘোষণা শুনার পর তারা মনে করেছিলো, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তারা ওখানে গিয়ে তরবারী দিয়ে তাদেরকে হত্যা করে দেয়। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর রাতে করুণ আর্তনাদ শুনে ক্যাম্পের বাইরে এলেন। কিন্তু তখন সবই শেষ। ঘটনা শুনে তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়।"

এর বিপরীত আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিককে নিজের কাছে ডেকে আনেন। তার সাথে আলাপ করেন। উদ্দেশ্য ছিলো, এ বিষয়ে দুই রকম সাক্ষী পাওয়া যায়। কেউ বলছে মালিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর কেউ বলছে ধর্ম ত্যাগকরে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে—এই দুই বক্তব্যের কোনটা সত্য তা বুঝার জন্য। যাকাত সম্পর্কে আলাপের সময় মালিক বলেছিলো ঃ

"আমার তো মনে হয় না, তোমাদের নেতা তোমাদেরকে এ হুকুম দিয়েছেন।"

একথা শুনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিলো, মালিক যাকাত পরিশোধে রাজী নয়। তাই তিনি কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন ঃ

"তুমি কি তাহলে তাঁকে তোমার নেতা মনে করো না ?"

একথা বলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক সহ সকলের গর্দান উড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিলেন। আবুল ফারজ তার নিজ গ্রন্থ কিতাবুল আগানীতে এ আলোচনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

ইবনে সালামের বর্ণনা হলো, খালিদ ভুল করেছেন বলে যারা মনে করেন তারা বলেন, আলোচনা চলার সময় মালিক বিন নুবিরা খালিদকে বলেছিলো ঃ

"তোমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের এ হুকুম দিয়েছেন ?"

প্রকৃতপক্ষে একথা বলে মালিক যাকাত পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়নি। বরং তা ছিলো তার জানার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যাকাত অস্বীকারকারীদের উপর হামলা করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ? কিন্তু যারা এ ব্যাপারে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেকসুর মনে করেন, তারা বলেন, মালিক অবশ্যই ইসলামকে অস্বীকার করেছিলো। এর প্রমাণ হিসাবে তারা এ কবিতা পেশ করে ঃ

وقلت خذوا اموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيئ من الغد

فان قام بالامر المخوف قائم منعنا وقلنا : الدين دين محمد

"আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, নিজের ধন-সম্পদকে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নির্ভয়ে রেখে দাও। কাল কি হবে তার প্রতি লক্ষ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও যদি ভয়াবহ কোনো বিপদ (ইসলামী রাষ্ট্র), তাহলে আমরা পূর্ণ

www.pathagar.com

শক্তিতে তার বিরোধীতা করবো এবং বলে দেবো, দীন হলো ঐটাই যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন।"

অর্থাৎ মালিক তার জাতিকে বলে রেখেছিলো, তারা যেন কোনো অবস্থায়ই যাকাত পরিশোধ না করে। যাকাত দিতে সবসময় অস্বীকার করে। তারা যেন বলে, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের উপর ঈমান এনেছি, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীনের উপর নয়।

ইবনে খালকান বলেন, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মালিককে কথা বলার জন্য ডেকে পাঠালেন, তখন সে বলেছিলো ঃ

"আমি নামায পড়ার অঙ্গিকার করছি। কিন্তু যাকাত দিতে অনিচ্ছুক।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তোমার কি জানা নেই, নামায ও যাকাত এক সাথে কবুল হয়। নামায ছাড়া যাকাত ও যাকাত ছাড়া নামায কবুল হয় না।"

মালিক বললো ঃ

"আপনাদের নেতাও কি একথা বলেছেন ?"

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তুমি কি তাঁকে তোমাদের নেতা মনে করো না ? আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছি।"

এভাবে তর্ক-বিতর্ক বেড়ে চললো। আলোচনা চরম উত্তেজনায় পৌঁছে গেলো। অবশেষে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"আমি তোমাকে হত্যা করেই ছাড়বো।"

মালিক বললো ঃ

"তোমাদের নেতা কি তোমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন ?"

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"এখনতো আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো।"

একথা বলেই তিনি তার লোকজনদেরকে মালিকের গর্দান উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

কেউ কেউ দ্বিতীয় বর্ণনাকে প্রথম বর্ণনার চেয়ে বেশী সঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেন, এসব বর্ণনা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। এসব ঘটনা কুররা বিন হিরা, ফুজারাতুস সালমী, আবু সাজারাহ ও অন্যান্য লোকদের সাথেও সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক বিন নুবিরার মতো তাদেরকে হত্যা করেনি। বরং তাদেরকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করা তিনি ঠিক মনে করবেন তা তিনিই করবেন। মালিক বিন নুবিরার অপরাধ তাদের অপরাধের চেয়ে বড় কোনো অপরাধ ছিলো না। তারপরও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে

www.pathagar.com

না পাঠিয়ে কেন হত্যা করবেন ? আর বনু তামিম গোত্রে মালিক যে প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, তা অন্যদের চেয়ে কোনো অবস্থাতেই কম ছিলো না। এ ব্যাপারটি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশ ওয়াকেফহাল ছিলেন।

এসব লোকদের মতে মূল ব্যাপার হলো, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মালিকের রক্ত শুকাবার আগেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। কাজেই এরা বলেন, এ বিয়েই মালিককে হত্যার মূল কারণ।

শিয়া মতবাদের ঐতিহাসিক ইয়াকুবী তাঁর গ্রন্থে লিখেন ঃ "মালিক বিন নুবিরা খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে আলোচনার জন্য ক্যাম্পে আসার সময় সাথে তার স্ত্রী ছিলো। তার রূপ যৌবন খালিদের মনকে আকর্ষণ করে। তিনি মালিককে বললেন, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন।

আবুল ফারজ আসবেহানী কিতাবুল আগানীতে লিখেন, "সাজাহ নবুয়াতের দাবী করলে মালিক তার আনুগত্য করে। কিন্তু এরপরও সে ইসলামে আছে বলে প্রকাশ করে। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে হত্যা করেন, সাহাবাদের এক অংশ এতে ঘোরতর আপত্তি জানান। কেননা তাকে হত্যা করার পরই খালিদ তার স্ত্রীকে বিয়ে করে ফেলেন। একথাও বলা হয় যে, জাহেলিয়াতের সময় থেকেই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে পসন্দ করতেন। এজন্য তার উপর অভিযোগ আনা হয়, একজন রমণীকে শুধু বিয়ে করার জন্য খালিদ একজন নারীর মুসলমান স্বামীকে হত্যা করেন।"

আমাদের মতে এসব বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। এগুলো গল্প কাহিনী রচনার মতো। একথা বলা হয়ে থাকে যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আলোচনায় আসার সময় মালিকের সাথে তার স্ত্রী লায়লাও ছিলো। তাকে হত্যা করা হবে ঘোষণা দিলে লায়লা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে খালিদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় তার মাথার বেনী কাধের উপর ঝুলে ছিলো। দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। এ অবস্থায় লায়লার রূপ যৌবন ফুটে উঠেছিলো মনোমুগ্ধকরভাবে। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এতে মনমুগ্ধ হয়ে পড়েন। এ অবস্থা দেখে মালিক বললো ঃ

"আফসোস ! আমার স্ত্রীই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো।"

খালিদ রাদিয়াল্লা আনহু উত্তরে বললেন ঃ

"তোমার স্ত্রী তোমার প্রাণ সংহারের কারণ নয়। তোমার কর্মফলই বরং তোমার প্রাণ হরণের মূল কারণ।"

একথা বলেই খালিদ তার গর্দান উড়িয়ে দিবার হুকুম দিলেন।

খালিদের উপর আবু কাতাদাহর অসন্তুষ্টি

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবু কাতাদা আনসারী খালিদের উপর অপরিসীম অসন্তুষ্ট হন। তিনি তার পতাকার নীচে আর লড়াই করবেন না বলে শপথ করলেন। এবং খালিদের বাহিনী ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন।

www.pathagar.com

এ ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, খালিদ "তোমাদের কয়েদীদের গরম রাখো" এ হুকুম দেবার পর যখন ওখানকার ব্যবস্থাপকরা মালিক ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করে ফেললো, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ

"আল্লাহ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তা হয়েই যায়।"

আবু কাতাদাহর ধারণা হলো, এটা খালিদের একটা বাহানা। আসলে এটা তার পূর্ব পরিকল্পিত। সকল কয়েদীদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই তিনি খালিদের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ 'এসব আপনার কারসাজী।' এতে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাগান্বিত হয়ে তাঁকে ধমকালেন। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা চলে গেলেন।

এরপর অন্য বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উম্মে তামিমকে বিয়ে করার পর আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় গিয়েছেন। তার সাথে মালিকের ভাই মোতাম্মিম বিন নুবিরাও ছিলেন। মদীনা পৌছে আবু কাতাদা সোজা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে চলে গেলেন। মালিকের হত্যা ও লায়লার সাথে খালিদের বিয়ের সম্পূর্ণ কথা তাঁকে শুনালেন। আর সাথে সাথে একথাও বললেন ঃ "আমি শপথ করেছি যে, ভবিষ্যতে কখনো খালিদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করবো না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কৃতিত্বে এ বিজয়াভিযানের জন্য খুবই প্রভাবিত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। আবু কাতাদাহর অভিযোগের প্রতি তিনি বেশী লক্ষ্যারোপ করলেন না। তিনি বললেন, ঐসব লোক সম্পর্কে এতো ঢালাও কথা বলা ঠিক নয়। খালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

একথার পরও আবু কাতাদাহর রাগ প্রশমিত হলো না। তিনি ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ওমরের কাছে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করলেন, যিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে ফরযকেও প্রাধান্য দেন না। প্রবৃত্তির বাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর হুকুমকে এড়িয়ে যায়। আবু কাতাদার বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব প্রভাবিত হলেন। আবু কাতাদাকে সাথে করে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলেন। এ অপরাধের জন্য তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পদচ্যুত করার দাবী জানালেন। তিনি আরো বললেন, খালিদের তরবারী এখন যুলুমের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাঁর শুধু পদচ্যুতিই যথেষ্ট নয়। তাঁকে গ্রেফতারও করতে হবে। কিন্তু আবু বকরের পক্ষে তার নিজের শাসকদের সাথে এমন আচরণ করা আদৌ পসন্দনীয় ছিলো না। ওমর খালিদের পদচ্যুতির জন্য চাপ দিতে থাকলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"ওমর ! ক্ষান্ত হও। খালিদ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে। এ চিন্তা-ভাবনায় ভুল হয়েছে, এটা ভিন্ন কথা।"

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ জবাবেও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি তাঁর দাবীতে বরাবরই অটল রইলেন। এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ

"ওমর ! এটা হতে পারে না। যে তরবারীকে আল্লাহ কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করার জন্য কোষমুক্ত করেছেন সে তরবারীকে আমি কোষবদ্ধ করতে পারি না।"

খালিদকে মদীনায় তলব

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ঘটনাকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ভালো চোখে দেখতেই পারলেন না। তাঁর ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মন পরিষ্কার হলো না। খালিদকে 'জবাবদিহি' করার জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চাপ দিতেই থাকেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ চাপের মুখে জবাবদিহি করার জন্য খালিদকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় পৌছে সোজা মসজিদে নবুবীতে চলে এলেন। তাঁর পরনে ছিলো একটি জিঙ্গারী 'কোবা' আর পাগড়ীতে বাঁধা ছিলো তীর। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে মসজিদে ঢুকতে দেখে তার পাগড়ী থেকে ঝাপটা মেরে তীর নিয়ে তীরটি টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং বললেন ঃ

"তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছো। তার বিধবাকে বিয়ে করেছো। আল্লাহর কসম আমি তোমাকে সংগেসার (পাথর মেরে হত্যা করা) করবো।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একেবারেই কিছু বললেন না। চুপ থাকলেন। কারণ, তাঁর খেয়াল ছিলো যে, তার ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুরও ঐ রায়ই ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘোষণা করলেন। যাহোক, অবশেষে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দরবারে হাজির হলেন এবং মালিক বিন নুবিরার পূর্বাপর সব ঘটনা তাকে বলে শুনালেন। কিভাবে সে নবুয়াতের বিষয় সাজ্জাহকে সহযোগিতা করেছে। তাকে কাবু করার পর যাকাতের ব্যাপারে সে কি টালবাহানা করেছে। এসব বিষয় তিনি পুংখানুপুংখ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে বর্ণনা দিলেন। তার হত্যার ব্যাপারে অবশ্য খালিদ ওজর পেশ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক এ ওজর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করলেন। যুদ্ধে সংঘটিত ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি তিনি ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু মালিকের বিধবা স্ত্রী লায়লাকে বিয়ে করার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। একেতো আরবরা নারীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনাটাকেই অপসন্দ করে। দ্বিতীয়তঃ ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের সাথে সহবাস করা লজ্জাজনক বলে মনে করে।

মালিক বিন নুবিরার ব্যাপারে খালিদের গৃহীত পদক্ষেপে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, তার বিস্তারিত বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় ব্যক্তিত্বই আপন আপন চিন্তা-ভাবনায় সঠিক ছিলেন। উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণের

www.pathagar.com

জন্যই ছিলো। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, উভয়ের এ মতভেদ কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে খালিদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না এর পেছনে ছিলো রাজনীতির কোনো মারপ্যাচ ?

খালিদের ব্যাপারে ওমরের পদক্ষেপ

আমার দৃষ্টিতে এ মতভেদের ধরন ছিলো রাজনৈতিক। আবু বকর ও ওমর উভয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। যে যেটাকে ঠিক মনে করেছেন সেটার উপরই জোর দিয়েছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের বাস্তব ছবি। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু একজন মুসলমানের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁর স্ত্রীকে বৈধব্য-ব্রত পালনের আগে বিয়ে করেছেন। তাই তাঁর মনে তাকে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্বে রাখা যায় না। কেননা, এতে মুসলমান ও মুসলিম সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। আর আরবে এদের এখন যে মর্যাদা ও সুখ্যাতি বিদ্যমান তা অবশিষ্ট থাকবে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা-ভাবনায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শুধু সেনাবাহিনীর পদ থেকে চ্যুত করলেই চলবে না। বরং লায়লাকে বিয়ে করার অপরাধে তাঁকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন ঃ যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে, মালিকের হত্যার ব্যাপারে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইজতেহাদী (জ্ঞান গবেষণামূলক) ভুল হয়েছে ; যদিও এর সম্ভাবনা নেই তবু তার স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারটার জন্য খালিদের উপর 'হদ' (শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি) জারী করা জরুরী। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে এ সাফাইকে তিনি কোনো ওজর হিসাবেই গণ্য করেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' খিতাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর তিনি এমন একজন সিপাহসালার যার পদতলে বিজয় আর বিজয় লুটিয়ে পড়েছে। খালিদের মতো ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এ ধরনের ত্রুটি হলে এবং তার প্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে তা হবে দীনের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়অনুপ্রবেশের রাজ দুয়ার খুলে দেয়া। মুসলমানরা আল্লাহর কিতাবের হুকুম-আহকামকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে সাহসী হয়ে উঠবে। তাদের মনে আল্লাহর হুকুমের প্রতি সম্মান অবশিষ্ট থাকবে না।

এসব খেয়ালের বশবর্তী হয়েই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময়ই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর চাপ দিতে থাকেন। তিনি যেন খালিদকে শাস্তিও দান করেন। এ কারণেই অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ডেকে আনেন এবং তাঁর কার্যক্রমের উপর পর্যালোচনা করে তাকে হুঁশিয়ার করে দেন।

খালিদের ব্যাপারে আবু বকরের দৃষ্টিভঙ্গি

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ছিলো, যে সময় মুসলমানদের উপর চারিদিক থেকে বিপদ আর সংকটের ঝড় বয়ে

www.pathagar.com

চলেছে ; গোটা আরবে কলহ-বিবাদ, বিদ্রোহ-বিদ্বেষ আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। কোনো সিপাহসালার এ সময় যদি কোনো এক ব্যক্তি অথবা কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এ জন্য খুব বেশী মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। এ নাজুক পরিস্থিতিতে কোনো সিপাহসালারকে কঠিন শাস্তি দেয়া, তার উপর আনীত অভিযোগ প্রচার করা, মুসলমানদের জন্য খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। তাঁর চিন্তায় পরাজিত দেশের কোনো বিধবা নারীকে তার ইদ্দাত (নির্দিষ্ট সময়সীমা) পার হবার আগে বিয়ে করা আরবের রীতিনীতির বিরুদ্ধ নয়। কেননা বিজিত দেশের নারীরা দাসী হিসাবে পরিগণিত হয়। এদের মালিকরা এদেরকে যে কোনোভাবে ব্যবহার করার অধিকার রাখে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, 'এ সময় খালিদের তরবারীর বড় প্রয়োজন ছিলো। কেননা মিথ্যা নবীর দাবীদার মুসাইলামা বনু হানিফার চল্লিশ হাজার শক্ত-সামর্থবান ব্যক্তি নিয়ে বাতাহার কাছে ইয়ামামায় অবস্থানরত ছিলো। এ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ইকরামা বিন আবু জেহেলকে সামরিক বাহিনী নিয়ে ওখানে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু মুসাইলামার হাতে পরাজিত হয়ে এসেছে। মুসলমানদের দৃষ্টি এখন খালিদের দিকে। মালিক বিন নুবিরার হত্যা ও তার স্ত্রীকে বিয়ে করা সত্ত্বেও খালিদকে এ অবস্থায় পদচ্যুত করা যায় না। কারণ, তাকে পদচ্যুত করা হলে মুসাইলামা মুসলিম বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর ইসলামও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতো। খালিদ আল্লাহর তরবারি এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মদীনায় তলব করে এনে মৌখিকভাবে ভর্ৎসনা করে ইয়ামামায় গিয়ে মুসাইলামার মুকাবিলা করার হুকুম দিয়ে দেন।

ইয়ামামার উপর খালিদের আক্রমণ

আমার মতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতপার্থক্যের এটাই হলো সঠিক ব্যাখ্যা। খালিদকে মদীনায় ডেকে এনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ামামায় মুসাইলামার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মদীনাবাসী বিশেষ করে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে এ নাজুক পরিস্থিতিতে খালিদের মতো বীর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন কতখানি ; তার উপস্থিতি যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে কিভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে—তা দেখিয়ে দেয়া। এদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও যুদ্ধের ময়দান থেকে ডেকে এনে হুঁশিয়ারী দেয়া এবং লায়লাকে তালাক দেবার হুকুম দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন।

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু তামিমে লায়লাকে যেভাবে বিয়ে করেছেন এভাবে ইয়ামামায়ও এক রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। এ জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ এসব ঘটনাকে রং ছড়িয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর নামে কুৎসা রটাতে চেষ্টা করেন। আর এদের চেয়ে বেশী চেষ্টা করেন ঐসব ঐতিহাসিকরা যারা রক্ষণাত্মক মনোভাব নিয়ে খালিদকে সবরকম বদনাম থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁকে নির্দোষ বলতে চান। তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওজুহাত পেশ করেন। এদের অবস্থা ওদের চেয়েও বিস্ময়কর। মালিকের হত্যা ও লায়লা বিনতে মোজায়ার সাথে খালিদের বিয়ের ঘটনা, ঐসব কর্মকাণ্ডের তুলনায় কিছুই নয় যা ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধে খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর হাতে সংঘটিত হয়েছিলো। তারা খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে সাইফুল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত হবার যোগ্যই মনে করেছেন।

মুসাইলামার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার হুকুম পাবার পর খালিদ মদীনা হতে বাতাহ ফিরে এলেন। এখানেও তারা আবু বকরের ওয়াদাকৃত সাহায্য পাবার অপেক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। এ সাহায্য পাবার পর খালিদ সামরিক বাহিনী নিয়ে মুসাইলামার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য রওনা হলেন। মিথ্যা নবীর দাবীদারদের মধ্যে মুসাইলামাই ছিলো সবচেয়ে শক্তিধর। এর বিদ্রোহই ছিলো আরব উপদ্বীপের ধর্মত্যাগীদের সকল বিদ্রোহ হতে বেশী বিপজ্জনক। মুসলমানরা তার তরফ থেকেই বেশী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা মনে করতো।

---

www.pathagar.com

৯

ইয়ামামার যুদ্ধ

মুসাইলামার বিরুদ্ধে খালিদের অভিযান

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রেরিত সমর সাহায্য নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ বাতাহ হতে মিথ্যা নবী মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামামার দিকে রওনা হলেন। যে সাহায্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু পাঠিয়েছেন, তা সংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মূল বাহিনী হতে কম ছিলো না। মুহাজির ও আনসার ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের অনেকেই এ বাহিনীতে উপস্থিত ছিলেন। তাই সব গোত্রের লোকই এতে শামিল ছিলেন, যারা আরবের বিখ্যাত যোদ্ধাদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সাবিত বিন কায়েস ও যায়েদ বিন মালিকের অধীনে ছিলেন আনসারগণ। আর আবু হুজাইফা বিন ওতবা ও যায়েদ বিন খাত্তাবের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন মুহাজিরগণ। অন্যান্য গোত্রেও আলাদা আলাদা সরদার ছিলো। ওদের সন্তোষজনক কার্যক্রমের জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এদের এসব পদে নিযুক্ত করেছেন। তিনি জানতেন, যুদ্ধের সময় মুসাইলামার চল্লিশ হাজার সৈন্য পাশাপাশি দাঁড়াবে এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল করার জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাবে। তাই মদীনার তরফ থেকেও উত্তম ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব ও যুদ্ধের পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিলো।

খালিদের জন্য হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে অনেক কুরআনে হাফেজ ও কারী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক সাহাবাও এতে উপস্থিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনি কোথাও না পাঠাবার নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। তিনি বলতেন, "আহলে বদরকে আমি যুদ্ধে ব্যবহার করবো না। তাঁরা তাদের নেক আমল সহকারে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাক—আমি তাই চাই। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর এ অবলম্বিত নীতি ভঙ্গ ও এ যুদ্ধের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে বদরে অংশগ্রহণকারী ও রাসূলের যুগে জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের একটা বিরাট অংশকেও এ সাহায্যকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেননা ইয়ামামায় মুসাইলামা কাজ্জাব যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় ও প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো। খুব সহজে সে বশ্যতা স্বীকার করার পাত্র ছিলো না।

মুসলমানদের অপূর্ব বিজয়

ইয়ামামায় মুসলমানদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে কোনো মামুলী বিজয় ছিলো না। ইয়ামামার অবস্থা ছিলো অন্যান্য গোত্রগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। মদীনার নিকটবর্তী

www.pathagar.com

গোত্রগুলো, যারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা হবার পর মদীনা অবরোধ করতে চেয়েছিলো, তাদের কেউ নবুয়াত দাবী করেনি। যাকাত হতে অব্যাহতি পাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো দাবী ছিলো না। উপরন্তু আদি বিন হাতেম নিজের গোত্রকে তোলাইহা আসাদীর সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে বেশ সফলতা লাভ করেছিলো। এর ফলে তার সৈন্যদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গিয়েছিলো। তারা দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারেনি। তার বাহিনীর একদল পলাতক সৈন্য উম্মে জুমালের সাথে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। কিন্তু পরাজিত বাহিনীর দ্বারা মুকাবিলা করার আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই উম্মে জুমালকেও পরাজিতই হতে হলো।

এখন অবশিষ্ট রইলো বনু তামিম। এদের মধ্যেও আবার মতবিরোধ দেখা দিলো। তারা মুসলমানদের সাথে আর কি মুকাবিলা করবে।

সাজাহর শক্তি, সাহস ও হিম্মত ভেঙ্গে দিয়েছিলো মালিক বিন নুবীরা। মদীনা আক্রমণ করার ইচ্ছাই সে ছেড়ে দিয়েছে। মালিক বিন নুবীরাও মুসলমানদের ব্যাপারে শংকিত ছিলো। খালিদের মুকাবিলা করার সাহস হিম্মতই সে খুইয়ে বসেছে।

এসব লোকদের বিপরীত মুসাইলামা ও ইয়ামামায় তার অনুসারীরা মূলতই বিশ্বাস করতো না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তারা মনে করতো কুরাইশদের মতো নবুয়াত ও রিসালাতে তাদেরও অধিকার আছে। আরবে তাদেরও সেই মর্যাদাই আছে যে মর্যাদার অধিকারী কুরাইশরা। তাদের সৈন্য সংখ্যা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তাছাড়াও তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ একতা বিদ্যমান। পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মোটেই নেই। আকীদা-বিশ্বাস ও গোত্রীয় মতবিরোধ তাদের মধ্যে মোটেই নেই। এসব কারণে মুসাইলামা নিজকে খুবই শক্তিশালী মনে করতো। তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো সফলতার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করে যেতে পারবে।

ইকরামার পরাজয়

হযরত আবু বকর আনহুর দূরদৃষ্টির মধ্যে এসব অবস্থা বিদ্যমান ছিলো। এ কারণেই ইয়ামামায় প্রেরিত বাহিনীকে খুবই শক্তিশালী করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর এগারটি বাহিনী গঠন করেছিলেন। প্রত্যেক বাহিনীকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন গোত্রের দিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুসাইলামার ব্যাপারে তিনি তা করেননি। বরং তার দিকে ইকরামা বিন আবু জেহেলকে পাঠালেন। তার পেছনে পেছনে শোরহাবিল বিন হাসানাকে একটি বাহিনী সহকারে ইকরামার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইকরামা ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হয়ে চলছেন। তিনি শোরহাবিলের পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, মুসাইলামার উপর বিজয় লাভ করার গৌরব তার একারই থাকুক। ইকরামা ছিলেন একজন যুদ্ধবিশারদ, অভিজ্ঞ এবং শত্রু পক্ষকে হিসাবে না

www.pathagar.com

আনার মতো অশ্বারোহী বীরযোদ্ধা। তার বাহিনীতে বড় বড় অনেক এমন বীরযোদ্ধাও ছিলেন, যারা অতীতের অনেক যুদ্ধে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু এরপরও তারা মুসাইলামার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে সক্ষম হননি। বনু হানিফা তাদেরকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। পরাজয়ের সব ঘটনা লিখে ইকরামা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খবর পাঠালেন। চিঠি পড়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাগের অবধি রইলো না। তিনি ইকরামাকে লিখলেন ঃ

"হে ইবনে উম্মে ইকরামা ! আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না। তুমি ফিরে এসে মানুষের মন দুর্বল করে ফেলার কারণ হয়ে উঠো না। বরং হুজাইফা আর আরফাজার কাছে গিয়ে তাদের সাথে মিলে ওমান ও মোহরাবাসীদের সাথে লড়াই করো। এরপর ওখান থেকে ইয়েমেন ও হাজরামাউত গিয়ে মুহাজির বিন আবু উম্মিয়ার সাথে মিলে যাও এবং তাদের পাশাপাশি ধর্মত্যাগীদের সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করো।"

এ চিঠিতে যে চাপা রাগ, ক্রোধ ও অভিমান লুকায়িত আছে, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। 'ইকরামার মার ছেলে' (ইবনে উম্মে ইকরামা) সম্বোধনেই তা প্রকাশ পায়।

মুসাইলামার শক্তির উৎস

প্রশ্ন উঠে, মুসাইলামা এত শক্তি সঞ্চয় করলো কিভাবে ? তার শক্তির উৎস কোথায় ? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ জীবনে বনু হানিফার একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মুসাইলামা মদীনা এসেছিলো। দলের সব লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলো। তাদের সাথে মুসাইলামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতে পারেনি। কারণ, জিনিস-পত্রের পাহারার জন্য তাকে ক্যাম্পে রেখে আসা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে কিছু উপঢৌকন দিলে তারা তাঁর কাছে মুসাইলামার অংশ চাইলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে মুসাইলামার অংশও দিলেন এবং বললেন ঃ

"সেতো মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে কম নয়।"

এর অর্থ ছিলো, তার তো মর্যাদা এত কম নয় যে, তোমরা তাকে ক্যাম্পের পাহারায় রেখে আসবে।

শুধু একথা পেশ করে মুসাইলামা নবুয়াতের দাবী উত্থাপন করতে পারতো না। আর এ জন্যই প্রথম প্রথম খুব কম মানুষই তার কথায় কান দিয়েছে। দু' বছর সময়ে হাজার হাজার মানুষকে নিজের দলে ভিড়ানোই কোনো মোজেযা হতে পারে না। এটা তো শুধু যাদুকরীর একটা গোলক ধাঁধা মাত্র।

মুসাইলামার শক্তি-সামর্থ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি করেছে তার সাথে 'নাহারুর রেজাল' এর একত্রিকরণ। এ ব্যক্তির নাম ছিলো 'নাহারান আর-রেজাল' অথবা 'নাহারুর

www.pathagar.com

রেজাল' বিন আনফুহ। সে এ এলাকারই বাসিন্দা ছিলো। হিযরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মদীনায় চলে এসেছিলো। এখানে কুরআন শিখেছে। দীনি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। যেহেতু সে খুব মেধাবী ছিলো, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামামাবাসীদেরকে দীনের শিক্ষা দেয়ার ও মানুষকে মুসাইলামার অনুসরণ থেকে বিরত রাখার জন্য ওখানে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে মুসাইলামা হতেও বেশী কলহ, বিদ্রোহ ও ফেতনাবাজ প্রমাণিত হলো। মানুষদেরকে মুসাইলামার অনুসারী হতে দেখে তাদের চোখে নিজেকে বড় করে তুলে ধরার জন্য সে তার সাথে মিশে গেলো। মুসাইলামার নবুয়াতকে স্বীকার করার সাথে সাথে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে একটা মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিলো, মুসাইলামাকে তাঁর সাথে নবুয়াতকে শরীক করা হয়েছে। ইয়ামামাবাসীদের জন্য এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাথীই মুসাইলামার নবুয়াতের সাক্ষী দিচ্ছে। আর সে ব্যক্তি কোনো সাধারণ মানুষ নয়। বরং একজন জ্ঞানী, মেধাবী এবং ফেকাহবিদ। তাদের সামনে কুরআন পড়ে, কুরআনের তালিম দিচ্ছে। দীনের শিক্ষা দিচ্ছে। এখন সে নিজেই মুসাইলামার নবী হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই তার নবুয়াতকে অস্বীকার করার আর অবকাশ কোথায় ? দলে দলে মূর্খ লোকেরা মুসাইলামার কাছে এসে বনু হানিফার নবী হিসাবে তার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে লাগলো। এভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তার শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেলো।

এ সেবার পুরস্কার হিসাবে মুসাইলামা 'নাহারুর রেজালকে' নিজের বিশেষ নির্ভরযোগ্য লোক হিসাবে গ্রহণ করলো। ফলে গোটা দুনিয়ার নেয়ামাত সে পেতে শুরু করলো। মুসাইলামা হতে প্রাণ ভরে পুরস্কার লাভ করতে লাগলো। একজন বিজ্ঞ ও প্রতিভাধর হবার পরও যদি দুনিয়ার কিছুদিনের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমন লাঞ্ছিত ধরনের তোষামোদ, নবী হবার মতো জঘন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহলে সাধারণ লোকদের ব্যাপারে আর আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে ? তারা যতো কিছুই করুক, তা ঐ তুলনায় নগণ্য বলেই গণ্য হবে।

মুসাইলামার মোজেযা দেখার ব্যাপারে ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। মোজেযা দেখেও কেউ তাকে মেনে নেয়নি। আর তার বানোয়াট অহী থেকে প্রভাবান্বিত হয়েও কেউ তার উপর ঈমান আনেনি। নবুয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামার জমজমাট ব্যবসা জমার মূল কারণই হলো 'নাহারুর রেজাল' য। আগে বর্ণিত হয়েছে।

মুসাইলামার প্রতি আনুগত্যের কারণ

সাধারণ মানুষ তো মূর্খ। তারা সত্য অসত্য সম্পর্কে সহজে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। কিন্তু যারা জাতির বিবেক ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে পরিচিত তাদের বুদ্ধিজ্ঞানের উপর কেমন তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। তারা অন্ধভাবে মুসাইলামার আনুগত্য করা শুরু করলো। এ ব্যাপারে নিগূঢ় সত্য প্রকৃতপক্ষে নিহিত অন্য

www.pathagar.com

জায়গায়। আরবদের গোত্রীয় আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার অনুভূতি ছিলো খুব প্রকট। নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকরা বলেন, তোলাইহা নিমেরী একবার ইয়ামামায় এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"মুসাইলামা কোথায় ?"

লোকেরা বললো ঃ

"তুমি এমন অসৌজন্য ও বেয়াদবীর সাথে তার নাম ধরে কথা বলছো অথচ তিনি আল্লাহর রাসূল।"

"আমি তো তার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তাকে রাসূল মানতে তৈরি নই। তোমরা আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।"

মুসাইলামার কাছে পৌছে তোলাইহা তাকে বললো ঃ

"তোমার কাছে কে আসে ?

মুসাইলামা জবাব দিলো—"রহমান।"

"আলোতে আসে না অন্ধকারে।"

"অন্ধকারে।"

তারপর তোলাইহা বললো ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি মিথ্যাবাদী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী। কিন্তু আমাদের নিজেদের মিথ্যাবাদী আমার কাছে অন্যদের সত্যবাদী অপেক্ষা অনেক প্রিয়।"

বস্তুত তোলাইহা মুসাইলামার আনুগত্য গ্রহণ করলো। আর তার পথে লড়াই করে নিহত হলো।

মুসাইলামার শক্তি বেড়ে যাওয়া ও ইকরামার পরাজয় বরণ করার পর তাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদকে ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্য খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই তিনি শোরহাবিল বিন হাসানাকে জানিয়ে দিলেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ তার কাছে পৌছার আগ পর্যন্ত সে যেখানে আছে ওখানেই থাকবে। মুসাইলামার ওখান থেকে অবসর হবার পর সে ওমর বিন আসের কাছে চলে যাবে। উত্তর অঞ্চলে কাজয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে।

শোরহাবিলের পরাজয়

এখনো হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার পথে, এ সময়ে মুসাইলামা শোরহাবিলের বাহিনীর সাথে টক্কর লাগিয়ে পিছু হটিয়ে দিলো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, শোরহাবিলও ইকরামার মতো মুসাইলামার উপর বিজয়ের

www.pathagar.com

গৌরবের একক অধিকারী হবার জন্য আগে অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু তাকে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হয়। তারপরও আমার মনে হয়। ইয়ামামা বাহিনী, শোরহাবিল ও খালিদের বাহিনী সহ একত্র হতে পারলে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে ভয়ে আগে বেড়ে তার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে এবং তাদেরকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দেয়। ব্যাপার যাই হোক, শোরহাবিল তার বাহিনী নিয়ে পেছনে চলে আসে। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে শোরহাবিলের সাথে একত্রিত হয়ে সব ঘটনা শুনে তাকে তিরস্কার করেন। তার মনে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি না থাকলে, বাঞ্ছিত শক্তি এসে যোগ হবার আগে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া উচিত। তা না হলে যুদ্ধে পরাজিত হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। পরাজয় বরণ করার চেয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়াই উত্তম।

খালিদের সাথে মোজায়ার যুদ্ধ

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মুসাইলামা খালিদের গতিবিধি সম্পর্কে সব খবর পেতো। এরই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটলো। বনু হানিফার জনৈক ব্যক্তি—মোজায়া বিন মারারা, বনী আমের ও বনী তামিমের কিছু লোকের কাছে নিজের কোনো আত্মীয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য কিছু সঙ্গী-সাথী নিয়ে বেরিয়ে ছিলো। তার ধারণা ছিলো, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সে সেই গোত্রে গিয়ে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ফিরে আসছিলো। এরা ছানিয়াতুল ইয়ামা পৌছার পর ক্লান্তিজনিত কারণে অচেতন ভাবে ঘুমিয়ে পড়লো। এরই মধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী ওখানে পৌছে গেলো। মোজায়ার লোকেরা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে যায়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানলেন এরা বনু হানিফার লোক। তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে নেমেছে ভেবে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের হত্যা করার হুকুম দিলেন। তারা বললো, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। বরং বনী তামিম গোত্রের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে বের হয়েছি। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি?"

তারা বললো ঃ

"একজন রাসূল আমাদের মধ্যে আর একজন রাসূল তোমাদের মধ্যে।"

এ উত্তর শুনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন।

এ ঘটনার সময় এক ব্যক্তি সারিয়া বিন আমের, তরবারী তার গলা স্পর্শ করবে এ মুহূর্তে মোজায়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললো ঃ

"তোমরা যদি তোমাদের কল্যাণ চাও, তাহলে এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও।"

একথা শুনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মোজায়াকে হত্যা করলেন না। বরং জামানত হিসাবে নিজের কাছে রেখে দিলেন। কারণ, এ ব্যক্তি বনু হানিফার একজন বড় সরদার। তারা তাকে বেশ ইজ্জত করতো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.pathagar.com

ভেবেছিলেন, ভবিষ্যতে এর দ্বারা কোনো কাজ হতে পারে। লোহার শিকলে বেঁধে তাকে নিজেদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো। খালিদের স্ত্রী লায়লা উম্মে তামিমকে তার দেখা শুনার দায়িত্ব দেয়া হলো।

খালিদ মুসাইলামার যুদ্ধ

ইয়ামামার একপাশে আকরাবা নামক স্থানে মুসাইলামা তার সেনাবাহিনী জমায়েত করলো। এর পেছনে রাখলো রসদপত্র সহ সব জিনিস। তার সৈন্য সংখ্যা ছিলো চল্লিশ কিংবা সত্তর হাজার। এতবেশী সৈন্য সংখ্যার কথা আরববাসীরা খুব কমই শুনেছে।

মোজায়াকে গ্রেফতার করার দিন খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসাইলামার বাহিনীর মুকাবিলায় নেমে গেলেন। উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়ে শুধু ঘোষণার অপেক্ষায়। উভয় পক্ষেরই বিজয় তাদের ভাগ্যে আসবে ও অপর পক্ষকে পরাজিত করবে শোচনীয়ভাবে—এ প্রত্যয়দীপ্ত চেহারা।

ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যুদ্ধ হিসাবে ইতিহাসে এক অনন্য দিন। কারণ, এ দিনটি ছিলো ইসলাম আর মিথ্যা নবীর শেষ মুকাবিলার দিন।

ইয়েমেন, আমনান, মোহরা, বাহরাইন, হাজরামাউত ও আরবের দক্ষিণাঞ্চল, মক্কা, তায়েফ হতে ইডেন উপসাগর পর্যন্ত গোটা এলাকার লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মুসাইলামার উপর। ইরানীরাও প্রত্যাশার দৃষ্টি হেনে এ যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে। মুসাইলামার উপর তার বাহিনীর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো। তার প্রদর্শিত পথে তারা যে কোনো আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত। তাছাড়াও হেজায ও আরবের দক্ষিণ এলাকার আন্তঃশত্রুরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনু হানিফার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলিম বাহিনীও আকারে-আকৃতিতে কম শক্তিশালী ছিলো না। তাদের সেনাপতি ছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদ। আর নিসন্দেহে তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। ইসলামী বাহিনীতে কুরআনে হাফেজ ও ক্বারীদের কোনো অভাব ছিলো না। আল্লাহর রাহে জিহাদ আর তার দীনের অন্তরায় দমন হলো মু'মিনের জিন্দিগীর সর্বপ্রথম ফরয—এ অনুভূতি নিয়েই তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন লোকদের জন্য এটা হলো ফরযে আইন। এ আবেগ অনুভূতি তাদের মনের উচ্ছাস অভিলাসকে বাড়িয়ে দিয়েছিলো। ধর্মত্যাগীদের চেয়ে সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়তা ও সাহসে-হিম্মতে তারা ছিলো অনেক বলিয়ান।

মুসাইলামার পুত্রের অগ্নিঝরা ভাষণ

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বক্ষণে মুসাইলামার ছেলে, বনু হানিফার বাহিনীর সারিতে ঘুরে ঘুরে তাদের শৌর্যবীর্য মান-মর্যাদা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে দিতে বললো ঃ

www.pathagar.com

"হে বনু হানিফা ! আজ তোমাদের ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্যাদার পরীক্ষার দিন। যদি তোমরা পরাস্ত হও তাহলে তোমাদের পরে তোমাদের নারীদেরকে বানানো হবে ক্রীতদাসী। তাদেরকে জোর করে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং নিজেদের বংশ গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মুসলমানদের সাথে আপ্রাণ লড়ে যাও। নিজেদের নারী সমাজের মর্যাদা রক্ষা করো।"

এদিকে দুর্ভাগ্যবশত মুহাজির, আনসার ও বেদুঈনদের মধ্যে বিতর্ক লেগে বসেছে যে, কে বড় বাহাদুর। মুহাজির ও আনসাররা বলতো ঃ

"আমরা বেদুঈনদের অপেক্ষা বেশী সমর বিশারদ।"

বেদুঈনরা বলতো ঃ

"মক্কা-মদীনার লোকেরা অবশ্যই ভাল যুদ্ধ করতে জানে না। তারা তো যুদ্ধ কাকে বলে তাও জানে না।"

মুসলমানদের উপর বনু হানিফার চাপ

এসব বিতর্কের ফল হলো, যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা বনু হানিফার চাপের মুখে দৃঢ়তার প্রমাণ রাখতে পারলো না। তাদেরকে অবস্থার চাপে পিছু হটে আসতে হয়েছে। এমন কি বনু হানিফা খালিদের খিমা পর্যন্ত এসে পৌঁছে গিয়েছিলো। তারা সেখানে মোজায়াকে শিকলে বাঁধা ও লায়লা উম্মে তামিমকে তার পাহারায় নিযুক্ত দেখতে পেলো। এক ব্যক্তি লায়লাকে হত্যা করার জন্য তরবারী নিয়ে উদ্যত হলে মোজায়া চীৎকার করে বললো ঃ

"থামো ! আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং পুরুষদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো।"

সৈন্যরা তাবুর রসিগুলো কেটে দিলো। তাবুকে তরবারী দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কিন্তু তারা মোজায়াকে মুক্ত করলো না। তারা আশা করেছিলো মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে আবার ফিরে আসবে। তাই তারা মোজায়াকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় রেখেই চলে গেলো।

নাহারুর রেজালকে হত্যা

পেছনে হটে আসা সত্বেও প্রথম হামলায়ই মুসলমানরা বনু হানিফার শত শত লোককে হত্যা করে ফেলেছেন। এ নিহতদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিই ছিলো নাহারুর রিজাল। এ ছিলো বনু হানিফার অগ্রগামী দলে নিযুক্ত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই যায়েদ বিন সাবেত তাকে হত্যা করে। তার হত্যায় মুসাইলামা কলহের একজন বড় নায়কের অবসান ঘটলো।

খালিদের রণকৌশল

খালিদের বাহিনী পেছনে সরে আসার পরও তার দৃঢ়তা, সাহস-হিম্মত ও মনোবলে মোটেও ভাটা পড়েনি। এক মুহূর্তের জন্যও তার মনে পরাজয়ের ধারণার

www.pathagar.com

উদয় হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্রের অহংবোধ, শৌর্যবীর্যের অহমিকাই এ দুর্বলতার মূল কারণ—একথা তিনি আঁচ করে ফেলেছিলেন এবং সাথে সাথেই বাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ

"হে মুজাহিদগণ ! ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ো এবং এ অবস্থায়ই শত্রুদের সাথে লড়ে যাও। তাহলে আমি দেখতে পাবো তোমাদের কোন্ গোত্র যুদ্ধে বাহাদুরীর শ্রেষ্ঠ নমুনা প্রমাণ করতে পেরেছো।"

মুজাহিদদের অটুট মনোবল ও দৃঢ়তা

খালিদের এ ছোট ভাষণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের প্রাধান্য ও বাহাদুরী প্রমাণের জন্য আগের চেয়েও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে শত্রুর মুকাবিলা শুরু করে দিলো। অবশেষে মুসলমানরা যুদ্ধের শুরুতে নিজেদের অহংকার অহমিকা প্রকাশের বিষয়টাকে অসমীচীন বলে মনে করেছে। সুতরাং আনসারদের একজন নেতা সাবিত বিন কায়েস মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানগণ ! তোমরা অনেক বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছো।"

এরপর ইয়ামামার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ ! এরা যার ইবাদাত করে তার থেকে আমি দায়িত্ব মুক্ত হবার কথা ঘোষণা করছি।"

আবার মুসলমানদের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ

"আর এরা যাকিছু করেছে তার উপরও আমি অসন্তুষ্ট।"

এরপর তিনি তরবারী উচিয়ে শত্রু সৈন্যদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। তিনি লড়ে যেতে ছিলেন আর বলছিলেন ঃ

"আমার তরবারীর আঘাতের স্বাদ আস্বাদন করো। আমি তোমাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার খাঁটি নমুনা দেখাবো।"

এমন হৃদয়হীনভাবে তিনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তার শরীরের এমন কোনো অংশ ছিলো না যাতে অস্ত্রের আঘাত পড়েনি। অবশেষে এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

বাররা বিন মালিক আরবের ঐসব সম্মানিত ও বাহাদুর ব্যক্তিত্বদের মধ্যে গণ্য ছিলেন যারা যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে জানতো না। তিনি মুসলমানদেরকে পেছনে সরে আসতে দেখে দ্রুত তাদের সামনে এসে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা ! আমি বাররা বিন মালিক। তোমরা আমার অনুসরণ করো।"

তাঁর বীরত্ব ও সাহসীকতা সম্পর্কে মুসলমানরা আগেই অবহিত ছিলেন। তাদের একটি দল বাররার সাথে অংশ নিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা

www.pathagar.com

করতে এগুলেন। এমন বাহাদুরীর সাথে তিনি লড়লেন যে, শত্রুরা পেছনে সরতে বাধ্য হলো।

তুমুল যুদ্ধ চলছে। ঠিক এ সময়েই ভয়াবহ ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলো। ঝড়ে বালু উড়ে এসে মুসলমানদের চেহারার উপর পড়তে লাগলো। কিন্তু লোক এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে যায়েদ বিন খাত্তাবকে বললেন ঃ এখন আমরা কি করবো ? তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! আজ আমি ঐ পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিতে না পারি। হে আল্লাহ ! এর আগে তুমি আমাকে শাহাদাত দান করো না। হে মানুষেরা ! ঝড়ো হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের নজর নীচের দিকে করে নাও এবং অবিচলভাবে লড়ে চলো।"

একথা বলে যায়েদ বিন খাত্তাব তরবারী কোষমুক্ত করে শত্রু সেনাদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। হৃদয়হীনভাবে চালাতে লাগলেন তরবারী। তাঁর দলও তাঁর পেছনে পেছনে দৃঢ়তার সাথে লড়ে চলছিলো। অতপর তাঁর মুখ নিসৃত কথা কবুল হয়ে গেলো। তিনি এভাবে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হলেন।

আবু হুজাইফা ডেকে ডেকে বলছিলেন ঃ

"হে কুরআনের বাণী বাহকের দল ! তোমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে কুরআনের মর্যাদা প্রদর্শন করো।"

তারপর নিজেও শত্রুসেনার ভিতরে ঢুকে পড়লেন। লড়াই করতে করতে আবু হুজাইফাও শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদাতের পর ইসলামের পতাকা তাঁর গোলাম সালেম উঠিয়ে নিয়ে বললেন ঃ

"আজ যদি অবিচল না থাকি, তাহলে আমি আমাকে একজন নিকৃষ্টতম কুরআনের বাণীবাহক হিসাবে প্রমাণিত করবো।"

বস্তুত সালেমও তুমুল যুদ্ধ করে শহীদ হলেন।

এসব আহ্বান, ঈমান ও বিশ্বাসে ভরপুর হৃদয় থেকে বের হয়ে আসছিলো যা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বাহাদুরীর এক নতুন প্রেরণা জাগ্রত করে দিলো। তাদের দৃষ্টিতে জীবন তুচ্ছ হয়েই রয়ে গেলো। শাহাদাতের অভিলাষ প্রত্যেকটি হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। বস্তুত মুসলিম বাহিনীর অকুণ্ঠিত চিত্তে হৃদয়হীনভাবে লড়াইর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসাইলামার বাহিনীকে তাদের আগের অবস্থানে এনে ঠেকিয়ে দিলো।

মুসলমানরা যুদ্ধ করছে দীনে হকের সংরক্ষণ ও জান্নাত লাভের জন্য। আর মুসাইলামার বাহিনী যুদ্ধ করছে জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণ বংশীয় গৌরব রক্ষার মতো দুর্বল বিশ্বাসের জন্য। এ জন্যই মুসলমানরা বনু হানিফার চেয়ে বেশী অটল ও অবিচলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে এবং দ্বিধাহীনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

মুসাইলামার হত্যার পেছনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদের উত্তেজনা ও উৎসাহ ব্যঞ্জক আহবান শুনে দৃঢ় আস্থা পোষণ করলেন, বনু হানিফার কঠিন প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও শেষ পরিণাম— বিজয়ের গৌরব মুসলমানদের ভাগ্যেই আসবে। কিন্তু তিনি এ বিজয় যতটুকুন সম্ভব সত্বর ঘটুক তা চাইতেন। তাই তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সমরবিদের দৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন, মুসাইলামার নিরাপত্তা বেষ্টনি খুবই শক্তিশালী। তাঁর নিরাপত্তার জন্য বনু হানিফার লোকেরা মরতেও রাজী। তাই বিজয়ের গৌরব দ্রুত ছিনিয়ে আনতে হলে মুসাইলামাকে তাড়াতাড়ি হত্যা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি নিশ্চিত। সুতরাং তিনি তার বাহিনী সহকারে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসাইলামার নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ঘিরে ফেললেন। মুসাইলামাকে শেষ করে দেবার জন্য কিভাবে হাতের কাছে পাওয়া যায় তিনি সে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু মুসাইলামাকে হাতে পাবার আগেই তার বাহিনী বরং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আক্রমণ করে বসলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তারা পাবে কোথায়, বরং যেই তার সামনে আসতো জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারতো না। এভাবে মুসাইলামার অসংখ্য লোক নিহত হয়ে গেলো।

মুসাইলামা সাথীদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে দেখে নিজে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর আক্রমণ করতে চাইলো। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর আক্রমণ করতে চাইলে সে নিশ্চয়ই মারা পড়বে ভেবে তা আর করতে সাহস পেলো না। এখন তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার অন্ত রইলো না। তার জানবাজরা তার সামনেই কচু কাটা হয়ে মাটিতে পড়ছে। সে নিজেও তার চোখের সামনে মৃত্যুর পরওয়ানা দেখতে লাগলো। তার এ উদ্বিগ্নতার ভিতর দিয়েই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সাথীদের নিয়ে আকস্মিকভাবে মুসাইলামার নিরাপত্তা প্রহরীদের উপর তীব্র হামলা চালালেন। এ দৃশ্য দেখে মুসাইলামার সাথীরা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"বিজয়ের ব্যাপারে আপনি যে ওয়াদা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন তা আজ কোথায় ?"

মুসাইলামার পলায়ন

মুসাইলামা তার সব সাহস, শক্তি ও হিম্মত হারিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের মনস্থ করলো। সুতরাং সে যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে যেতে যেতে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলো ঃ

"নিজেদের বংশ মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য তোমরা প্রাণপণ লড়াই করতে থাকো।"

কিন্তু যেখানে তাদের নেতা তাদেরকে মুসলমানদের তরবারীর নীচে সমর্পণ করে কাপুরুষতার প্রমাণ বয়ে পলায়ন করবে, সেখানে তারা আর কি লড়াই করবে ?

www.pathagar.com

বনু হানিফার এক নেতা মোহকাম বিন তোফায়েল যখন দেখলো তাদের লোকেরা পলায়ন করছে, আর মুসলিম বাহিনী তাদের ধাওয়া করে ছুটছে, চীৎকার করে বলতে লাগলো ঃ

"হে বনু হানিফার দল ! বাগানে প্রবেশ করো।"

এ বাগানকে হাদিকাতুর রহমান বলা হয়ে থাকে। এ বাগান ছিলো যুদ্ধের ময়দানের সংলগ্নই। এর মালিক ছিলো স্বয়ং মুসাইলামা। বেশ প্রশস্থ ছিলো বাগানটি। আর দুর্গের মতো এর চারিদিকে ছিলো সুউঁচু দেয়াল ঘেরা। মোহকামের চীৎকার শুনে সকলে ওর ভিতরে ঢুকে পড়লো। এর ভেতরে মুসাইলামা আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু মোহকাম নিজে কিছু সাথী নিয়ে মুসলমানদেরকে বনু হানিফার পেছনে ধাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের ময়দানেই রয়ে গেছে। সে বেশ বাহাদুরীর সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। অবশেষে আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর একটি তীরের আঘাত বুকে লাগলে সে প্রাণ ত্যাগ করলো।

বাগান অবরোধ

মুসাইলামা ও তার গোত্রের লোকেরা বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পূর্ণ বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত ওখানে অবস্থান গ্রহণ ও বাগান অবরোধ করে রাখা ছাড়া মুসলমানদের কোনো উপায় ছিলো না। তাই বাগান চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো। তাঁরা প্রাচীরের এমন কোনো দুর্বল স্থান খুঁজতে লাগলেন যাতে সেখান দিয়ে বাগানের ভেতর ঢুকে মূল গেট খুলে দিতে পারেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও দুর্বল কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া গেলো না।

অবশেষে বারায়া বিন মালিক বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা ! এখন তোমরা উঁচুতে উঠিয়ে আমাকে প্রাচীরের ভেতর ফেলে দাও। আমি ভেতরে প্রবেশ করে ফটক খুলে দেই। এছাড়া তো আর কোনো পথ খুঁজে পাই না।"

কিন্তু মুসলমানরা তা করতে রাজী হলো না। তারা কি করে তাদের একজন সম্মানীত ভাইকে হাজার হাজার শত্রুর মধ্যে তাঁর জীবন শেষ করে দেবার জন্য ফেলে দিতে পারে। কিন্তু বারায়া বার বার বলতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা আমাকে ফেলে দাও।"

অবশেষে মুসলমানরা তাঁকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাচীরের উপর দিয়ে বাগানে ফেলে দিলেন। প্রাচীরের উপর উঠে দুশমনদের এত লোককে একত্রে দেখে ক্ষণিকের জন্য তার প্রাণ কেঁপে উঠলো। অতপর আল্লাহর নাম নিয়ে বাগানের গেটের সামনে লাফিয়ে পড়লেন। দু' হাতে দু'দিকে ডানে বামে তরবারী চালিয়ে শত্রু সৈন্য নিধন করতে করতে বারায়া বিন মালিক গেটের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশজন শত্রু সৈন্য খতম করে তিনি ঝড়ের বেগে প্রাচীরের ফটক খুলে দিতে সমর্থ হলেন।

www.pathagar.com

বনু হানিফার হত্যা

ফটক খোলার উদগ্র অপেক্ষায় মুসলমানরা বাইরে প্রস্তুত। ফটক খোলা মাত্রই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারী উঁচিয়ে শত্রুদের নিসংকুচিতভাবে হত্যা করতে লাগলেন। বনু হানিফা পলায়নের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। আজ তার পালাবার জায়গা কোথায়? বাগান থেকে বের হবার পথ অবরুদ্ধ। ফলে হাজার হাজার শত্রু সেনা মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। কসাইখানায় যেমন পশুকে উপায় অন্তর না পেয়ে ছুরির নীচেই মাথা পেতে দিতে হয় ধর্মত্যাগীদেরও হলো আজ সে একই অবস্থা।

আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বারায়া বিন মালিক আরো ক'জন সাথী দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে দরযার দিকে অগ্রসর হলেন। প্রায় দরযার কাছে প্রাচীর ভেদ করার ফলে তিনিই লড়াই করে করে সর্বপ্রথম ফটক খুলে দিতে সমর্থ হয়েছেন। বনু হানিফা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের রোখার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা তীর নিক্ষেপ করে করে তাদেরকে মুসলমানদের থেকে দূরে রাখলেন।

মুসাইলামার হত্যা

মুসলমানরা বাগানে ঢুকে বনু হানিফাকে নিঃশব্দে হত্যা করা শুরু করেছিলেন। বনু হানিফাও বেশ বাহাদুরীর সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তারা টিকে থাকতে পারেনি। উভয় পক্ষের অনেক মানুষ এ সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। কিন্তু ধর্মত্যাগী বনু হানিফার মুসলমানদের চেয়ে বিশ গুণ বেশী লোক মারা গেছে। ওহোদের যুদ্ধে হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবকে হত্যাকারী ও মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী হাবশী গোলাম 'ওয়াহশী' এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসাইলামাকে বাগানে দেখতে পেলেন। তার নিজের ছোট নেজাটি তাক করে মুসাইলামর দিকে নিক্ষেপ করলেন। নেজাটি সোজা গিয়ে তার গায়ে বিদ্ধ হলো। ঠিক এ সময় একজন আনসারীও তার উপর তরবারীর আঘাত হানলেন। ওয়াহশী বলতেন, "আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের মধ্যে কে মুসাইলামাকে হত্যা করেছে। কিন্তু মুসাইলামা যদি মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হতো তাহলে অবশ্যই বলতো, তাকে কৃষ্ণকায় চেহারার গোলামটাই হত্যা করেছে।"

মুসাইলামার মৃত্যু সংবাদ শুনে বনু হানিফা সাহস হিম্মত হারিয়ে ফেললো। মুসলমানরা পাইকারীভাবে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করলো। আরবে ঐ পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, ইয়ামামার যুদ্ধের চেয়ে বেশী হত্যাযজ্ঞ আর কোনো যুদ্ধেই সংঘটিত হয়নি। এজন্যই মুসাইলামার বাগান হাদিকাতুর রহমানের নাম "হাদিকাতুল মাউত" পড়ে গিয়েছিলো। ইতিহাসের বইতে আজও এ নামেই ডাকা হয়।

বাগানের সব কাজ সমাপনের পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর তাবু হতে মোজায়াকে নিয়ে আসলেন। নিহত ব্যক্তিদের দেখিয়ে তিনি মুসাইলামার লাশ সনাক্ত করার জন্য বললেন। মুসলমানরা নিজেও ঘুরে ঘুরে নিহতদের লাশ সনাক্ত করতে লাগলেন। তারা যখন মোহকামুল ইয়ামামার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.pathagar.com

"ইনিই কি তোমাদের নেতা ?"

মোজ্জায়া জবাব দিলো, 'না' ইনি তো মোহকামুল ইয়ামামা। মুসাইলামা হতে অনেক উত্তম ও নেক লোক ছিলেন তিনি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে জাফরানী রংয়ের পোশাক পরা লাশের কাছে পৌঁছে মোজায়া বললো, "এইতো মুসাইলামা" যাকে তোমরা হত্যা করেছো।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"এ সেই ব্যক্তি যে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে একটি বিরাট কলহের জন্ম দিয়েছিলো।"

পলায়নপরদের ধাওয়া ও অবরোধ

মুসাইলামার ফেতনার অবসান ও স্বয়ং তার হাজারো সাথী সহ নিহত হবার পরও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শান্ত হতে পারছিলেন না। কারণ, শত্রুদের তরফ থেকে বিরোধিতা মূলক আচরণের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলেও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে ছেড়ে দিতেন না। এটা ছিলো তার একটি রণনীতি। তিনি তোলাইহার পলায়নের পরও উম্মে ইয়ামান ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়া পর্যন্ত বনু আসাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে দেননি। বনী তামিম গোত্রের বিরোধিতার আগুন জ্বালিয়ে দেবার মত একজন লোক বেঁচে থাকতেও তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেননি। এ নীতি তিনি এখানেও অবলম্বন করেছিলেন।

হাদিকাতুল মাউতের যুদ্ধ হতে অবসর হবার পর, সেনাবাহিনীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বনু হানিফার কেল্লাগুলো অবরোধ করার জন্য পরামর্শ দিলেন আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। কেননা এখানকার অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে ওসব কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু এতে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একমত হলেন না। তিনি বললেন, কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ না করে যারা এ এলাকায়ই এদিক ওদিক ঘুরছে তাদেরকে তালাশ করে বের করতে হবে। সুতরাং তিনি চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। তারা এদিক ওদিক থেকে গনিমাতের মাল, নারী, বাচ্চাদেরকে এনে জড়ো করতে লাগলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বাহিনীকে এবার বনু হানিফার কেল্লা অবরোধ করতে যাবার জন্য পাঠালেন যাতে ওদের আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট না থাকে।

সন্ধির প্রস্তাব

লায়লা উম্মে তামিমকে বনু হানিফার হাত থেকে বাঁচানোর এবং মুসাইলামার ব্যাপারে সত্য কথা বলার কারণে মোজায়ার উপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ আস্থা জন্মিলো। বনু হানিফার কেল্লা অবরোধের পর মোজায়া খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন ঃ আপনি বনু হানিফার উপর বিজয় লাভ করেছেন —এমন কথা মনে করবেন না। ইয়ামামার কেল্লাগুলোর মধ্যে এখনো আমাদের

www.pathagar.com

অনেক যুদ্ধবাজ সৈনিক সশস্ত্রে বিদ্যমান। তারা বেশ কঠিনভাবে আপনার মুকাবিলা করবে। যদি আপনি যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চান তাহলে আমাকে কিছু সময়ের জন্য শহরে যাবার অনুমতি দিন। আমি তাদেরকে একটা আপোশ মীমাংসায় রাজী করানোর চেষ্টা চালাই।

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জানতেন, তার বাহিনী এখন রণক্লান্ত। বনু হানিফার উপর বিজয় লাভের পর তারা আর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। তাই তিনি মোজায়ার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। তাকে শহরে যাবার অনুমতিও দান করলেন। কিন্তু সন্ধিতে বনী হানিফাকে গোলাম না বানানোর শর্ত শামিল হতে পারবে না বলে তাকে বলে দিলেন।

মোজায়ার চালবাজী

শহরে পৌছে মোজায়া দেখতে পেলো, নারী, শিশু ও বুড়ো লোক ছাড়া ওখানে আর কেউ বেঁচে নেই। সে তাদেরকে লৌহবর্ম পরিয়ে কিল্লার পাচিলে একত্রিত হবার জন্য শিখিয়ে দিলো। উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে ধোঁকায় ফেলা এবং তাদের পেশকৃত শর্তে আপোষ রাজী করানো। পরামর্শ অনুযায়ী তারা লৌহবর্ম পরে তরবারী ও নেজা হাতে করে পাচিলে গিয়ে পৌছলো। বাইরে থেকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুসলমানরা এ দৃশ্য দেখে মোজায়ার কথাই সত্য বলে বিশ্বাস করলো। সত্যিই বনু হানিফার এখনো যারা জীবিত আছে তারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখে।

খালিদ ও বনু হানিফার সন্ধি

অল্পক্ষণের মধ্যেই মোজায়া শহর থেকে ফেরত আসলো। সে বললো, আমার জাতি আপনার দেয়া শর্তে আপোষ করতে রাজী নয়। আর আমিও আপনার সাথে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছি তাও তারা মানতে রাজী নয়। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইছিলেন না। তাই তিনি মোজায়াকে বললেন, "আমরা বনু হানিফার জন্য অর্ধেক ধন-সম্পদ, অর্ধেক ফলোয়ারী বাগান ও অর্ধেক গ্রেফতার কৃত মানুষ রেখে যাবো। তুমি তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করো। তারা যেনো নিজেদের ধ্বংস নিজেরা আর ডেকে না আনে বরং সন্ধি করে নেয়।" মোজায়া আবার শহরে গেলো। ফিরে এসে বললো, 'তারা এসব শর্তে রাজী নয়। আপনি এক-চতুর্থাংশ ধন-সম্পদ নিতে সম্মত হোন। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এতেও রাজী হয়ে গেলেন। 'সন্ধি চুক্তি' লেখা হলো, সন্ধির পর শহরে প্রবেশ করে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দেখতে পেলেন, সেখানে কোনো নওজোয়ান পুরুষের নামগন্ধও নেই। তিনি মোজায়াকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে কেন ? সে বললো, আমার জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো। জাতির খাতিরে তাদের জীবন রক্ষা করা আমার জন্য ফরয। তাই আমি এ কৌশল অবলম্বন করেছি। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার কারণ দর্শানো গ্রহণ করে সন্ধিচুক্তি বহাল রাখলেন।

www.pathagar.com

এ সংক্রান্ত আরো একটি কথাও বর্ণিত হয়েছে। সন্ধিপত্র লেখার আগে মোজায়া শহরে গিয়ে আপোষের আলোচনা চালালে, সালমা বিন ওমাইরুল হানাফী নামক এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, আমরা তোমার কোনো কথা মানবো না। আমাদের দুর্গ মযবুত। রসদের কোনো অভাব নেই আমাদের। শীতের মৌসুম এসে গেছে। শীতের প্রকোপতা বেড়ে গেলে মুসলমানরা অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হবে।"

উত্তরে মোজায়া বললো ঃ

"এটা তোমাদের খোশ খেয়াল। তোমরা মনে করেছো আমি তোমাদের সন্ধির প্রতি আকৃষ্ট করে তোমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি। অথচ ব্যাপার তা নয়। তোমাদের জানা আছে ইবনে মুসাইলামা লড়াই শুরু হবার আগে কি বলেছিলো ঃ 'হে লোকেরা তোমাদের নারীদের কয়েদী বানিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেবার পূর্বে তোমরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দাও।' আমি তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে এসেছি। আমার অনুরোধ তোমরা সন্ধি করে নাও। নিজের জীবনের সাথে তোমরা শত্রুতা পোষণ করো না।"

মোজায়ার বক্তব্য শুনে তারা সন্ধি করার জন্য রাজী হয়ে গেলো। আর সালমা বিন ওমাইরুল হানাফীর পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলো না।

আবু বকরের কাছে বনু হানিফা

এরই মধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফরমান আসলো, যারা যুদ্ধে সামর্থবান তাদের হত্যা করে দাও। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ততক্ষণে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে ফেলেছেন। সন্ধি তিনি ভঙ্গ করে ওয়াদা নষ্ট করতে চাইলেন না। এরপর বনু হানিফার লোকেরা বাইয়াত গ্রহণ করা ও মুসাইলামার নবুয়াত থেকে দায়িত্বমুক্ত হবার জন্য একত্রিত হলো। এদের সকলকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আনা হলো। তারা বাইয়াত গ্রহণ করলো। আবার ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মদীনায় প্রেরণ করলেন। তারা মদীনায় পৌছলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"অবশেষে তোমরা কিভাবে মুসাইলামার ফাঁদে পা বাড়ালে। আর নিজেরা গোমরাহ হয়ে গেলে।"

তারা জবাব দিলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা ! আমাদের সব অবস্থা আপনার ভালো জানা আছে। মুসাইলামা না নিজে উপকৃত হতে পেরেছে আর না তার আত্মীয়-স্বজন ও জাতির লোক তার থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পেরেছে।"

মোজায়ার ধোঁকা ও খালিদের সন্ধি

এখানে কারো মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, মোজায়ার ধোঁকার পরও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এত কঠোর প্রকৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সন্ধি করতে তৈরি হয়ে

www.pathagar.com

গেলেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো আগের বেশ কয়টি বড় বড় বিজয়ে বিশেষ করে বনু হানিফার যুদ্ধগুলোতে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তাই মোজায়ার ধোঁকা ধরা পড়ার পরও খালিদ এসব চিন্তা করে রণক্লান্ত সৈনিকদের মনের ভাব বুঝে সন্ধি স্থাপন করাই উত্তম মনে করেছেন।

বনু হানিফার নিহতদের সংখ্যা

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাদিকাতুল মাউতের যুদ্ধে বনু হানিফার সাত হাজার লোক নিহত হয়েছিলো। যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের সংখ্যাও ছিলো সাত হাজার। পলায়নরতদের খোঁজে যে ছোট ছোট বাহিনী পাঠানো হয়েছিলো সেখানেও নিহতদের সংখ্যা ছিলো সাত হাজারই। মোজায়ার সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের পরিপূর্ণ অবসান ঘটে। এ সন্ধি অনুসারে, সোনা-রূপা এবং অস্ত্র-সস্ত্র সহ যেসব মাল গনিমাত হিসাবে পাওয়া গেছে তার মালিক হলেন মুসলমানগণ। তাছাড়াও এক-চতুর্থাংশ গ্রেফতারকৃত লোকও তারা পেলেন। বনী হানিফার বস্তিসহ এসব এলাকার যেসব বাগান এবং ফসলের জমি ছিলো তা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর দখলে থাকবে বলে স্বীকৃত হলো।

একথা ঠিক যে, মোজায়া নিজ জাতির যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট লোকদের জীবন রক্ষা করেছিলো। কিন্তু এসব লোক পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফত মেনে নিয়েছিলো। তাই মোজায়ার উপর অসন্তুষ্ট হবার বা কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করার আর কোনো কারণ খালিদের জন্য বাকী রইলো না।

মুসলমান শহীদদের সংখ্যা

এ যুদ্ধে বনু হানিফা গোত্রের নিহতদের সংখ্যা যেমন অতীতের সকল যুদ্ধের চেয়ে অধিক ছিলো। তদ্রূপ মুসলিম শহীদদের সংখ্যাও ছিলো পেছনের সকল যুদ্ধের চেয়ে বেশী। এ যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ছিলো বারশত। তিনশত সত্তরজন ছিলেন মুহাজির আর তিনশত ছিলেন আনসার। অবশিষ্ট শহীদগণ ছিলেন বিভিন্ন গোত্রের। এ শহীদদের মধ্যে তিনশত সত্তরজন মর্যাদাশালী সাহাবা ও কুরআনে হাফেজ ছিলেন। মুসলমানদের কাছে তাঁরা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হাফেজদের শাহাদাতে মুসলমানরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে। তবে এ কারণেই কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করে এক জিলদে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিলো। এটা ছিলো হাফেজে কুরআনদের শাহাদাতের নাজরানা। আর কোনো যুদ্ধে ভবিষ্যতে যদি হাফেজে কুরআন এভাবে শহীদ হন, তাহলে কুরআন সংরক্ষণ কঠিন হয়ে পড়বে ভয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরআনকে সংগ্রহ করে একত্রিত করেছেন।

মুসলমানদের শোকের ছায়া

অনেক মুসলমান এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের শাহাদাতের কারণে স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনদের যেমন দুঃখের কোনো সীমা ছিলো না। অপরদিকে মুসলমানদের

www.pathagar.com

শাহাদাতের বিনিময়ে তারা ধর্মত্যাগের শেষ ফেতনার চির অবসান ঘটাতে পেরেছেন, এটাই হলো তাদের আপনজন হারাবার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব তার পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লা আনহুকে যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রাখার পরও ইয়ামামা হতে মদীনায় ফিরে আসার পর ছোট ভাইয়ের শাহাদাতের কারণে বলেছিলেন ঃ

"তোমার চাচা যখন যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তখন তুমি জীবিত ফিরে আসলে কেন? কেন আমার থেকে তোমার চেহারা লুকিয়ে রাখলে না?"

শুধু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুই নন। মক্কা-মদীনার শত শত পরিবার তাদের বীর বাহাদুর ও সন্তানদের জন্য রক্তিম অশ্রুজল ঝরিয়েছেন।

মোজায়ার কন্যার সাথে খালিদের বিয়ে

অন্যান্য শোকাহত মুসলমানদের মতো খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কি এ সময় শোকাহত ছিলেন? মানব রক্তের গরম স্রোত ও হাজার হাজার লোকের লাশের মিছিল কি তাঁর মনে কোনো ভীতি সঞ্চার করতে পেরেছিলো? না, পারেনি। এ অবস্থা যদি খালিদেরও হতো তাহলে আগত জীবনে তিনি আর কোনো দিন সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। ইরাক আর সিরিয়া বিজয়ও তার ভাগ্যে ঘটতে পারতো না। এ জন্যই এতো ভীতিপ্রদ সময়ে খালিদের মনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ও উদ্বিগ্নতা ও অশান্তির রেশ সৃষ্টি হয়নি।

সন্ধি চুক্তি সম্পাদন হবার পরই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মোজায়াকে ডেকে এনে তার কাছে তার মেয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। লায়লা উম্মে তামিমের ঘটনা, খালিদকে মদীনায় ডেকে নিয়ে ধমকানো ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খালিদের উপর অসন্তুষ্টির কথা মোজায়া আগ থেকেই জানতো। তাই এ প্রস্তাবের জবাবে সাহস করে সে বললো ঃ "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যদি তাই করেন, তাহলে তা শুধু আমাকে দুর্বল করে তুলবেন বরং আপনি নিজেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাস্তি হতে বেঁচে থাকতে পারবেন না।"

কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুই শুনলেন না। বরং বললেন ঃ

"আমার কাছে তোমার মেয়ে বিয়ে দিতেই হবে।"

অতপর বাধ্য হয়েই মোজায়া খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলো।

এ বিয়েতে আবু বকরের অসন্তুষ্টি

বিয়ের খবর শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব রাগ করলেন। লায়লাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, বিয়ে করার উদ্দেশ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মালিককে হত্যা করেনি। ভুল বুঝার কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তারপরও সেখানে একজন মুসলমানেরও প্রাণ হানি ঘটেনি। কিন্তু মোজায়ার

www.pathagar.com

কন্যার সাথে খালিদের বিয়ে এমন সময় হলো, যখন রক্তে রাঙ্গা যুদ্ধের মাঠে বারশত মুসলমানের তাজা শহীদী লাশ পড়ে ছিলো। সমগ্র আরব গোত্রে শোকের মাতম জারী ছিলো। অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজেকে ঠিক করে রাখতে পারলেন না। খালিদকে তিনি একটি কঠিন চিঠি লিখলেন। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী চিঠির প্রতি ছত্র ছত্র হতে রক্ত ঝরে পড়ছিলো। তিনি লিখেছেন ঃ

> "হে খালিদ বিন ওয়ালিদ ! তোমার কি হলো ? তুমি কেবল মেয়েদেরকে একের পর এক বিয়ে করে চলেছো। অথচ তোমার তাবুর সামনে যুদ্ধের ময়দানে বারশত মুসলমানের গরম খুন মাটিতে ছড়িয়ে আছে। এ ভেজা রক্ত শুকাবারও সময় দিলে না তুমি।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর চিঠিতে খালিদ রাদিয়াল্লা আনহু মর্মাহত হলেন। মাথা নেড়ে নেড়ে তিনি বললেন, এসব হলো ওমরের উস্কানী।

ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মত্যাগীদের সব শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। ধর্মত্যাগীদের জন্য এখন নীরবে আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ ও পুনরায় ইসলামের অন্তর্ভুক্তি হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর ছিলো না। ইয়ামামার যুদ্ধের পরে মুহরা, ওমান, ইয়েমেনের যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার কোনোটাই ইয়ামামার চেয়ে বিপজ্জনক ছিলো না। এ জন্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু শান্তির নিঃশ্বাস নিতে ও খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মোজায়ার কন্যা ও লায়লা বিন উম্মে তামিমকে নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরান ইরাক গিয়ে যুদ্ধ করার আদেশ পাবার আগ পর্যন্ত ইয়ামামার এক নদীর তীরে বসবাস করতে থাকেন।

---

www.pathagar.com

১০

ধর্মত্যাগের অন্যান্য যুদ্ধ

বাহরাইন, ওমান, মোহরা, কান্দাহ এবং হাজরামাউত

আরবের উত্তরাঞ্চলের যাকাত অস্বীকারকারী ও ধর্মত্যাগী গোত্রগুলো, খালিদ বিন ওয়ালিদের সামরিক তৎপরতার ফলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে পুনরায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হলো। আরবের উত্তর পূর্ব অঞ্চল থেকে শুরু করে সুদূর পূর্বাঞ্চলে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এবং ওখান থেকে নীচের দিকে মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এসব গোত্রগুলোর সীমানা। অথচ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব হাতে নেবার সময় তাঁর ক্ষমতার সীমা ছিলো মক্কা, মদীনা আর তায়েফের মধ্যে একটি ত্রিভুজ আকৃতির ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ।

মদীনার উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলোর বিদ্রোহ বনী আসাদ ও বনী হানিফা গোত্রের বিদ্রোহের মতো বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেনি। দাওমাতুল জান্দাল ছাড়া অবশিষ্ট সকল এলাকার লোকজন বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই বেশ সহজভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনুগত্য স্বীকার করলো।

সেই সময় দাওমাতুল জান্দালের শাসক ছিলো আকিদ রুকুন্দি। ইসলামী হুকুমাতের মুকাবিলায় সে অটল রইলো। ইরাক বিজয়াভিযানের সময় খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে পদানত করে।

বিদ্রোহে অটল ঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রসমূহ

ধর্মদ্রোহীদের ব্যাপারে উত্তরাঞ্চলে সংঘটিত ঘটনাসমূহ হতে দক্ষিণাঞ্চলীয় লোকেরা কোনো শিক্ষাগ্রহণ করেনি। তারা যথাপূর্ব আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধাচারণ ও বিদ্রোহ এবং ধর্মত্যাগে অটল রইলো। এ কারণে দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলমান ও ধর্মত্যাগীদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে আসছে।

দক্ষিণ অঞ্চল হলো গোটা আরবের অর্ধেক। পারস্য উপসাগর হতে ইয়ামেনের দক্ষিণে অবস্থিত লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাহরাইন, ওমান, মোহরা, হাজরামাউত, কান্দাহ এবং ইয়েমেন প্রদেশ অবস্থিত। পূর্ব এলাকা হতে পশ্চিম এলাকা এবং পশ্চিম এলাকা থেকে পূর্ব এলাকার যাতায়াত করতে হতো এসব উল্লেখিত প্রদেশগুলোর মধ্য দিয়েই। কারণ, এসব প্রদেশ পারস্য উপসাগর, ইডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিলো। ইয়েমেন ছাড়া বাকী সব প্রদেশগুলোরই প্রশস্থতা ছিলো খুব কম। এসবের সীমানা ও উপসাগরীয়

www.pathagar.com

এলাকার দূরত্ব ছিলো মাত্র কয়েক মাইল। এসব প্রদেশকে ঘিরে রয়েছে আরবের গোটা দক্ষিণ এলাকা। আর এ এলাকাই জুড়ে রয়েছে জনমানবহীন ভয়াবহ মরুভূমি। এসব মরুভূমি অতিক্রম করে যাওয়া ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। এসব উষ্ণ মরুভূমি দেখে অতীতের মতো আজো মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এটাকে রুবোল খালি নামে অভিহিত করা হয়।

দক্ষিণ আরবে ইরানী প্রভাব প্রতিপত্তি

এসব প্রদেশে প্রবেশের উৎসমুখগুলোর প্রতি তাকালে পরিষ্কার মনে হয় যে, এতে ইরানী প্রভাব প্রতিপত্তি সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার মধ্যবর্তী পথে যাতায়াতের পথ ছিলো খুবই কষ্টকর। কারণ, মধ্যবর্তী এলাকার ভীতপ্রদ বিরাণভূমি অতিক্রম করে যাওয়া শুধু দূরহ নয় বরং ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। হেজাজ হতে ওমান ও বাহরাইন পর্যন্ত পৌছতে এবং ওমান ও বাহরাইন হতে হেজাজ পর্যন্ত যেতে দীর্ঘ উপসাগরীয় অঞ্চল পার হয়ে যেতে হতো। এ হিসাবে বাহরাইন, ওমান, হাজরামাউত এবং ইয়েমেনের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রদেশগুলো হেজাজের উত্তর অঞ্চলগুলো হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলো। এ অবস্থার সুযোগে ইরানী বাদশাহগণ এসব এলাকার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করে এবং এখানে তাদের ক্ষমতা বহাল করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বুদহানের' ইসলাম কবুল করার আগ পর্যন্ত ইয়েমেনে ইরানী শাসন কায়েম ছিলো। বুদহান প্রথমে ইরানেরই নিযুক্ত শাসক ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ করার ও ইয়েমেন মুসলমানদের অধীনে আসার পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ওখানকার শাসক হিসাবে বহাল রাখেন। বাহরাইন এবং আম্মানও সে সময় ইরানের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। অনেক ইরানী এসব দেশে বাস করে এটাকে নিজের দেশ বানিয়ে নিয়েছিলো। এ কারণে ইরানী ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিলো। যখনই ইরানীরা আরবদের তরফ থেকে বিদ্রোহের আশংকা করতো এবং আরবরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকে পরাভূত করতে চাইতো তখনই তারা এখানে বসবাসকারী ইরানীদের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করতো এবং তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করে দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করার ভাগ্য লাভ হয়েছিলো ওমান ও বাহরাইন এলাকাবাসীর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও এরাই সর্বপ্রথম ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু ভয়াবহ যুদ্ধ ও কঠিন সংগ্রামের পর যখন ধর্মত্যাগের ফেতনা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো এবং আরববাসী পুনরায় একটি দীনি ও সিয়াসী ঐক্যে একত্রিত হলো তখন এরাই সে ব্যক্তি যারা বাধ্য হয়ে সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে।

এসব এলাকায় ধর্মত্যাগের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছে এ নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এগার হিজরী সনে, আবার কেউ বলেন, বার হিজরী সনে। এসব মতভেদের প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য নেই। কেননা একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের প্রথম দিকে এসব যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গোটা

www.pathagar.com

আরব পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার পূর্ব পর্যন্ত এ যুদ্ধ শেষ হয়নি। শুরু হয়েছিলো আরবের উত্তরাঞ্চল থেকে। ওখানকার মুরতাদদের নিশ্চিহ্ন হবার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় আরবের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে।

দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা আরম্ভ হয় বাহরাইন থেকে শুরু করে এবং ওমান, মোহরা, হাজরামাউত এলাকাকে পদানত করে ইয়েমেন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে অথবা তাদের কার্যক্রম ইয়েমেন থেকে শুরু করে হাজরামাউত, মোহরা এবং ওমানের লোকদেরকে দমন করে শেষ হবে বাহরাইনে গিয়ে। ভৌগলিক অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণের ধারা রচনার জন্য মুসলমানদের আর কোনো বিকল্প ছিলো না।

সামরিক তৎপরতার সূচনা

অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানরা বাহরাইন থেকে সামরিক তৎপরতা শুরু করা সমীচীন মনে করেছেন। কেননা প্রথমত বাহরাইন ছিলো ইয়ামামার খুব নিকটবর্তী এবং ইয়ামামার 'আকরাবা' নামক স্থানে অল্প কিছু দিন অগে বনী হানিফার সাথে তারা বিরাট বিজয় লাভ করেছে। যার কারণে তাদের নামডাক গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত ইয়েমেনের মুকাবিলায় এখান থেকে অভিযান পরিচালনা শুরু করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো। এখানে যদি সফলতা লাভ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রভাব অন্যান্য গোত্রেও অবশ্যই পড়বে।

তারপরও এ বর্ণনা থেকে এ ধারণা ঠিক হবে না যে, কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই বাহরাইনের উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে। বাহরাইন মূলত হিজরের সংলগ্ন একটি সংকীর্ণ উপসাগরীয় ক্ষুদ্র অংশ—যা পারস্য উপসাগরের তীর বেয়ে কাতিফ থেকে ওমান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে। কোনো কোনো স্থানে তো উষ্ণ মরুভূমি ও ক্ষুদ্র অংশকে কেটে দিয়ে উপসাগরীয় এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে বাহরাইন ইয়ামামার সাথে সংলগ্ন। ইয়ামামা আর বাহরাইনের মধ্যে উঁচু নীচু অনেক টিলার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। এগুলোকে অতিক্রম করে যাওয়া বেশ সহজ। এ বাহরাইন ও হিজরের এলাকাতেই রবিয়ার গোত্রসমূহ ও বনী বকর ও বনী আবদুল কায়েস অবস্থান করতো। এখানে ভারত ও ইরান থেকে আগত একদল ব্যবসায়ীও বাস করতো। তারা নীল নদের মোহনা থেকে শুরু করে আদনের উপসাগরীয় এলাকার মধ্যবর্তী অংশে বসতিস্থাপন করেছিলো। এ ব্যবসায়ীরা স্থানীয় লোকজনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন করে। এদের ঔরষে যেসব সন্তান জন্মলাভ করে তাদেরকে 'আল আবনা' নামে অবহিত করা হতো। বাহরাইন এলাকার বাদশাহ ছিলো 'মানজার বিন সাদী আল আবদী' নামক একজন খৃষ্টান। হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দূত 'আলা বিন হাজরামীকে' তার কাছে পাঠালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যথারীতি বাহরাইনের শাসক হিসাবে বহাল রাখলেন। দীন গ্রহণ করার পর তিনি তার জাতিকেও দীনের শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং দীনের তালীম-তরবিয়াত

www.pathagar.com

গ্রহণের জন্য জারুদ বিন মোয়াল্লাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। জারুদ সেখানে গিয়ে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, হুকুম-আহকাম শিখে দেশে ফিরে আসেন। মানুষকে দীনের ও ইসলামী শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

বাহরাইনে ধর্মত্যাগের সূচনা

যে মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন, সে মাসেই মানজার বিন সাদীও মৃত্যুবরণ করে। আরবের অন্যান্য এলাকার মতো বাহরাইনের সব লোকও এ সময় ইসলাম ত্যাগ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত আলা হাজরামীকে তারা বাহরাইন থেকে বের করে দিলো। কিন্তু জারুদ বিন মোয়াল্লা আবদী অবিকল ইসলামেই অটল রইলেন। তিনি তার জাতির লোকদেরকে ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো ঃ

"মুহাম্মাদ যদি নবী হবেন, তাহলে তাঁর মৃত্যু হতো না।"

জারুদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা জানো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগেও আল্লাহ পাক নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সব এখন কোথায় গেলেন ?"

তারা জবাব দিলো ঃ

"তারা মৃত্যুবরণ করেছেন।"

জারুদ বললেন ঃ

"যেভাবে অন্যান্য নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন সেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যান্য নবীদের মৃত্যুর কারণে যদি তাদের নবুয়াতে কোনো পার্থক্য না এসে থাকে, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে তাঁর নবুয়াত চলে যাবে কেন ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

জারুদের কথায় তার জাতি বেশ প্রভাবিত হলো। কালেমা পড়ে তারা আবার মুসলমান হয়ে গেলো। বনু আবদুল কায়েস ইসলাম গ্রহণ করলেও বাহরাইনের অন্যান্য গোত্র 'হাতম বিন দাবিয়ার' নেতৃত্বে ধর্মত্যাগের উপরই অবিচল রইলো। তারা বাদশাহীকে আবার মানজার বংশে স্থানান্তরিত করে মানজার বিন নোমানকে নিজেদের বাদশাহ বানিয়ে নিলো। তারা সর্বপ্রথম জারুদ এবং বনু আবদুল কায়েসের গোত্রকে ইসলাম থেকে বিগড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে জোর প্রয়োগ করতে উদ্যত হলো। 'কাতিফ' ও হেজেরে বসবাসকারী বহিরাগত ব্যবসায়ী ও যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা তাদেরকে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নিয়ে 'কসবায়ে জাওয়াদী' নামক স্থানে জারুদ ও তার সাথীদের অবরোধ করে দিলো। এ অবরোধ ছিলো খুবই কঠিন। ক্ষুৎ পিপাসায় বনু আবদুল কায়েসের লোকদের প্রাণ ছিলো উষ্ঠাগত। কিন্তু তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামে অবিচল থাকলো।

www.pathagar.com

আলা বিন হাজরামীর অভিযান

বাহরাইন থেকে ধর্মত্যাগের সংবাদ শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলা বিন হাজরামীকে ধর্মত্যাগীদের মুকাবিলা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ সময়ে আবার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ আকরাবায় মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করায়। এ কারণে আলা বিন হাজরামী ইয়ামামা হতে বের হবার পর বনু হানিফার একটি বড় দল 'সামামা বিন আমাল' ও 'কায়েস বিন আসেম মুনকারী'র নেতৃত্বে তার সাথে যোগ দিলেন। ইয়েমেনবাসী ও অন্যান্য গোত্রসমূহে অনেক লোক তাদের সাথে শামিল ছিলো। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো, গোটা আরব অবশেষে মুসলমানদের দখলে এসে যাবে। ইসলামের বিরোধী শক্তি অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে।

সবসময়ই মানুষ শক্তির কাছে মাথানত করে। বস্তুত যে কায়েস বিন আসেম তার গোটা জাতিসহ আজ আলা বিন হাজরামীর বাহিনীতে যোগ দিলেন, কিছুদিন আগে যাকাত অস্বীকারকারীদের দলের প্রথম সারিতে তিনি অবস্থান করেছিলেন। তার গোত্রের যাকাত তিনি মদীনায় প্রেরণ করা বন্ধ করে দিয়ে জমাকৃত যাকাতের মাল প্রত্যেকের কাছে আবার ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু হানিফাকে পরাভূত করে দিলে কায়েস মুসলমানদের সামনে আনুগত্যের শির নত করাকেই কল্যাণকর মনে করলো। তাই আলা বিন হাজরামী ইয়ামামা থেকে বের হয়ে আসলে এটাকেই কায়েস একটা সুযোগ মনে করলো। সব যাকাত একত্র করে তা নিয়ে আলা বিন হাজরামীর সাথে যোগ দিলেন। তার বাহিনীতে থেকে বাহরাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য রওনা হয়ে যান।

বাহরাইনের ধর্মত্যাগীদের পরাজয়

আলা বিন হাজরামী তার বাহিনী নিয়ে বাহরাইন পৌছে 'হাতমে'র কাছে অবস্থান গ্রহণ করলেন। জারুদ বনী আবদুল কায়েস সহ আগ থেকেই কিল্লাবন্দী ছিলেন। আলা হাতম থেকে তাদেরকে খবর পাঠালেন, মুসলমানরা এসে পৌছেছে। ভয়ের কারণ নেই। তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ফ্রন্ট ও শত্রু পক্ষের অবস্থান যাচাই করে তিনি জানতে পারলেন যে, সংখ্যা অনেক বেশী। বেশী চিন্তা-ভাবনা করে তাদের মুকাবিলায় বের হওয়া সমীচিন হবে না। তাই তারা তাদের বাহিনীর চারিদিকে পরিখা খনন করলেন। গোটা বাহিনী দিয়ে পরিখার পেছনে অবস্থান নিলেন। কোনো কোনো সময় পরিখা অতিক্রম করে মুরতাদদের উপর হামলা করে কিছু সময় যুদ্ধ করে আবার পরিখার পিছনে সরে আসতেন। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হলো। লড়াইর পরিণতি কি হবে কোনো পক্ষই তা আঁচ করতে পারছিলো না। অবশেষে একদিন মুসলমানরা মুরতাদদের উপর পরিপূর্ণ হামলার সুযোগ পেয়ে তাদেরকে তছনছ করে দিলো।

একরাতে শত্রুপক্ষের ঘাটিতে শোরগোলের শব্দ শুনা গেলো। গোয়েন্দার মাধ্যমে আলা বিন হাজরামী খবর নিয়ে জানালেন যে, তারা মদপানের আসরে সবাই অচেতন

www.pathagar.com

হয়ে গাল-মন্দ ও মাতলামী করছে। আলা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাহিনী নিয়ে পরিখা অতিক্রম করেন। ছাউনিতে আক্রমণ করে তারা তাদেরকে গাজর কাটা করে ফেলেন।

কোনো উপায়ন্তর না দেখে শত্রুসেনা পলায়ন করতে শুরু করে। শত শত লোক পলায়ন করতে গিয়ে পরিখায় পতিত হলো। অনেক লোক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নের পথ খুঁজে না পেয়ে মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। এ সময় কায়েস বিন আসেম হাতমকে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তরবারি বের করে তার কাজ সাঙ্গ করে দেন। আনিক বিন মান্‌জার আল গুরুরকে মুসলমানরা জীবিত গ্রেফতার করে ফেলে। তাকে আলা বিন হাজরামীর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ

"তোমরাই হলে ঐ লোক যারা এসব লোকদের ধোঁকা দিয়েছো।"

গুরুর আর কোনো উপায় না দেখে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে ঃ "আমি ধোঁকা দেইনি। অবশ্য আমার শক্তির উপর আমার গর্ব ছিলো।"

দারাইনে পলাতকদের আশ্রয় গ্রহণ

যারা নিহত হয়নি গ্রেফতার হয়নি তারা নৌকাযোগে দারাইনের উপদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিলো। আলা বিন হাজরামী তাৎক্ষণিকভাবে এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তিনি বাহরাইনের অন্যান্য এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গোটা বাহরাইনের শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হবার পর সব গোত্র এসে ইসলামী হুকুমাতের আনুগত্য স্বীকার করলো। আলার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলো। তিনি তার সেনাবাহিনীকে দারাইনের উপর হামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা যেনো পলায়নের অথবা কোনো আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে না পায়।

দারাইন বিজয়

দারাইন হলো পারস্য উপসাগরের একটি উপদ্বীপ। বাহরাইনের বিপরীতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তা অবস্থিত। ওখানে কিছু খৃষ্টান পরিবার বসবাস করতো। বর্ণনায় জানা যায় আলা বিন হাজরামী যখন মুসলিম বাহিনীকে এ উপদ্বীপে হামলা করার হুকুম দিলেন তখন উপদ্বীপে পৌঁছার জন্য তাদের কাছে কোনো নৌযান ছিলো না। এ অবস্থায় আলা দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"হে লোকেরা ! আল্লাহ স্থলভাগ তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি কি সাগরে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাতে পারেন না ? ভূ-ভাগের নিদর্শন জমিয়ে তিনি সাগর অভিযানে তোমাদের সাহস-হিম্মত বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে যাও। নিসংকোচে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের নেগাহবান ও সাহায্যকারী। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আল্লাহ দুনিয়ার সব ধর্মত্যাগীদের এক জায়গায় একত্রিত করে দিয়েছেন। সহজে তোমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে। এ

www.pathagar.com

সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। তাই কোমর মযবুত করে সাগরের ঢেউয়ের সাথে লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যাও।"

সৈনিকদের দল সমস্বরে জবাব দিলো ঃ

"হে আমাদের প্রিয় নেতা ! আমরা সবসময়ই আপনার হুকুম মানার জন্য তৈরি। ভয়াবহ উষর মরুভূমি যখন আমাদেরকে দমাতে পারেনি তখন সমুদ্রকে আমরা খুব কমই পরওয়া করি।"

সুতরাং সেনাবাহিনী তৈরি হতে আরম্ভ করলো। উপসাগরীয় কূলে পৌঁছে তারা গাধা, খচ্চর আর উটের উপর আরোহণ করে আল্লাহর নামে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল্লাহর অপার করুণায় তাদের কোনো অসুবিধা হলো না। তাদের আরোহীরা স্থলভাগের মতই সাগর পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে গিয়ে পৌঁছলো। সাগরের পানি উটের পা পর্যন্তই ছিলো।

সম্ভবত সে সময় সাগরে ভাটা ছিলো। অথবা বর্ণনায় অতিরঞ্জিত বলা হয়েছে। অথবা স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্বারা মুসলিম বাহিনী নদী পার হবার নৌযান পেয়ে গিয়েছিলো। এতে আরোহণ করে তারা সাগর অতিক্রম করেছে। (যদিও কোনো বর্ণনায় একথা উল্লেখ হয়নি।) তারপরও কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বাহিনী দারাইন পৌঁছে গিয়েছিলো। তারা পলাতকদের কঠিনভাবে মুকাবিলা করে সকলকে হত্যা করলো। তাদের নারী ও শিশুদেরকে গ্রেফতার করলো। এ যুদ্ধে মুসলমানরা অনেক মালে গানিমাত লাভ করলো। প্রত্যেক আরোহীর অংশে ছয় হাজার দেরহাম ও পায়ে চলা সৈনিকদের অংশে পড়েছে দুই হাজার দেরহাম। এর থেকেই কতো গানিমাত পাওয়া গিয়েছিলো তার আন্দাজ করা যায়।[১]

বাহরাইনে আলার প্রত্যাবর্তন

দারাইনের কাজ শেষ হবার পর আলা বিন হাজরামী বাহরাইন ফিরে গেলেন। সেনাবাহিনীর কিছু লোক দারাইনে থেকে যাওয়াকেই পসন্দ করলেন। অন্যরা আলার সাথে চলে এলেন। বাহরাইনে পৌঁছার পর তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দারাইন বিজয়ের খবর পাঠিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য এখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। এখন শুধু বেদুঈনদের তরফ থেকে মুসলমানদের বিপদাপদের আশংকা অবশিষ্ট থাকে। আর এদের পেশাই ছিলো লুট-তরাজ সহ সব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া। ইরানীরাও মুসলমানদের জন্য একটা ভয়ের কারণ ছিলো। মুসলমানদের অগ্রগতির পথে ইরানীদের স্থানীয় প্রভাব ও প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিলো একটা প্রবল বাধা স্বরূপ। তারপরও তার মনে এদিক থেকে বড় শক্তি ছিলো। কারণ, দারাইন যাবার আগেই বাহরাইনের বিভিন্ন গোত্র ও আবনারা খাঁটি মনে আল্লাহর

১. এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, আলা এ সময়ে এ যুদ্ধ করেননি। আর এ উপদ্বীপটি ইসলামী শাসন থেকে যথারীতি আলাদা ছিলো। এ দেশে মুসলিম শাসনের অধীনে আসে হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে।

www.pathagar.com

আনুগত্য করে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবা করার জন্য নিজেদেরকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলো। এসব লোকদের সম্মুখে নেতৃত্ব দিয়েছেন ওতাইবা বিন নিহাস এবং মুসান্না বিন হারেসা শায়বানী। এদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের কারণে পরাজিত গোষ্ঠী এবং কলহ প্রিয় সম্প্রদায় আর মাথা উঠাতে সাহস করেনি।

ইরাক অভিযান

মুসান্না বিন হারেসা ইরানীদের ধোঁকাবাজী আর ছল-চাতুরীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। আর এ উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হতে হতে ফোরাত নদীর মোহনা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছেন। ইরাক সীমান্তে পৌছে ইসলামের শত্রুদের তৎপরতা বন্ধ করা আর এ এলাকায় ইসলামের তাবলীগের প্রচেষ্টা চালানো ছিলো ইরাক বিজয়ের প্রথম মাইল স্টোন।

আম্মানের যুদ্ধ বিগ্রহ

বাহরাইনের পর আমরা এখন ওমানের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। এখানকার ফেতনা-ফাসাদ ও অন্যান্য এলাকার ফেতনা ও কলহ থেকে কোনোভাবেই কম গুরুত্বের ছিলো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে আম্মান ছিলো ইরানী শাসনের অধীন। তাদের তরফ থেকে জায়ফর নামক এক ব্যক্তি এখানকার শাসক ছিলো। ওখানে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর বিন আস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তার কাছে পাঠালেন। জায়ফর ওমর বিন আসকে বললো, ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার মনে কোনো সংকোচ নেই। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে মদীনায় পাঠালে আমার জাতি আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠার ভয় অবশ্যই আছে। এবার ওমর বিন আস তাকে এ এলাকা থেকে যাকাত উসুল করে এখানেই গরীবদের মধ্যে খরচ করার পরামর্শ দিলেন। সুতরাং জায়ফর ইসলাম গ্রহণ করলো। ওমর বিন আসও এখানে বসবাস শুরু করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আম্মানবাসীরা ধর্মত্যাগ করলে ওমর বিন আস মদীনায় চলে এলেন এবং জায়ফর পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন।

আম্মানে ধর্মত্যাগের মূল নায়ক

আম্মানে ধর্মত্যাগের ফেতনার মূল নায়ক ছিলো 'জুত-তাজ লকিত বিন মালিক ইজদি।' এ ব্যক্তি নবুয়াতের দাবীও করে বসেছিলো। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু হোমাইরের হোজাইফা বিন মোহসিন গালফানীকে আম্মানে এবং ইজদ গোত্রের আরফাজা বিন হারছামা আলবার্কীকে মোহরায় পাঠালেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো এক সাথে সফর করার। যুদ্ধ শুরু হবে ওমান থেকে। ওমানের যুদ্ধের সময় সেনাপাতি থাকবেন হোজাইফা আর যুদ্ধ যখন মোহরায় চলবে তখন সেনাপতিত্ব করবেন আরফাজা।

www.pathagar.com

আমি আগেই বর্ণনা করেছি, ইয়ামামার ধর্মত্যাগের কলহকে দমন করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকরামা বিন আবু জেহেলকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন শোরাহবিল বিন হাসানাকে। যুদ্ধ বিজয়ের কৃতিত্ব এককভাবে লাভ করার জন্য ইকরামা শোরাহবিল পৌছার আগেই মুসাইলামার বাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা করে বসলো। কিন্তু মুসাইলামা তাঁকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দিলো। ইকরামার এতো তাড়াহুড়া করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপর রাগ করলেন। তাকে মদীনায় আসতে বারণ করে ফরমান পাঠালেন, ওমানে গিয়ে বিদ্রোহীদের মুকাবিলায় হোজাইফা ও আরফাজকে সাহায্য করতে। এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দু' নেতাকেও ইকরামার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ না করার জন্য হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। হোজাইফা ও আরফাজা পৌছার আগেই ইকরামা ওমানে পৌছে গেলেন। তিন নেতা একত্রে পরামর্শ করে জায়ফরের ভাই ইবাদকে[১] পাহাড় থেকে ফিরে এসে ইসলামী বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য খবর পাঠালেন। কারণ, ইবাদ ধর্মত্যাগীদের ভয়ে ওমান থেকে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছিলো।

মুসলমানদের বিজয়

লকিত মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে তার বাহিনী নিয়ে দাবা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিলো। এদিকে জারফার ও ইবাদ তাদের সঙ্গী-সাথী নিয়ে পাহাড় থেকে বের হয়ে 'সাহার' এসে পৌছে। ওখান থেকে আবার রওনা হয়ে তারা ইসলামী বাহিনীর সাথে যোগ দিলো। দাবার যুদ্ধের ময়দানে উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হলো। প্রথম প্রথম মকিতের পাল্লা ভারী ছিলো। মুসলমানরা ছিলো উদ্বিগ্নতার মধ্যে। আর তাদের সারির মধ্যেই বিক্ষিপ্ততা দেখা দিয়েছিলো। তারা প্রায় পরাজয় বরণের নিকটবর্তী পৌছে গিয়েছিলো। এ সময় বনু আবদুল কায়েস এবং বাহরাইনের অন্যান্য গোত্রগুলোর কাছ থেকে বিপুল সামরিক সাহায্য আল্লাহর রহমত হিসাবে দেখা দিলো। এতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে গেলো। তাদের শক্তি সাহস বৃদ্ধি পেলো উল্লেখযোগ্যভাবে। তারা অগ্রসর হয়ে লকিতের বাহিনীর উপর হামলা শুরু করে দিলো। শত্রুদের দশ হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। নারী ও শিশুরা হয়েছে বন্দী। বিপুল অর্থসম্পদ গানিমাত হিসাবে পাওয়া গেলো। এভাবে ওমানেও ধর্মত্যাগের ফেতনার চির অবসান ঘটে। এখানে মুসলমানদের বুনিয়াদ মযবুত হয়।

যুদ্ধ অবসানের পর হোজাইফা ওখানেই বসতিস্থাপন করেন। এখানে সুব্যবস্থা, শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েমের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে এক-পঞ্চমাংশ গানিমাত পৌছাবার জন্য আরফাজা মদীনায় গমন করলেন। বিদ্রোহ দমন ও ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডিন করার জন্য ইকরামা তার বাহিনী নিয়ে মোহরার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

---

১. কামিল ইবনে আসিরে জারফারের ভাইয়ের নাম ইবাদের জায়গায় ইয়াজ লিখা হয়েছে।

www.pathagar.com

মোহরার যুদ্ধ

হোজায়ফাকে দক্ষিণ আরবের পূর্ব এলাকার শেষ সীমায় অবস্থিত আম্মানে রেখে মোহরার বিদ্রোহ দমন ও ধর্মত্যাগের ফেতনার অবসান ঘটাবার জন্য ইকরামা পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলো মুসলমানদের এক বিরাট বাহিনী। বাহিনীর অধিকাংশ লোক ধর্মত্যাগ হতে ফিরে এসে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। মোহরায় পৌঁছে তাদেরকে দু'টো দলের মুকাবিলা করতে হয়েছে। এ দু'টো দলই একে অপরের শত্রু ছিলো। প্রত্যেক দলেরই অভিলাষ ছিলো ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে অন্য দলকে অধীন করে রাখা। এ অবস্থার সুযোগে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কূটনৈতিক বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে দুর্বল দলকে নিজের সাথে এনে সবল দলকে প্রথম দমন করার বুদ্ধি আটলেন। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব, পরামর্শ ও আমন্ত্রণক্রমে দুর্বল দল ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের পর মোহরার নও মুসলিমদেরকে সাথে নিয়ে শক্তিশালী গ্রুপের মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। এখানে 'দাবা'র চেয়েও অধিক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অবশেষে বিজয় লাভ মুসলমানদের ভাগ্যেই জুটলো। তারা অনেক ধন-সম্পদ গানিমাত হিসাবে লাভ করলো।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের শুভসংবাদ, গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ পাঠাবার সাথে সাথে মিত্র গোত্রের সরদারকেও মদীনায় আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে রয়ে গেলেন মোহরায়। মোহরায় আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি নিমগ্ন হলেন। এখানে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বহাল করার পর খলিফাতুল মুসলিমীনের হুকুমে বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি মুহাজির বিন আবু উম্মিয়ার সাহায্যে ইয়েমেন রওনা হয়ে গেলেন। এ সময়ে অন্যান্য গোত্র ছাড়া অনেক মোহরাবাসীও তাঁর সাথে শামিল ছিলেন।

ইয়েমেনে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা

উপকূলীয় পথ ধরে ইকরামা মোহরা থেকে হাজরামাউত ও কান্দাহার দিকে অগ্রসর হলেন। এ অভিযানে তিনি তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হননি। কেননা হাজরামাউত ছিলো মোহরার সংলগ্ন দেশ। অবশ্য মুহাজির বিন আবু উম্মিয়াকে ওখানে পৌঁছতে বেশ বেগ হতে হয়েছে। কেননা তাকে ইয়েমেন পৌঁছতে হয়েছে সুদূর উত্তর সীমান্ত হতে। ইকরামা মুহাজিরের সাথে যোগ দেয়ার জন্য বেশ দ্রুত ইয়েমেনে পৌঁছেছিলেন। কারণ, ইয়েমেনের বিদ্রোহ বেশ দীর্ঘসূত্রিতা ধারণ করে ফেলেছিলো। আর ফেতনার বীজানু গোটা এলাকাটাকেই রুগ্ন করে দিয়েছিলো। এদের দেখাদেখি অন্যান্য এলাকায়ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিলো। এসব কারণে ইয়েমেনে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের জোর প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন ছিলো বেশী। এতে শুধু এ এলাকাতেই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতো

www.pathagar.com

না বরং কান্দাহ, হাজরামাউতের অবশিষ্ট ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ দমনেও সহজ উপায় বের করা সম্ভব হতো।

ইয়েমেনে বিদ্রোহের কারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আসওয়াদে উনসি কিভাবে নবুয়াতের দাবী উত্থাপন করে সুনয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। কিভাবে মক্কা ও তায়েফ পর্যন্ত তার প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিলো। উনসির স্ত্রী আযাও পূর্বে সুনায়ার বাদশাহ শাহর বিন বাজানের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। তার যোগ সাজস ও ষড়যন্ত্রে কিভাবে উনসি সমূলে নিহত হলো—এসব কথাও আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন ঠিক সে দিনই মদীনায় উনসির নিহত হবার খবর পৌঁছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরোজকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু সংবাদে বিদ্রোহের দাবানল জোরেশোরে আবার জ্বলে উঠে। তাছাড়াও সেখানে এমন কিছু কারণ ঘটে গিয়েছিলো যা এ বিদ্রোহকে ঘৃতাহুতি দিয়ে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

ইয়েমেন বিদ্রোহের প্রথম কারণ

এ এলাকায় একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে বিভিন্ন শাসকের অধীনে একে ভাগ করে দেয়াই হলো ইয়েমেন বিদ্রোহের প্রথম কারণ। বস্তুত বাদশাহ বাজানের মৃত্যুর পর ইয়েমেন রাষ্ট্র তার ছেলে শাহরকে ছাড়াও আরো কয়েকজন শাসকের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছিলো। শাহরকে দেয়া হয়েছিলো সোনায়ার দায়িত্ব। অন্যান্য শাসকদেরকে দেয়া হয়েছিলো নাজরান, হামদান ইত্যাদি। এসব অবস্থার কারণেই আসওয়াদে উনসি বিদ্রোহের সূত্রপাত করতে সাহস পেয়েছিলো। শুধু ইয়েমেনেরই অবস্থা এ ছিলো না বরং মক্কা ও তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ইয়েমেনের উত্তর এলাকাকেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন শাসকের অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। বস্তুত তেহামার ঐসব এলাকা যা উপকূলীয় অঞ্চলের সমান দূরত্বে অবস্থিত ছিলো, তা একজন শাসকের অধীন ছিলো। আর আন্ত-অঞ্চলীয় শাসক ছিলো অন্যান্য শাসকের অধীনে। আসওয়াদে উনসির কলহ দমনের পর প্রত্যেক শাসকেরই প্রত্যাশা ছিলো, তারা নিজ নিজ জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে শাসন কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লড়তে হলে তাতেও তারা প্রস্তুত ছিলো।

অপরদিকে আসওয়াদে উনসির সহযোগিদের এ চিত্র ভালো লাগেনি। যে এলাকা আসওয়াদ বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর দখল করে নিয়েছিলো তা আবার মুসলমানদের দখলে চলে যাক, তার বন্ধুরা তা মেনে নিতে পারেনি। তাই মুসলমান শাসকদের আবার নিজ নিজ এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভ হতে বিরত রাখতে ও আসওয়াদে উনসির জায়গা পুনরুদ্ধার করতে রওনা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর ধর্মত্যাগের এ ফিতনা মহামারির মতো গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রত্যেক গোত্রই মুসলমানদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতি ছিলো।

এসব কারণ মিলে ইয়েমেন ও এর সংলগ্ন এলাকায় আসওয়াদে উনসি ও তার সহযোগিদের তৎপরতা কাজ করে একটা ভীষণ উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিলো।

আসওয়াদের পর তার সহযোগীদের তৎপরতা

আসওয়াদে উনসির মৃত্যুর পরও তার সহযোগীদের উদ্যোগ উদ্যম বন্ধ হয়ে যায়নি। নাজরান ও সানায়া এলাকায় তারা তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলো। ওমর বিন মা'দি কারাব একজন কবি এবং প্রখ্যাত বাহাদুর ছিলো। তার বাহাদুরী ও সাহসিকতার খ্যাতি গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ 'ওমর বিন মা'দি কারাব' আসওয়াদে উনসির সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। এ সুযোগে সে মসুলমানদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলো। সে কায়েস বিন আবদে ইয়াগুসকে সাথে নিয়ে ইয়েমেন থেকে ফিরোজকে বের করে দিলো। সাথে সাথে ওয়াজদিয়াকেও' দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিলো। এভাবে দ্বিতীয়বারের মতো এ ফেতনা ইয়েমেনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এ বিদ্রোহের ফলে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়লো।

এ নাজুক পরিস্থির্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মদীনা আর ইয়েমেনের মধ্যবর্তী রাস্তায় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ। এ পথটি সমুদ্র উপকূল বয়ে চলে গেছে। এখানে বসবাস করছিলো 'আক' আর 'আশ-আরিয়াইনের' কোনো কোনো গোত্র। এ গোত্রগুলো বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো। তায়েফ ছিলো এ পথের একেবারেই পাশে। ওখানকার শাসনকর্তা তাহের বিন আবি হালা এ পরিস্থিতি সম্পর্কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করেছিলেন এবং স্বয়ং একটি সাহসী ও দুর্দান্ত বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হলেন। এদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হলো। এতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলো। তাদের অসংখ্য লোক নিহত হলো। ঐতিহাসিকগণ এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, তাদের লাশের কারণে রাস্তা ভরে গিয়ে চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজয়ের খবর পাবার আগেই চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করার হেদায়াত দিলেন ; এসব খবিসরা সরে গিয়ে যে পর্যন্ত রাস্তা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন না হবে সে পর্যন্ত তাদেরকে 'আলাব'[১] নামক স্থানে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। এদিন থেকে 'আক' বাহিনীর নাম 'জুমুয়ুল আখাবিস' (খবিসদের একত্রিকরণ) এবং রাস্তার নাম 'তরিকুল আখাবিস' (খাবিসদের পথ) হিসাবে পরিচিত হয়ে পড়ে। পরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ নাম আরবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিলো।

---

১. 'আলাব' ঃ মক্কা আর উপসাগরীয় কূলের মধ্যে একটি জায়গার নাম। এখানে বনু 'আক' ও বনু আদনান বাস করতো।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের দ্বিতীয় কারণ

ইয়েমেনে ফেতনা জ্বলে উঠা এবং তা তীব্র আকার ধারণ করার আর একটা কারণ ছিলো জাতীয়তার বিষবাষ্প। শাহরের মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিরোজকে সানায়ার শাসক নিযুক্ত করেন। আসওয়াদে উনসির মৃত্যুর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ফিরোজের সাথে শাহরের দু'জন মন্ত্রী ওয়াজদিয়া ও হাশবনাস এবং সেনাপতি কায়েস বিন আবদে ইয়াগুসও জড়িত ছিলো। ওয়াজদিয়া ও হাশবনাস ছিলো ফার্সি ঔরষজাত। আর সেনাপতি কায়েস ছিলো আরবীয় বংশোদ্ভূত ও ইয়েমেনের হোমাইর গোত্রের লোক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিরোজকে শাসক নিযুক্ত করলে সেনাপতি কায়েসের তা ভালো লাগেনি। তাই সে ফিরোজকে হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো।

কয়েসের ফেতনা

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কায়েস বুঝতে পারলো, ফিরোজকে হত্যা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে সব 'আবনারা' তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ইরানী বংশোদ্ভূত লোক, যারা ইরান হুকুমাতের কালে ইয়েমেনে বসবাস শুরু করেছিলো, এখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এমন কি রাষ্ট্র শাসনেও তাদের প্রভাব বিরাজিত ছিলো।

ইরানী বংশোদ্ভূত লোকজনের শক্তি ও প্রভাবের জন্য কায়েস ইয়েমেনের সব আরবীয়দের একত্র করে ইরানীদের দমন করার চেষ্টা চালানো প্রয়োজন মনে করলো। নতুবা তার পরিণতিও আসওয়াদের পরিণতির মতো হবে। তাকেও ঐভাবেই জীবন দিতে হবে যেভাবে জীবন দিতে হয়েছে আসওয়াদকে।

সুতরাং কায়েস জুলকালাহ হামিরী সহ ইয়েমেনের আরবীয় বংশোদ্ভূত সরদারদের কাছে লিখলো—ইরানী আবনারা তোমাদের দেশে এসে জোর করে সব নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে। অবৈধভাবে তারা এখানে বসতিস্থাপন করেছে। তোমরা যদি এ ব্যাপারে সতর্ক না হও তাহলে অচিরেই তারা তোমাদের সব জিনিসই নিয়ন্ত্রণ করে নেবে। আমার মতে তাদের সরদার ও নেতাদেরকে হত্যা করে ওদেরকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তোমরা এ কাজে আমাকে সাহায্য করো।

কায়েসের এ প্রস্তাবে জুলকালাহ ও তার সাথীরা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলো। তারা কায়েসের সাথে মিলে আবনাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আবার আবনাদের সাথে একত্রিত হয়েও কায়েসের কোনো ক্ষতিসাধন করেনি। কায়েসকে তারা বলে পাঠালো—আমরা এ ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে অপারগ। তোমার সাথীদের সাথে পরামর্শ করে যা করা ভালো মনে করো তাই করো। আবনাদের বিরুদ্ধে কায়েসকে তারা সহযোগিতা করতে হয়তো গররাজী হতো না। কিন্তু তারা জানতো এ ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু অবশ্যই আবনাদেরকে সাহায্য করবেন। কেননা আবনারা যথারীতি ইসলামের উপর কায়েম আছে ও মদীনার হুকুমাতের আনুগত্য করে চলেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কোনো জোটভুক্ত হওয়া নিজেদের কোনো বিপদে ফেলার শামিল হবে। এবং পরিণতি কি হবে তা কারো জানা নেই। বিশেষ করে ধর্মত্যাগের ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইয়েমেনে এখন মুসলিম সামরিক বাহিনীর লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর এর আগে মুসলমানরা সব ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করেছে।

আসওয়াদ সহযোগীদের কাছে কায়েসের সাহায্য প্রার্থনা

'জুলকালা' ও তার সাথীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া না গেলেও কায়েস ভগ্ন মনোরথ হলো না। সে গোপনে গোপনে আসওয়াদে উনসির আবির্ভাবের সময় যারা তাকে সাহায্য করেছিলো তাদের কাছে আবনাদেরকে বহিষ্কার করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলো। এরা আগ থেকেই ভিন দেশী আবনাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজছিলো, তাই কায়েসের এ আহ্বান তারা সানন্দে গ্রহণ করলো। তার সাহায্যে অচিরেই তারা পৌঁছে যাচ্ছে বলে তাদেরকে জানালো।

যেহেতু খবরাখবর ও চিঠিপত্র যোগাযোগ অত্যন্ত সঙ্গোপনে করা হয়েছে। আর সামরিক বাহিনীর চলাচলেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এ কারণে সানায়াবাসীরা ওদের বাহিনী শহরের খুব কাছে পৌঁছে যাবার আগে কিছুই জানতে পারেনি।

তাদের বাহিনী আসার খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে কায়েস ফিরোজের কাছে গিয়ে বললো, এই মাত্র সে বাহিনী আসার খবর জানতে পেরেছে। চেহারায় বিমর্ষের ছাপ ফেলে অত্যন্ত চতুরতার সাথে সে ফিরোজ ও ওয়াজদিয়ার সাথে বর্তমান অবস্থার মুকাবিলা করার ব্যাপারে পরামর্শ করলো। আরো পরামর্শের জন্য ফিরোজ, ওয়াজদিয়া ও হাশবনাসকে পরের দিন সকালে তার বাড়িতে খাবারের দাওয়াত দিলো।

ওয়াজদিয়াকে হত্যা

পূর্ব কথা অনুযায়ী পরের দিন ওয়াজদিয়া কায়েসের বাড়ী পৌঁছলো। তার অপর দুই সাথী ফিরোজ ও হাশবনাস এখনো এসে পৌঁছেনি। ওয়াজদিয়া ঘরে পা রাখা মাত্র তরবারীর আঘাতে কায়েস তাকে হত্যা করে ফেললো। ক্ষণিক পরেই ফিরোজ এসে উপস্থিত। কিন্তু দরযায় পা রাখতেই তার সাথীর হত্যার ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছে টের পেয়েই সে দ্রুত ঘোড়া নিয়ে পালালো। পথে হাশবনাস ফিরোজ থেকে খবর পেয়ে সেও তার সাথে পালাতে লাগলো। কায়েসের লোকেরাও তাদের পেছনে দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু না পেয়ে ফেরত চলে এলো। ফিরোজ ও হাশবনাস আশ্রয়ের জায়গা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে জাবালে খোলান গিয়ে নানার বাড়িতে আশ্রয় নিলো। কিন্তু তখনো তারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে বলে নিশ্চিত হতে পারেনি।

কায়েসের সানয়া নিয়ন্ত্রণ

অবশেষে কায়েস সানয়া দখল করে ফেললো। নিশ্চিন্তে সে সেখানে হুকুমাত করতে লাগলো। কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে অথবা কেউ তাকে ক্ষমতাচ্যুত

www.pathagar.com

করতে পারে এমন ধারণাও কায়েসের মনে আসেনি। ফিরোজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে বনু খোলান সহ তার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে শুনে কায়েস ঠাট্টা করে বললো :

খোলানকে দেখো ! আর ফিরোজকে দেখো ! এ মূর্খদের জানা নেই তাদের শক্তি কতো ? কিসের বলে তারা আমার সাথে মুকাবিলা করার কথা ভাবছে।

হোমাইর গোত্রের লোকজনও কায়েসের সাথে মিশে গেছে। অবশ্য এ গোত্রের নেতারা কায়েসের আনুগত্য স্বীকার করেনি। তারা সব ছেড়ে নির্জন স্থানে চলে গেলো।

আবনাবাসীদের সাথে কায়েসের আচরণ

নিজের ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা আসার পর কায়েস 'আবনাবাসীদের' প্রতি দৃষ্টিপাত করলো। তাদেরকে কায়েস তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগের সাথে আলাদা আলাদা নীতি অবলম্বন করলো। যারা ফিরোজের প্রতি নিরাশক্ত হয়ে কায়েসের আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাদেরকে সে মুক্ত রেখে পরিজনসহ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে বাধা দেয়নি। যারা পালিয়ে গিয়ে ফিরোজের সাথে একত্রিত হয়েছে তাদের পরিবার-পরিজনকে দু' ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে এডেনে পাঠিয়ে দিলো। তারা যেনো সেখান থেকে জাহাজে চড়ে স্বদেশে চলে যেতে পারে। আর অপর অংশকে স্থল পথে পারস্য উপসাগরের দিকে পাঠিয়ে দিলো। তাদেরকে নিজ নিজ শহরে চলে যাবার জন্য কায়েস হুকুম জারী করে দিলো। তাদের কেউ যেনো ইয়েমেনে আর না থাকে।

কায়েসের পরাজয়

ফিরোজের স্বদেশবাসীর সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা তিনি জানতে পেরেছেন। তাই ইসলামে আজও অবিচল আছে এমন গোত্রগুলোর কাছে তাঁকে সাহায্য করতে আবেদন জানালেন। ভৌগলিক জাতীয়তার পথকে ফিরোজ ধর্মীয় জাতীয়তার প্রভাব দিয়ে রুদ্ধ করে দিতে চাইলেন। বনু আদিল, বনু রাবিয়া, বনু আক ফিরোজের সাহায্যে এগিয়ে এলো। একটি বাহিনী তৈরি করে তারা কায়েসের মুকাবিলার জন্য রওনা হয়ে এলো। সানয়ার সামান্য দূরে কায়েসের বাহিনীর সাথে তারা মুখোমুখি হলো। কায়েস পরাজিত হলো। ফিরোজ আবার সানয়া দখল করে নিলেন। খলিফাতুল মুসলিমীনের তরফ থেকে আবার তিনি ওখানকার শাসনভার পরিচালনা করেন।

কায়েস পরাজিত হয়ে তার দলবল নিয়ে আসওয়াদে উনসির সময় যে জায়গায় ছিলো সে জায়গায় চলে গেলো। ফিরোজের বিজয় ও আমীরাতের দায়িত্বে সমাসীন হবার পরও ইয়েমেনে প্রত্যাশিত নিরাপত্তা বিধান হলো না। সানয়া ফিরোজ শাসন করে যাচ্ছিলেন কিন্তু অবশিষ্ট ইয়েমেন বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাঁই হয়ে যাচ্ছিলো। সেখানকার ধর্মত্যাগীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এখনো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

www.pathagar.com

ইয়েমেন ও হিজাজে আত্মকলহ

এখানে আর একটি তৃতীয় কারণ বলে দেয়া সমীচীন। ইয়েমেন ও হিজাজের আত্মকলহ ও পারস্পরিক শত্রুতা এ এলাকায় বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠার ইন্ধন যুগিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইয়েমেনের বনী হোমাইরের হাত থেকে ক্ষমতা হেজাজীদের হাতে চলে আসে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের যুগে যদিও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিজয় ইয়েমেনবাসীদের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তারা মুসলমানদেরকে ভীতির চোখে দেখেছে কিন্তু এরপরও তাদের এক বীরযোদ্ধা ওমর বিন মায়াদী কারব বেঁচে ছিলো, যার ভয়ে বড় বড় বীর বাহাদুরদের হৃদয়ে কম্পন উঠতো। বনু জুবায়দা গোত্রের ছিলো এ বীর ঘোড় সওয়ার। তাকে নিয়ে ইয়েমেনবাসী গৌরব অনুভব করতো। পরে ওমর বিন মায়াদীকারবও ইসলাম গ্রহণ করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট কার্যক্রম আ াম দেন। ইতিহাসের বইতে আজ পর্যন্ত তাঁর কথা উল্লেখ হয়ে আসছে। বুড়ো হয়ে যাবার পরও তার বাহাদুরীতে ও বীরত্বের কমতি হয়নি। কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় তার বয়স একশত বছরের বেশী হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এরপরও তিনি যুবকদের চেয়ে বেশী বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

ওমর বিন মায়াদী কারবের বিদ্রোহ

ওমর বিন মায়াদী কারব নিজকে বড় বাহাদুর মনে করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। কায়েস বিন আবদে ইয়াগুসকেও সে তার সাথে একত্রিত করে নিলো। এরা দু'জনে প্রত্যেক গোত্রের কাছে গিয়ে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মানুষদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। ফলে নাজরানে খৃষ্টান অধিবাসীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব গোত্র ওমর বিন মায়াদী কারবের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। খৃষ্টান গোত্রগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো। আর সে চুক্তিতে তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও অটল রইলো।

ইয়েমেনে ইকরামা ও মুহাজির

এ বেগতিক অবস্থা দেখেও মুসলমানরা ঘাবড়িয়ে যায়নি। একদিকে ইকরামা বিন আবু জেহেল মোহরা হতে ইয়েমেনে গিয়ে পৌঁছেছে। নিজের বাহিনী নিয়ে 'আবিল' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছে। অপরদিকে মুহাজির বিন আবু উমিয়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেয়া পতাকা সহকারে মক্কা ও তায়েফ হয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন। অসুস্থতার কারণে ইয়েমেনে তাঁর কয়েক মাস বিলম্ব হয়ে গেলো। মক্কা, তায়েফ ও নাজরান থেকে কিছু সংখ্যক যুদ্ধ অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ বিশারদ লোক তার সাথে জমায়েত হলো। ইয়েমেনবাসীরা এসব সিপাহসালারদের আগমনের কথা শুনলো। আরো শুনলো পথিমধ্যে মুহাজির বিন আবু উম্মিয়া তার এক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তারা উপলব্ধি করতে পারলো, তাদের এ বিদ্রোহ তাদের

www.pathagar.com

জন্য এক ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মুসলমানদের মুকাবিলা করতে তারা সমর্থ হবে না। শত শত লোক নিহত হবে। আর যারা বেঁচে যাবে তাদেরকে বানানো হবে মুসলমানদের গোলাম।

কায়েস ও ওমরের মতভেদ

ইয়েমেনবাসী এখনো এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে মগ্ন। এমন সময় কায়েস আর মায়াদী কারবের ভাঙ্গন দেখা দিলো। আর এ অবস্থায়ই তারা মুহাজিরের মুকাবিলা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। এদিকে গোপনে গোপনে উভয়েই উভয়ের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকতো।

কায়েস ও ওমরের গ্রেফতারী

শেষে ওমর বিন মায়াদী কারব মুসলমানদের সাথে মিলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। একদিন ওমর বিন মায়াদী কারব নিজের বাহিনী নিয়ে কায়েসের ঘাটিতে আক্রমণ করে তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন। তারপর তাকে মুহাজিরের কাছে পেশ করে দেন। কিন্তু মুহাজির কায়েসের গ্রেফতারীকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং সাথে সাথে ওমর বিন মায়াদী কারবকেও গ্রেফতার করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে তাদের ফায়সালার ভার তাঁর উপর ছেড়ে দেন।

আবু বকরের অনুকম্পা

ওয়াজদিয়ার হত্যার বদলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কায়েসকে হত্যা করতে চাইলেন এবং তাকে বললেন ঃ

"হে কায়েস ! তুমি আল্লাহর নিষ্পাপ ও মাসুম বান্দাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছো। মু'মিনদেরকে ছেড়ে দিয়ে মুরতাদদেরকে রক্ষা করে চলছো।"

কায়েস ওয়াজদিয়াকে হত্যা করার কথা অস্বীকার করলো। যেহেতু তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সাক্ষ্য-প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কারণ, অত্যন্ত সঙ্গোপনে এ হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়েছিলো। কেউ তা দেখেনি—তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষমা করে দিলেন। হত্যা আর করলেন না।

এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমর বিন মায়াদী কারবের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"তোমার লজ্জানুভব হয় না। প্রতিদিন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। এরপরও এ সব দুষ্কৃতি হতে বিরত হচ্ছো না। তুমি যদি ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করতে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে উন্নতি ও মর্যাদা দান করতেন।"

ওমর বিন মায়াদী কারব উত্তর দিলো ঃ

"আমার অবশ্যই ত্রুটি হয়েছে। আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর আমার কাছ থেকে এ ধরনের কার্যক্রম সংঘটিত হবে না। আমি ইসলামী রাষ্ট্রের একজন আনুগত্যশীল নাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করবো।"

www.pathagar.com

একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং উভয়কে তাদের গোত্রে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ইয়েমেনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান

আসওয়াদে উনসির কাল থেকে যারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে দেশের বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। নাজরান থেকে সানয়া পৌঁছেই মুহাজির তাদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর লোকদেরকে আরো নির্দেশ দিলেন, ওদের যাকেই ধরতে পারবে তাকেই হত্যা করে ফেলবে। যেন ফেতনার আর কোনো বিজাণু এ মাটিতে তারা ছড়াতে না পারে।

ইকরামা দক্ষিণ ইয়ামামায় অবস্থান গ্রহণ করে সেখানকার "নাখা" ও "হোমাইর" গোত্রের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকেন। তিনি উত্তরে ইয়েমেনে পৌঁছার সুযোগ পাননি।

এ উভয় নেতার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গোটা ইয়েমেন দেশে পরিপূর্ণভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কায়েম হয়ে গেলো। এখানকার বাসিন্দারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এখন 'হাজরামাউত ও কান্দাহ ছাড়া গোটা আরবে মুরতাদদের আর কোনো নাম-নিশানা বাকী থাকলো না।

ইরানীদের সাহায্যের কারণ

এখানে আমি ঐসব লোকদের সন্দেহ-সংশয় নিরসন ঘটানো সমীচীন মনে করি যারা বলেন, অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনের আরবদের মুকাবিলায় কেন ইরানীদের সাহায্য করলেন। ফিরোজ এবং তার সঙ্গী-সাথীরা কোন্ হিকমতের কারণে কায়েসের মুকাবিলায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতা করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ সহজ। গোটা জগত জানে ইসলাম আরব আর অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচীত করে না। ভৌগলিক জাতীয়তায় ইসলাম বিশ্বাসী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কে কত আল্লাহভীরু পার্থক্য শুধু হয় তারই ভিত্তিতে। ইরান বংশোদ্ভূত লোকেরা ঈমান আনে সকলের আগে। আর সকলের আগে ঈমান আনার কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাদের একটি মর্যাদার আসন ছিলো। অপরদিকে এ এলাকার আরব বাসিন্দারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আসওয়াদে উনসি নবুয়াতের দাবী করে বসেছে। আসওয়াদের পরও তার সাহায্যকারী সহযোগীরা ফেতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে আসওয়াদের চেয়ে কম ছিলো না। এদের মধ্যে ওমর বিন মায়াদী কারব ও কায়েস বিন আবদে ইয়াগুস ছিলো এসব দুষ্কৃতির হোতা। কিন্তু বাজান, শাহর, ফিরোজ সহ অন্যান্য ইরানী বংশোদ্ভূত লোকেরা যথারীতি ইসলামের উপর অবিচল ছিলো। শুধু তাই নয় বরং গোটা আরবে যখন বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তাদের দুর্দমনীয় বাহিনী যখন ইসলামী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখনও পরিপূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এসব লোকেরা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য

www.pathagar.com

সহযোগিতা করেছেন। মুসলিম বাহিনীর পাশে পাশে থেকে এ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এ অবস্থায় যদি আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সামরিক বাহিনী ও সেনাপতিদের দ্বারা ফিরোজকে সাহায্য করে থাকেন এবং বিজয়ের পর তাকে আবার সানয়ার শাসক হিসাবে নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে এতে আপত্তি করার অবকাশ কোথায়? স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর আগে শাহর বিন বাজানকে গোটা ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

কান্দাহ ও হাজরামাউতে যুদ্ধ-বিগ্রহ

কান্দাহ ও হাজরামাউত প্রসঙ্গে একই অবস্থা বিরাজ করছিলো। এখানকার অধিবাসীরাও ধর্মত্যাগের ফেতনায় অংশগ্রহণ করে। মুহাজির ইবনে উম্মিয়া এবং ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের নেতৃত্বে এখানে শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই জিয়াদ বিন লবিদকে হাজরামাউতে, ওকাশা বিন মুহসিনকে সাক্কাফ ও সকুনে, মুহাজির বিন আবু উম্মিয়াকে কান্দাহার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। অসুস্থতার কারণে মুহাজির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কান্দাহ পৌঁছতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে জিয়াদ বিন লবিদ শাসন কাজ দেখাশুনা করেন।

মুহাজিরের কান্দাহর শাসক হবার ঘটনা

মুহাজিরের কান্দাহর শাসক হবার ব্যাপারটিও একটি ঘটনা। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমার ভাই ছিলেন এ মুহাজির বিন আবু উম্মিয়া। তাবুকের যুদ্ধে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমাকে মর্মপীড়া দিয়েছে। একদিন উম্মে সালমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। কথায় কথায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যন্ত বিনীত ও হৃদয় বিগলিত সুরে মুহাজিরের উপর অসন্তুষ্টি বিদূরীত করার সুপারিশ জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কান্দাহর শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। তাঁর কান্দাহার পৌঁছার আগ পর্যন্ত জিয়াদ বিন লবিদ ভারপ্রাপ্ত শাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

কান্দাহবাসীর ধর্মত্যাগ

কান্দাহ ইয়েমেনের পাশাপাশি দেশ। এ কারণে আসওয়াদে উনসি ইয়েমেনে নবুয়াতের দাবী করার সাথে সাথে কান্দাহবাসীরাও ইয়েমেনের মতোই আসওয়াদকে সমর্থন করে যেতে লাগলো। তাই দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন কান্দাহর কিছু কিছু সাদাকা ও যাকাতের মাল হাজরামাউতে এবং কিছু সাদাকা ও যাকাতের মাল কান্দায় বণ্টন করে দিতে হবে।

যাকাত আদায়ের ব্যাপারে জিয়াদের কিছু কঠোরতার কারণে ওখানকার জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে গেলো। ইসলামের উপর কায়েম আছে এমন

www.pathagar.com

'সকুনবাসীদের' দ্বারা কান্দাহর বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সকুনের কেউ তার ডাকে সাড়া দিলো না। আর কেউ কান্দাহার মুকাবিলায় উঠে দাঁড়ালো না।

মুসলমানদের সাথে আশআছের যুদ্ধ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের কলহ ছড়িয়ে পড়লে তার লেলিহান শিখা সুদুর হাজরামাউত ও কান্দাহ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। এ কলহ গহীনে পৌছার আগেই জিয়াদ এর মূলোৎপাটন করে দিতে চাইলেন। তাই তিনি ইসলামে আস্থাশীল ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে বনু ওমর্র বিন মুয়াবিয়ার উপর তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলা করে বসলেন। পুরুষদেরকে হত্যা ও নারীদেরকে গোলাম বানিয়ে গানিমাতের মালসহ তারা ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কান্দাহার নেতা আশআছ বিন কায়েসের কান্দাহর গোত্রগুলোর পাশ দিয়ে আসার সময় গ্রেফতারকৃতদের কিছু সম্মানীত বংশের মহিলা উচ্চস্বরে বলতে লাগলো ঃ

> "হে আশআছ ! তোমাদের খালাদের মান-ইজ্জত বিপন্ন। তাদেরকে লাঞ্ছনা হতে বাঁচানো তোমাদের ফরয কাজ।"

এ ফরিয়াদ শুনে আশআছবাসীর রক্ত টগবগ করে উঠলো। তারা জীবনপণ করে তাদেরকে উদ্ধার করার শপথ নিলো। আশআছ বিন কায়েস ছিলো এ গোত্রের জনপ্রিয় ও সম্মানিত নেতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষাংশে এ ব্যক্তি বনু কান্দাহার আশিজন লোক নিয়ে মদীনায় এসেছিলো। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে ছিলো দামী দামী রেশমী কাপড়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে আশআছ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং প্রস্তাবক্রমে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কন্যা উম্মে ফারদাকে বিয়ে করলেন।

মহিলাদের কাতর ফরিয়াদ আশআছের মনকে বিগলিত করে দেয়। তাঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তির কারণে অল্প সময়ের মধ্যে সব লোক একত্র হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় বের হয়ে মহিলাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করে নেয়।

ইকরামা ও মুহাজিরের কান্দাহ যাত্রা

বিজয়ের এ দিন থেকে আশআছ কান্দাহ ও হাজরামাউতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে লাগলো। অধিকাংশ গোত্রকে তার সাথে যোগ করে নিলো। এ অবস্থা দেখে জিয়াদ ঘাবড়িয়ে গেলেন। তিনি কান্দাহ আসার জন্য তৎক্ষণাত মুহাজির বিন উম্মিয়াকে চিঠি লিখলেন। ইকরামা ও মুহাজির সে সময় ইয়েমেনের বিদ্রোহ দমন করে ফেলেছেন।

তাই তারা উভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সাহায্য করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। মুহাজির রওনা হলেন সানয়া হতে আর ইকরামা আদন থেকে। মায়ারের উভয় নেতা একত্রিত হলেন। সোহাইদ মরুভূমি অতিক্রম করে কান্দাহর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। জিয়াদ সম্পর্কে মুহাজির ভাল জানতেন। তাই তিনি ইকরামাকে মূল

www.pathagar.com

বাহিনীর সাথে রেখে নিজে একটি ছোট বাহিনী নিয়ে দ্রুত জিয়াদের কাছে এসে আশআছের উপর হামলা করে তাকে পরাজিত করে দিলেন। আশআছ পালালো। বাহিনীর লোক নিয়ে সে 'বখায়ের' নামক কিল্লায় আশ্রয় নিলো।

বখায়ের দুর্গ অবরোধ

'বখায়ের' হলো একটি ঘাঁটি। এর উপর হামলা করা চাট্টিখানি কথা ছিলো না। ঐ ঘাঁটিতে পৌছার ছিলো তিনটি পথ। একটি পথ জিয়াদ অবরোধ করে রেখেছেন। দ্বিতীয় পথে অবরোধ করে রেখেছেন মুহাজির। আর তৃতীয় পথটি ছিলো খোলা। এ খোলা পথে দুর্গবাসীদের রসদপত্র ও সামরিক সাহায্য আসা যাওয়া করতো।

অবশেষে ইকরামাও তার বাহিনীসহ এখানে পৌছে তৃতীয় পথটি অবরোধ করে বসলেন। এখন দুর্গবাসীদের সকল সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ। তারা দুর্গের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এ ব্যবস্থা ইকরামা যথেষ্ট মনে করলেন না। তিনি বরং তার সব ঘোড় সওয়ারদেরকে কান্দাহর উপসাগরীয় কূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তারা যে কোনো বিদ্রোহীকে পাবে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলবে। বখায়েরে অবরুদ্ধ লোকেরা জাতির এ ধ্বংসযজ্ঞ নিজ চোখে দেখছিলো। এখন তাদের সামনে আবার মৃত্যুর বিভিষিকা ভেসে উঠেছে। এ ব্যাপারে কোনো সুরাহা বের করার জন্য তারা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগলো। কেউ বললো ঃ

> "তোমাদের বর্তমান অবস্থা হতে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। তোমরা তোমাদের মাথার চুল কেটে ফেলো। যেনো বুঝা যায় তোমরা তোমাদের জীবনকে আল্লাহর দরবারে পেশ করে দিয়েছো। হতে পারে আল্লাহ এভাবে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং এ ঘোর বিপদ হতে নিষ্কৃতি দান করবেন।"

এ পরামর্শ অনুযায়ী সকলেই মাথার চুল কেটে ফেললো। তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো একজন লোকও মুসলমানদের মুকাবিলায় তাদের কোনো ভাইকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।

নিজ গোত্রের সাথে আশআছের বিশ্বাসঘাতকতা

ভোর হবার সাথে সাথে তারা তিনটি পথেই বের হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ছয় শত। অপরদিকে মুহাজির ও ইকরামার সৈন্য সংখ্যা ছিলো অসংখ্য। মুসলমানদের এতবেশী সৈন্য দেখে তারা উপলব্ধি করলো, তাদের বিজয় সম্ভব নয়। নিরাশ হয়ে তারা জীবনের আশা ত্যাগ করলো। এ সময় তাদের নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজ নিজ জীবন বাঁচানোর চিন্তা-ভাবনায়। আশআছ ইকরামার কাছে এসে আবেদন জানালো, মুহাজিরের কাছে সুপারিশ করে তাদের নয়জন সাথীর জীবন রক্ষা করার জন্য। বিনিময়ে তারা দুর্গের সকল দরযা মুসলমানদের জন্য খুলে দেবে।

মুহাজির আশআছের আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন। তাকে বলে দেয়া হলো, যাদের জীবন ভীক্ষা চাওয়া হয় তাদের নাম একটি কাগজে লিখে দিতে। আশআছ

www.pathagar.com

তার নিজের পরিবার-পরিজন ও ভাইদের নাম তো লিখে দিলো কিন্তু নিজের নাম লিখতে ভুলে গেলো। কাগজখানা সীলমোহর দিয়ে মুহাজিরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এরপর সে এই নয় ব্যক্তিকে কিল্লা হতে বের করে দিলো। তারা মুসলমানদের জন্য কিল্লার দরযা খুলে দিলো। মুসলমানরা ভিতরে প্রবেশ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো। তাদের প্রায় এক হাজারের মতো নারীকে গ্রেফতার করলো। এরপর আশআছকে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ মালসহ মদীনায় আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

অবস্থার পরিবর্তনের মোড় বড় বিস্ময়কর। যে আশআছ শুধু নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করলো। গোটা জাতিকে তরবারীর নীচে ফেলে. রেখে এক হাজার নারীকে দাসী বানাবার জন্য মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিলো ; সে আশআছই একদিন বনু মুয়াবিয়ার নারীদের ফরিয়াদ ঃ "হে আশআছ ! তোমার খালাদের মান-ইজ্জত বিপন্ন। তাদেরকে এ লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্ত করা তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব।" শুনে তার শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠেছিলো। প্রতিটি নারীকে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সে দম ফেলেনি। এ আশআছই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌছলে তার প্রতি তার জাতির জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা দেখে মুসলমানগণ তাকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু তার থেকে এ লজ্জাকর কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেলে মুসলমানরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। স্বয়ং তাদের নারীরা তাকে অভিশাপ বর্ষণ করে। তারা তাকে (উরকুন-নার ইয়েমেনী ভাষায়) গাদ্দার বলে অভিহিত করে। কিন্তু তাকে মৃত্যু ভয় পেয়ে বসে সে তার জীবন রক্ষার খাতিরে যে কোনো লাঞ্ছনার পথ অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। নিজের জানের নিরাপত্তার জন্য যে কোনো ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

আশআছের মদীনা যাত্রা

আশআছ কাগজে যাদের নাম লিখে দিয়েছিলো, মুহাজির তাদের সকলকে ডেকে এনে মুক্ত করে দিলেন। যে চিঠিতে সীলমোহর লাগিয়ে আশআছ এ নামের তালিকা পাঠিয়েছিলো তাতে তার নিজের নাম ছিলো না। তাই মুহাজির তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন এবং বললেন ঃ

> "আল্লাহর অপার মহিমা, যিনি তোমার মনের উপর পর্দা টেনে দিয়েছিলেন ; আর তাই তুমি তোমার নাম তালিকাভুক্ত করতে ভুলে গিয়েছিলে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন—এটাই ছিলো আমার অভিপ্রায়। এখন তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।"

কিন্তু এরই মধ্যে ইকরামা হস্তক্ষেপ করে বললেন ঃ

"আপনি তাকে হত্যা না করে বরং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি তার ব্যাপারে যা ভালো মনে করবেন সিদ্ধান্ত নেবেন। সে যদি তার

www.pathagar.com

নাম তালিকায় সন্নিবেশিত করতে ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে খলিফার কাছে তাকে তার অভিযোগ পেশ করতে দিন।"

ইকরামার এ পরামর্শ মুহাজিরের মনপূত না হলেও তিনি তাকে অবশেষে ইকরামার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের সাথে মদীনায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় তার বাঁচার চেয়ে মরাই উত্তম ছিলো। কারণ, মদীনায় সারাটা পথে তার গোত্রের লোকেরা তাকে অত্যন্ত গাল-মন্দ ও অভিসম্পাত করতে থাকে।

আশআছকে আবু বকরের ক্ষমা

মদীনায় পৌঁছার পর আশআছকে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পেশ করা হলো। তিনি আশআছের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"হে আশআছ ! তোমার সাথে আমি কি ব্যবহার করবো বলে তোমার ধারণা ?"

উত্তরে আশআছ বললো ঃ

"আপনার মতামত আমি কিভাবে বুঝবো ? তারপরও আমি আপনার কাছে অনুকম্পা ও করুণার প্রত্যাশা করবো।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আমিতো তোমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।"

আশআছ বললো ঃ

"আমিই তো দুর্গের ফটক মুসলমানদের জন্য খুলে দিয়েছি। তারপরও কি আমি হত্যার উপযোগী ?"

আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে গেলো। অবশেষে আশআছ বুঝতে পারলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে হত্যা করেই ফেলবেন। তাই সে বললো ঃ

"আমি আমার উপর রহম করার জন্য আপনার কাছে সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি। আমার জাতির গ্রেফতারকৃত রমণীদের মুক্তি দিন। আমার অপরাধ মার্জনার দৃষ্টিতে দেখুন। আমার ইসলাম গ্রহণকে আপনি মঞ্জুর করুন। আমার সাথে আপনি এমন আচরণ করুন যা আমার মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে আপনি করে থাকেন। আমার স্ত্রী আপনার কন্যাকেও আমার কাছে ফেরত দিন।"

এ আবেদন মঞ্জুর করতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দ্বিধাগ্রস্ততা দেখে আশআছ আবার মিনতিভরে আবেদন জানালো ঃ

"হে খলিফাতুল মুসলিমীন ! আপনি আমাকে মুক্তি দিন। ভবিষ্যতে আমি খাঁটি দিলে ইসলামের উপর অবিচল থাকবো। আপনি আমাকে একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে দেখতে পাবেন।"

www.pathagar.com

অনেক ভেবেচিন্তে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জীবন ভিক্ষা দিলেন। নিজের কন্যাকে পুনরায় তার কাছ থেকে ফেরত দিলেন এবং তাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"নিজের গোত্রের কাছে ফেরত চলে যাও। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আর কোনো দিন আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসবে না।"

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আশআছ নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে সাহস পেলো না। বন্ধন মুক্ত হবার পর স্ত্রী উম্মে ফরদা সহ সে মদীনায়ই বসবাস করতে লাগলো। ওমরের খেলাফতের সময় ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হবার কালে আশআছ ইসলামী বাহিনীর সাথে ইরান-রোম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এসব যুদ্ধে তার বীরবিক্রম এবং অবলম্বিত কর্মকাণ্ডে লোকদের চোখে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে গেলো এবং তার লুপ্ত সম্মান ফেরত গেলেন।

হাজরামাউত ও কান্দায় নিরাপত্তা বিধান

হাজরামাউত ও কান্দায় শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার এবং ইসলামী হুকুমাত দৃঢ়মূলে ভিত্তিস্থাপন করার আগ পর্যন্ত মুহাজির ও ইকরামা হাজরামাউত ও কান্দায় অবস্থান করলেন। ধর্মত্যাগীদের সাথে এটাই ছিলো সর্বশেষ যুদ্ধ। এরপর আরবে বিদ্রোহের দাবানল চিরদিনের জন্য নিবে গেলো। আরবের সকল গোত্র ইসলামী হুকুমাতের অধীনে চলে আসে।

এ এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি ইয়েমেনে অবলম্বিত ব্যবস্থার মতো অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট।

কান্দায় দু'জন গায়িকা ছিলো। একজন গায়িকা তার গানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করতো। আর অপরজন মুসলমানদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করতো। মুহাজির এ উভয় গায়িকার হাত কেটে দিলেন। তাদের সামনের দাঁত উপড়ে ফেললেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসব ঘটনার কথা পৌঁছলে তিনি মুহাজিরকে এসব ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখেন। তিনি লিখলেন, যে গায়িকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করতো তাকে হত্যা করা সমীচীন ছিলো। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগালের সাজা অন্যান্য সাজার মতো হতে পারে না। আর যে গায়িকা মুসলমানদের কুৎসা করতো সে যদি জিম্মি হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত ছিলো। মানুষের মুসলা (নাক কান চোখ দাঁত ইত্যাদি কাটা) করা হতে বিরত থাকবে। এটা মহাপাপ। হত্যার বদলে কেসাস ছাড়া তার কোথাও এমন ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয নেই।

এ দু'জন গায়িকার সাথে মুহাজির যে আচরণ করেছেন এর থেকে আন্দাজ করা যায় অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। কি কঠোরতা তিনি অবলম্বন করেছেন তাদের সাথে।

www.pathagar.com

ইয়েমেনে শাসক হিসাবে মুহাজির

হাজরামাউত অথবা ইয়েমেন যে কোনো একটির শাসনভার গ্রহণ করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজিরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। মুহাজির ইয়েমেনের শাসনভার গ্রহণ করাকে পসন্দ করেছেন। তাই তিনি সানয়া চলে গেলেন। সেখানে ফিরোজের সাথে মিলে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। জিয়াদ বিন লবিদ যথারীতি হাজরামাউতের শাসক হিসাবে কর্তব্য পালন করতে থাকেন।

নোমানের কন্যার সাথে ইকরামার বিয়ে

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু তার সাথে ছিলেন তার স্ত্রী নোমান বিন আলজাওনের কন্যা যাকে তিনি যুদ্ধের ময়দানেই বিয়ে করে ফেলেছেন। তিনি জানতেন, মোজায়ার কন্যা উম্মে তামিমকে বিয়ে করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি কুণ্ঠাবোধ না করেই নোমানের কন্যাকে বিয়ে করে ফেলেন। এ ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে ইকরামার বাহিনীর কিছুলোক তার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন।

এ বিষয়টি মুহাজিরের কাছে পেশ করা হলে তিনিও কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারলেন না। তিনি সব ব্যাপার জানিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখে তাঁর রায় জানতে চাইলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকরামার বিয়ে করাকে অসমীচীন কাজ নয় বলে রায় লিখে পাঠালেন।

প্রকৃত ঘটনা হলো—একবার নোমান বিন আলজাওন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি তার কন্যাকে তার পিতার সাথে ফেরত পাঠালেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই ইকরামা বাহিনীর কারো কারো ধারণা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করার অস্বীকৃতির উপর আমল করে ইকরামারও এ বিয়ে না করা উচিত ছিলো। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করলেন। ইকরামার বিয়েকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করলেন। ইকরামা তাই তার স্ত্রীকে নিয়ে মদীনায় চলে এলেন। বাহিনীর যে অংশ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইকরামা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তারা আবার তার সাথে এসে মিলিত হলেন।

আরবের বিদ্রোহের চির অবসান

আরবের সকল বিদ্রোহের চির অবসান ঘটলো। ধর্মত্যাগীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হলো। আল্লাহ তাঁর দীনকে মর্যাদা দিয়ে চির বিজয়ী করলেন। ইসলামী হুকুমাতের ভিত্তি আরবের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অত্যন্ত মযবুতভাবে কায়েম হয়ে গেলো। ইসলামের বিজয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপার আনন্দিত। কিন্তু এতে কোনো অহমবোধ ছিলো না। কারণ, তিনি জানতেন, যা কিছু হয়েছে শুধু আল্লাহর ফযল ও

www.pathagar.com

করমেই হয়েছে। সমগ্র আরবের যুদ্ধবাজ সৈনিকদের মোকাবিলা করা, তাদেরকে পরাস্ত করে ইসলামের পতাকাকে সুনামের সাথে আবার উড্ডিন করা আরবের হাতে গণা কয়েকজন মুসলমানের শক্তি সামর্থ দ্বারা সম্ভব হতো না।

ভবিষ্যত্ত পদক্ষেপ

দীনের ঐক্যকে শক্তিশালী করা ও ইসলামকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছাবার জন্য কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করাই ছিলো এখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রধান দায়িত্ব। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর কালেমাকে উড্ডিন করা। এ আকাঙ্খাই প্রতিটি মুহূর্তে তার মাথায় ঘুরপাক খেতো। এ আবেগ অনুভূতির ছায়ায়ই অত্যন্ত সাজ-সরঞ্জামহীনভাবে ধর্মত্যাগীদের বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে সমরাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এ আবেগ অনুভূতি ইরাক ও সিরিয়ার লড়াইতেও ষোলআনা কার্যকর ছিলো।

www.pathagar.com

১১

ইসলামের বিজয়াভিযান

আরবের উত্তর সীমান্ত

আরব উপদ্বীপের ঐ অংশটা, যা একদিকে আকাবা উপসাগর ও অন্যদিকে পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে উত্তর দিকে প্রসারিত হয়ে চলে গেছে, তা আরববাসীদের জন্য সবসময়ই চিত্তাকর্ষক ছিলো। আকাবা উপসাগরের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অংশ সিরিয়া নামে আর পারস্য উপসাগরের উত্তর পশ্চিম অংশ ইরাক নামে ডাকা হতো। উভয় উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল পাহাড়ে ভরা ছিলো। এ পাহাড়গুলো[১] 'নুপুদ' মরুভূমি ও সিরিয়ার বন-জঙ্গলকে পৃথক করে রেখেছে জাওফের এলাকায় দাওমাতুল জান্দাল হতে। ঐ জায়গা যেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকে সিরিয়া ও ইরাক এবং আরবের সীমা একত্রিত হয়েছে।

সিরিয়াবাসীরা কাইনুকা বংশীয় লোক ছিলো আর ইরাকের আদিম অধিবাসীরা ছিলো আশুরা বংশীয় লোক। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ইরাকের বনাঞ্চল অবস্থিত ছিলো। বনাঞ্চল রেখেছিলো দুই দেশকে পৃথক করে। এসব ভয়াবহ মরুভূমি অতিক্রম করে অন্য এলাকায় প্রবেশ করা শহরের বাসিন্দাদের জন্য ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। মরুভূমি প্রান্তরে সচরাচর বিপদাপদের সম্মুখীন হতে তারা সাধারণত চাইতো না। তাছাড়া মরুভূমিতে তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য এমন কোনো জিনিস ছিলো না। আজকালও বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরম সময়ে তারা মটরযানে চড়ে এসব মরুভূমি অতিক্রম করতে ভয় পায়। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এ মরুভূমির উপর দিয়ে তারা উড়োজাহাজে আরোহণ করে সফর করাকেই অগ্রাধিকার দেয়।

সিরিয়ার ঊষর মরুতে বসতিস্থাপন

এটা সেই মরুভূমি যার প্রতি প্রাচীনকালে সিরিয়ার কাইনুকা বংশীয় বাসিন্দারা আকর্ষিত হতে পারেনি। আকর্ষিত করতে পারেনি ইরাকের আশুরী আরবের বেদুঈনদেরকে। কেননা মরুভূমি ও মাঠে-ময়দানে বসবাস করার দরুন তাদের প্রকৃতিই এমন ধাচের হয়ে গিয়েছিলো। দুনিয়ার সকল শোভা-সৌন্দর্য তারা মরুভূমিতেই লুকায়িত দেখতে পেতো। শহরের জীবনকে তারা এর সকল সুষমা ও সৌন্দর্য সত্ত্বেও কয়েদী জীবন বলে মনে করতো। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ দেয়াল—'মায়ারের' ভেঙ্গে পড়ার আশংকার পরে শুধু সর্বপ্রথম উত্তরাঞ্চলের দিকে তারা সরে গিয়েছিলো। এ আশংকা যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো, তখন ইয়েজদী গোত্র ইয়েমেন থেকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করলো এবং উত্তর দিকে হেজায ও সিরিয়ার দিকে যেতে লাগলো।

---

১. সামাদা মরুভূমির নতুন নাম।

www.pathagar.com

আরবের উত্তর সীমান্তের দিকে স্থানান্তরিত হবার আরো একটি কারণ ছিলো, রোমীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য স্থল পথ ছেড়ে দিয়ে জলপথে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিলো। এ কারণে দক্ষিণ আরবে বসবাসকারী মানুষদেরকে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তারাও উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য ইয়েমেন থেকে হেজায ও সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলো। দেশ ত্যাগের ধারা ঐতিহাসিকদের মতে ইংরেজী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরম্ভ হয়েছিলো। এ ধারণা যদি সত্য বলে মনে করা হয়, তাহলে মানতে হবে যে, আরবীয় গোত্রগুলো অনেক অনেক দিন আগ থেকেই সিরিয়া মরুভূমিতে বসতিস্থাপন করতে শুরু করে দেয়। তারা সেখানে শুধু টুলা হিসাবেই বসতিস্থাপন শুরু করে দেয়নি বরং লুট মার ও তেজারতের উদ্দেশ্যে আরবের যেসব গোত্র সিরিয়া ও ইরাকে যাচ্ছিলো তাদেরও অধিকাংশ দেশে ফেরত যাবার পরিবর্তে ওখানেই বসবাস করতে শুরু করে দিলো।

সিরিয়া ও ইরাক গিয়ে বসবাসকারী আরবরা যদিও শহরের পরিবর্তে মরুভূমি এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলো, তবু তারা বসবাসের জন্য শহরতলীর নিম্ন অঞ্চলকেই পসন্দ করতো। দেশের অবস্থা তাদেরকে এরূপ করতে বাধ্য করেনি বরং এটা তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। বেদুঈন হবার কারণে একদিকে তাদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিই ছিলো মরুজীবন যাপন করা, কোনো অবস্থাতেই তারা এ জীবন পরিত্যাগ করতে পারতো না। অপরদিকে সহজভাবে জীবন যাপনের প্রয়োজন শহরের কাছে বসবাস করতে তাদের বাধ্য করেছিলো। সব যুগেই বেদুঈনদের অবস্থা এমন ছিলো। আজকালকের যুগেও মিসর ও সিরীয় বেদুঈনরা মরু এলাকার এমন চিত্তাকর্ষক স্থানে বাস করে যা শহরের খুব নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। কারণ, এখানে জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ যোগাড় করা যেমন সহজ তেমনি মরু অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ ও তৃপ্তি লাভ করে।

আরব গোত্রসমূহ দলে দলে দক্ষিণ সীমান্তের দিকে চলে গিয়ে বসবাস করার কারণে সিরিয়াকেও আরবের একটি অংশ বলে মনে হচ্ছিলো। এদের মধ্যে গাস্সানীরাই ছিলো সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। এ গোত্রটি নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে সিরিয়া সীমান্তে একটি রাষ্ট্র কায়েম করে বসেছিলো। আর গাস্সানীদের অনুকরণে "লাখমী" গোত্র ফোরাত উপকূলে হিরা নামে একটা রাষ্ট্রের পত্তন করে।

আরব মরুতে বসবাসকারীদের পূর্বপুরুষদের চলে আসা জীবনধারা, অভ্যাস ও রীতিনীতিতে সিরিয়া ও ইরাকে বসবাসকারী আরবীয়রা কোনো পরিবর্তন আনেনি। আরবদের বৈশিষ্ট্য ছিলো, তারা যে দেশে বসবাস করতো, সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সকল ব্যাপারে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতো। এ কারণেই তারা সিরিয়ায় রোমীয় শাসকদের ও ইরাকে ইরানী রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্যের শির নত করে বসেছিলো। তাদের এ আনুগত্য ও অনুসরণ প্রবণতা ছিলো সহযোগিতার কৌশলগত নীতি। এখানে কোনো শাসকের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ছিলো না। তাই যতটুকু সম্ভব আরবীয়রা অন্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তি

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বকীয়তার কোনো পরিবর্তন আসতে দেয়নি। যদি কখনো তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো রকম হুমকীর সম্ভাবনা দেখা দিতো তারা তা কঠোরভাবে দমন করে ফেলতো।

এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বেদুঈনরা মরু জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও বন-জঙ্গল ভ্রমণে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শহুরে জীবনযাপনের প্রতিও ছিলো অসীম অনুরাগী। সুতরাং তারা যখন মরু অঞ্চল থেকে দূরে চলে যেতো তখন এ জীবনের গুণগানে ও প্রশংসায় তারা দিনরাত পঞ্চমুখ থাকতো। কিন্তু শহুরে জীবনের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশের আধিক্যের প্রতিও ছিলো তারা ঈর্ষাকাতর। সিরিয়ার চিত্তাকর্ষক বিচরণভূমি, দীগন্ত বিস্তৃত বাগান, আঙ্গুর বাগানের সারি, ওখানকার রূপসী সুন্দরী নারীদের বর্ণনা, মক্কা-মদীনা সহ গোটা হিজাযের মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। যখনই কোনো কাফেলা সিরিয়ার বাণিজ্যিক ভ্রমণ থেকে ফিরে আসতো, তারা তাদের সাথী-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন এবং জানতে আগ্রহীদের কাছে ওখানকার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতো। এরপর বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে তা দূর-দূরান্তের গোত্র পর্যন্ত যেতো। শ্রবণকারীরা তা অপলক নেত্রে শুনে যেতো। তাদের মনে অলক্ষ্যে জেগে উঠতো, হায়! তাদের দেশ যদি এ ধরনের আরাম-আয়েশ ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ হতো আর তারা যদি তা অবলোকন করতে পারতো, তাহলে কতইনা সুখী হতে পারতো।

আরবীয় জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্ক

ইরাক ও সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবীয় গোত্রগুলোর অবস্থাও ছিলো একই। যদিও তারা সচ্ছল-সচ্ছন্দ এবং শহরের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের সাথে যথেষ্ট অংশীদার ছিলো। কিন্তু এরপরও আরবীয় জীবনযাপনের প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ ছিলো। কারণ, আরবী বংশোদ্ভূত হওয়া ছাড়াও জাজিরাতুল আরবের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো শত শত বছরের।

এসব অবস্থা বর্ণনা করে ইরাক ও সিরিয়া অধিবাসীদের সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং 'লাখমী' ও গাস্‌সানীদের দ্বারা আরব বিজয়সমূহ আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে ইসলামী সালতানাতের রূপরেখার গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন করাই হলো মূল লক্ষ্য।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে আরবদের ঘরবাড়ী স্থানান্তরিত করণ, 'মা'রেবের প্রাচীর ভাঙ্গা আর রোমের ব্যবসায়ী পথ স্থল থেকে জলে রূপান্তরিত হবার পূর্বেই শুরু হয়েছিলো। যদিও এ দু'টো ঘটনা আরবদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তারপরও ঘরবাড়ী স্থানান্তরিত করার এ ধারাবাহিকতা এসব ঘটনার অনেক আগে শুরু হয়েছিলো। আরবদের সাথে এ প্রতিবেশী দেশসমূহের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকেই গভীর ও নিবিড় ছিলো। কেননা পূর্বদিকের সব ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরই হাতে ছিলো। আর ব্যবসায়িক কারণে তারা প্রায়ই সিরিয়া, মিসর, রোম ইত্যাদি দেশে ভ্রমণে যেতো। হাজরামাউত থেকে দু'টি পথে ব্যবসায়ী

www.pathagar.com

কাফেলা সিরিয়ায় পৌছতো। একটি পথ বাহরাইন ও পারস্য উপসাগরের উপকূল বয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গেছে। আর অপরটি ইয়েমেন ও হেজাজ হয়ে চলে গেছে। এ দ্বিতীয় পথটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল মক্কা নগরী।

ব্যবসা-বাণিজ্যের এ ধারা সর্বপ্রথম আরবের দক্ষিণাঞ্চল হাজরামাউত, ইয়েমেন, ওমান ও বাহরাইনের লোকেরা শুরু করেছিলো। কেননা তারা সুজলা, সুফলা ও শ্যামল এলাকার মালিক হবার ও ইরানীদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখার কারণে দক্ষিণ এলাকার তুলনায় অধিক সভ্য ছিলো। ইরাক ও সিরিয়ায় যারা ঘরবাড়ী স্থানান্তরিত করেছে এবং ওখানে গিয়ে আবাদ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিলো দক্ষিণাঞ্চলের লোক। গাস্‌সানীরা, যারা পূর্বে সিরিয়ায় একটি রাষ্ট্র কায়েম করে বসেছিলো, তারা আম্মানের একটি গোত্র 'ইজদের' সাথে সম্পর্কিত ছিলো। ঠিক এভাবে কাজায়া, তানূখ ও কাবল গোত্রের লোকেরা—যারা সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসরত ছিলো এবং ইয়েমেনের বিখ্যাত গোত্র হোমাইরেরও সাথে সম্পর্কিত ছিলো। ইরাকেও ছিলো এ অবস্থাই। ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রীয় লোকদের অধিকাংশই হাজরামাউত থেকে এসেছিলো।

এসব গোত্র শুরুতে সিরিয়া মরু প্রান্তরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিলো। ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তে নিজেদের আধা স্বায়ত্বশাসিত সালতানাত কায়েম করে বসেছিলো। মায়ারেবের প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়া ও বাণিজ্য পথ জল ও স্থলে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কোনো গোত্র হেজাযে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। এরপর আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিকার উত্তম পথ বের করার জন্য মরু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে শহুরে জীবনের রস আস্বাদনের জন্য সিরিয়ার দিকে চলে গেলো।

ইরান-রোম সম্পর্কের ধরন

সেকালে ইরাক ও সিরিয়া, ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের মতো দুই পরাশক্তির মধ্যে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। কখনো ইরানীরা সিরিয়া আক্রমণ করে একে রোম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতো। আবার কখনো রোমীয় শাসকরা ইরাককে ইরানীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সিরিয়ার সাথে মিলিয়ে নিয়ে ওখানে নিজেদের শাসন কায়েম করতো।

সিরিয় মরু প্রান্তরে অবস্থিত আরবদেরও এমনই অবস্থা ছিলো। তারা তাদের স্বভাবগত প্রকৃতি অনুযায়ী কখনো ইরানীদের সাথে মিশে যেতো আবার কখনো রোমীয় বাহিনীর সাথে মিশে লুটতরাজে অংশ নিতো।

অবশেষে এ দু'টি সাম্রাজ্য আপন আপন নিরাপত্তার জন্য এ মরুপ্রান্তর-বাসীদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করতো। যাতে কোনো সাম্রাজ্য অপর সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করতে না পারে এবং সিরিয়া পরিপূর্ণভাবে রোমীয়দের আর ইরাক পরিপূর্ণভাবে ইরানীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

রোম ও ইরানীদের কৌশলানুযায়ী সিরিয় সীমান্তে বসবাসকারী গোত্র-সমূহকে রোমীয়গণ তাদের সাথে, আর ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী গোত্রগুলোকে ইরানীরা তাদের সাথে মিলিয়ে নিলো। এসব গোত্রগুলো আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন বেদুঈন পদ্ধতির জীবনযাপন এবং আরবীয় সমাজপ্রথা ঠিক রেখে নিজেদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলো।

সিরিয়ায় বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও রোমীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও রাজনৈতিক প্রভাব গ্রহণ করা হতে নিবৃত্ত থাকতে পারেনি। কিন্তু যেভাবে তারা রোমক কৃষ্টি কালচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমনি তারা রোমীয়দের উপরও আবার নিজেদের প্রভাব এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, বিখ্যাত রোমক শাহেনশাহ 'কালপ' আরব বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন। তিনি 'সামীজা' গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এ গোত্রই সর্বপ্রথম আরব থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার আগে 'কালপ' নিজ গোত্রের সদরদার ছিলো। সে কারণে সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবদের মর্যাদা ও প্রতাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এরপরও তারা মরু অঞ্চল ত্যাগ করা এবং রোমীয়দের মধ্যে বিলোপ হওয়াকে পসন্দ করেনি।

সিরিয় আরবদের উল্টো ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরবগণ মরু অঞ্চল ছেড়ে ইরাকী সীমান্তে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে। কেননা যদি তা-ই হয়, তাহলে তাদের পরিপূর্ণভাবে ইরানীদের অনুগত হয়ে থাকতে হতো। আর এ অবস্থা তাদের মুক্তমন ও স্বাধীন স্বভাব কোনোভাবেই পসন্দ করতে পারছিলো না। কিন্তু পরে যখন ইরানী সালতানাতে বিশৃংখলা ও গৃহযুদ্ধ দেখা দিলো এবং বিভিন্ন গোত্রের নেতাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন শাসক বনে বসলো তখন আরবীয়রা ইরাকী সীমান্তে প্রবেশ করে ওখানে বসবাস করতে কোনো অসুবিধা মনে করেনি। কেননা এখন তাদের মন থেকে ইরানী সালতানাতের দাসত্বের ভয় বিদূরীত হয়ে গেছে। তারা ইরাক সীমান্তে প্রবেশ করে ফোরাত নদের উপকূলে 'আম্বার' শহর এবং এর থেকে সামান্য দূরে 'হিরা' শহর আবাদ করে এখানে বসবাস করতে লাগলো।

এ বর্ণনার বিপরীত আর এক বর্ণনায় জানা যায়, ফোরাত নদের উপকূলে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে কয়েদী ছিলো। তাদেরকে ইরানীরা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে লুটতরাজ করার সময় গ্রেফতার করেছিলো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, শাহানশাহ দ্বিতীয় বখত্নসর আরবের উপর আক্রমণের সময় যাদেরকে গ্রেফতার করেছিলেন, তাদেরকে তিনি সাথে করে নিয়ে গেছেন। ইরাক পৌঁছে তিনি তাদেরকে ফোরাত নদীর উপকূলে 'আম্বার' নামক স্থানে আবাদ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাদেরকে আম্বার থেকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন। ওখানে আরবীয়রা 'হীরা' শহর পত্তন করে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে দেয়।

আরবীয়রা এ সময় থেকেই ইরাকে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে শুরু করে দিয়েছিলো। ২১৫ থেকে ২৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইরাকীরা আরবদের নেতৃত্ব যখন

www.pathagar.com

'জাজিমাতুল আবরাশ' অথবা জাজিরাতুল ওজাহর হাতে আসে তখন তিনি পূর্ণ সতর্কতার সাথে ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরবদেরকে সাথে নিয়ে 'হিরা' থেকে শুরু করে আম্বার ও আইনুত তামার পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল করে ফেলেন। ফোরাত নদের পশ্চিমে সিরিয়া মরুভূমি পর্যন্ত তারা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে বসলো। এখানে শুধু তিনি থেমে থাকেননি। বরং সিরিয় মরুতে বসবাসকারী 'মোদার' নামক একটি গোত্রের উপর হামলা করে ওখানকার আরব বাসিন্দাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করে নেন। 'মোদারের' জনৈক ব্যক্তি আদি বিন রাবিয়া জাজিমার সাথে মিশে গিয়েছিলো। জাজিমা তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করে।

আদি জাজিমার বোন রেক্কাশকে বিয়ে করেন। আরবীয় বর্ণনায় ও বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে অনেক রসের গল্প রচিত হয়েছে। রেক্কাশের গর্ভজাত সন্তান হলো ওমর বিন আদ। এ আদির কথা পরে বর্ণনা করা হবে। যে সময় জাজিমা ইরাকে আরবীয়দের বাদশাহ হয়ে বসেছিলো ঠিক সে সময়ে 'উজাইনা' বিন সামিজা সিরিয়ায় অবস্থিত আরবীয়দের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। 'সাবুর' হলো তখন ইরানের বাদশাহ। আর রোমের বাদশাহ ছিলো 'ফালপ'। ফালপ ছিলো অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর হৃদয়ের বাদশাহ। প্রজাদের উপর সে অবিরাম নির্যাতন চালাতো। তার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তখনকার লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ সুবর্ণ সুযোগে 'সাবুর' সিরিয়ার উপর হামলা করে রোমক বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। এদিকে উজাইনা রোমের সাথে কৃত মিত্রচুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে ইরানীদের সাথে মিশে গেলো। মূলত তার অভিলাষ ছিলো, সাবুরের ছায়ায় ঐ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যা জাজিমা ইতিপূর্বে লাভ করেছিলো। কিন্তু তার এ অভিলাস পূরণ হতে পারেনি। কারণ, ঐ সময়ই 'কালরিয়ন' নামক ব্যক্তি ফালপকে সিংহাসনচ্যুত করে তার স্থলে নিজের বাদশাহী কায়েম করে। বাদশাহ হবার পর সর্বপ্রথম সে বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করলো। সেখানে সাবুরকে পরাজিত করে তাকে ইরানের দিকে তাড়িয়ে দিলো। অবস্থা বেগতিক দেখে উজাইনা নীতি পরিবর্তন করে রোমীয়দের সাথে আবার মিত্রতা স্থাপন করে নিলো। কিন্তু কালরিয়ানের বাদশাহীও বেশীদিন স্থায়ী হতে পারলো না। অতি তাড়াতাড়ি তাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হতে হলো। এ সময় উজাইনা আবার সাবুরের সাথে মিলতে চাইলেন। কিন্তু সাবুর এ সুযোগ সন্ধানী মানুষের সাথে মিত্রতা গঠন ও তাকে সহযোগিতা যোগাতে অস্বীকার করলো। নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য উজাইনা সিরিয় আরবদের সাথে মিলে ইরানীদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পেলো না। এবার ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হলো। সে ইরানীদের পরাজিত করে মাদায়েনের দিকে তাড়িয়ে দিলো। এ কার্যক্রম ও কৃতিত্বের কারণে রোমীয়দের হৃদয়ে তার মর্যাদা বেড়ে গেলো। তারা বুঝতে পারলো, ইরানীদের বিরুদ্ধে মুকাবেলা করার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যক্তির সহযোগিতা তারা পেয়ে গেলো।

উজাইনার পর তার বংশধরেরা শাসক হলো। এদের মধ্যে তার অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা 'জিবা'ও ছিলো। জিবা জাজিমাকে ফাঁদে ফেলে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে

www.pathagar.com

জাজিমা তা সানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু বিয়ের পর সুযোগ বুঝে জিবা তাকে হত্যা করে ফেলে। জাজিমার ছেলে ওমর বিন আদির মনে পিতার হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। কায়সার বিন ওমরকে সাথে নিয়ে জিবাকে অবরোধ করে ফেললো। জীবন বাঁচাবার কোনো পথ না পেয়ে ওমর বিন আদির হাতে নিশ্চিত মৃত্যু দেখে জিবা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো। তার মৃত্যুর মাধ্যমে সিরিয়ায় বনু সামিজার কর্তৃত্বের ও নেতৃত্বের অবসান ঘটলো। তাদের স্থান দখল করলো গাস্‌সানী বংশ। কিছুদিন পর ইরাকে ক্ষমতাসীন বনু নসরের একটি দল সিরিয় আরবের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালো, কিন্তু তা সফল হলো না।

ইসলামী বিজয়ের পটভূমি

এসব ঘটনা পড়লে বুঝা যায় যে, যেসব লোককে প্রথম দিকে কয়েদী বানিয়ে আরব থেকে আনা হয়েছিলো তারাই কালক্রমে ও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ফলে ইরান ও রোমকেই তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিলো এবং যথেষ্ট চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে এদের সাথে মিত্রতা ও সখ্যতা গড়ার কাজে তাদেরকে ব্যাপৃত হতে হয়েছিলো। বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে উভয় রাষ্ট্রকেই ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিলো। সত্য কথা বলতে কি, ইরান ও রোমের ছায়ায় বসবাসকারী আরবীয় গোত্রগুলো ইয়েমেন ও হাজরামাউতের গোত্রগুলো থেকে তো কম নয়ই বরং বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এর কারণ হিসাবে যদি বলা হয়, সে সময় আরব সীমান্ত দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও এডেন থেকে শুরু করে উত্তরে মাওসেল ও আরমানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, তাহলে তা বলা ভুল হবে না। এভাবে এ দাবী করাও ভুল হবে না যে, ইরান ও সিরিয় সীমান্তে বসবাসকারী এসব আরবীয় গোত্রগুলো ভবিষ্যতের ইসলামী বিজয়সমূহের জন্য যুদ্ধের "অগ্রগামী বাহিনী' হিসাবে কাজ করেছে। আর এসব এলাকায় ইসলামী সুলতানাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এসব লোকদের চিন্তায় চেতনায় ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও কোনো ধারণা ছিলো না। কেউ আরব ভূখণ্ডে এক বিরাট মর্যাদাবান নবী হিসাবে প্রেরিত হবেন এবং তাঁর দ্বারা আরব জাতির উন্নতি অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—এ ধারণার সৃষ্টিও তাদের মনে হতে পারে না। কিন্তু নীল নদ ও সিরিয়া মরু অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে এসব গোত্রসমূহের বসবাস, তাদের দ্বারা আরবীয় রেওয়াজ রীতি, স্বভাব, চরিত্র, কঠোরভাবে সংরক্ষণ, ইরান ও সিরিয়ার সাথে আরব গোত্রগুলোর সম্পর্ক গড়ে উঠা, এসব উপায়-উপকরণ ঐ আরবী সুলতানাতের বুনিয়াদ হিসাবে গড়ে উঠলো, যা পূর্ণ চার শতকের পর ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের স্থান দখল করে নিলো।

এসব বিচ্ছিন্ন কথা বাদ দিয়ে আমার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। জাজিমাতুল আবরাশের হত্যার পর সাবুরের তরফ থেকে ওমর বিন আদিকে ইরাকে আরবীয় নেতা হিসাবে মেনে নেয়া হলো। তিনি হিরাকে রাজধানী বানালেন। তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পূর্ব পর্যন্ত হিরাই ছিলো লাখমীদের রাজধানী।

www.pathagar.com

হিরার বাদশাহগণ

ইরাকে বসবাসকারী আরবরা নামে মাত্র ইরানী বাদশাহদের প্রজা ছিলো। আসলে ক্ষমতা ছিলো সব হিরার শাসকের হাতে। আরব অথবা সিরিয়ার তরফ থেকে ইরানের উপর আক্রমণ হলে বাধা প্রদান ও পারস্য হতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ রাখাই শুধু ছিলো তাদের করণীয় কাজ।

কিন্তু এসব করেও ইরানের উপর আরবের হামলা তারা প্রতিহত করতে পারেনি। পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী স্থান ছিলো এসব হামলার জন্য সবচেয়ে উত্তম জায়গা। তারা শুধু স্থল পথেই হামলা করতো না বরং কোনো কোনো সময় সামুদ্রিক পথেও ধাওয়া করে বসতো। ইরানীরা বহুবার এসব হামলা প্রতিহত করেছে। ওসব হামলার ভয়াবহতা হ্রাস ও ইরানকে ভবিষ্যতে এ মাথা ব্যথা হতে পরিত্রাণ দেবার জন্য অবশেষে জুল আকতাফকে নিজের সীমানার মধ্যে একটি পরিখা খনন করতে হলো।

একের পর এক বনি নছরের বাদশাহ হিরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে থাকে। সবশেষে ইংরেজী চতুর্থ শতাব্দির শেষভাগে শাহনাহ ইয়াজদ জুরদের পক্ষ থেকে নোমান আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দু'টি বিখ্যাত মহল—'খোরানাক' ও 'সাদির' তিনিই নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইরাকে নোমানের যুগ থেকে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার হতে শুরু করে। এ কারণে খৃষ্টান ধর্মের ব্যাপারে নোমান খুবই উৎসাহিত ছিলেন। পাদ্রীরা খৃষ্ট ধর্মের প্রতি নোমানের দুর্বলতার কথা টের পেয়ে তার অনুমতিক্রমে কয়েকটি গীর্জা তৈরি করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক একথাও বলেন যে, নোমান শুধু খৃষ্ট ধর্মের প্রতি উৎসাহিতই ছিলেন না বরং তিনি এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শাহানশাহ ইয়াজদ জুদির খৃষ্ট ধর্মের ঘোর বিরোধী ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাচ্ছেন। তখন তিনি তার ছেলে মানজারকে শাসনভার দিয়ে বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করলেন।

শাহনশাহ ইয়াজদ জুদির নিজের ছেলে বাহরামগোরকে লালন পালনের জন্য ছোট বেলায়ই হিরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওখানে লালিত পালিত হওয়ার কারণে বাহরামগোর আরবী ও ইউনানী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন এবং আরব ও রোমকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক হালচাল সম্পর্কে অবহিত হন। ইয়াজদ জুদির মৃত্যুর পর ইরানী সরদারগণ কেসরা বিন ইরদশির বিন সাবুর জুল আকতাফকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কেননা ইরানে তার লালন পালন হয়েছিলো। আর তিনি তাদের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তার কাছে বাহরামের অবস্থান ছিলো একজন অপরিচিতের মতো।

সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য বাহরাম মানজার থেকে সাহায্য লাভ করলেন। ছিনিয়ে নেয়া সাম্রাজ্যকে ফেরত পাবার পর শত্রুদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য মানজার তাকে পরামর্শ প্রদান করলে বাহরাম সে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি

www.pathagar.com

শুধু বিরোধী নেতা ও সরদারদেরই নিজের প্রতি আসক্ত বানিয়ে নেননি, বরং পদবী ও পুরস্কার দিয়ে করের বোঝা কমিয়ে তিনি প্রজা সাধারণের মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

খৃষ্টধর্ম

বাহ্‌রামও পিতার মতো খৃষ্টানদের ঘোর শত্রু ছিলেন। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি ঈসায়ী ধর্ম ধ্বংস করে দেবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ফলে ইরান ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো। এ যুদ্ধে মানজার বাহ্‌রামকে সাহায্য করেছে। কিন্তু তা বেশীদিন চলতে পারেনি। উভয় পক্ষই একটা সন্ধি চুক্তিতে উপনীত হওয়া শ্রেয় মনে করলেন। এ সন্ধি দীর্ঘদিন পর্যন্ত কায়েম ছিলো।

ইরানীদের সাথে যুদ্ধের সময় সিরিয়ার বনী গাসসান গোত্রের আরব সরদার ও শাসকরা রোমীয়দের সাহায্য করতো। এদিকে লাখমীরা ইরানীদের মিত্র হিসাবে রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। এ দুই বড় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো তা দুই পক্ষকেই ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করতে সাহায্য করতো। খৃষ্ট চতুর্থ শতাব্দির প্রথম দিকে 'কোসতুনতিন' যখন রোমক সাম্রাজ্যের লাগাম হাতে নিলো সে সময় খৃষ্টধর্ম উন্নতি করতে শুরু করে। আর খৃষ্টধর্মের আহ্বায়করা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পয়গাম শুনাতে শুরু করলো। এসব প্রচারকগণ তাদের কর্মক্ষেত্র সিরিয়ার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ রাখলেন না। বরং ইরাক ও পারস্যের শহরে শহরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচার করার চেষ্টা চালাতে থাকলেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইরানী ও রোমীয়দের এ ধর্মীয় যুদ্ধের সময় ইরাক ও সিরিয়ার আরবীয়দের ভূমিকা কি ছিলো? তারা তাদের প্রভুদের ধর্মীয় প্রভাব গ্রহণ করে অগ্নিপূজা ও ঈসায়ী ধর্ম অবলম্বন করেছিলো অথবা অবিকল তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের মূর্তিপূজার উপর কায়েম ছিলো।

পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার আগে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। কেননা এর থেকে আরবীয়দের মানসিক আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে এবং এও বুঝা যাবে, এ মানসিক আবেগ-উচ্ছ্বাস ইসলামী বিজয়াভিযানের জন্য ক্ষেত্র কতটুকু তৈরি করতে পেরেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবীয়রা ইরাক ইরানীদের ও সিরিয়ায় রোমীয়দের কৃষ্টি-কালচারের প্রভাব বহুল পরিমাণে গ্রহণ করে ফেলেছে। ইরাকে বসবাসকারী কোনো কোনো আরব ভালোভাবে ফার্সি ভাষা আয়ত্ব করে ফেলেছিলো। ইরানী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ধর্মবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়েও তারা বেশ ওয়াকফহাল হয়ে গিয়েছিলো। অংকন বিদ্যা, জরদস্ত, মজুকশিল্প ও আকায়েদ সম্পর্কেও তারা গভীর জ্ঞানার্জন করেছে।[১]

সিরিয়ায় অবস্থানরত আরবীয়দেরও অবস্থা ছিলো এ রকমই। রোমীয়দের সভ্যতা, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়েই শুধু তারা গভীর অধ্যয়ন করেনি বরং সচেতন

১. আহমদ আমীনের লেখা ফজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা–২৩।

www.pathagar.com

মানসিকতার দিক দিয়েও তারা আরবদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলো। কারণ, ইউনানী সভ্যতা ও রোমীয় সভ্যতার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিলো।

ইরাকী আরবীয়রা ইরানীদের সাথে গভীর সম্পর্ক, মিলামিশা গড়ে উঠলেও অগ্নিপূজাকে কখনো গ্রহণ করেনি। ঠিক এভাবে সিরিয় আরবগণও কোনোদিনই রোমীয় ও ইউনানী দেবতাদের পূজা-অর্চনা করেনি। এরপরও রোমক সুলতানাতে খৃষ্ট ধর্ম প্রসার লাভ করলে শুধু সিরিয় আরবরাই নয়, বরং ইরাকী আরবরাও তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে এ নতুন ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলো। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আরবীয়রা যখন এতোদিন তাদের প্রভুদের প্রথম দীনগুলো গ্রহণ করলো না তখন এ খৃষ্টধর্ম গ্রহণে কিভাবে এতো ঝুঁকে পড়েছিলো ?

ঐতিহাসিগণ উল্লেখ করেছেন, রোমের শাহানশাহ তার নিজ দেশে কোনো জায়গাই কোনো অ-ঈসায়ী ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করছেন না দেখে বনু গাস্সান গোত্রের প্রথম ঈসায়ী বাদশাহ ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেন। এ কারণেই এদের মধ্যে ঈসায়ী ধর্ম প্রসারতা লাভ করেছে। এরপরও আমাদের প্রশ্ন থেকেই যায়। যদি মেনে নেয়াও হয় যে, রোমীয় শাহানশাহের চাপ ও দমনের মুখে গাসসানী শাসকগণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাহলে সাধারণ মানুষের এ ধর্ম গ্রহণের কারণ কি ? যদি একথা বলা হয়, তাহলে বলতে হবে, আরবী প্রবাদ বাক্যটি 'বাদশাহ যে ধরনের হয় প্রজা সাধারণও সে ধরনেরই গড়ে উঠতে বাধ্য।' আর এর ফলেই সিরিয়া গোত্রগুলো নিজেদের নেতাদের অনুকরণে ঈসায়ী ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এরপরও আবার প্রশ্ন উঠে, অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। এ অবস্থায় মানতে হবে যে, ইরান ও সিরিয়ায় খৃষ্ট ধর্ম বিস্তৃত হয়ে পড়ার কোনো না কোনো এমন কারণ অবশ্যই আছে যা আরবীয়দের মানসিক রুচি ও ঝোঁক প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত ছিলো এবং এসব কারণগুলো হতে সম্পূর্ণই ভিন্ন ছিলো। এসব কথা উপরে উল্লেখ হয়েছে।

আরবীয়রা প্রকৃতিগতভাবেই সহজ-সরল, সাদা-মাটা। তারা কোনো ঘুর-প্যাচের কথাবার্তা বলতো না। আর এ ধরনের কথাবার্তাকে আদৌ পসন্দও করতো না। 'মোজদেক' ও 'মানি' দার্শনিকগণ যেসব দুর্বোধ্য ও জটিল দর্শন ও আদর্শ পেশ করেছেন, ঠিক এভাবে ইউনানী দর্শনের ভিত যেভাবে দুর্বোধ্য, কঠিন ও জটিল আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আরবীয়দের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে মোটেই সক্ষম হয়নি। এর উল্টো ছিলো ঈসায়ী ধর্ম। এ ধর্ম দর্শনে ছিলো সহজ-সরল কথা—যা মানুষের বোধগম্য হতো। তাই সহজ-সরল রুচিবোদের অধিকারী আরবীয়গণ ঈসায়ী ধর্মকে সহজে গ্রহণ করেছে। আর খুব অল্প সংখ্যক লোক মাজুসি অর্থাৎ অগ্নিপূজার দিকে আকর্ষিত হতে পেরেছে।

যেহেতু ঈসায়ী ধর্ম আল্লাহর একজন খুবই নেক বান্দাহর মারফত প্রচারিত হয়েছে—এই ধর্মগ্রহণকারীরা আহলি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের আবির্ভাবের

www.pathagar.com

সময় পবিত্র মনের অধিকারী অনেক ঈসায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তাই বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই যে, ইরাক ও সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবীয় বাসিন্দাগণের ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ আরবীয়দের বিজয় ও ইসলামী সুলতানাতের প্রতিষ্ঠার একটি মাইল ষ্টোন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্ম পরিবর্তনের কারণে ঐসব আরবীয়দের প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে শেষে তারা ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়নি। আর শত শত বছরের অবলম্বিত ও প্রতিষ্ঠিত বেদুঈন জীবনযাপনকেও তারা পরিত্যাগ করেনি।

ইংরেজী চতুর্থ শতকের শেষের দিকে মাবিয়া বিনতে আরকাম বিন হারিস দ্বিতীয় নামক জনৈক রমণীর উপর সিরিয়ার আরবীয়দের শাসনভার ন্যস্ত হয়। রোমীয়রা তাকে দুর্বল মনে করে তার থেকে বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু রমণী হওয়া সত্ত্বেও মাবিয়া বিনতে আরকাম বীরত্বের সাথে রোমক শক্তির মুকাবিলা করে তাদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করে। পরে কিছু সংখ্যক লোক রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে মাবিয়া বিগত ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে কিছু সংখ্যক বীর ঘোড় সওয়ারকে রোমীয়দের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। তারা কনস্টান্টিনোপল গিয়ে অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের দমন করে।

তারপর ইরাকী ও সিরিয় আরবীয়দের মধ্যে বিরাজিত স্বাধীনতার আবেগ অনুভূতি তাদেরকে একত্রিত করতে পারেনি। আর ঈসায়ী ধর্মের প্রতি উভয় পক্ষেরই গভীর ঝোঁক থাকলেও তা তাদের পারস্পরিক শত্রুতা হতে নিবৃত্ত করতেও সক্ষম হয়নি। এর বিপরীত লাখমী ও গাসসানী ইরান ও রোমীয়দের সাথে মিলে সবসময়ই একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে ও একে অপরের অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা বাদ দেয়নি।

লাখমী ও গাসসানীরা উন্নতির তুঙ্গে

ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ইরাকে লাখমী ও সিরিয়ায় গাসসানীরা উন্নতির শীর্ষ দেশে পৌঁছে গিয়েছিলো। সে সময় লাখমীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মানজার তৃতীয়। আর গাসসানীদের নেতৃত্ব ছিলো হারিস বিন জাবালোর হাতে। হিরার বাদশাহ তৃতীয় মানজার বিন 'মাওস সামার' শাসনকাল ছিলো ৫১৩ ইংরেজী সন থেকে শুরু করে ৫৬২ ইংরেজী সন পর্যন্ত। এ সময় ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন যথাক্রমে কোব্বাজ ও কেসর নওশেরাওয়া। হারিস বিন জাবাল ছিলেন মাবিয়া বিনতে আকরাম জাতুল কারতাইনের স্বামী। তিনি ৫২৯ ঈসায়ী সন থেকে শুরু করে ৫৭২ ঈসায়ী সন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় রোমের শাসক ছিলেন যথাক্রমে জেস্তেনিয়ান ও জেস্তাইন দ্বিতীয়। হারিস বিন জাবালকে হারিসুল আরাজ ও হারিসুল ওহাব নামেও অভিহিত করা হতো।

এ সময়ই ইরান-রোম যুদ্ধে মেতে উঠলো এ যুদ্ধ আগের মতো ইরানীদের তরফ থেকে মানজার আর রোমের তরফ থেকে হারিস অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের ময়দানে মানজার বেশ বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রম আনজাম দেয় এবং পরিশেষে রোমকে মীমাংসায়

www.pathagar.com

উপনীত হতে বাধ্য করে। রোমীয়রা মানজারকে জরিমানা হিসাবে বার্ষিক খাজনা দিতেও স্বীকার করে। কিন্তু এ মীমাংসা বেশিদিন টিকে থাকেনি। মীমাংসার সুযোগ রোমক শাসক যুদ্ধ প্রস্তুতির অবকাশ পেলে তা দ্রুত সেরে নেন। এতে কেসরা বেশ আশংকাবোধ করলেন। তিনি মানজারকে হারিসের উপর আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেন। ফলে আর একবার হারিসকে পরাজিত হতে হলো। ঈসায়ী ৫৬২ সনে রোম ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করলো।

এ গোটা সময়টাতে মানজার ইরানের পাশে পাশে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে রোম সীমান্তকে তছনছ করে দিয়ে মিসরের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়।

মানজারের এতো দাপট ও শক্তি সঞ্চয় করার পরও রোমীয়দের নজরে হারিসের গুরুত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি। তারা তখনো ভাবতে লাগলো, ইরানের বাড়তি শক্তি আর ইরাকীয় আরবদের অতর্কিত হামলার মুকাবিলায় সিরিয় আরবগণ একটা ঢাল হিসাবে প্রমাণিত হবে। এ জন্য শাহানশাহ জাষ্টিনিন ইংরেজী ৫২৯ সনে হারিসকে সিরিয়ার সবগুলো আরবীয় গোত্রের বাদশাহ বানিয়ে তাকে ফিলার্ক ও বতারিক *(Phlsorqe et Patrice)* খেতাবে আখ্যায়িত করেন। এর আগে এ খেতাব সিরিয়ায় নিযুক্ত রোমক শাসকদের দেয়া হতো।

মানজার থেকে নিষ্কৃতি পাবার ফন্দি ফিকিরে ডুবে গেলেন হারিস। যেহেতু তিনি যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন না তাই তিনি ছলচাতুরি ও ধোঁকার আশ্রয় নিতে চাইলেন। একবার উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হারিস শ'খানেক মানুষের একটি দল হিরার বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে জানালেন, তিনি তার আনুগত্য স্বীকার করতে চান। একথা শুনে মানজার খুব খুশী হলেন এবং প্রতিনিধিদলকে আদর-আপ্যায়ন করালেন। কিন্তু প্রতিনিধি দলের জনৈক ব্যক্তি সুযোগ বুঝে মানজারকে হত্যা করে ফেললো। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ইরাকী বাহিনীর মধ্যে একটা হৈ হুল্লোর পড়ে গেলো। এ অবস্থায় হারিস জোরেশোরে হামলা চালিয়ে দিয়ে ইরাকী দলকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। আরবগণ এ দিনকে 'হালিমার দিন' বলে অভিহিত করে থাকে। কেননা এ দিনে একশত মানুষকে মানজারের কাছে পাঠাবার সময় হারিসের কন্যা হালিমা আতর মাখিয়ে পাঠিয়েছিলো।

এ বিজয়ে সিরিয়া আরবীদের মনোবল বেড়ে গেলো, তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। এ সময় অন্ধ যুগীয় সাহিত্য বেশ উৎকর্ষ সাধন করে।

মানজারই 'ইয়াওমে নাঈম' ও 'ইয়াওমে বুস'-এর ভিত্তি রেখে ছিলেন। আরবের বিখ্যাত কবি ওবায়দুল আবরাসকে ইয়াওমে বুস উপলক্ষ্যে হত্যা করানো হয়েছিলো।[১] আরবের প্রখ্যাত মহিলা কবি নাবেগা জুবয়ানী এবং আলকামাতুল ফাহাল হারিস ওহাবের সমসাময়িক ছিলেন।

---

১. ইয়াওমে নাঈম ও ইয়াওমে বুস (নাঈম ও বুসের দিন) জাহেলী সাহিত্যের প্রখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। অধিকাংশ কবি তাদের কবিতায় এ দু'টি দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ দু'টি দিনের প্রবর্তক মানজার তৃতীয় বিন মাওস্ সামা। তার দু'জন সহচর খালিদ বিন অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

হিরার সুলতানাতের অন্তিমকাল

মানজার তৃতীয়ের মৃত্যুর পর তার ছেলে ওমর বিন মানজার ইরাকের বাদশাহ হলেন। তার বাদশাহীর নব্বইতম সনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। ওমর বিন মানজারের পরে হিরার সিংহাসনে পর পর বনু মানজাররই অধিষ্ঠিত হতে থাকে। এমন কি আবু তাবুস নোমান বিন মানজার চতুর্থ পর্যন্ত (৫৮৩ ঈসায়ী সন হতে ৬০৫ সন পর্যন্ত) তাঁরাই বাদশাহীর পদ অলংকৃত করে রাখেন। বিখ্যাত কবি আশ মাইমুন বিন কয়েস দরবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। নোমানের যুগে ইরাকী আরবীয়দের সুলতানাত দজলা নদীর কিনার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। তার সুলতানাতের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একথা থেকেই আন্দাজ করা যায়, তিনি কেসরার রাজধানী মাদায়েনের লাগ নিকটবর্তী এলাকায় নোমানিয়া শহরের পত্তন করেন। যদিও নোমান দেখতে বেশ কুৎসিত ছিলো। কিন্তু পার্থিব জীবন উপভোগের সকল উপায়-উপকরণই সে ব্যবহার করেছে। সে তার সুন্দরী সৎ মা মোতাজাররেদাকে বিয়ে করেছে। মানখাল ইয়াশকারীর সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। এ প্রসঙ্গেই সে মানখালকে হত্যা করেছে।[২]

নোমান তার রাজত্বকালে বেশ কয়েকটি বড় বড় শানদার বাগান তৈরি করিয়েছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান হতে নানা ধরনের ফল-ফুলের চারা এনে বাগানে লাগিয়েছে। এ কারণেই গোলে লালার নাম নোমানের নামের সাথে সম্পর্কিত হয়ে শাকায়েকুন নোমান হয়ে গেছে।

কেসরা পারভেজ নোমানের শান-শওকত ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সহ্য করতে পারেনি। সে তাকে তার দরবারে ডেকে এনে হত্যা করে ফেললো। নোমানের মাধ্যমে লাখমী গোত্রের বাদশাহীর চিরদিনের জন্য অবসান ঘটলো। কেসরা পারভেজ নোমানের স্থলে আইয়াস বিন কোবাইসা আতাতাইকে হিরার বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। এদিকে একজন ইরানী ব্যক্তি বাহারজানকে শাসক বানিয়ে ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো বাহারজান যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন সম্রাট হিসাবে নিজেকে মনে না করে এবং একজন ইরানী হাকিমের অস্তিত্ব তাকে একথা মনে করিয়ে দেবে, সে ইরানী

মোদলেন এবং ওমর বিন মাসউদকে একদিন মদ্যপ অবস্থায় জিন্দা দাফন করে দেয়। পরের দিন নিশামুক্ত হলে কৃতকর্মের জন্য তিনি লজ্জিত হলেন। কিন্তু তখন আর কিছু বলার ছিলো না। এ দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে মানজার তাদের দু'জনের কবরের উপর দু'টো ছোট স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। আর স্তম্ভগুলোর নাম দিলেন 'গোরয়ান'। বছরে দু'বার সেখানে যেতেন। একদিনের নাম দিয়েছিলেন ইওয়ামে নাঈম। এদিন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তার সামনে আসবে তাকে একশত কালো উট পুরস্কার হিসাবে দিয়ে দিতেন। আর দ্বিতীয় দিনকে বলা হতো ইয়াওমে বুস। এদিন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তার সামনে পড়বে তাকে তিনি হত্যা করে ফেলতেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এ ভয়াবহ রীতি জারি ছিলো এভং কয়েক ব্যক্তিকে এ বলির শীকার হতে হয়।—অনুবাদক

২. কোনো কোনো আরবী বর্ণনায় জানা যায় নোমানের ভয়ে মানখাল আত্মগোপন করে। তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। বস্তুত আরবীতে প্রবাদ বাক্য আছে لا افعله حتى يؤب المنخل "আমি মানহাল ফিরে না আসা পর্যন্ত এ কাজ করবো না।"—অনুবাদক

হুকুমাতের তাবেদার মাত্র। এ আইয়ামের যুগেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেই সময়ই জু'কারের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আরব ইতিহাসে জু'কারের যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের সূচনা এভাবে হয় —কেসরার অসন্তুষ্টির খবর সম্পর্কে অবহিত হয়ে নোমান বিন মানজার তার সব ধন-সম্পদ ও অস্ত্রসস্ত্র হানাই বিন কোবাইসার কাছে গচ্ছিত রাখলো। নোমানের হত্যার পর হানাইর কাছে নোমানের এসব জিনিস ফেরত চাইলে সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এরই মধ্যে নোমানের হত্যার খবরে রাগান্বিত হয়ে বনু বকর বিন ওয়ায়েল সাওয়াদে ইরাকের উপর হামলা করে অনেক এলাকা ইরানীদের থেকে ছিনিয়ে নিলো। এ অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য কেময়া আরবের মুকাবিলায় ইরানী বাহিনী পাঠিয়ে দিলো। কুফার কাছে জু'কার নামক স্থানে ইরান-আরবের মুকাবিলা হলো। এখানে ইরানীরা পরাজিত হলো। বর্ণনায় পাওয়া যায়, এদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বলেছেন ঃ

"আজ প্রথম দিন, যেদিন আরবরা আজমের উপর বিজয় লাভ করলো। আর শুধু আমার কারণেই এ বিজয় লাভের সৌভাগ্য তাদের হয়েছে।"[১]

একথা উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জু'কারের বছর নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। নোমানের পরে আরো তিনজন বাদশাহ হিরার সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। শেষ বাদশাহ মানজার ছিলো খুবই অহংকারী। ৬৩২ সনে তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ইরাকে হিরার বাদশাহীর যুগ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেসরা তার নিজের তরফ থেকে ওয়াজদিয়া ইরানীকে হুকুমাতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ইরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

গাসসানী সুলতানাতের শেষ সময়

লাখমীদের পরে এখন আমরা গাসসানীদের সম্পর্কে আলোচনা করবো। লাখমীদের মতো গাসসানী শাসকগণও একের পরএক রাজ সিংহাসনে আসীন থাকেন। সিরিয়ার শেষ আরবীয় শাসক ছিলো জাবালা বিন আয়হাম। এর শাসন কার্য পরিচালনার পরিসমাপ্তি ঘটে মুসলিম বাহিনীর হাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে ঈসায়ী ৫৮৭ সন। ওমর আল আসগর গাসসানী সিরিয় আরবের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলো। বিখ্যাত কবি নবেগা জুবয়ানী হিরার শাসক নোমান বিন মানজারের ভয়ে ওমর আল আসগরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওমর আল আসগরের পরে আবু কুরব আন-নোমান আসসাদের বিন হারিস আল আসগর ক্ষমতায় এলেন। কবি নাবেগা তার প্রশংসায় যে আরবী কাসিদা রচনা করেন তা আরবী সাহিত্যের পাতায় গুরুত্ববহ। নোমানের পর গাসসানীদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিলো। প্রত্যেক এলাকায় বিভিন্ন শাসক তার শাসন জমিয়ে নিয়েছে। অবশেষে দ্বিতীয় আয়হামের পুত্র হাবালা বিন আয়হামের সময় গাসসানী শাসনের অবসান ঘটে।

১. মাবদা জুজাহাব, মাসউদী, প্রথম খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, বাগদাদ সংস্করণ।

www.pathagar.com

গাসসানী শাসনের মধ্যে বিশৃংখলা প্রবেশের মূল কারণ ছিলো রোমান শাসকদের চালবাজী। একটি ঐক্যবদ্ধ আরবী শাসনের আশংকা থেকেই তারা এ চালবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করে। এ জন্য কৌশল অবলম্বন করে তারা প্রত্যেক এলাকা এলাকায় ভিন্ন শাসক নিযুক্ত করে দিতো। আরবরা যেন একত্রিত হতে এবং রোমান সাম্রাজ্যের উপর কোনো আঘাত হানতে না পারে।

ইরাকে লাখমীদের একমাত্র রাজধানী ছিলো হিরা। অপরদিকে সিরিয়ায় গাসসানীদের রাজধানী ছিলো বিভিন্ন। জাবিয়ায়ও একটি রাজধানী ছিলো। এভাবে তাদামনুর, জুলান, দামেশ্কের কাছে জালাকও তাদের রাজধানী ছিলো। এর থেকে বুঝা যায়, যেখানে ইরাকে লাখমীদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র ছিলো বিস্তৃত ; সেখানে গাসসানীদের এ অবস্থা ছিলো না। তাদের আভ্যন্তরীন স্বাধীনতা অবশ্যই ছিলো কিন্তু ইরাকী আরবদের চেয়ে অনেক কম ছিলো। আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও নির্ভেজাল আরবীয় জীবন ধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ইরাকী ও সিরিয়দের ভাষা অবিকল আরবী রয়ে গেলো। ইরাকে ফার্সি ও সিরিয়ায় ইউনানী ও ল্যাটিন ভাষা আরবী ভাষার স্থান দখল করতে পারেনি। এর আরো একটি ফল ছিলো, হিরার বাদশাহ ও বনু গাসসানের শাসকদের সম্পর্ক নিজ দেশীয় আরবদের সাথে খুব গভীর ও নিবিড় ছিলো। আর এ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আরবের ঐসব কবিদেরও অসীম অবদান ছিলো। যারা হিরা ও গাসসানের বাদশাহদের তরফ থেকে মোটা অংকের পুরস্কার পেতো। সাহিত্য গ্রন্থে ও কবিতা গুচ্ছে এসব বাদশাহদের স্মরণে অনেক স্তুতি গাওয়া হতো। নাবেগা জুখরামী, আশা কয়েস ও আলকামা আল ফহল ইত্যাদি কবিগণ এসব বাদশাহদের উচ্ছসিত প্রশংসায় শক্তিশালী বর্ণনা দিতো। এভাবে দরবারে নবুবীর কবি হাসসান বিন সাবিত ইসলাম গ্রহণ করার আগে জাবালা বিন আয়হামের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলো।

এসব কারণ যা উপরে বর্ণিত হয়েছে ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে। তাই আমরা দেখছি, যখন আরবরা এসব এলাকায় আগমন শুরু করে দিয়েছে তখন এখানে বসবাসকারী আরবরা অনেক সময় তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা যোগাবার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেনি। তারা মুসলমানদের সারিতে শামিল হয়ে তাদের রোমীয় ও ইরানীদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

রোম ও ইরানের হামলা

এ সময় রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র এলোমেলো ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। গোটা দেশ বিবাদ বিসম্বাদে ও বিদ্রোহে ভরে গেছে। রোমের শাহানশাহ ফোকাসের বিরুদ্ধে হিরাকলের বিদ্রোহ জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ইরানীরা এ সুযোগে সিরিয়ার উপর হামলা করে প্রথমে এনতাকিয়া দখল করে নিলো। ওখান থেকে তারা বায়তুল মাকদাসের দিকে রওনা হলো। হিরাকলে যেখানে শাহানশাহে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিলো এখন জীবন বাঁচানোর জন্যই ব্যস্ত। ইরানীদেরকে বায়তুল মাকদাসের দিকে আসা হতে কোনো রকমে বিরত রাখার জন্য

www.pathagar.com

হিরাকলে অগ্রীম চেষ্টা চালাতে লাগলো। কিন্তু তার প্রচেষ্টায় কোনো কাজ হলো না। হিরাকলে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে এবং মসিহি ও ইহুদীদের পবিত্র নিদর্শনসমূহের অবমাননা হতে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়নি। এরপর আবার যুলুমের উপর যুলুম হলো —অর্থাৎ ইহুদীরা ও মুজুসীদের সাথে মিলে গেলো। আর তারা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করলো। সিরিয়ার উপর ইরানীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আসার পর তারা মিসরের দিকে রওনা হলো এবং সেখানে রোমের স্থলে নিজেদের হুকুমাত কায়েম করে নিলো।

ইরানীদের একের পর এক বিজয়ের সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ঃ

الٓمٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ فِىْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ

"যদিও আজ রোমীয়রা মিসরের মাটিতে পরাজিত হয়েছে কিন্তু খুব শীঘ্রই কয়েক বছরের মধ্যে তারা নিজেদের পরাজয়ের পর আবার বিজয় লাভ করবে। আল্লাহর হাতেই সব শক্তি। আল্লাহর সাহায্যে তারা সেদিন আনন্দিত হবে।"

–(সূরা আর রূম ঃ ১-৫)

অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর ওয়াদা পালন হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে হিরাকলে আবার শক্তি সঞ্চয় করে ইরানের উপর হামলা চালিয়ে ইরানকে সিরিয়া ও মিসর হতে বের করে দিলো। 'সুলাইবে আজম' (বড় শত্রু) তাদের থেকে ছিনিয়ে এনে তা বায়তুল মাকদাসের পুরানো স্থানে স্থাপন করে দিলো। এ ধারাবাহিক যুদ্ধে যেমন ইরানের বিজয়ে ও ক্ষমতায় যথেষ্ট পার্থক্য সূচীত হয়েছে তেমনি রোমকদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য উপকরণের সাথে এটিও আরবদের হুকুমাত প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম বিজয়ের জন্য খুবই সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদক্ষেপ

রোম ও ইরানে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে মক্কা-মদীনাবাসী অনবহিত ছিলো না। একইভাবে ইরাক ও সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবদের অবস্থাও তাদের কাছে গোপন ছিলো না। এসব কারণের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে আরবদের মনে ইরান ও রোমীয়দের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ভয়-ভীতি হ্রাস পেতে চললো। তাদের দৃষ্টিতে এসব সুলতানাতের গুরুত্বও কমে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তি ও গোটা আরব সন্নিবদ্ধভাবে ইসলামের ঝাণ্ডার নীচে একত্রিত হয়ে যাবার কারণে এ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেলো। এরপরও একথার অর্থ এ নয় যে, আরবদের সুদৃষ্টিতে এ দু'টো সুলতানাতের গুরুত্ব এতই কমে গেছে যে, তারা এখন এর উপর

www.pathagar.com

কোনো রকম হামলা বা এর সীমান্তকে পদদলিত করার ইচ্ছাও হৃদয়ে পোষণ করে না। আরবদের মধ্যে জাগরণ অবশ্যই এসেছে। কিন্তু এর সীমারেখা ছিলো আরব উপদ্বীপকে ঐ সময় ঐসব সুলতানাতের প্রভাব ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইয়েমেনে এবং আরবের সব দক্ষিণাঞ্চলগুলো ইরানীদের আনুগত্যকে অস্বীকার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনকালে ইরানীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁরও উদ্দেশ্য ছিলো আরবের উত্তর সীমান্তকে কায়সার বাহিনীর লুটতরাজ থেকে মুক্ত রাখা। সিরিয়া আক্রমণ করা তাঁর উদ্দেশ্যে ছিলো না। আর না মুসলমানরাও হিরাকলের নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলিগি চিঠিকে সিরিয়ার উপর আক্রমণ পরিচালনা করার কোনো বাহানা বানিয়েছে। কিন্তু এরপরও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেলো যার জন্য মুসলমানদের পক্ষে ইরান ও সিরিয়ার উপর আক্রমণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

যে সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইয়ামামায় এবং মুহাজির বিন আবু উমিয়া ও ইকরামা বিন আবু জেহেল ইয়েমেন ও এর আশেপাশে ধর্মত্যাগীদের মনের জন্য কর্মব্যস্ত ছিলেন, সে সময় সকলের স্থির বিশ্বাস জন্মেছিলো, এখন এ আরব উপদ্বীপে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য চলবে। ভবিষ্যতে আর কোনো কলহপ্রিয় লোক কোনো ধরনের গণ্ডগোল ও বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে সাহস করবে না। কিন্তু এসব সাধারণ লোকদের বিপরীত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো খোশ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কাজ করেননি। একথা অনুমানের বাইরে ছিলো না যে, ফেতনা-ফাসাদের আগুন একবার নিভে যাবার পর পুনরায় তা জ্বলে উঠতে ও আবার একবার আরব উপদ্বীপে বিচ্ছিন্নতা বিক্ষিপ্ততা ছড়াতে পারে। অত্যন্ত দূরদৃষ্টি দিয়ে এসব অবস্থার পর্যালোচনা করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এ সমস্যার উপর চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি ভাবতে থাকেন, আরব গোত্রগুলোর বিদ্রোহের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ইরান ও সিরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কি সমীচীন হবে না? তাহলে তারা হুকুমাতের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করতে ও কলহের বিপদ ছড়াবার কোনো সুযোগই পাবে না। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহ আগে থেকে উপায় ঠিক করে রেখেছিলেন। সিরিয়ার মরুপ্রান্তরে অনেক আরব গোত্র বসবাস করতো। তাদের কাছে প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো, যেভাবে তাদের স্বদেশী স্বজাতীয়রা ইসলাম গ্রহণ করেছে সেভাবে তারাও হাসিমুখে ইসলাম গ্রহণ করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' পতাকাতলে সমবেত হবে।

উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে মোটকথা প্রতি মুহূর্তে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ চিন্তা ঘুরপাক খেতো। এর অর্থ এ নয় যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের বিস্তৃতি বাড়াবার জন্য লোভাতুর ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। একটি বিস্তৃত এলাকায় ক্ষমতা কায়েম করার অভিপ্রায় পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের জন্য বাঁধা-বিপত্তি ছাড়া সুখে

www.pathagar.com

শান্তিতে আল্লাহর দীনের হুকুম-আহকাম মেনে চলতে পারার প্রতিবিধান করা। ইসলাম প্রচারের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হওয়া। মানুষ তখনই শান্তি পেতে পারে যখন হুকুমাতের ভিত্তি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে লোভ-লালসা ও আত্মস্বার্থের কোনো দখল থাকবে না। ন্যায় ও ইনসাফের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন এমন একজন রাষ্ট্র প্রধানের যিনি লোভ-লালসা হতে পূতপবিত্র থাকবেন। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার স্বার্থপরতা ও আত্মপূজার ভাব বিন্দুমাত্রও থাকবে না। তাছাড়াও প্রজাসাধারণের উপর তিনি থাকবেন অত্যন্ত সহৃদয়দবান ও করুণাময়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে এ মানদণ্ডে ষোলআনা সফল হয়েছিলেন। তিনি নিজের পদের বা মর্যাদা পাবার অভিলাষী ছিলেন না। অন্যদের তুলনায় কখনো নিজেকে তুলে ধরতে চাইতেন না। সাধারণ মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ বর্ণনার প্রয়োজন রাখে না। আদল ও ইনসাফকে প্রত্যেক জিনিসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজের জীবন ও পরিবার-পরিজনকেও ভুলে যেতেন। তাছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনায় যাবতীয় কাজের দেখাশুনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করতেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের প্রথম বছর ধর্মত্যাগীদের মুকাবিলায় বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য মুসলমানদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দলে দলে মুসলমানরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের দূর-দূরান্তের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য চলে যেতেন। কিন্তু নাজুক পরিস্থিতিতেও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাবকে মদীনার কাজী হিসাবে নিযুক্ত করেন। যদিও এ ব্যাপারে তাঁকে কোনো কাজ করতে হয়নি। তিনি পূর্ণ এক বছর কাজীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন কিন্তু তার কোর্টে কোনো মকদ্দমা বিচারের জন্য দায়ের হয়নি। বায়তুলমালের দায়িত্বে ছিলেন আবু ওবায়দা বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু। যাকাত ও সদাকার যে সম্পদ বায়তুল মালে জমা হতো তিনি তা বণ্টনের দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান ও যায়েদ বিন সাবিতের দায়িত্ব ছিলো লেখা-পড়ার বা রেকর্ড সংরক্ষণের কাজ। বিভিন্ন ফরমান জারী করা ও চিঠি-পত্র লেখা এ দু' ব্যক্তির দায়িত্বে ছিলো। এদের নিযুক্ত শাসক ও নেতাগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাদের সকলের গভীর সম্পর্ক ছিলো। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিই তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ ছাড়া কোনো কাজ করতে সম্মত হতেন না। এ কারণেই ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর শাসক ও নেতাদের মধ্যে অনেক পত্রালাপ হয়েছে। এসব ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে। ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধের কারণে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের প্রথম বছর খুবই ব্যস্ততার ভেতর কেটেছে, তাই তিনি হজ্জের সময় নিজের স্থানে উতবা বিন উসাইদকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।

www.pathagar.com

ধর্মত্যাগীদের সাথে যতোদিন যুদ্ধ চালু ছিলো ততদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভবই ছিলো না। মুরতাদরা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হবার পর দেশের সর্বত্র ইসলামী হুকুমাত সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়ে গেলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার কালেমার পতাকা উড্ডীন ও দীনে হক প্রচারের জন্য মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে কি কি কর্মসূচী প্রণয়ন ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে সে দিকে তাঁর লক্ষ্যারোপ করেন।

এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুরু করা তাবুক যুদ্ধ পরিপূর্ণ করার জন্য আবার রোমীয়দের উপর আক্রমণ করে দেয়া ছিলো একটি পথ। আরবদের দৃষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে রোমীয়দের দিকে ফিরিয়ে দিলে ভবিষ্যতে আরব থেকে শুধু বিদ্রোহ ও কলহ বিবাদই দূর হবে না বরং রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলাম প্রচারের পথও সুগম হয়ে যেতো।

কিন্তু এর আর একটি দিকও ছিলো। এদিকে দৃষ্টি দেয়াও ছিল খুবই প্রয়োজন। মুসলমানরা যদি রোমীয়দের উপর বিজয় লাভ করতে না পারে তাহলে গোটা জাজিরাতুল আরব এক হুমকীর সম্মুখীন হতো। আর এটা হতো ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ। রোম তার নিজের এলাকায় মুসলমানদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়াই শুধু যথেষ্ট মনে করতো না বরং তাদের উপর আক্রমণ করার মজা দেখাবার জন্য পাল্টা জাজিরাতুল আরবের উপরই হামলা করে বসতো। আরবের উপর রোমানদের আক্রমণ কোনো মামুলী কথা ছিলো না। যদি অবস্থা এমন হতো তাহলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকতো।

মুরতাদদের মুকাবিলায় মুসলমানদের বিজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হলো —ইসলামের আগমনের পর আরব থেকে মূর্তিপূজার অবলুপ্তি ঘটেছে চিরতরে। গোটা আরব একত্ববাদের আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো। আর এটা ছিলো ইসলামের সবচেয়ে বড় শক্তি। গোত্রীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে আরবের কিছু সরল প্রাণ মুসলমানকে কিছুদিনের জন্য ধর্মত্যাগীরা সাথে নিয়েছিলো। কিন্তু শুধু ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাস ও হাস্যকর শিক্ষার মাধ্যমে এসব লোককে তারা বেশীদিন বিভ্রান্ত করে রাখতে পারেনি। এ কারণেই তাদের মিথ্যার বেসাতী ধরা পড়ার সাথে সাথে সরল প্রাণ মুসলমানরা তাদের দল ত্যাগ করে চলে আসে। রোমকদের ব্যাপারটা ছিলো এর থেকে ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র ধরনের। তারা ছিলো খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত। আর সে ধর্মের অনুসারীদের একটা উজ্জ্বল ও শানদার অতীত ছিলো। তারা ছিলো আহলে কিতাব। তাছাড়া তারা ছিলো বিরাট শক্তির মালিক।

একথাও ঠিক যে, তাদের ও ইরানীদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলে আসছিলো। প্রথমতঃ ইরানীরা রোমকদের উপর বিজয় লাভ করেছে। কিন্তু পরে রোমকদের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। অমীমাংসিত ও অসমাপ্ত এসব যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তাদের শক্তি সামর্থ ও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

এত সব পরও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর তাদের প্রতাপ প্রভাব অবিকল জারী ছিলো। তারা তৎকালীন দু' পরাশক্তি পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকে একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত করার জন্য অবিরত চেষ্টা করতো। কিন্তু অন্য কোনো দেশের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করাও সম্ভব ছিলো না। বিশেষ করে আরবের মতো একটি নিকৃষ্ট ও দুর্বল জাতির পক্ষে এসব সাম্রাজ্যের সাথে টক্কর লাগানোর অর্থই ছিলো নিজের হাতে নিজের জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।

অন্যান্য আরবদের মতো ইরানের সাথে যুদ্ধ করার খেয়াল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হতো না। হেজাজ পারস্য সংলগ্ন দেশ ছিলো না। আর ইরানের সাথে আরবের যেসব এলাকা সংলগ্ন ছিলো তাতে এর আগে ধর্মত্যাগের ফেতনার আগুন জোরেশোরে লেগে গিয়েছিলো। যুদ্ধের ব্যাপারে এসব এলাকার লোকদের উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না। এ জন্যই আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে ধর্মত্যাগের এ আগুন ঠাণ্ডা করার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া ছিলো বেশী সমীচীন। তাতে আরবের ঐক্য ও সংহতি বহাল হয়ে বিশ্বে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য স্থান নির্ধারিত হতো এবং শক্তিও অনেক বৃদ্ধি পেতো।

মুসান্না বিন হারেছা ও ইরাক

ভবিষ্যতের পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় বিভোর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু। এ সময় খবর পেলেন মুসান্না বিন হারেছা শায়বানী নামক জনৈক ব্যক্তি একটি ছোট বাহিনী সহকারে অগ্রসর হয়ে বাহরাইনের উত্তরে দাজলা ও ফোরাত নদের মোহনা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ইরানী শাসক—যারা বিদ্রোহের আগুন ছড়াবার জন্য বাহরাইনের ধর্মত্যাগীদের সাহায্য করেছে তারা মুসান্নার সামনে অসহায় হয়ে গেলো। তার চাপের তীব্রতায় সস্থান থেকে তারা পেছনে হটে গেলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এখনো মুসান্নার সম্পর্কে কিছুই জানেননি। এ খবর জানার পর তিনি অনুসন্ধান করে জানলেন, বাহরাইনের ওয়ায়েল গোত্রের সাথে মুসান্নার সম্পর্ক। সে আলা বিন হাজরামীর সাথে মিলে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করছে। বাহরাইন ও এর আশেপাশের এলাকার যেসব লোক ইসলামে কায়েম রয়েছে এবং যারা ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলে ধর্মত্যাগের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, মুসান্না ছিলেন তাদের সরদার। ধর্মত্যাগের কলহ শেষ হবার পরও তিনি নিশ্চিন্তে বসেছিলেন না। নিজের সব বাহিনী নিয়ে পারস্য উপসাগরের কূল বয়ে বয়ে উত্তরে ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অবশেষে তিনি ঐসব আরবীয় গোত্রের কাছে গেলেন যারা দাজলা ও ফোরাতের বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস করতো। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি ওদেরকে ইরানী সুলতানাতের আনুগত্য পরিত্যাগ করতে সম্মত করে ফেলেন। এছাড়াও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু জানতে পারলেন, মুসান্না কোনো সাধারণ মানুষ নন। নিজ গোত্রের অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন এবং বেশ নির্ভরযোগ্য লোক। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধানের জবাবে কায়েস বিন আসেম আলমুনকারী আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"এ ব্যক্তি অখ্যাত, বংশ ও গোত্র, পরিচয় বিহীন ও ধোঁকাবাজ মানুষ নন। ইনি হলেন মুসান্না বিন হারিসা শায়বানী। অত্যন্ত উঁচু বংশীয় প্রখ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ।"

এ অবস্থা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য চিন্তা-ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলো। এখন তার সামনে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, এ সময়ে কি মুসলমানদেরকে আরব সীমান্তের বাইরে পাঠানোই সমীচীন হবে? ইরাকে প্রবেশ করে ইরানী সালতানাতের দরজা মুসলমানদের জন্য খুলে দেবার মতো এত ক্ষমতা কি মুসান্নার মধ্যে আছে?

ইরাকের হাল অবস্থার প্রতি অবশ্যই মুসলমানদের লক্ষ্য করার ব্যাপার ছিলো। তারা এ ব্যাপারে অবহেলা দেখাতে পারে না।

ইরাকে বনু লাখাম, তোগলব, আয়াদর নাম এবং বনু শারবান সহ বিভিন্ন আরব গোত্র বসবাস করতো। এসব গোত্র যদিও ইরানীদের শাসনাধীন ও তাদের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলো। এরপরও জাজিরাতুল আরবের সাথে তাদের যে কুদরতী সম্পর্ক ছিলো কোনো অবস্থায়ই তা তারা ভুলে যেতে পারেনি। আরবে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতো তার প্রতিই তারা সতর্ক ও গভীর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করতো। এদিকে সাজাহও আবার ইরাক থেকে বেরিয়েই নবুয়াতের দাবী করেছিলো। আর তার সব আশা ভরসাও এসব গোত্রের সাথেই সম্পর্কিত ছিলো।

এ সময় ইরাকে ইরানী ক্ষমতা টলটলায়মান হয়ে উঠেছিলো এতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের কিছু আগে রোমের শাহানশাহ হেরাকলে নিনোয়া ও দাস্তাজরাদে ইরানী বাহিনীকে পরাজিত করে প্রায় তাদের রাজধানী মাদায়েনের দরযা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো।

হেরাকলের সেনাবাহিনী পরিচালনা করার পর কোনো কোনো এলাকাও ইরানের দখল থেকে স্বাধীন হতে লাগলো। ইয়েমেন সর্বপ্রথম তাদের হাত থেকে মুক্তি পেলো। ওখানকার শাসক 'বাজান' ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী হুকুমাতের আনুগত্য কবুল করে নিলো। এরপর বাহরাইন, পারস্য উপসাগর, এডেন ও উপসাগরের গোটা এলাকা ইরানী গোলামীকে শেষ সালাম জানিয়ে দিলো। এসব জায়গায়ও ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়ে গেলো। ইরানী শাসকগণ এসব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো প্রচেষ্টা চালায়নি। তাদের নিযুক্ত শাসকরা স্ব স্ব স্থানে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে তাদের দখলকৃত এলাকা অপরের দখলে চলে যাবার দৃশ্য দেখতে লাগলো।

এ সময় তারা আর কি-ই বা করতে পারতো। স্বয়ং রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের স্বীকার হয়ে পড়েছিলো। ইরানের রাজ সিংহাসনে বসার জন্য ইরানী শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিলো। চার বছরে ন'জন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। প্রত্যেক বাদশাহই কুণ্ঠাহীনভাবে বিরোধীদের নির্বিচারে হত্যা

www.pathagar.com

করতো। কোনো বাদশাহই শান্তিতে রাজত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি এবং ক্ষমতায় বসার অত্যল্পকালের মধ্যেই তাকে শত্রুদের শিকারে পরিণত হতে হতো।

ভবিষ্যত কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি, মুসান্না স্বয়ং মদীনায় এসে পৌঁছলেন। খলিফার কাছে সব অবস্থা তুলে ধরলেন। বললেন, সিরিয়া বিজয় অপেক্ষা ইরাক বিজয় সহজসাধ্য কাজ। ইরাকের ময়দানে সাধারণত আরবদেরকে ঐসব ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না যে বিপদ সিরিয়ায় সামরিক তৎপরতা চালাতে হতে হয়। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আরো জানালেন, দাজলা ও ফোরাতের মর্ধবর্তী এলাকা খুবই সুফলা, উৎপাদনশীল ও সৌন্দর্যের লীলা কেন্দ্র। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিক দিয়ে সিরিয়া কোনো অবস্থায়ই কম নয়। হেজাজবাসীরা যেহেতু ইরাক অপেক্ষা সিরিয়া সফরে যেতে সহজ বলে মনে করে। তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৃষ্টি সিরিয়ার দিকে নিবদ্ধ করে। কিন্তু তারা যদি ইরাকের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী অবলোকন করতো তাহলে অবশ্যই এ এলাকাও তাদের জন্য আকর্ষণীয় বলে মনে হতো।

মুসান্না আরো বললেন, যেসব আরব গোত্র দাজলা ও ফোরাত নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস করে তারা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নিগৃহীত হতো। আরবরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেত-খামারে কাজ করতো। ফসল পাকার পর ইরানী জমিদাররা আসতো। সব ফসল কেটে নিয়ে চলে যেতো। কিন্তু যে গরীব দুঃখি কৃষাণরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে ফসল তৈরি করেছিলো তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকতো। তাদের ভাগ্যে ঐ কয়েকটা টাকাই জুটতো যা জমিদারদের মালিকগণ খুশী হয়ে, করুণা করে তাদেরকে দান করে যেতো। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য আরবদের মনে ইরানী শাসক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ জমে উঠেছিলো। ইরানী ধোঁকাবাজী, ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতামূলক কার্যক্রম থেকে জাজিরাতুল আরবকে বাঁচাবার জন্য যদি ইরাকের উপর হামলা পরিচালনা করা হয় তাহলে ইরানীদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ থাকার কারণেই ওখানকার আরবীয় গোত্রগুলো অবশ্যই তারা স্বদেশীয়দের সাথে থাকবে এবং সর্বতভাবে তাদের সাহায্য করবে। কাজেই এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এ পরিস্থিতিতে ইরানের দিকে এখনি সামরিক তৎপরতা চালানো প্রয়োজন।

ইরাকের বদ্বীপ এলাকাটাই শুধু আপন সৌন্দর্যাবলী, উৎপাদনশীল ও সুফলা উর্বরভূমি হবার কারণে অনুপম ছিলো না বরং দাজলা ও ফোরাতের তিন শত মাইল লম্বা গোটা এলাকাটাও আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি ছিলো। সুজলা-সুফলা হওয়া ছাড়াও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এলাকাটি বেশ গুরুত্বের অধিকারী। এর জায়গায় জায়গায় প্রাচীন নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো সেসব নিদর্শনাবলী তাদের ভাষায় অতীতের ভীতিপ্রদ রাজত্বের ও অভিযোগে ভরা বাদশাহীর কাহিনী পথিককে শুনাতো। বস্তুত 'উর' শহর যার নিদর্শনাবলী আমাদের কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। যার ব্যাপারে কারো কারো ধারণা, ফেরাউন বংশ যখন মিসরে ক্ষমতাসীন তখন এ শহর

www.pathagar.com

নির্মিত হয়েছে—এ এলাকায়ই অবস্থিত ছিলো। উত্তর দিকে আরো কিছুদূর এগুলে প্রাচীন শহর বাবেলের নিদর্শনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। ফোরাত নদীর কূলে বাবেল শহরের বিখ্যাত গম্বুজ শির উঁচু করে আজও আশোরীনদের কৃতিত্বের গুণকীর্তণ বর্ণনা করছে। এ নীল নদের উপকূলে সাসানীদের জৌলুসের নিদর্শন এবং ইরানী সুলতানাতের দারুল হুকুমাত মাদায়েন শহর অবস্থিত। আর এ শহরের প্রাচুর্য শান-শওকতের সুখ্যাতি বিশ্বের অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো।

বাগবাগিচার আধিক্য, শস্যের পর্যাপ্ততা, চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কারণে এ অঞ্চলেকে 'ভূস্বর্গ' বলে অভিহিত করা হতো। তাই মুসান্না শায়বানী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে সমস্ত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করলে তিনি এ এলাকায় ইসলামী বাহিনী পাঠাতে রাজী হলেন। মুসান্নার পরিকল্পনা ছিলো ইরাকের বদ্বীপ এলাকায় ইসলামী বাহিনী পাঠিয়ে আরব গোত্রগুলোকে তাদের ইরানী শাসকদের যুলুম নির্যাতনের এ ষ্টিম রোলার থেকে মুক্ত করে দিতে হবে। এভাবে তাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। ইরানী শাসকরা যদি এদের ইসলাম কবুল করার পেছনে অন্তরায় ও বাধার সৃষ্টি না করে তবে মঙ্গল। আর তা না হলে ইরান সরকারের সাথে যথারীতি যুদ্ধ লাগিয়ে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় আযাদীর জন্য পথ খুলে নিতে হবে। প্রমাণ্য দলীলপত্র সহকারে আল্লাহর দীন প্রচারের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

কোনো চূড়ান্ত ফায়সালা করার পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় 'পরামর্শ সভা' ডেকে পরামর্শ করে নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। তাদেরকে ডেকে ইরাকের সকল অবস্থা শুনিয়ে মুসান্নার এ অভিপ্রায় তাদের সামনে পেশ করলেন। তাকে তাদের কাওমের নেতা বানিয়ে ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করার ও এভাবে এখন একটি ফরয কাজ করার সুযোগ দেয়া হোক যে কাজ পালন করার মূল দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই অর্পিত হয়।

মদীনাবাসীরা যেহেতু ইরাক সম্পর্কে কিছুই জানতো না, ইরানের উপর হামলা করে আবার না উল্টো বিপদে পড়তে হয়, এ ভয় তাদের ছিলো। এ জন্য তারা খালিদ বিন ওয়ালিদকে ডেকে তার কাছেই পরিপূর্ণ অবস্থা পেশ করে তার মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। সে সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু 'আকবারা' যুদ্ধ হতে অবসর হয়ে দু' স্ত্রী লায়লা বিন উম্মে তামিম ও বিনতে মোজায়াকে নিয়ে ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরফ থেকে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে মদীনায় আসার জন্য ডেকে পাঠানো হলো। খালিদ মদীনায় আসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদের সামনে মুসান্নার সুপারিশমালা পেশ করে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। হযরত খালিদ মুসান্নার সুপারিশমালাকে নির্দ্বিধায় সমর্থন জানালেন।

খালিদ আল্লাহ প্রদত্ত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা নিমিষেই বুঝে নিয়েছিলেন যে মুসান্না ইরাক সীমান্তে ইরানীদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, আল্লাহ্ না করুন তা যদি বিফল হয় আর মুসান্না বাহিনীকে আরবের দিকে হটে আসতে হয়, তখন ইরানী বাহিনী খুব সাহসী ও তৎপর হয়ে উঠবে। তারা তখন শুধু মুসান্নার বাহিনীকেই ইরাক সীমান্ত থেকে বের করে দেয়া যথেষ্ট মনে করবে না বরং বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পুনরায় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার ও তাদের নিয়ন্ত্রণ মযবুত করার চেষ্টা চালাবে। যদি তাই হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তা হবে এক বিপজ্জনক ব্যাপার। এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য শুধু একটিই পথ আছে আর তাহলো দরবারে খেলাফত থেকে মুসান্নাকে অবশ্যই সুন্দরভাবে সাহায্য সহযোগিতা চালিয়ে যেতে হবে এবং ইরানীদেরকে আরব সীমান্তে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে আরো পেছনে হঠতে বাধ্য করতে হবে। তাহলে তাদের তরফ থেকে ভবিষ্যতে আর আরবদের জন্য কোনো বিপদ অবশিষ্ট থাকবে না।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের এ রায় শুনে অন্যান্য সাহাবারাও মুসান্নার প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন। তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর কাছে আরজ করলেন, "মুসান্নার নেতৃত্বে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।" সুতরাং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু মাছনার ইচ্ছানুযায়ী তাকে ঐসব লোকের আমীর বানিয়ে দিলেন যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ইরাক সীমান্তে অগ্রসর হয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি ওখানকার আরব গোত্রগুলোকে সাথে নেয়ার এবং ইসলাম গ্রহণ করার দিকে আকর্ষিত করতে বলে দিলেন। মদীনা হতে তাড়াতাড়ি তার সাহায্যে আরো বাহিনী পাঠানো হবে বলে তাকে আশ্বাস দেয়া হলো। এদের সাহায্যে মুসান্না সম্মুখভাগে আরো অগ্রসর হতে পারবেন।

সকল বর্ণনার চেয়ে এ বর্ণনাই আমার ধারণায় বেশী গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, মুসান্নাও সাহায্যের জন্য কোনো আবেদন জানায়নি আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর সাথেও তার সাক্ষাত ঘটেনি। মুসান্না তার বাহিনী নিয়ে বদ্বীপ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে হতে অনেক দূরে চলে গেছেন। সম্মুখে যাবার পর তাকে ইরানী সিপাহসালার হরমুজের বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয়েছে। হরমুজ ও মুসান্না যুদ্ধে লিপ্ত এ সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এ খবর পেলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি মুসান্নার নাম মোটেও শুনেননি। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারলেন, মুসান্না ধর্মত্যাগের যুদ্ধের সময়ে বাহরাইনে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নির্দেশ পাঠালেন, একটি সামরিক বাহিনী নিয়ে মুসান্নার সাহায্যে ইরাকে পৌছে যেতে। সেখানে হরমুজ বাহিনীকে পরাজিত করে লাখমী আরবীয়দের দারুল হুকুমাত 'হিরার' দিকে অগ্রসর হতে। সাথে সাথে তিনি ইজ বিন গানামকে হুকুম পাঠালেন, দওমাতুল জান্দাল পৌছে ওখানকার বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগী বাসিন্দাদেরকে অনুগত করে হিরা পৌছে যেতে। উভয় নেতা যদি প্রথম ওখানে পৌছেন তার হাতেই ঐ এলাকার সামরিক তৎপরতা চালাবার নেতৃত্ব থাকবে।

প্রথম বর্ণনার তুলনায় দ্বিতীয় বর্ণনা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য নয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আমি এটাকে মোটেই সঠিক মনে করছি না। কারণ, এ

www.pathagar.com

সময়কার যেসব বর্ণনা আমার হাতে পৌঁছেছে এতে অসংখ্য মতভেদ পাওয়া যাচ্ছে। আর এ মতভেদ এতবেশী যে, প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক তিবরী ও ইবনে আসির প্রমুখও কোনো বর্ণনাকে সঠিক বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন তার বাহিনী নিয়ে ইরাকের বদ্বীপ এলাকায় পৌঁছেন তখন তার কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও আগে থেকে তৈরি করা কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। তিনি শুধু মুসান্নার সাহায্য ও তাঁকে ইরানী বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক যুদ্ধে যখন তাদের বিজয় লাভ ঘটলো তখন তিনি নিজ থেকে একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা বানিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুমোদন লাভ করা ছাড়াই হিরা ও উত্তর ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গানিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ ও তাকে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাকেই যথেষ্ট মনে করলেন।

এ বর্ণনা দুর্বল বলে মনে হয়। কারণ, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু পূর্ব থেকেই তার সকল সমরবিদ সেনাপতিদের কাছে নির্দেশ জারী করে রেখেছিলেন, কোনো যুদ্ধ শেষে পরবর্তী নির্দেশ পাবার আগ পর্যন্ত নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। ধর্মত্যাগের যুদ্ধ ও পরে ইরাকে ও সিরিয়ার বিজয় লাভের সময় দেখা গিয়েছে যে, সকল সমর নেতা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। তাই ইরাকে অগ্রসর করার সময় এ সুস্পষ্ট ও অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশকে এড়িয়ে গিয়ে নিজ থেকে একটি সামরিক পরিকল্পনা বানিয়ে খলিফার অনুমোদন ও হুকুম ছাড়া তা কার্যকর করতে শুরু করা হযরত খালিদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

www.pathagar.com

১২

ইরাক বিজয়

খালিদের ইরাক যাত্রা

মুসান্না বিন শায়বানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ইরানীদের উপর হামলা করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সুতরাং মুসান্না তার গোত্রের লোকদেরকে সাথে নিয়ে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ইরাকের উপর হামলা করে বসলেন। দজলা ও ফোরাত নদের বদ্বীপ এলাকায় একের পর এক বিজয় লাভ করে যেতে লাগলেন। বিজয়ের এসব খবর মদীনায় পৌছলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের এ ধারা বজায় রাখার জন্য মুসান্নাকে সামরিক সাহায্য পাঠানো জরুরী মনে করলেন। তাই তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাক চলে যেতে হুকুম দিলেন। বাহিনীর কমাণ্ডের দায়িত্বও তাঁর হাতে নিয়ে নিতে বলে দিলেন। আইয়াজ বিন গানামকে প্রথমে দাওয়াতুল জান্দাল গিয়ে ওখানকার বিদ্রোহী লোকদেরকে অনুগত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। ওখান থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পূর্ব দিকে হিরায় যেতে বলে দিলেন। তিনি যদি সেখানে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগে গিয়ে পৌছেন, তাহলে ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করার সময় বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর খালিদ যদি ওখানে প্রথমে পৌছেন তাহলে সিপাহসালারের দায়িত্ব তিনিই পালন করবেন। আর আইয়াজ হবে তার অধীন।

আরবরা ইরাকের ভূমিতে চাষাবাদের কাজ করতো। ফসল কাটার পর তাদের বণ্টনে পড়তো যৎসামান্য অংশ। অধিকাংশ অংশই চলে যেতো ইরানী জমিরদারদের ভাগে। তারাই এ জমির মালিক। এসব ভুঁই মালিক জমিদাররা গরীব আরব কৃষাণদের উপর অসীম নির্যাতন চালাতো। তাদের সাথে দাসদাসীদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের সময় এসব গরীব আরব কৃষকদের সাথে উত্তম আচরণ দেখাবার জন্য সেনাপতিদেরকে বলে দিলেন। হত্যা অথবা গ্রেফতার কোনোটাই না করারও নির্দেশ তিনি দিয়ে দিলেন। মোটকথা তাদের সাথে যেনো কোনো প্রকার খারাপ আচরণ করা না হয়। কেননা তারা আরবীয় লোক। ইরানীদের নির্যাতন নিগ্রহের চাক্কায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। তাদের ধারণা দিতে হবে, এবার তাদের নির্যাতিত নিষ্পেষিত জীবনের অবসান ঘনিয়ে আসছে। এখন তারা তাদের স্বজাতীয়দের মাধ্যমে সত্যিকারের ন্যায় ও ইনসাফ এবং বৈধ স্বাধীকার ও সমতালাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কর্ম-কৌশল মুসলমানদের যথেষ্ট কাজে আসলো। তাদের বিজয়ের পথ সহজ হয়ে গেলো। পেছনের দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে আর কেউ পথ বন্ধ করে দিতে পারার আশংকা তাদের মনে রইলো না।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো খুব স্বল্প। কারণ, তাঁর বাহিনীর অনেক সৈনিক ইয়ামামায় শহীদ হয়েছেন। এদিকে ইরাকে যেতে অনিচ্ছুক সৈনিকদের জোর করে না নেবার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো সাবেক ধর্মত্যাগীকে খলিফার তরফ থেকে পুনরায় আদেশ না আসা পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীতে শামিল করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো সামরিক সাহায্য পাঠাবার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আবেদন জানালে তিনি শুধু কা'কা' বিন ওমর তামিমীকে তাদের সাহায্যের জন্য পাঠালেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে আবেদন করলেন ঃ

"আপনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে শুধু এক ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছেন, অথচ তার বাহিনীর অধিক সংখ্যক সৈনিক আলাদা হয়ে গেছে।"

উত্তরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"যে বাহিনীতে কা'কা'র মতো লোক শামিল হবে সে বাহিনী পরাজিত হতে পারে না।"

শুধু কা'কা'র সাথেই ব্যাপারটা খাস নয় বরং একবার আইয়াজ বিন গানামও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আরদ ইবনে আউফুল হোমাইরীকে তাঁর সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। সেখানেও লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঐ জবাবই দিলেন, যে জবাব কা'কা'র ব্যাপারে দিয়েছিলেন।

তারপরও তিনি কা'কা'র কাছে খালিদের নামে চিঠি লিখলেন ঃ "যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন তাদেরকে নিজের বাহিনীতে শামিল হতে অনুপ্রাণিত করতে। আর তাদেরও উৎসাহিত করতে যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।[১] এ চিঠি

---

১. খালিদের নামে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি চিঠির কথা 'এজদী' উল্লেখ করেছেন। এ চিঠিতে তিনি খালিদের বাহিনীকে উপদেশ দিয়েছেন, হামদ ও ছানার পর তিনি লিখেছেন, আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইরাকে যাবার হুকুম দিয়েছি এবং উপদেশ দিয়েছি আমার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে। তুমিও তাদের সাথে যাও এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে কোনো রকম ইতস্তত: করবে না। ভালোভাবে জেনে রেখো, তুমি তোমার জন্য যে পথ বেছে নিয়েছো যদি সৎ নিয়তে তাতে অগ্রসর হও, আল্লাহর তরফ থেকে বিরাট সওয়াবের মালিক হবে। যখন তুমি ইরাকে যাবে, ফিরে আসার ব্যাপারে আমার তরফ থেকে পুনঃ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করবে। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের সাথে থাকবেন। সব কাজই তার সন্তুষ্টির জন্য আঞ্জাম পেতে হবে। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। তাবারী, ইবনে খালদুন ও ইবনে কাসির এ চিঠির উল্লেখ করেননি।

www.pathagar.com

পাওয়ার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার সৈন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। প্রথম থেকে তাঁর কাছে ছিলো দু' হাজার সৈন্য। 'মুদার' ও 'রাবিয়া' গোত্র থেকে তিনি প্রায় আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এ দশ হাজারের এক সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি ইরাক রওনা হয়ে যান খালিদের পূর্বে যেসব বাহিনী ওখানে কাজ করছিলো যাদের নেতৃত্ব মুসান্না দিয়ে যাচ্ছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো আট হাজার। এভাবে ইরাকে লড়বার মত মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো মোট আঠারো হাজার।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদকে ইরাকে 'এবলা' নামক জায়গা হতে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ জায়গা ছিলো পারস্য উপসাগরের উপর একটি সীমান্ত এলাকা। হিন্দুস্তান ও সিন্ধু গমনকারী ব্যবসায়ী কাফেলা এখান থেকে সফর শুরু করতো। আর এ দু'টো দেশ থেকে যেসব ব্যবসায়ীরা ইরাকে আসতো তারাও সর্বপ্রথম এই 'এবলা'তে অবস্থান গ্রহণ করতো। এবলার বিজয় সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানরা প্রথম এবলা বিজয় করে। কিন্তু পুনরায় তা ইরানীদের দখলে চলে যায়। এরপর এবলা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে মুসলমানরা পুরোপুরিভাবে জয় করে নেন। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগেই এবলা বিজয় করা হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিকগণ একথায় একমত যে, ইরাকে সর্বপ্রথম যুদ্ধ[২] সংঘঠিত হয়েছে হাফির নামক স্থান থেকে।

হরমুজের সাথে মুকাবিলা

পারস্য উপসাগর আর কাজেমার সীমান্ত শহরের নিকটবর্তী মরু অঞ্চলের একপাশে অবস্থিত ছিলো হরমুজের গ্রাম। ইরানীদের তরফ থেকে হরমুজ এ এলাকার শাসক ছিলো। মানে সম্মানে বংশ মর্যাদায় সে ইরানী অধিকাংশ শাসকদের চেয়ে উত্তম ছিলো। ইরানী মর্যাদাশালী ব্যক্তিরা সাধারণ টুপি পরার চেয়ে মূল্যবান টুপি পরতে অভ্যস্ত ছিলো। বংশ মর্যাদা, মান-সম্মানের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি যতবেশী মর্যাদাশালী হতো সে সেই অনুসারেই মূল্যবান টুপি পরিধান করতো। সবচেয়ে মূল্যবান টুপি সেই সময়কার এক লাখ টাকা দামেরও তৈরি হতো। আর সে টুপি

২. তাবারী ও ইবনে আসির উভয় গ্রন্থে 'এবলা' সম্পর্কে উল্লেখিত মতভেদ পাওয়া যায়। ইজদি বলেন, এবলা থেকেই যুদ্ধ শুরু করেনি সুওয়াইদ ইবনে কোতবা জেহলী। কিন্তু ইবলাবাসীদের বীরত্বের সামনে তারা টিকে থাকতে পারেনি। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরাক পৌছে সুয়াইদের সাথে সাক্ষাত করে উভয় সিদ্ধান্ত করলেন, তারা প্রকাশ্যভাবে শত্রুদের কাছে এমনভাব দেখাবে যে, খালিদ সুয়াইদকে ছেড়ে মুসান্নার কাছে চলে গেছেন কিন্তু গভীর রাতে তিনি বাহিনী নিয়ে সেনানিবাসে পৌছে যাবেন। বস্তুত তাই হলো। যখন এবলায় অবস্থিত ইরানী সৈনিকরা খালিদের বাহিনীকে চলে যাচ্ছে দেখে ভাবলো, একটি সুবর্ণ সুযোগ বুঝি তারা পেয়ে গেলো। সুয়াইদের বাহিনী তাদের মুকাবিলা করতে সমর্থ হবে না। এ জন্য একবার আবার তুমুল হামলা করে তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে হবে। সুতরাং তারা পরদিন প্রত্যুষে সুয়াইদের বাহিনীর উপর হামলা করে বসলো। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনী রাতের অন্ধকারে এখানে এসে পৌছেছিলো তা তাদের জানা ছিলো না। তাই তারা হেরে গেলো। বেলদানে বালাজুরীতেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

পরিধান করতো ঐ ব্যক্তি যার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত এবং মান-সম্ভ্রমে, বংশ মর্যাদার প্রভাব প্রতিপত্তিতে যে ব্যক্তি চরম উৎকর্ষ সাধন করতো। হরমুজের মাথার টুপির মূল্যও ছিলো এক লাখ টাকা। কাজেই এ থেকেই বুঝা যায় যে, হরমুজ কতো মর্যাদাশালী ছিলো। ইরানীদের কাছে তার মর্যাদা ছিলো সর্বজন সমর্থিত। কিন্তু ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরবরা তাকে অপরিসীম ঘৃণার চোখে দেখতো। কারণ, সে এসব আরবদের প্রতি সকল শাসকের চেয়ে অধিক কড়াকড়ি ও যুলুম করেছে। তার প্রতি আরবদের ঘৃণা বিদ্বেষ এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, তারা কোনো ব্যক্তির অসভ্যতা ও নোংরামীর উল্লেখ করে প্রবাদ বাক্য হিসাবে হরমুজের নাম ব্যবহার করতো। তারা বলতো ঃ

"অমুক ব্যক্তি হরমুজ অপেক্ষাও ইতর।"

"অমুক ব্যক্তি হরমুজের চেয়ে বদমেজাযী ও বদ অভ্যাসী।"

"অমুক ব্যক্তি হরমুজের চেয়েও অকৃতজ্ঞ।"

এ কারণেই জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে বসবাসকারী আরবরা নিজেদের ভাইদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের খবর শুনে সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে হরমুজের এলাকায় ধাওয়া করে তার আরাম-আয়েশকে বাধাগ্রস্ত করে তুলতো। হরমুজ একদিকে আরবদের উপর্যোপুরি হামলা ও লুটতরাজে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতো। অপরদিকে হিন্দুস্তানের জলদস্যুরা তাকে শান্তিতে বসবাস করতে দিতো না। তারা নৌকায় আরোহণ করে আসতো এবং এ এলাকায় লুটতরাজ করে চলে যেতো।

দশ হাজারের এক বাহিনী নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামা হতে ইরাকের দিকে রওনা হয়ে ইরাক সীমান্তে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষমান মুসান্নাকে দেখতে পেলেন। তারা সেনাবাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে বিভিন্ন পথ ধরে হাফির নামক স্থানে একত্রিত হবার জন্য হুকুম দিলেন। প্রথম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মুসান্না। খালিদের রওনা হবার দু'দিন আগে তিনি রওনা হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বাহিনীর নেতা ছিলেন আদি বিন হাতিম। তিনি তার বাহিনী নিয়ে একদিন আগে রওনা হলেন। তৃতীয় দিন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। এ বাহিনীগুলো প্রেরণের পূর্বে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হরমুজকে লিখলেনঃ

"হরমুজ ! তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। নিরাপদে থাকবে। যদি একথা না মানো তাহলে জিম্মি হয়ে আমাদের রাষ্ট্রের অধীনে বাস করো ও জিজিয়া আদায় করো। যদি এ প্রস্তাবও গ্রহণ না করো তাহলে পরে অনুশোচনা করেও কোনো লাভ হবে না। পরবর্তী অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে। আর কেউ নয়। আমরা আমাদের সাথে এমন জাতিকে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ততো ভালোবাসে যতো ভালোবাসো তোমরা তোমাদের জীবনকে।"

চিঠি পেয়ে হরমুজ ইরানের বাদশাহ 'ইরশির'কে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করালো। নিজে বাহিনী সংগ্রহ করে খালিদের মুকাবিলা করার জন্য কাওয়াজেম রওনা

www.pathagar.com

হলো। পথিমধ্যে হরমুজ খবর পেলো, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার বাহিনীকে 'হাফিরে' একত্রিত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সে দ্রুত খালিদের পৌছার আগেই 'হাফিরে' গিয়ে উপস্থিত হয়ে পানির উপর অবরোধ করে বসলো। খালিদকে বাধ্য হয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিতে হলো যেখানে পানির নাম-গন্ধও নেই। বাহিনীর লোকেরা অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ

> "চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানেই অবস্থান গ্রহণ করো। চরমভাবে ও হৃদয়হীন চিত্তে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, পানির উপর নিয়ন্ত্রণ অবশেষে তাদেরই আসবে যারা যুদ্ধে দৃঢ়তা ও কঠিন মনোবলের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে।"

হরমুজ শাহী খান্দানের দু'জন লোক 'কাব্বাজ' ও আনুসাজানকে মাইমুনা ও মাইসারার উপর দেখা-শুনার দায়িত্ব অর্পণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। সারি হতে বের হয়ে সে খালিদ সাইফুল্লাহকে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। হযরত খালিদের সাহস, হিম্মত, বীরত্ব, মনোবল, রণকৌশল এবং দুনিয়া জোড়া খ্যাতির কথা হরমুজ জানতো। তাঁকে হত্যা করতে পারলেই মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে বলে ধারণা ছিলো তার। অবশ্য তাকে হত্যা করা বা তাকে কাবুর মধ্যে আনা যে বড় দুরূহ কাজ, একথা তার অজানা ছিলো না। তাই সে ধোঁকাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করে তার কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যকে বলে রাখলো, যখনই খালিদকে আসতে দেখবে তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এদিকে হরমুজের আমন্ত্রণ শুনে ঘোড়া হতে অবতরণ করে পায়ে হেটে তার মুকাবিলা করার জন্য রওনা হলেন। কাছে গিয়ে তরবারী উচিয়ে হরমুজের উপর আক্রমণ চালালেন। এ সময় হরমুজের মনোনীত অশ্বারোহী সৈন্যরা ত্বরিত বেরিয়ে এসে খালিদকে হত্যা করে হরমুজকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। মুসলিম সৈন্যরাও এ ব্যাপারে অসতর্ক ছিলো না। কা'কা' বিন ওমর শত্রুদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। ইরানী সৈনিকদেরকে তাদের গোপন আড্ডাখানা হতে বেরিয়ে আসতে দেখেই তিনি নিজ বাহিনীসহ দ্রুত রওনা হয়ে গেলেন। এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌছার আগেই কা'কা' তাদেরকে তরবারি উঁচিয়ে আটকিয়ে রাখলেন। এ সুযোগে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তরবারির এক দুই আঘাতে হরমুজ মিঞাকে ধরাশায়ী করে নিজ সারিতে ফিরে গেলেন।

দুই বাহিনীতে এখন হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্তু সেনাপতির মৃত্যুতে ইরানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেলো। যুদ্ধের ময়দানে তারা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। পরাজিত হয়ে তারা পালাতে শুরু করলো।

রাতের অন্ধকারে মুসলমানরা পেছন থেকে তাদেরকে ধাওয়া করে ফোরাত নদীর বড় পুল পর্যন্ত হত্যা করতে করতে নিয়ে গেলেন। বর্তমানে এখানেই বসরা শহর

www.pathagar.com

অবস্থিত। এ পলাতকদের মধ্যে কোব্বাজ ও আনুমাজানও ছিলো। এদেরকে হরমুজ মাইমানা ও মাইসারায় নিযুক্ত করে রেখেছিলো।

শত্রুদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মা'কাল বিন মাকরান আল মুজনিকে এবলা গিয়ে গানিমাতের মাল একত্রিত করার আর মুসান্না বিন হারেছাকে পরাজিত ও পলাতক সৈন্যদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে তারা স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে চলে গেলেন।

পেছন থেকে আক্রমণ পরিচালনার সময় মুসান্না একটি কেল্লার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ কেল্লাতে থাকতো ইরানের শাহজাদী। এ কারণে আরব ঐতিহাসিকগণ এ কেল্লাকে হাসনুল মারয়াত নামে ডাকতো। এ কেল্লার থেকে কিছু দূরে তার স্বামীও আর একটি কেল্লায় ছিলো। মুসান্না তার ভাই মা'না বিন হারেছাকে শাহজাদীর কেল্লা অবরোধ করার হুকুম দিলেন। আর নিজে অবরোধ করলেন স্বামীর কিল্লা। স্বামীকে পরাজিত করে তার পরাজিত বাহিনীকে পেছন থেকে ধাওয়া করলেন তিনি। শাহজাদী স্বামীর পরাজিত হবার খবর শুনে মা'নার সাথে সন্ধি করে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

ইরাকে সংঘটিত এসব যুদ্ধকে 'জাতুস সালাসিলের যুদ্ধ' নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা ইরানীরা একে অপরের সাথে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে নিয়েছিলো। তাদের কেউ যেনো এ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু কেউ কেউ এ বর্ণনাকে সমর্থন করেন না। তারা এ যুদ্ধকে কাজেমার যুদ্ধ নামে অভিহিত করে। কারণ, এ যুদ্ধ কাজেমার কাছে সংঘটিত হয়েছিলো।

কাজেমার যুদ্ধে সুদূর প্রসারী ফল পাওয়া গেছে। ইরানীদের শক্তিমত্তা, শৌর্যবীর্যের যে ঢাকঢোল বহুদিন থেকে চলে আসছিলো তা এ যুদ্ধে অন্তসারশূন্য প্রমাণিত হলো। নগণ্য সংখ্যক মুসলমান বাহিনীর সাথে তাদের বাহিনী কিভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে খড়কুটার মতো উড়ে গেলো। তাদের সেনাপতি হরমুজ খালিদের হাতে মারা গেলো। হাজার হাজার সৈনিককে যুদ্ধের ময়দানে কচুকাটা করিয়ে অবশেষে তাদেরকে পলায়ন করতে হলো। এ যুদ্ধে গানিমাতের যে মাল হস্তগত হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই প্রত্যেক সৈনিক এক হাজার দেরহাম করে ভাগ পেয়েছেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের একটা বড় কারণ ছিলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুসৃত রণনীতি, যা তিনি ইরাকের কৃষিজীবি মানুষের ব্যাপারে আরোপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সে কর্মসূচীকে হযরত খালিদ কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলছিলেন। এ পলিসি অনুযায়ী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কৃষিজীবিদের কোনো কাজে বাধা দেননি। তারা যেখানে যেখানে আবাদ ছিলেন সেখানেই তাদেরকে থাকতে দেয়া হলো। নামমাত্র কিছু জিজিয়া আদায় করা ছাড়া আর কোনো ট্যাক্স জাতীয় কিছু তাদের কাছ থেকে উসুল করা হয়নি।

খালিদ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দরবারে এক-পঞ্চমাংশ গানিমাত পাঠিয়ে দিলেন। এ ছাড়াও যুদ্ধে প্রাপ্ত হরমুজের মহামূল্যবান টুপি ও একটি হাতীও তিনি

গামিমাতের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। মদীনাবাসীরা এর আগে কখনো হাতী দেখার সুযোগ পায়নি। আর মদীনাবাসীরাই শুধু কোনো কেনো গোটা আরবের কোনো অধিবাসীই আবরাহার হাতী ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনো হাতীই চোখে দেখেনি। কাজেই ইরাক থেকে প্রেরিত হাতীর মাহুত যখন মদীনার রাস্তায় রাস্তায় এটাকে ঘুরাতো তখন এ আশ্চর্যজনক জন্তু দেখে মানুষ হতবাক হয়ে থাকতো। তাদের বুঝে আসতো না এ কেমন ধরনের জীব। কোনো কোনো মহিলা বিস্ময় বিস্ফারাতি নেত্রে জিজ্ঞেস করতো এটা কি সত্যিই আল্লাহর সৃষ্ট জীব ? কোনো কোনো মহিলার ধারণা ছিলো ইরানীদের নির্মিত কোনো আশ্চর্যজনক বস্তু। হাতীটি মদীনায় রাখার কোনো উপকারিতা না দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মাহুত সহকারে তা ইরাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

এ বিজয় মুসলমানদের হিম্মতকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলো। তাদের মধ্যে একটি নতুন উদ্যম উৎসাহের সৃষ্টি হলো। পলায়ন পর পরাজিত ইরানী বাহিনীকে নোছন থেকে ধাওয়া করলেন মুসান্না সায়বানী। তাঁর ইচ্ছা ছিলো মাদায়েন পৌছার আগেই এসব লোকদেরকে পরিপূর্ণভাবে খতম করে দেয়ার। তিনি পথিমধ্যে জানতে পারলেন ইরানীদের এক বিরাট বাহিনী তাঁর ও খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করার জন্য রওনা হয়েছে। হরমুজের চিঠি পেয়েই শাহানশাহ ইরদাশির এ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছিলো। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলো, 'কারেন বিন কারইয়ানেস'। কারেন বাহিনী নিয়ে মাদায়েন থেকে যাত্রা শুরু করার পর পথিমধ্যেই কোব্বাজ ও আবু সাজানের সাথে সাক্ষাত হলো। হরমুজের পরাজিত বাহিনী সাথে নিয়ে তারা ভেগে চলে আসছিলো। কারেন বিন কারইয়ানেস তাদেরকে সাহস দিয়ে তার সাথে নিয়ে চললো। কিছুদূর আগে অগ্রসর হয়েই তারা 'মাজার' নামক স্থানে একটি নদীর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করলো। এ নদী ছিলো দজলা আর ফোরাতের মিলনস্থল।

মাজারের যুদ্ধ

কারেনের বাহিনীর আগমনের কথা শুনে মুসান্না বিরাট বাহিনীর সাথে একা একা মুকাবিলা করা সমীচীন হবে বলে মনে করলেন না। কাছেই এক জায়গায় অবস্থান নিয়ে তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখে সব খবর জানালেন। খালিদ চিঠি পেয়ে মুসান্নার ক্ষুদ্র বাহিনীর উপর কারেনের বিরাট বাহিনীর আক্রমণের আশংকায় তড়িঘড়ি করে তার বাহিনীসহ রওনা হয়ে মাজারে পৌছে গেলেন।

খালিদের আশংকা অমূলক ছিলো না। কারেন মুসান্নার বাহিনীর উপর আক্রমণের জোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু খালিদের দ্রুত পৌছে যাবার ফলে তার উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। হরমুজের হত্যা ও তার বাহিনীর পরাজয়ের কারণে ইরানীদের মনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিলো। প্রতিটি ব্যক্তি মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত উঠেপড়ে লেগে গেলো। তাদের ধারণা ছিলো মুসান্নার স্বল্প সংখ্যক দুর্বল বাহিনীকে পরাজিত করে প্রতিশোধের জিঘাংসা নিবারণ করবে। খালিদ রাদিয়াল্লাহ

www.pathagar.com

আনহু মাজারে গিয়ে উপস্থিত হবার কারণে ইরানীরা অবশ্যই অনুশোচনা করেছে কিন্তু প্রতিশোধের স্পৃহা তাদের বিন্দু মাত্রও কমেনি। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কোব্বাজ ও আবু সাজান হোকায়বের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য নিজ নিজ বাহিনীকে সাহস শক্তি যুগিয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৈরি করতে লাগলো। এ দু' ব্যক্তি ও কারেনের ধারণা ছিলো, তারা এখন খালিদের বিশৃংখল বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসলে অবশ্যই মুসলমানদেরকে পরাজিত করে তাদের আরব উপদ্বীপের দিকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। ইরানের শাহানশাহের কাছে তাদের মর্যাদাও বেড়ে যাবে।

ইরানী সৈন্যদেরকে তৈরি হচ্ছে দেখে তিনিও তার বাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। তার অসংঘটিত ও বিশৃংখল বাহিনীর উপর ইরান বাহিনী হামলা করার সুযোগ তিনি দেবেন না। যুদ্ধ শুরু হলো খালিদের ঐ কথার সত্যতার প্রমাণ ইরানীরা দেখতে শুরু করলো। খালিদ বলেছিলেন, "আমি এমন লোক নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি। যারা মৃত্যুর প্রতি পাগলপারা যেমন তোমরা জীবনের জন্য ব্যাকুল।" মুসলমানরা জীবনের বাজি নিয়ে লড়ছিলো। তাদের সামনে ইরানী দল দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিলো না। মুসলমানদের তরবারি অত্যন্ত নির্দয়তার সাথে ইরানীদের মাথা উড়িয়ে দিচ্ছিলো। কারেন, কোব্বাজ আর আবু সাজান এক এক করে মুসলমান নেতাদের সামনে এলো। কেউ নিজকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলো না। অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা তিনজনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এ তিনজনের উপর গোটা ইরানী বাহিনীর দায়িত্ব ছিলো। আর তারা তাদের নিজের বাহাদুরী ও সাহসিকতার জন্য গর্ব অনুভব করতো।

বড় বড় বাহাদুর এবং বাহিনীর কমাণ্ডারদের এমন লাঞ্ছিত মৃত্যু নিজ চোখে দেখে ইরানী বাহিনী হতোদ্যম হয়ে গেলো। মুসলমানরা ইরানীদের ভীত বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে অবরোধ করে হত্যা করতে শুরু করে দিলো।

ইরানী বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের চিহ্ন আগে থেকে প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো। এ নতুন হামলায় তাদের বুদ্ধি বিবেচনার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যে সৈনিক কিছুদিন আগে নিজের শক্তিমত্তার জন্য গর্ব অনুভব করতো এবং বিজয়ের স্বপ্ন দেখতো। খালিদের বাহিনীর সামনে প্রাণপণে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিলো। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয়। ইরানীরা জল পথে আগেই জলযানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। যদি তারা এ জলযান দিয়ে ঐ পাড়ে যেতে না পারতো অথবা যদি মুসলিম বাহিনীর মাঝে নদী প্রতিবন্ধক হিসাবে না দাঁড়াতো তাহলে ইরানীদের একটি সৈনিকও মুসলমানদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারতো না। বিজয়ের পরে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু সময়ের জন্য মাজারেই থেকে গেলেন। গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ও বিজয়ের শুভ সংবাদ সহ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ বিন নোমানকে মদীনায় হযরত আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও ইরানী বাহিনীর সাহায্য সহযোগিতা দানকারীদের পরিবার-পরিজন সহ গ্রেফতার করা হলো। এ গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবুল হাসান বসরীও শামিল ছিলেন।

যেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর এমন কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ দেখানো হয়েছে। কৃষিজীবি ও ঐসব লোক যারা জিজিয়া দিতে রাজী হয়েছে তাদেরকে কিছু বলা হয়নি। তাদেরকে ঘরবাড়িতে থাকতে দেয়া হয়েছিলো।

এসব প্রাথমিক কাজ সমাধা করে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ বিজিত এলাকার আইন-শৃংখলার দিকে দৃষ্টি দিলেন। এলাকার সব লোক জিম্মি হিসাবে পরিগণিত হলো। তাদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হলো। জিজিয়া আদায় করার জন্য জায়গায় জায়গায় শাসক নিয়োগ করা হলো। বিজিত এলাকার হিফাজতের জন্য তারা 'হাফির' ও 'জাসরে আজমে' সেনাবাহিনী নিয়োগ করে রেখেছিলেন। এদের শাসন ব্যবস্থা আরো উত্তম রূপে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। মুসলিম বাহিনীকে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন সিপাহসালাদের অধীন করে দিয়ে তাদেরকে শত্রুদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য তৎপরতার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন ও প্রয়োজন হলে এদের উপর হামলা করার হুকুমও দিয়ে দিলেন।

খালিদের সমর কৌশল ও পারদর্শিতার প্রমাণ এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে? ইরানে তার আগমনের প্রথম থেকেই কেসরার শক্তি সামর্থ ও সামরিক বাহিনী পরাজিত হতে শুরু করেছে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, শক্তি সামর্থ, আবেগ উল্লাস সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। মাজার যুদ্ধ হিরার কিছু দূরে হয়েছিলো। আর হিরা পারস্য উপসাগর আর মাদায়েনের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

ওয়ালজার যুদ্ধ

কোনো উপায় অন্তর না দেখে ইরানীরা, দাজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় ইরাকের সীমান্তের নিকটবর্তী বসবাসকারী আরবদেরকে নিজেদের সাথে মিলাতে চাইলো। এদের অধিকাংশই ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলো। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তারা এদেরকে অগ্নিপূজার ধর্ম গ্রহণ করাতে পারলো না।

মুসলমানরা এ ভূখণ্ডে আগমন করে এদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তা নাহলে তাদের কাছে জিম্মি হিসাবে জিজিয়া দাবী করলেন। জিজিয়ার দাবী গ্রহণ করাকেই তারা কল্যাণকর মনে করলো। কারণ, এতে তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে যা অন্যান্য অন্যান্য মুসলমানরা লাভ করে আসছে। বহুদিন পর্যন্ত ইরানী শাসনের অধীনে থাকার কারণে তারা তাদের আদেশের বরখেলাপ করতে সাহস পেলো না। বকর বিন ওয়ায়েল নামে ইরাকে ঈসায়ীদের একটি বড় গোত্র ছিলো। 'কেসরা' ও 'ইরদশির' এদেরকে তলব করে এনে তাদের মধ্যে হতে একটি বাহিনী তৈরি করে। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওয়ালজার দিকে পাঠালো। মুসলমানদের উপর বিজয়ের গৌরব

www.pathagar.com

একচেটিয়া ঈসায়ী আরবদের অংশে না আসুক এ জন্য তাদের একজন বড় বাহাদুর সিপাহসালার 'বহমন জাযবিয়াকে' একটি বিরাট বাহিনী সহকারে তাদের পিছু পিছু পাঠিয়ে দিলো। ঈসায়ী বাহিনী হিরা ও ওয়ালজার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী অন্যান্য আরব গোত্র ও কৃষাণদেরকেও সাথে নিয়ে নিলো। এভাবে আরবদের একটি বড় বাহিনী নিজেদেরই স্বদেশীয়দের সাথে লড়তে রওনা হলো। আর এদের পিছে আসছিলো ইরানীদের একটি বিরাট সামরিক দল।

মাজারে বসে বসেই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব খবর পাচ্ছিলেন। যেসব সামরিক অফিসারগণ আগে থেকেই হাফির, কাজেমা এবং ইরাকের অন্যান্য অংশে মওজুদ ছিলেন, তাদেরকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার ও তাদের চালে না পড়ার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। অতীতে অনেক বড় বড় বিজয় লাভ হয়েছে—এখন শত্রুরা মাথা উঠাতে পারবে না—এমন ধারণা যেনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। খালিদ নিজে একটি বাহিনী নিয়ে কেসরার পাঠানো বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য ওয়ালজা রওনা হয়ে গেলেন এবং শত্রু পক্ষের সামনে অবস্থান গ্রহণ করলেন। যেহেতু উভয় পক্ষই শক্তি-সামর্থে, শৌর্য-বীর্যে, ধৃঢ়তা ও সাহসিকতায় কেউ কারো চেয়ে কম ছিলো না তাই অনেকক্ষণ ধরে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে পারলো না। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে এ দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখে থাকা সম্ভব ছিলো না। তিনি তার বাহিনীর দু'জন সরদারকে তাদের বাহিনী নিয়ে আলাদা হয়ে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের সারির পেছনে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর শত্রুদের উপর পেছন থেকে হামলা চালিয়ে তাদেরকে যেনো ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে। কিন্তু পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা শত্রুপক্ষের সারির পেছনে গোপন অবস্থান নিতে পারলো না। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ে শত্রুর উপর আঘাত হানতে পারলো না।

যুদ্ধে কখনো মুসলমানরা চাপ সৃষ্টি করে শত্রু পক্ষকে পেছনে সরিয়ে দেয় আবার কখনো শত্রু পক্ষের অবস্থাও ভালো হয়ে গেলে মুসলমানরাও পিছ'নে সরে আসতে বাধ্য হয়। অবশেষে যখন কোনো পক্ষই বিজয়ের নিশ্চিত অবস্থা দেখতে পেলো না, নিরাশ হয়ে আপন আপন শিবিরে ফিরে গিয়ে পরবর্তী দিনের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক এ সময় ইসলামী বাহিনীর ছোট দলগুলো গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে কেসরা বাহিনীর উপর হামলা করে বসলো। ইরানীরা আগ থেকেই মুসলমানদের শক্তিমত্তা দেখে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলো, এখন এ নতুন আকস্মিক বিপদ দেখে তারা তাদের শক্তি, সাহস, হিম্মত হারিয়ে ফেললো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ দিক দিয়ে আর গোপন জায়গা হতে বেরিয়ে আসা দলগুলো পেছন থেকে শত্রুসেনাদের ঘিরে ফেলে হত্যা করতে শুরু করলো।

ইস্ত্রিসের যুদ্ধ

বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রকে নিজ জাতির কাছে এভাবে পরাজিত হবার কারণে ইরাকের আরব বংশোদ্ভূত ঈসায়ীদের মনে আগুন ধরিয়ে দিলো। তেজোদীপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। বনু ইজলান গোত্রের জনৈক আবদুল আসওয়াদ ইজলীকে তাদের সরদার বানিয়ে হিরাহিও এবলার কাছে ইল্লিস নামক স্থানে সেনাবাহিনী একত্রিত করতে লাগলো। সাথে সাথে ইরান শাহের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে পাঠালো। ওখান থেকে বহমান জাযুবিয়াকে বিরাট দল নিয়ে ঈসায়ীদের সাহায্যে চলে যাবার জন্য হুকুম দেয়া হলো। এ নির্দেশ পাবার পর বহমান মুসলমানদের সাথে সিদ্ধান্তকারী কোনো মুকাবিলা করার পূর্বে ইরানের শাহানশাহ ইরদশিরের সাথে সাক্ষাত আলোচনা প্রয়োজন মনে করলেন। তাই তিনি বাহিনীর কমাণ্ড জাবান নামক এক নেতার কাছে দিয়ে তাকে বাহিনী নিয়ে ইল্লিস চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ইরান শাহর দরবার থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ সম্ভব যুদ্ধ যেনো শুরু করা না হয় সে কথাও বলে দিলেন। শাহানশাহের সাথে পরামর্শ করার জন্য ওখানে গিয়ে সে শাহানশাহ ইরদশিরের অসুস্থতার কথা শুনলো। এদিকে ইল্লিসে গিয়ে জাবান ঈসায়ী বাহিনীর সংলগ্ন স্থানে অবস্থান নিল এবং তাদেরকে মুসলনাদের উপর হামলা করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে লাগলো।

এদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন না ঈসায়ীদের সাহায্যার্থে ইরানী বাহিনী বাজানের নেতৃত্বে ময়দানে উপস্থিত। তিনি শুধু জানতেন আরব বংশোদ্ভূত ঈসায়ীরা ইল্লিস নামক স্থানে একত্রি হয়েছে। তিনি তার বাহিনী নিয়ে 'হাফরে' পৌঁছে ওখানকার ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে দেখলেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। পেছনের তরফ থেকে হামলা পরিচালনার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। ইল্লিস পৌঁছেই তিনি ঈসায়ীদের তৈরি হবার আগেই যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা শামলিয়ে উঠতে পারলো না। প্রথম ধাওয়াতেই তাদের সেনাপতি মালিক বিন কায়স মারা গেলো। ঈসায়ী বাহিনীতে বিক্ষিপ্ততা ও বিচ্ছিন্নতার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বুঝতে পেরে জাবান নিজ বাহিনী নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এলো। উৎসাহ ব্যঞ্জনমূলক বাক্য দিয়ে ঈসায়ীদের সাহস ও হিম্মত যোগাতে ও দৃঢ় পদক্ষেপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবার জন্য নির্দেশ জারী করতে লাগলো। তার নিযুক্ত করা লোকেরা ঈসায়ী বাহিনীর সারিতে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করতে লাগলো, বহমন জাযুবিয়া একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য অচিরেই এসে পৌঁছাবে। তাদের এসে পৌছা পর্যন্ত বাহাদুরীর সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা জারী রাখতে হবে। যতসব বিপদাপদকে উপেক্ষা করে বাহাদুরের মতো যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকবে। সুতরাং ঈসায়ীরা অবস্থা কিছু সামলিয়ে নিয়ে মুসলমানদের ধারাবাহিক আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করলো। তাদের এ দৃঢ়তা, স্থিরতা ও ধৈর্য দেখে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি মুসলমানদেরকে পূর্ণ শক্তিপ্রয়োগ করে আর একবার শত্রুর উপর হামলা করার জন্য উৎসাহ যোগাতে লাগলেন।

দীর্ঘক্ষণ ঈসায়ীরা যুদ্ধ করে চলছে। তাদের একমাত্র ভরসা ছিলো বহমন জাযবিয়া। কেননা সে না আসা পর্যন্ত ইরানী বাহিনী তাদের সাথে মিশে যুদ্ধ করতে পারছে না। এদিকে কোথাও তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। জাবানও কি করবে না করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিলো না। এদিকে মুসলমানদের চাপ উত্তরোত্তর বেড়েই

www.pathagar.com

চলেছে। তাদের সামনে ঈসায়ীরা কিছুই করে উঠতে পারছে না। অবশেষে শত্রু শক্তি টুটে গেলো। এক এক করে তাদের সারি ভেঙ্গে যেতে শুরু করলো। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে শুরু করলো। তাদেরকে পালাতে দেখে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করে দিলেন, পলাতকদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করো। জীবিতদের ধরে আমার কাছে হাজির করো। যাকে ধরতে পারা যাবে না শুধু তাকেই হত্যা করবে। তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং মুসলমান আর তাদের মিত্রশক্তি ইরাকী আরবীয়রা —যারা ইসলামী বাহিনীর সাথে শামিল ছিলো, এভাবেই কাজ করতে করতে ঈসায়ীদেরকে দলে দলে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসতে লাগলো।

জাবানের ইরানী সৈনিকরা যুদ্ধ শুরু হবার আগে খাবার তৈরি করে নিয়েছিলো। তারা প্রশান্তির সাথে বসে খাবার খাচ্ছিলো। এমনি সময় মুসলমানরা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এ বিপদ এনে ঢেলে দিলো। খাবার থালা এভাবে রেখেই তারা পালাতে লাগলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীদের বললেন ঃ

"এ খাবার আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্যই তৈরি করেছিলেন, এখন তোমরা মজা করে খাও।"

মুসলমানরা দস্তরখানের চারদিকে বসে পড়লেন এবং খেতে শুরু করলেন। এমন এমন আশ্চর্যজনক খাবার তৈরি ছিলো যা মুসলমানরা কোনো দিন দেখেওনি ও আস্বাদনও করেননি। তারা খাচ্ছিলো। আর যে আল্লাহ্ চাওয়া ছাড়াই তাদেরকে এতো নেয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করতে থাকলেন।

ইল্লিসের কাছে ফোরাত ও বাদকেল্লী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিলো। আমগেশিয়া মানিশিয়া নামক শহর। এ শহরটি জনবসতি ও ধন-সম্পদের দিক থেকে 'হিরার' সমকক্ষ ছিলো। ইল্লিসের যুদ্ধে এখানকার বাসিন্দারা ঈসায়ী ও ইরানীদের মদদ যুগিয়েছিলো। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ছোট শহরকেও জয় করে নিলেন। এখান থেকেও অনেক গানিমাতের মাল লাভ করেন। এখানেও প্রত্যেকে সৈনিক ইল্লিস ছাড়াও পনের শত দেরহাম করে গানিমাত লাভ করেন।

এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গানিমাতের মাল সহ এক-পঞ্চমাংশ ও যুদ্ধাপরাধী কয়েদী মদীনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সাথে বনু এজেলের জনৈক ব্যক্তি জুন্দলকেও পাঠিয়ে দিলেন। ইল্লিসের বিজয়, সাথে গানিমাত, অধিকসংখ্যক কয়েদী ও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কৃতিত্ব সম্পর্কে জুন্দল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সবিস্তারে বলে শুনালে তিনি বললেন ঃ

"খালিদের মতো বীর সেনানী জন্ম দিতে এখন মায়েরা অপারগ।"

ইল্লিসের যুদ্ধে প্রাপ্ত একজন দাসীকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুন্দলকে দান করলেন। সুলতানাতের সব অংশে দূত পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে

www.pathagar.com

ঘুরে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইসলামী বাহিনীর বিজয় এবং বিরাট কৃতিত্বের খবর পৌছিয়ে দিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতে এসব যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলো।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইল্লিস ও আমগাশিয়ার ঘটনাবলীর উল্লেখ করে অনুতাপের স্বরে বলেছেন, এসব যুদ্ধে মুসলমানরা চরম নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিয়েছে। তারা বলেন, আফসোস ! যদি ইতিহাসে বর্ণিত এসব ঘটনা মিথ্যা হতো। অথচ এগুলোকে মিথ্যা বলা যাবে না। কারণ, বেশ কয়েকজন বর্ণনাকারী এসব ঘটনার একই বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানব সভ্যতা এখনো এতো উন্নত হয়নি, যা হলে তারা নিজকে সকল প্রকার বর্বর ও পশুত্ব হতে পরিপূর্ণরূপে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন মনে করতে পারে। যদিও মুখে তা স্বীকার করা হয় না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজও বর্বরতা ও পশুত্বের গণনা ঐসব উপায়-উপকরণের মধ্যেই ধরা হয় যা সভ্যতা ও কৃষ্টির পুনর্গঠনের জন্য সাহায্যকারী ও সহযোগি বলে মনে করা হয়। আজও জাতীয় জীবন ঠিক রাখার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের অস্তিত্বকে আবশ্যকীয় বলে ধরা হয়। ঐসব জাতিকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে সবচেয়ে উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়, যারা জীবন বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে নিজের প্রতিযোগী জাতির তুলনায় পিছে পড়ে থাকে না। আর যেসব জাতি সামরিক প্রস্তুতিতে ত্রুটি বা অবহেলা করে, তাদেরকে অনুন্নত ও অবহেলিত জাতির মধ্যে গণনা করা হয়। এ অবস্থার আলোকে যদি কোনো সিপাহসালার যুদ্ধের ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দ্বির সাথে কঠোর আচরণ করে এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্য কোনো অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে মানব স্বভাবের দিকে তাকিয়ে এটাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না।

কোনো কোনো সময় যুদ্ধের ময়দানের সেনাপতি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কঠোরতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। যদি প্রতিপক্ষকে এভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে এ প্রতিপক্ষ তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিদ্রোহের সকল প্রকার সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যুদ্ধের ময়দানে নির্দয়তার সাথে শত্রুদের ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়। ভবিষ্যতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ ও মাথা উঠাতে যেন না পারে তার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। বীর সেনানী খালিদকেও তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কঠোর দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সম্মুখীন হতে হয়।

'মাজার' ও 'হাফিরে' ইরানীদেরকে যে শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করতে হয় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ইরাকে বসবাসকারী আরব বংশোদ্ভূত ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুললো। ইল্লিসের ঘটনাও তা-ই। বিজয়ের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরানী ও তাদের সহযোগীদের যুদ্ধ স্পৃহা সমূলে ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। ভবিষ্যতে যেন তারা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে শির উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস না পায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন এর দ্বারা সত্যি

www.pathagar.com

সত্যিই ইরানীদের সাহস হিম্মত একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। কেসরা ও ইরদশির এ সময় অসুস্থ ছিলো। এ শোচনীয় পরাজয়ে তারা খুবই মর্মাহত হয়। তারা আর সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারেনি। অত্যন্ত ব্যথাহত চিত্তে তারা দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলো।

হিরা

ইরদশিরের মৃত্যুতে ইরানীরা দ্বিগুণ মুশকিলে নিপতিত হলো। একদিকে শাহানশাহর মৃত্যুর বিরহ ব্যথা আর অন্যদিকে মরু সিরিয়া ও ফোরাত দাজলার মধ্যবর্তী এলাকার মুসলমানদের উত্তরোত্তর সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া। হতাশার ছায়া তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। তারা আর মুসলমানদের মুকাবিলা করার শক্তি ও সাহস পাচ্ছিলো না। নিজেদের এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া তাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হলো। তারপরও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের হতাশার ভাব দেখে কোনো ভুল করলেন না। ইরানীদের বিরুদ্ধে জয় লাভের কারণে নিজের শক্তিমত্তা, সাহসিকতা ও রণকৌশলের জন্য কোনো অহমিকাবোধ করলেন না। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ঈসায়ী গোত্রগুলোকে ইরানীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে ইব্লিসের ময়দানে নামিয়ে দিয়েছিলো, তারা আজ অবস্থার প্রেক্ষিতে খামুশ থাকলেও জিঘাংসা ও প্রতিশোধের দাবানল তাদের মনে অবিরতই জ্বলতে থাকবে। কোনো সুযোগ হাতে এলেই তারা তা হাতছাড়া করবে না। তাই যদি এখনই এসব বিরোধিতা ও বিদ্রোহের জীবানু সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয়া না হয় এবং জাজিরাতুল আরবে গমনের সব পথ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমানরা ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হবে। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করে হিরার উপর তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ লাভ করা তিনি সমীচীন বলে মনে করলেন। তাহলে ফোরাত নদীর পশ্চিম কূল বয়ে আরব উপদ্বীপের সীমান্ত পর্যন্ত গোটা এলাকা মুসলমানদের অধীনে এসে যাবে। পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করার আর কোনো আশংকা অবশিষ্ট থাকবে না।

এ সময়ে হিরার শাসক ছিলেন একজন ইরানী হাকিম 'আজাজবিহ'। পঁচিশ বছরেরও বেশী ইরানী আরবের এ রাজধানী আরব হুকুমাতের সময় যে শান-শওকত অর্জন করলো তা সে দীর্ঘ সময়েও অর্জন করার সৌভাগ্য পায়নি। কারণ, 'লাখমীদের' সাথে (যারা ঈসায়ী দ্বিতীয় শতকে হিরাতে নিজেদের রাজধানী বানিয়েছিলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত শাসক ছিলো) 'তাইওদের' বিরাট মতভেদ সৃষ্টি হয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধও লেগে গিয়েছিলো। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেসরার থেকে সুযোগ গ্রহণ করে লাখমী বাদশাহ নোমান বিন মাজহারের বিরুদ্ধে 'তাইওদের' সাহায্য করে নোমানকে হত্যা করে ফেললো। আয়াছ বিন কোবাইছা আত্তাইকে হিরা সহ আশেপাশের এলাকার শাসক বানিয়ে দিলো। মাত্র কয়েক বছর হলো আয়াছ শাসক হয়েছে, এরই মধ্যে জুকার নামক স্থানে বনু বকর বিন ওয়ায়েল ইরানী এক বাহিনীকে পরাস্ত করে দিলো। ইরানী বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলো 'আয়াছ'। তাই আয়াছকে হুকুমাত থেকে সরে যেতে হলো। কেসরা তার তরফ থেকে এক ব্যক্তিকে হিরার শাসক বানিয়ে

www.pathagar.com

দিলো। এভাবে হিরা নিজ জৌলুস ও শান-শওকত থেকে বঞ্চিত থাকে। তারপরও এর সাথে আরবদের হৃদয়ের সম্পর্ক ছিলো। তারা এর শান-শওকত আবার দেখতে চাইলো। হযরত খালিদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এসব ঈসায়ীদের জিঘাংসা দেখে আশংকা করলেন। বনু বকর বিন ওয়ায়েশ 'তাইও' এ হিরার অধিবাসী অন্যান্য আরবরদেরকে জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাথে মিলিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। পেছন থেকে তাদের পথে বাধা দেবার চেষ্টা চালাবে। এ জন্য তিনি হিরার উপর হামলা করে তা দখল করার ও একে রাজধানী বানাবার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করেন।

এদিকে হিরাবাসীরাও কোনো খোশ খেয়ালে নিমগ্ন ছিলো না। তারা ইল্লিস ও আমগাশিয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত ছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, খালিদ অল্পদিনের মধ্যেই তার বাহিনীকে এদিকে পাঠাবেন। প্রথম থেকেই হিরার শাসক অনুমান করেছিলো। জলপথে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরা পৌঁছাতে পারেন। আমগাশিয়ার নৌকায় চড়ে নদী পার হয়ে হিরায় আসবে। সে তার বাহিনী নিয়ে হিরার বাইরে এসে নিজের ছেলেকে ফোরাতের পানি ফিরিয়ে রাখার আদেশ দিলো। উদ্দেশ্য ছিলো নদীর পানি শুকিয়ে দিয়ে নৌকা আটকিয়ে দেয়া। তাহলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

'আজাজবিহর' অনুমান সঠিক ছিলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমগাশিয়া থেকে নৌকায় আরোহণ করে উত্তরে হিরার দিকে রওনা হলেন। সামান্য পথ অতিক্রম করার পর নদী শুকিয়ে সব নৌকা কাদামাটিতে আটকিয়ে গেলে বিস্মিত হয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাল্লাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা ইরানীদের নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বন্ধ করে রেখে তা নদীর সাথে সম্পৃক্ত সকল খালে বিলে ছেড়ে দেবার কথা জানালো। ঘটনা জেনে নৌকা ছেড়ে দিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ছোট দল সাথে নিয়ে নদীর উৎস মুখের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আজাজবিহর ছেলেকে দাঁড়িয়ে থেকে নদীর পানি বন্ধ করার কাজ দেখাশুনা করতে দেখলেন। আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে খালিদ তাকে ও তার বাহিনীকে হত্যা করে দিলেন। বাঁধ কেটে দিয়ে তিনি ফোরাতের পানির স্রোত ছেড়ে দিলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার তার সাথীদের সহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধ কেটে পানির স্রোতধারা সৃষ্টির কাজ দেখাশুনা করতে লাগলেন। তারা আবার নৌকায় চড়ে তাদের যাত্রা শুরু করে দিলেন। ইসলামী বাহিনী নিয়ে খালিদ 'নূরে হক' এ পৌঁছেন। এখানেই বাহিনীকে অবতরণ করার নির্দেশ দিয়ে নূরে হকের বিখ্যাত মহলের সামনে তাবু টাঙ্গালেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আজাজবিহ হিরার শাসক নিজ পুত্রের আর ইরদশিরের মৃত্যুর খবর এক সাথে পেলো। খালিদ এসে পৌঁছার আগেই পলায়ন করে জীবন বাঁচানোই শ্রেয় বলে মনে করে সে তাই করলো। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাহিনী নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরার দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথমে 'নূরে হক' ও 'নাজফ' দখল করে নিলেন।

www.pathagar.com

এখানেই গ্রীষ্মের মওসুমে শাসকবর্গ এসে বসবাস করতো। তারপর হিরায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

আজাজবিহ্ জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে গেলেও হিরাবাসীরা হিম্মত ছাড়লো না। তারা শহরের চারটি কেল্লা ঘিরে বসে গেল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ চারটি কেল্লাকেই কঠিনভাবে অবরোধ করে বসলেন। তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণের জন্য বাধ্য করতে শুরু করলেন। এরা যখন কোনো অবস্থাতে সন্ধি করতে রাজী হলো না, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে বলে পাঠালেন, যদি তারা একদিনের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ না করে তাহলে তাদের পেশকৃত তিনটি শর্তের একটি গ্রহণ করবে। তিনটি শর্ত হলো ঃ (১) ইসলাম গ্রহণ, (২) জিজিয়া দেয়া, (৩) যুদ্ধ। যদি তা না করে তাহলে তাদেরকে তছনছ করে দেয়া হবে। আর তাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী হবে তারাই।

তারা সন্ধির কথাবার্তা চালাবার পরিবর্তে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দিলো। মুসলমানরাও প্রতি উত্তরে ইরানীদের উপর তীরের বর্ষণ শুরু করে দিলো। এতে ওদের অসংখ্য লোক নিহত হলো। এ অবস্থা দেখে হিরাবাসীরা ভীত হয়ে পড়লো। শহরে অনেক পাদ্রী ও ধর্মযাজক বিদ্যমান ছিলো। তারা ইরানী সরদারদের কাছে গিয়ে আবেদন জানালো। রক্ত প্রবাহের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে। পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে মানুষকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো।

কোনো উপায় না দেখে কেল্লার নেতা সন্ধি করার জন্য রাজী হয়ে গেলো। তারা ইসলামী বাহিনীকে খবর পাঠিয়ে দিলো। তারা তাদের তিনটি শর্তের যে কোনো একটি শর্ত মানতে রাজী। অতএব দয়া করে তীর বর্ষণ বন্ধ করে দিন। নিজের সিপাহ্সালারদেরকে এ খবর জানিয়ে দিন। মুসলমানরা তীর বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। তারা সন্ধি করতে প্রস্তুত। তাঁর সাথে দেখা করতে চায়। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ খবর পেয়ে তাদেরকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি দিলেন।

তাদের ওয়াদা অনুযায়ী হিরার সরদারা নিজ নিজ কেল্লা থেকে বের হয়ে শহরের সম্মানী ব্যক্তিদের নিয়ে মুসলীম বাহিনীর সরদারদের কাছে পৌঁছলো। তারা তাদেরকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নিয়ে গেলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু পালাক্রমে প্রত্যেক কিল্লাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন ঃ

> "তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। তোমরা নিজেদেরকে কি ভেবে আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে চেয়েছিলে। তোমরা যদি আরবীয় হয়ে থাকো, তাহলে স্বজাতীর সাথে মুকাবিলা করার কি দরকার ছিলো। যদি অনারবীয় হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধে জয়ী হবে, যারা ন্যায় ও ইনসাফে নজীরবিহনী।"

www.pathagar.com

সরদাররা জিজিয়া দিতে রাজী হলো

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আশা ছিলো, এক জাতি হবার কারণে এ ইরাকী আরবরা ইসলামই গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের ঈসায়ী ধর্মের উপর অধিষ্ঠিত থাকার জিদ দেখে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন ঃ

"আমি তোমাদের কাছ থেকে এ জবাব প্রত্যাশা করিনি। কুফরীর পথ অবশ্যই ধ্বংসের দিকে চলে যায়। মূর্খ আরব সে, যে আরবীয় রাজপথ ছেড়ে দিয়ে অনারবীয় পথ ধরে চলে।"

খালিদের কথা তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না। তারা ঈসায়ী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যই জেদ ধরলো। কারণ, এরা ধর্মীয় স্বাধীনতার হক থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে চায়। ইসলামী সিপাহসালারের তরফ থেকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াতকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে ধারণা করে। দ্বিতীয় কারণ, হতে পারে, তারা ধারণা করে থাকবে, মুসলমানরা ইরাকে টিকে থাকতে পারবে কি ? তারা এখানে হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে কি ? তাই এ অনিশ্চিত অবস্থায় ধর্ম পরিবর্তন করে লাভ কি ?

হিরাবাসীদের কাছ থেকে বার্ষিক এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিজিয়ার উপর সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো। এ ব্যাপারে নিচে উদ্ধৃত সন্ধি লিখা হয়েছিলো ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"এ হলো ঐ সন্ধিচুক্তি যা খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরার সরদার আদি বিন আদি, ওমর বিন আদি, ওমর বিন আবদুল মসীহ, আইয়াস বিন কোবাইছা আত্‌তাই এবং হিরি বিন আক্কালের সাথে সম্পাদন করলেন। হিরাবাসী এ সন্ধি চুক্তি মেনে নিয়েছে। এবং তাদের সরদারদেরকে এ সন্ধি পূর্ণ করার দায়িত্ব দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী হিরাবাসীকে বার্ষিক এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিজিয়া হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। আর এ জিজিয়া তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের কাছ থেকেও উসূল করতে হবে। অবশ্য দরিদ্র, মুখাপেক্ষী, বিকলাঙ্গ, সংসার ত্যাগী বৈরাগী সাধু-সন্নাসীরা মাফ পাবে।

যদি এ জিজিয়া যথারীতি পরিশোধ হতে থাকে তাহলে হিরাবাসীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। যদি তারা নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে জিজিয়া আদায় করতে পারবে না। যদি কথা বা কাজের দ্বারা এ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হয়, তাহলে এ সন্ধির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। এ সন্ধি চুক্তি ১২ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে সম্পাদিত হলো।"

হিরাবাসীরা জিজিয়া ছাড়াও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু উপঢৌকন পেশ করে। এ উপঢৌকন গানিমাতের মালের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে পাঠালো, এ

www.pathagar.com

উপঢৌকন যদি জিজিয়া রূপে পরিগণিত হয়, তাহলে তো উত্তম ; আর তা নাহলে তা জিজিয়ার অংকে শামিল করে বাকী অংক হিরাবাসীদেরকে ফেরত দিন।

হিরার বিজয় পরিপূর্ণ হবার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আট রাকাআত নফল নামায আদায় করেন। তারপর তিনি তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

"মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গেছে। কিন্তু পারস্যবাসীদের সাথে যে কঠিন যুদ্ধ হলো তা এর আগে আর কোনোদিন হয়নি। পারস্যবাসীদের মধ্যে ইল্লিসবাসীরা যে বাহাদুরী ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে এর কোনো নজীর এর আগে আমি কখনো দেখিনি।"

বিজয়ের পরে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরাকে মুসলমানদের সামরিক হেডকোয়াটার ও বিজিত এলাকার রাজধানী বানালেন। জাজিরাতুল আরবের বাইরে এটাই হলো ইসলামী হুকুমাতের প্রথম রাজধানী। তারপরও এখানকার শাসনব্যবস্থা ও শান্তি শৃংখলার ব্যবস্থা স্থানীয় নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়। তারা তাদের প্রতি এ সম্মান প্রদর্শনের জন্য খুবই খুশী হলো। মনপ্রাণ দিয়ে তারা তাদের আনুগত্য করতে এবং হিরা ও আশেপাশের এলাকায় শান্তি-শৃংখলা স্থাপনে বেশ সহযোগিতা করতে লাগলো। হিরার নিকটবর্তী শহরের বাসিন্দারা হিরাবাসীদের ইসলামী হুকুমাতের আদর্শ, ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রেওয়াজ রীতি, ইবাদাত-বন্দেগীতে পূর্ণ আযাদী লাভ করে। শান্তির সাথে কাজ-কারবারে ব্যস্ত আছে, ওদিকে ইরানী প্রশাসনও নিশ্চুপ আছে দেখে তারা খালিদের সাথে সন্ধি স্থাপনে ও তার আনুগত্য পালনের ইচ্ছা পোষণ করলো। তারা দেখলো মুসলমানদের শাসনে গরীব চাষীরা অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত আছে। মুসলমানরা এদের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ তো করছেই না বরং ইরানী জমিদারদের হাতে এদের উপর যে নির্যাতন ও নিগ্রহ চলছিলো তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মুসলমানরা লক্ষ্য রাখছে। তাই তাদের হৃদয় তাদের অলক্ষ্যেই মুসলমানদের প্রতি ঝুঁকে গেলো।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি খালিদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন, তিনি ছিলেন দেরে নাতিকের পাদ্রী সালুবা বিন নাস্তুনা। তিনি 'বানকিয়া' ও 'বিসামা' নামক অঞ্চলের সব জমিন লাগানোর জিম্মাদারী গ্রহণ করলেন। এ অঞ্চল ফোরাত নদীর কিনারে অবস্থিত ছিলো। কেসরার 'মূর্তি' ছাড়াও তিনি নিজের, বংশের ও জাতির তরফ থেকে দশ হাজার দিনার দেবার ওয়াদা করেছেন। সুতরাং যথারীতি সন্ধিপত্র লেখা হলো ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"এ সন্ধি চুক্তি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে সালুবা বিন নাস্তুনা এবং তার জাতির জন্য লেখা হচ্ছে। এ অঙ্গিকার পত্র অনুযায়ী তোমার কাছ থেকে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম জিজিয়া আদায় করা হবে। কেসরার

www.pathagar.com

'মুতি' হবে এর অতিরিক্ত। জিজিয়ার এ অংশ সামর্থবান ও উপার্জনকারী ব্যক্তির কাছ থেকে তার আয়-আমদানী অনুযায়ী বার্ষিক উসুল করা হবে। এ জিজিয়ার বিনিময়ে মুসলমানদের তরফ থেকে 'বানকিয়া' ও 'বাসামা' হিফাযত করা হবে। তোমাকে তোমার জাতির নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে। যা তোমার জাতি গ্রহণ করেছে। এ সন্ধি চুক্তির সাথে আমি ও আমার সাথীগণ একমত এবং তারা তা গ্রহণ করে। এভাবে তোমার জাতিও এ চুক্তির সাথে একমত ও এটাকে তারা গ্রহণ করেছে।"

সালুবার পরে ইরাকের অন্যান্য জমিদাররাও খালিদের আনুগত্য গ্রহণ করলো। ফালালিজ থেকে হরমুজ পর্যন্ত এলাকার জন্য বিশ লাখ দিরহামের বিনিময়ে সন্ধি হয়েছে। এভাবে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে উত্তরে হিরা পর্যন্ত, পশ্চিমে আরব উপদ্বীপ থেকে শুরু করে পূর্বে দাজলা নদী পর্যন্ত গোটা বিস্তীর্ণ এলাকাটাই খালিদের অধীনে এসে গেলো। এসব এলাকায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। এসব শাসকরা শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা সহ শহরের শাসনব্যবস্থা ও দেখাশুনা ছাড়াও সব রকমের খাজনাপাতি উসুল করতেন। এসব কার্যক্রম ছাড়াও তিনি বিভিন্ন শহরে সামরিক বাহিনী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যদি কোনো বিদ্রোহ শুরু হয় অথবা কোনো দিক থেকে কোনো হামলা হয়, তার প্রতিরোধ যেনো এরা করতে পারে। এসব সামরিক বাহিনীর নিযুক্তিতে দুষ্টমতি ও লম্পট ধরনের লোকদের হিম্মত ভেঙ্গে গেলো। ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ধারণাও আর কারো মনে জাগতে পারেনি।

এ সময়ে মুসলমানরা যখন দাজলার ঐ পাড়ে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে যাচ্ছিলো তখন পারস্যবাসীরা নিজেদের আত্ম-কলহে লিপ্ত ছিলো। ইরদশিরের মৃত্যুতে ইরানী শাহানশাহর শাসনব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। সিংহাসন আরোহণকারী সব শাহজাদাই তার প্রতিদ্বন্দ্বির হাতে নিহত হয়েছে। কার শিরে বাদশাহীর তাজ পরাবে ইরানবাসী তা বুঝে উঠতে পারছিলো না। একের পর এক বেশ কয়েকজনই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

কোনো শাহজাদার পক্ষেই কয়েকদিনের বেশী বাদশাহী করার সৌভাগ্য হয়নি। এভাবে উত্তরোত্তর ইরান সাম্রাজ্যে নিদারুণ বিশৃংখলা ও দুর্বলতা দেখা দিলো। এ অবস্থায় তারা ভাবলো খালিদের বিজিত এলাকায় হামলা চালিয়ে তা পুনরুদ্ধার করার চেয়ে উত্তম হবে এখনো যেসব এলাকা তাদের হাতে আছে তা ইরানী বাহিনীর সাহায্যে মুসলমানদের বিজয় হতে ঠেকিয়ে রাখা। সুতরাং তারা দাজলা নদীর অপর পাড়ে নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করলো।

বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ ইরানী বাহিনীকে এসব সামরিক ব্যবস্থাকে সামান্যই ভ্রূক্ষেপ করেন। আর ইরানীরাও তাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করে টিকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছে তাহলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ। তাঁর

www.pathagar.com

নির্দেশ ছিলো, ইয়াজ বিন গানাম দাওয়ামাতুল জুন্দুলের বিজয় থেকে অবসর হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরা ত্যাগ করতেও পারবে না আর অতিরিক্ত বিজয়ের জন্য সামনেও অগ্রসর হবে না। এদিকে ইয়াজ দাওয়ামাতুল জুন্দুলে আটকে গেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ওখানে পাঠাবার পর এখনো তিনি বিজয় লাভ করতে পারেননি। পূর্ণ একটি বছর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হিরা বসে বসে কাটালেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো কর্মব্যস্ত বীর পুরুষের পক্ষে এতো বেকার সময় কাটানো ছিলো বড় কষ্টকর ও সময়ের অপচয়। তিনি বার বার তার সাথীদের বললেন, যদি খলিফার এ নির্দেশ না থাকতো, তাহলে আমি ইয়াজের জন্য মোটেই অপেক্ষা করতাম না। আর তাকেও আমার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতাম না। এখন ইরান বিজয় অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় আর কোনো কাজ নেই। একটি বছর চলে গেলো। শুধু ইয়াজের কারণে আমরা হাতের উপর হাত রেখে সময় কাটাচ্ছি।

হযরত খালিদের ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেলে তিনি বিরক্ত হয়ে হিরার ও আম্বাতের একজন করে লোক ডেকে আনেন। পারস্যের বাদশাহদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য হিরার অধিবাসীর কাছে একটি চিঠি এবং ইরানী প্রশাসকদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য আম্বার অধিবাসীর কাছে আর একটি চিঠি তিনি হস্তান্তর করলেন।

পারস্যের বাদশাহর কাছে তিনি লিখলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহহির রাহমানির রাহীম

"এ চিঠি খালিদ বিন ওয়ালিদের তরফ থেকে পারস্যের বাদশাহদের নামে প্রেরিত হচ্ছে। আল্লাহর শুকুর, তিনি তোমাদের শাসনব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের ছলচাতুরীকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদি তিনি তা না করতেন, তোমরা আরো ক্ষতির সম্মুখীন হতে। এখন আমাদের আনুগত্য করাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। যদি তোমরা তা করো, আমরা তোমাদেরকে ও তোমাদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবো। যদি তোমরা তা না করো তাহলে এমন এক জাতির কাছে তোমাদেরকে পরাজিত হতে হবে, যারা জীবনকে তোমরা যে রূপ ভালোবাসো তার চেয়ে বেশী ভালোবাসে মৃত্যুকে।"

ইরানী প্রশাসকদের নামে তিনি লিখলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"এ চিঠি খালিদ বিন ওয়ালিদের তরফ থেকে ইরানী প্রশাসকদের নামে প্রেরিত হলো। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। নিরাপদে থাকবে। অথবা জিজিয়া দেবার প্রতিশ্রুতি দাও। আমরা তোমাদের সব নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নেবো। এ দু'টোর কোনোটাতেই যদি রাজি না হও, তাহলে মনে রাখবে আমি এমন এক জাতি নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করছি যারা মৃত্যুর জন্য পাগলপারা, যেমন তোমরা পাগলপারা শরাব পানের জন্য।"

www.pathagar.com

আম্বারের যুদ্ধ

ইরানের সামরিক বাহিনী হিরার একেবারেই কাছে আম্বার ও আইনুততামারে ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছে। মুসলমানদের জন্য এ ঘাঁটি বিপদের সম্ভাবনা হয়ে দেখা দিলো। এ অবস্থায় যদি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিশ্চুপে হিরায় বসে থাকতেন এবং বেরিয়ে এসে ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা না চালাতেন, তাহলে যে এলাকা মুসলমানরা প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, তা আবার হাতছাড়া হয়ে যাবার আশংকা ছিলো। সুতরাং তিনি বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কা'কা' বিন ওমরকে হিরার রক্ষণাবেক্ষণে এখানে পেছনে রেখে দিয়ে, আকরা বিন হাবেসকে অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে তারা আম্বার রওনা হলেন।

আম্বারে পৌছে তারা শহর ঘেরাও করে ফেললেন। বাহিনীকে হুকুম দিলেন কিল্লাহর রক্ষীবাহিনীর উপর তীর বর্ষণ করতে। কিন্তু মযবুত প্রাচীর, চারিদিকে খনন করা গভীর পরিখার কারণে মুসলমানদের এ তীর বর্ষণ ইরানীদের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। এভাবে মুসলমানদের প্রাথমিক আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেলো।

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশী সময় ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারলেন না। শহরের উপর হামলা পরিচালনা করার জন্য পথের অনুসন্ধানে তিনি পরিখা পথ ধরে শহরের চারিদিকে চক্কর লাগালেন। দেখতে পেলেন, এক জায়গায় পরিখা বেশ সরু। তিনি তার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, যেসব উট বেশী অসুস্থ ও একেবারেই অকেজো সেগুলোকে যবেহ করে ঐ সরু জায়গায় ফেলে দিতে। হুকুম অনুযায়ী মুসলমানরা উট যবেহ করে ওখানে ফেলে দিলে উটের লাশে ঐ সরু জায়গা ভরাট হয়ে একটি সেতু নির্মাণ হয়ে গেলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি ক্ষুদ্র বাহিনী সহ উটের পুল দিয়ে পরিখা পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। এ ছোট দলটি প্রাচীর ফেড়ে শহরের দরজা খুলে দিলেন। ইসলামী ফৌজ দরযা দিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো।

এ অবস্থা দেখে ইরান বাহিনীর সিপাহসালার 'শিরজাদ' সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে বললো, তার জীবন রক্ষা করা হলে সে সওয়ারীদের একটি ছোট দল নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে যাদের কাছে কোনো সরঞ্জাম থাকবে না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শিরজাদ শহর থেকে বেরিয়ে গেলে মুসলমানরা তা দখল করে ফেললো। আম্বারের আশেপাশের এলাকার লোকজন খালিদের সাথে সন্ধি করে নিলো।

আইনুত তামার

আম্বার ও এর আশেপাশের এলাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবরকান বিন বদরকে নিজের সহকারী করে আম্বারে রেখে গেলেন। তিনি নিজে আইনুত তামারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। এ আইনুত তামার হলো ইরাক আর সিরিয়া মরুভূমির মাঝে মরুভূমির একপ্রান্তে অবস্থিত। আম্বার থেকে আইনুত তামার পৌছুতে তিন দিন লাগলো। ওখানে ইরানী শাসক ছিলেন মিহরান বিন বাহরাস চৌবিন। শহরের হেফাযতের জন্য সে একটি ইরানী বাহিনী এনে

www.pathagar.com

এখানে জমা করে রেখেছিলো। ইরানী বাহিনী ছাড়াও বনী তোগলব, নামার ও আযাদের বেদুঈন জাতিও ওক্কা বিন আবু ওক্কা ও নোদাইলের নেতৃত্বে মেহরানের কাছে জমা ছিলো। আইনুত তামারবাসীরা ইসলামী বাহিনীকে আসতে দেখলে ওক্কা মেহরানকে বললো ঃ

"আরব আরবদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো করে লড়তে জানে। তাই তুমি আমাকে মুসলমানদের সাথে এর মীমাংসা করতে দাও।"

মুচকি হাসি হেসে মেহরান বললো ঃ

"তুমি ঠিকই বলেছো। আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা এমন পারদর্শী, যেমন আমরা অনারবদের সাথে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করো। যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরাও যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যাব।"

ইরানীরা মেহরানের চাল বুঝতে পারেনি। মেহরানের কথাবার্তা হতে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে ভেবে তারা তাকে বকাবকি করলো। মেহরান জবাব দিলো ঃ

"তোমরা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করো না। আমি যা করেছি, তোমাদের কল্যাণের জন্য করেছি। এবার তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য এমন একজন লোক আসছেন তিনি তোমাদের বাদশাহদেরকে হত্যা আর তোমাদের সুলতানদের টুকরা টুকরা করে ছাড়বেন। এই আরবদের দ্বারা আমি তোমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করেছি। যদি এরা খালিদের মুকাবিলায় কামিয়াব হয়ে যায়, তাহলে কামিয়াবীর সুনাম তোমরাই পাবে। কিন্তু যদি পরাজয় বরণ করে, তাহলে আমাদের যৌবনদীপ্তরা রণক্লান্ত ইসলামী বাহিনীকে সহজেই পরাজিত করতে পারবে।"

একথা শুনে ইরানী বাহিনী নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো।

ওক্কা বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পথ বন্ধ করে দিলো। লড়াই শুরু হলো। খালিদ খুব দ্রুত রশি নিক্ষেপ করে ওক্কাকে গ্রেফতার করে ফেললেন। কমাণ্ডারের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো পালাতে লাগলো। পেছন থেকে ধাওয়া করে মুসলমানরা শত শত লোককে গ্রেফতার করে নিলো। অবশ্য হোজাইল সহ বেশ কয়েকজন নেতা পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়।

মেহরান বেশ প্রশান্তির সাথে কিল্লায় অবস্থান করছিলো। তার আশা ছিলো অবশ্যই বেদুঈনরা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করবে। কিন্তু এরূপ দেখে বেশ দুঃখ করলো এবং তার বাহিনী নিয়ে কেল্লা থেকে পালিয়ে গেলো। তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী ও যেসব বেদুঈন ওক্কার বাহিনীতে শামিল ছিলো। পরাজিত হয়ে কিল্লায় আশ্রয় নিলো। তারা ছাড়া তখন ওখানে আর কেউ ছিলো না।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সামনে অগ্রসর হয়ে কিল্লা অবরোধ করে বসলেন। কিছুদিন পর্যন্ত কিল্লাবাসীরা দরযা বন্ধ করে তাদের অবরোধের মুকাবিলা

www.pathagar.com

করতে লাগলো। কিন্তু তারা যখন বুঝলো খালিদের মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। তারা তাদের জীবন ভিক্ষার শর্তে দরযা খুলে দেবার প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু খালিদ নিঃশর্ত দরযা খোলার দাবী জানালেন। অবশেষে তাদেরকে তা মানতেই হলো এবং দরযা খুলে দিলো। সকলকে গ্রেফতার করার জন্য খালিদ রাদিয়াল্লা আনহু আদেশ করলেন। এরপর খোলা ময়দানে ওক্কার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলো।

আম্বার ও আইনুত তামার বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ গানিমাতের রাষ্ট্রীয় অংশ ও বিজয়ের খবর দিয়ে ওয়ালিদ বিন ওকবাকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি মদীনায় পৌছে খালিফাকে সমস্ত খবরাখবর খুলে বললেন। দীর্ঘ এক বছর হলো হিরায় বসে বসে খালিদ কাটিয়েছেন। আইয়াজ দাওমাতুল জুন্দুল থেকে কখন আসবেন তার কোনো হদীস পাওয়া যাচ্ছিলো না। এ অবস্থায় তিনি আর অলস বিমূঢ় বসে থাকা সমীচীন মনে করে নাই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও আইয়াজের এত ধীরগতির জন্য বিরক্ত হলেন। তিনি নিজেও ভেবেছিলেন আইয়াজের কারণে মুসলমানদের সাহস হিম্মত কমে যাচ্ছিলো। শত্রুরা যদি ইরাকে সংঘটিত খালিদের বাহাদুরী ও সাহসিকতার খবর না পেতো, তাহলে তারা আইয়াজের দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানদেরকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতো।

দাওমাতুল জুন্দুল

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদের কাছে ইরাকের সব খবরাখবর পেয়ে খালিদকে আইয়াজের সাহায্যের জন্য দাওমাতুল জুন্দুল যাবার হুকুম দিলেন। ওখানে গিয়ে খালিদ দেখলেন, আইয়াজ বিন গানাম দাওমাতুল জুন্দল অবরোধ করে বসে আছেন। প্রতি উত্তরে দাওমাতুল জুন্দলবাসীরাও আইয়াজকে অবরোধ করে তার সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। ওয়ালিদ আইয়াজের সাথে আলাপ-আলোচনা ও অবস্থার পর্যালোচনা করে বুঝলেন, আইয়াজ ও তার এ বাহিনী দিয়ে দাওমাতুল জুন্দলকে পরাস্ত করতে পারবেন না। আবার ওদিকের অবরোধ থেকে ছুটেও আসতে পারবে না। তাই ওয়ালিদ আইয়াজকে বললেন, অনেক সঠিক ও বুদ্ধিসম্মত একটি ক্ষুদ্র কাজ বিরাট সৈন্য বাহিনী হতেও বেশী কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। আমার কথা যদি শুনেন, তাহলে খালিদের কাছে দূত পাঠিয়ে সাহায্য কামনা করুন।

ওয়ালিদের কথা মানা ছাড়া আইয়াজের আর কোনো গত্যন্তর ছিলো না। এক বছরের অধিক সময় দাওমাতুল জুন্দুলে কাটাচ্ছে অথচ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি খালিদের কাছে দূত পাঠিয়ে সাহায্য চাইলেন। এ সময় খালিদ আইনুত তামারে যুদ্ধ হতে অবসর হয়েছেন। চিঠি পড়ে তিনি আইয়াজের ভীত ও অপ্রস্তুত ভাব বুঝতে পারলেন। তার ভীতি ত্রাস করার জন্য খালিদ তাঁকে লিখলেন ঃ

"খালিদ বিন ওয়ালিদের তরফ থেকে আইয়াজের কাছে প্রেরিত হচ্ছে। আমি খুব দ্রুত তোমার কাছে পৌছছি। তোমার কাছে এমন সব উট আসছে যেগুলোর

www.pathagar.com

উপর বিষাক্ত সাপ আরোহণ করেছে। সেনাবাহিনীর পেছনে সেনাবাহিনী আসছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

আইয়াজের নামে লিখা খালিদের চিঠিতে বুঝা গেছে যে, হিরায় বেকার পড়ে থাকার কারণে খালিদ কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আম্বার ও আইনুত তামারের যুদ্ধও তার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। এ কারণেই আহ্বান পাবার সাথে সাথেই তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওয়াইম বিন কাহিল আসলামীকে আইনুত তামারে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নিজে দাওমাতুল জুন্দলে রওনা হয়ে গেলেন। এ দু'টি জায়গার ব্যবধান ছিলো তিন শত মাইলের। দশ দিনেরও কম সময়ে খালিদ এ পথ অতিক্রম করেন। উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাবার সময়ে মধ্যবর্তী স্থানে সিরিয়া ও নুমুজের ভয়াবহ ধূসর মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়। এসব পথ অতিক্রম করার সময় অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব বিপদাপদকে উপেক্ষা করে সামনে চলতেই থাকলেন। দাওমাতুল জুন্দুলের কাছে পৌঁছলে শহরবাসীরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের সংবাদ শুনতে পেয়ে বড় অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের নেতা ভবিষ্যত কর্মসূচীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করলো।

দাওমাতুল জুন্দুলে এখন এক বছর আগে—আইয়াজের অবরোধ শুরুর প্রথম অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী গোত্র একত্রিত হয়ে পড়েছে। কারণ, 'বনু কালব', 'বহরা' এবং 'গাসআন' গোত্রসহ আরো কয়েকটি গোত্র ইরাক হতে দাওমাতুল জুন্দুলে এসে পৌঁছেছিলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে অনবরত পরাজয় বরণ করে করে সমস্ত প্রতিশোধ আইয়াজ থেকে আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে তারা এখানে এসেছে। প্রতিদিন এদের আগমন আইয়াজকে অস্থির ও অধীর করে তুলেছিলো। এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা তিনি ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

দাওমাতুল জুন্দুলের বাহিনী দু'টো বড় অংশে বিভক্ত ছিলো। একটি অংশের নেতা ছিলেন উকাইদার বিন আবদুল মালিক কুদি। আর দ্বিতীয় অংশের নেতা ছিলেন জুদী বিন হোব্বাইয়া। উকাইদার ছিলেন দাওমাতুল জুন্দুলের হাকিম। সে মদীনার খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তাকে দমন করার জন্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আইয়াজকে পাঠিয়েছিলেন। এখানে একত্রিত গোত্রগুলোর মধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে উকাইদার চেয়ে বেশী কেউ জানতো না। তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা এখনো সে ভুলে যায়নি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে ওফাদারীর অঙ্গীকার নিয়ে মদীনায় তশরীফ নিয়ে এসেছিলেন। আর তার সে কথা আজও স্মরণ আছে যখন রাসূলুল্লাহর নির্দেশানুযায়ী পাঁচ শত আরোহী নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দাওমাতুল জুন্দুলে পৌঁছেছিলেন। এবং তাকে গ্রেফতার করে ধমক দিয়েছিলেন। যদি মুসলমানদের জন্য দাওমাতুল জুন্দুলের দরযা খুলে দেয়া না হয়, তাহলে তার জীবনাবশানের ভয় আছে। তার এও জানা ছিলো যে,

www.pathagar.com

বাধ্য হয়ে অবশেষে তাকে দাওমাতুল জুন্দুলের দরযা খুলে দিতে হয়েছে। এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দু' হাজার উট, আটশ' বকরী, চারশ' ওয়াসক* আটা এবং চারশত দিরহাম দিয়ে সন্ধি করতে হয়েছে। শুধু এটাই যথেষ্ট নয় বরং তাকে খালিদের সাথে মদীনায় আসা, ওখানে ইসলাম গ্রহণ করা এবং রাসূলের সাথে মিত্রতার অঙ্গীকারও করতে হয়েছে। এসব কথা উকাইদার মনে খিলের মত বসে গিয়েছিলো। এ কারণেই সে দাওমাতুল জুন্দলে খালিদের আগমনের সংবাদ শুনে ইরাক থেকে আগমনকারী বেদুঈন গোত্রগুলোর সরদার জুদি বিন রাবিয়ার সাথে দেখা করে বললো ঃ

"তোমাদের তুলনায় আমি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বেশী চিনি ও জানি। বর্তমান বিশ্বে খালিদের মতো ভাগ্যবান পুরুষ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আর কেউ নেই। যে জাতি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করবে তার সৈন্যসংখ্যা যা-ই হোক, সে পরাজিত হবেই। তাই আমার কথা মেনে তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও।"

প্রতিশোধের বহ্নিজ্বালা যাদের মনে প্রজ্বলিত ছিলো, তারা উকাইদার পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। উকাইদা তখন বললো—তোমারা তোমাদের ব্যাপারে বুঝো। তোমাদের সাথে মিলে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে আমি যুদ্ধ করতে তৈরি নই।" একথা বলে উকাইদা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলো।

নিজের মিত্রদের থেকে আলাদা হয়ে উকাইদা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর ক্যাম্পে চলে গেলো। এখানে পৌছে বর্ণনায় মতভেদ সৃষ্টি হয়। কেউ বলেন, উকাউদা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌছলেই তিনি তার শিরচ্ছেদের হুকুম জারী করলেন। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় উকাইদাকে গ্রেফতার করে খালিদ মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ওমরের খেলাফতকালে উকাইদাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। সে মদীনা হতে ইরাক চলে যায়। ওখানে আইনুত তামারের কাছে 'দোমাহ' নামক স্থানে জীবনের শেষ পর্যন্ত বসবাস করতে থাকে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আরো আগে অগ্রসর হয়ে দাওমাতুল জুন্দুলে পৌছলেন। ওখানকার বাহিনী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেক গোত্র গোত্রীয় সরদারের অধীনে ছিলো। আর এসব সরদার জুদী বিন রাবিয়ার অধীনে ছিলো। দাওমাতুল জুন্দুলকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের এবং আইয়াজ বিন গানামের বাহিনীর অবরোধের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলেন। আরব বংশোদ্ভূত যেসব ঈসায়ী দাওমাতুল জুন্দলবাসীদের সাহায্যে ওখানে পৌছেছিলো তারা কিল্লার বাইরে চারিদিকে জমা ছিলো। কিল্লায় তাদের ধারণের কোনো স্থান ছিলো না।

যুদ্ধ শুরু হবার পর জুদি বিন রবিয়া ও ওয়াদিয়া খালিদের মুকাবিলায় এবং ইবনে হাদরজান ও ইবনুল আইহাম আইয়াজের মুকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

* ১ ওয়াসক = ৬০ সা' ১ সা' = ৩.৫০ সের × ৪০০ ওয়াসক = ২১০০ মন আটা।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জুদিকে ও আকরা বিন হারেস ওয়াদিয়াকে গ্রেফতার করে ফেললেন। অন্যান্যরা কিল্লার দিকে পালিয়ে গেলো। কিল্লায় লোক সংকুলানের স্থান ছিলো না। দরযা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো আগেই। তাই বাইরের লোকেরা মুসলমানদের তরবারীর ছায়ায় চলে গেলো। এ অবস্থা দেখে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর বাহিনীর একজন সরদার আসিম বিন ওমর নিজ গোত্র বনু তামিমের কাছে মিত্র গোত্র বনু কালবের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা জানালেন। সাথে সাথে বনু তামিম তাদের নিরাপত্তার জন্য পৌঁছে গেলো। এভাবে বনু কালব গোত্রের জীবন বেঁচে গেলো।

যারা কিল্লার দিকে পালিয়েছিলো খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাদের পিছন থেকে ধাওয়া করে এতো লোককে হত্যা করলেন, যাদের লাশের ভারে কিল্লার দরযা ভেঙ্গে গেলো এবং ভিতরে প্রবেশ করার আর কোনো পথ থাকলো না। তারা জুদি বিন রবিয়া সহ অন্যান্য ধৃত ব্যক্তিদের শিরচ্ছেদ করে ফেললেন। শুধু বনু কলব গোত্রের ধৃত ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা পেলো। কারণ, তাদেরকে আসেম বিন আমের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কিল্লার দরযা উপড়ে ফেলে সেখানে যত লোক অবরুদ্ধ ছিলো সকলকে হত্যা করে দিলেন। বিজয় লাভের পর তিনি আকরা বিন হারেসকে আম্বারে ফিরে যেতে হুকুম দিলেন এবং নিজে দাওমাতুল জুন্দুলে থেকে গেলেন।

প্রশ্ন উঠে, কি কারণে মুসলমানরা দাওমাতুল জুন্দুলের দিকে এতবেশী লক্ষ্যারোপ করলেন। যে কোনো মূল্যে একে বিজয় করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দাওমাতুল জুন্দুলের উপর দু'বার হামলা হলো। অবশেষে ওকাইদার সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দাওমাতুল জুন্দুলকে ইসলামী শাসনের মধ্যে শামিল করা হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানরা এক বছর থেকে একে অবরোধ করে রাখে, যে পর্যন্ত একে পরিপূর্ণ আনুগত্যে এনে দ্বিতীয়বার নিজেদের হুকুমাতের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়েছে।

আসলে দাওমাতুল জুন্দুলের ভৌগলিক অবস্থানই এমন ছিলো। যে কোনো অবস্থায় এর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন ছিলো। একদিকে হিরা ও ইরাক ও অপরদিকে সিরিয়ার দিকে যাবার পথের উৎস মুখে এ দাওমাতুল জুন্দুল অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যাতে রোমক শক্তি এদের অলক্ষ্যে ও অবহেলার সুযোগে আরব ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে। এ জন্যই তিনি দাওমাতুল জুন্দুলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ঠিক একই কারণে এ প্রচেষ্টা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও চালিয়েছেন। তাঁর খেলাফতকালে মুসলিম বাহিনী একদিকে ইরাকে ইরানী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, অপরদিকে তারা সিরিয় সীমান্তে রোমকদের সাথে সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিলেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা খুবই

www.pathagar.com

প্রয়োজন ছিলো। এ একই কারণে আইয়াজ বিন গানাম প্রায় এক বছর পর্যন্ত একে অবরোধ করে রেখেছিলো। যথেষ্ট বিপদ সংকুল অবস্থায় পতিত হয়েও তিনি এখান থেকে সরে যাননি। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দাওমাতুল জুন্দুল যেতে বলা হলে তিনিও কালক্ষেপন না করে সেদিকে রওনা হলেন। আল্লাহ না করুন দাওমাতুল জুন্দুল যদি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে না আসতো, তাহলে শুধু ইরাক বিজয়ই দুরূহ হয়ে পড়তো না ; বরং সিরিয়া বিজয়ও অসম্ভব হয়ে পড়তো।

খালিদের ইরাক প্রত্যাবর্তন

যখন কোনো শক্তিশালী তেজস্বী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব কোথাও আসীন থাকে তখন অধিনস্তদের ভিজা বেড়ালের মতো বসবাস করাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু যখনই সে ব্যক্তি অন্য কোথায়ও চলে যায়, তারা ময়দান খালি পেয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করে দেয়। খালিদের অনুপস্থিতিতে এ অবস্থা হিরা ও ইরাকবাসীদের ব্যাপারেও সংঘটিত হয়েছিলো। ইরানী ও তাদের আরব সহযোগীরা ভেবেছিলো, মুসলমানদের আনুগত্যের বোঝা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে দেবার এটাই উত্তম মুহূর্ত। বনু তোগলুবরা ভাবলো ওক্কার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর আসবে না। যে এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো তা হাতছাড়া না করা ও শত্রুদের আগে অগ্রসর হতে না দেয়ার কর্তব্য সমাপন করা ছাড়া এ অবস্থায় তার পক্ষেও করার আর কিছু ছিলো না। তার দ্বারা খালিদের কর্মসূচী ও রণকৌশল বাস্তবায়ন করা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। আর শত্রুদের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়ই ছিলো তাদের দখলকৃত এলাকায় আঘাতের পর আঘাত হানা এবং তাদেরকে তাদের এলাকায়ই ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখে মুসলমানদের দখলকৃত জায়গাগুলোর দিকে তাদের অগ্রসর হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রাখা।

এদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন ইরানী ও আরব বংশোদ্ভূত ঈসায়ীদের অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি এক মুহূর্ত আর দাওমাতুল জুন্দুলে থাকতে পারলেন না। তাৎক্ষণিকভাবে রওনা করার প্রস্তুতি চালালেন। 'আকরা বিন হারেসকে অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক করে তিনি আইয়াজ বিন মাগজানকে নিয়ে হিরা রওনা হলেন। হিরা পৌঁছেই তিনি এর ভার ছেড়ে দিলেন আইয়াজের হাতে, আর কা'কা'কে পাঠালেন হোসাইদের দিকে। ওখানে তখন হচ্ছিলো আরব ও ইরানীদের সম্মেলন। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শপথ করে বললেন, বনু তোগলুবের উপর এমন অতর্কিত হামলা করা হবে, যা তারা কোনো রকমেই শামলিয়ে উঠবার সময় পাবে না।

ইরাকবাসীরা তাদের দমনের জন্য আবার খালিদ বিন ওয়ালিদের আগমনের খবর শুনে পেরেশান হয়ে উঠলো। তারা নিজেদের এলাকাকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার যে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখছিলো তা এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেলো। তাদের ধারণা ছিলো অন্যান্য জাতির মতো মুসলমানরাও তাদের দেশ লুটতরাজ করে চলে যাবে। পরে তারা তাদের নিজের এলাকা দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

www.pathagar.com

হোসাইদ, খানাফিস ও মুদিহ্র হামলা

খালিদের হুকুম মুতাবিক কা'কা' হোসাইদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ইরানী বাহিনী তার সামনে টিকতে পারলো না। তাদের সিপাহসালার মারা গেলো। বাহিনীর লোকেরা পালিয়ে গিয়ে জীবন বাচানোই মঙ্গল মনে করলো। পরাজিত সৈনিকেরা ভেবেছিলো খানাফিসে আশ্রয় নিতে পারবে। ওখানে আগেই একটি ইরানী বাহিনী ছিলো। তারা এখানেও ব্যর্থ হলো। কারণ, খানাফিসে অবস্থানরত ইরানী বাহিনীর সিপাহসালার মুসলমানদের আগমনের খবর শুনে আগ থেকেই ওখান থেকে পলায়ন করে মুদিহ্ চলে গিয়েছিলো। ওখানকার শাসক ছিলো হোজাইল বিন ইমরান।

এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই খানাফিস দখল হয়ে গেলো। এখন এমন আর কোনো লোক ছিলো না যারা ইরাকী বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৈরি করে যুদ্ধের ময়দানে আনতে পারে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার তাঁর সরদারদেরকে মুদিহ্র দিকে রওনা হবার হুকুম দিলেন। নিজেও ঐদিকেই রওনা হলেন। আগ থেকেই সকল নেতাদেরকে কোন্ রাতে কখন মুদিহ্ পৌছতে হবে তা পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিলো। সুতরাং সকলেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে গেলো। হোজাইল বাহিনী অসতর্ক অবস্থায় শুয়ে ছিলো। মুসলিম বাহিনী তিন দিক থেকে তাদেরকে হামলা করে বসেন। হোজাইল কিছু সঙ্গী-সাথী সহ পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অন্যান্য সৈনিকদের প্রায় সকলেই নিহত হয়। লাশে গোটা ময়দান ভরে গেছে। মনে হচ্ছে যেন বকরী যবেহ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

এ যুদ্ধে দু'জন মুসলমানও ইসলামী বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। এ দু'জন মুদিহতেই বাস করতেন। এদের কাছে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দানকৃত একটি 'সাদাকাত নামাও' বিদ্যমান ছিলো। এদের মৃত্যুর খবর শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'জনেরই রক্ত মূল্য আদায় করে দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদের এ কাজের শাস্তির জন্য জিদ ধরে বসলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যে মুসলমান শত্রুর দেশে শত্রুর সাথে বসবাস করে তাদের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

মুদিহ্র যুদ্ধ হতে আসার পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের শপথ পূরণ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তার দু'জন সরদার কা'কা' ও আবু লায়লাকে বনু তোগলুবের বস্তির দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও তাদের পেছনে রওনা হলেন। মুদিহ্র যুদ্ধের মতোই এ যুদ্ধেরও পরিকল্পনা বানানো হয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সাথীদের সাথে নিয়ে দুশমনদের উপর তিন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। এতে বনী তোগলুবের একজন পুরুষও জীবিত ছিলো না। নারীদেরকে গ্রেফতার করা হলো। বিজয়ের পরে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নোমান বিন আওফ শায়বানীর মাধ্যমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে গানিমাতের এক-

www.pathagar.com

পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দিলেন। এসব কয়েদীদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাবিহা বিনতে রবিয়া বিন বুখায়রকে খরিদ করে নেন। সেই ঘরে ওমর ও রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ফারাজ বিজয়

খালিদের এ আকস্মিক হামলা ও এর মুকাবিলায় গোত্রগুলোর অসতর্কতার খবর ইরাকে ছড়িয়ে পড়লো। এতে মরু অঞ্চলে বসবাসকারী সব গোত্রগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারা আত্মসমর্পণ করে মুসলমানদের আনুগত্য করাকেই কল্যাণ মনে করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সামরিক বাহিনী নিয়ে ফোরাত নদীর উপকূল বয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, ওখানকার বাসীন্দারা সন্ধি করে তার আনুগত্য মেনে নিতো। অবশেষে তিনি ফারাজ পৌছে গেলেন। এখানে ইরাক, সিরিয়া ও আলজাজিরার সীমান্ত এসে মিলেছে। ইরাক ও সিরিয়ার শেষ উত্তর সীমান্তে ফারাজ অবস্থিত। যদি আইয়াজ বিন গানামের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো ও প্রথম দিকেই তিনি দাওমাতুল জুন্দুল বিজয় করে ফেলতে পারতেন তাহলে খালিদকে হয়তো এতদূর পর্যন্ত আসতে হতো না। কেননা গোটা ইরাক ও সিরিয়া বিজয় করা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা ছিলো না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, এ দু'টো দেশের আরব সীমান্তে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃংখলা বিরাজ করুক। সবদিক হতে যেনো ইরানী ও রোমক শক্তি মুসলমানদের উপর আরবে এসে হামলা করতে না পারে। কিন্তু এ দু'টো দেশ পরিপূর্ণভাবে মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসা ছিলো আল্লাহর মেহেরবাণী। এ জন্য বিজয়ের এমন উপায় তিনি সৃষ্টি করে দিলেন যাকে খালিদ উপলক্ষ্য করে ইরাকী গোত্রগুলোকে অনুগত করার জন্য শেষ উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত চলে যান। এভাবে মুসলমানদের জন্য উপর দিক থেকে সিরিয়ার উপর হামলা করার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলো। ঠিক এভাবে ইরান সীমান্তসমূহ হতে রোমকদের উপর আক্রমণ করার পথও খুলে গেলো। ইরান সীমান্তসমূহ থেকে রোমকদের উপর আক্রমণের পথ সৃষ্টি হওয়াটা ছিলো এমন এক অলৌকিক ব্যাপার যা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিত্বের মাথায় আসেনি। আর এতোসব বিস্ময়কর কার্যক্রম এমন আল্লাহর সৈনিকের হাতে সমাপন হয়েছে যার মত বীর পুরুষ জন্মানো আরব ও অনারব নারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পূর্ণ এক মাস ফারাজে অবস্থান করতে হয়েছে। এখানেও তিনি যে দুঃসাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। চারিদিক থেকে তিনি শত্রু বেষ্টিত ছিলেন। পূর্বদিকে ছিলো ইরান। তারা ছিলো খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্ত পিপাসু শত্রু। পশ্চিম দিকে ছিলো রোমক সাম্রাজ্য। তাদের ধারণা ছিলো এ সময়ে যদি তারা খালিদ ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে না পারে, তাহলে তাদের বিজয়ের এ প্লাবন থামিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। রোমক শক্তি আর মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান ছিলো ফোরাত নদী। তাছাড়াও চারিদিকে ছিলো বেদুঈন বাসস্থান। যাদের বড় বড় সরদারকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে ফেলার কারণে তাদের মনে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা

www.pathagar.com

অনির্বাণ ছিলো। এসব নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কেও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অনবহিত ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করলে হিরায় ফিরে এসে তার শক্তি-সামর্থ আরো বৃদ্ধি করে রোমক শক্তির মুকাবিলায় রওনা হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, শত্রুসেনা তার দৃষ্টিগোচর হলে ধৈর্যের বাঁধ তাঁর টুটে যেতো। তাঁর দৃষ্টিতে ইরানী আর রোমী বা বেদুঈন জাতি ছিলো খুবই নগণ্য। তাদের বিরাট সামরিক শক্তিকে তিনি আগেও কোনো দিন গুণেননি। আর ভবিষ্যতেও গণনার কোনো কারণ ঘটবে বলে তিনি মনে করেন না। তাই নিবিষ্ট ও নিশ্চিন্ত মনে তিনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

এদিকে রোমকগণ সরাসরি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কোনো মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়নি। তারা খালিদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। ইসলামী বাহিনী 'ফরাজে' একত্রিত হয়ে এক মাস পর্যন্ত তাদের সামনে তাবু গেড়ে থাকলো। এতে রোমক বাহিনীর উৎসাহ বেড়ে গেলো। তারা তাদের নিকটবর্তী ইরানী ঘাঁটিগুলো হতে সাহায্য প্রার্থনা করলো। ইরানীরা সানন্দে রোমক বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসলো। মুসলমানদের হাতে তারা ইতিপূর্বেই নাজেহাল হয়ে পড়েছিলো। মুসলমানরা তাদের শৌর্যবীর্য বিনষ্ট করে দিয়েছিলো। ইরানীরা ছাড়াও বনু তোগলুব, আয়াদ ও নমরের আরব বংশোদ্ভূত গোত্রগুলোতে রোমক সাম্রাজ্যের পুরোপুরি মদদ করেছে। কেননা তারা মুসলমানদের হাতে নিহত তাদের নেতৃবৃন্দ ও সিপাহসালাদের বিয়োগ ব্যথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সুতরাং রোম, ইরান ও আরব বংশোদ্ভূত গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ার জন্য রওনা হলো। ফোরাত নদীর কাছে পৌঁছে তারা মুসলমানদেরকে বলে পাঠালো ঃ

"তোমরা নদী অতিক্রম করে আমাদের দিকে আসবে, অথবা আমরা তা অতিক্রম করে তোমাদের দিকে আসবো ?"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তরে বললেন ঃ

"তোমরাই আমাদের দিকে আসো।"

সুতরাং শত্রুপক্ষ নদী পার হয়ে অপর পাড়ে আসতে শুরু করে। এ সুযোগে হযরত খালিদ তার বাহিনীকে সুন্দর করে পুনর্গঠিত করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার সময় হলে রোমক বাহিনীর সিপাহসালার বাহিনীর সকল গোত্রকে-প্রত্যেকের শৌর্যবীর্যের পরীক্ষার জন্য পৃথক পৃথক হয়ে যাবার নির্দেশ জারী করলো। সুতরাং সকলেই আলাদা হয়ে গেলো। যুদ্ধ শুরু হলে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শত্রু পক্ষকে ঘিরে ফেলে তাদেরকে এক জায়গায় একত্র করে উপর্যপুরি হামলা করে বেসামাল করে দেবার জন্য তার বাহিনীকে হুকুম দিলেন। যেমনি হুকুম তেমনি কাজ। মুসলিম বাহিনী রোমক বাহিনীকে চারিদিক থেকে ঘিরে এক জায়গায় একত্রিত করে তাদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালালেন। রোমক বাহিনী ও তাদের মিত্রপক্ষের ধারণা ছিলো তারা পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের

www.pathagar.com

মুকাবিলায় পাঠিয়ে যুদ্ধে অনেক সময় ক্ষেপণ করতে পারবে। মুসলমানরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের উপর পরিপূর্ণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু তাদের এ খেয়াল ছিলো ভুল। আর তাদের এ কৌশলও পরিশেষে তাদেরই বিরুদ্ধে কাজ করেছে। মুসলমানরা তাদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে হামলা শুরু করলে তারা এর তীব্রতা সহ্য করতে পারেনি। সহসাই পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে শুরু করলো। কিন্তু মুসলমানরা ছাড়বার পাত্র নয়। পেছন থেকে ধাওয়া করে হত্যা করতে করতে তারা তাদেরকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গেলো।

ইতিহাসবিদগণ এ ঘটনায় একমত। এ যুদ্ধে ও যুদ্ধের পরে পলায়নপর অবস্থায় শত্রুদের প্রায় এক লাখ সৈন্য নিহত হয়।

বিজয়ের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফারানে দশ দিন অবস্থান গ্রহণ করেন। ১২ হিজরীর ২৫ জিলকাদা খালিদ তার বাহিনীসহ হিরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খালিদের গোপন হজ্জ

ইয়ামামায় খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগীদের ফেতনা সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। ইরাকও তাঁর দ্বারাই বিজিত হয়েছে। তাঁর হাতেই কেসরার ক্ষমতার মসনদ ধ্বসে পড়েছে। ফারাজ বিজয়ের মাধ্যমে রোম সুলতানাতে অগ্রাভিযানের পথ সুগম হয়েছে। আর এসবই ছিলো আল্লাহ পাকের অসীম কৃপা। তা না হলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো লোকের এতোবড় বিজয়লাভের ও ইরানের মতো শক্তিকে পদানত করার কি শক্তি ছিলো? আল্লাহর এতোসব রহমত ও করুণার কথা মনে হলে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন শোকরগুজারীর আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরে আসতো। শোকর আদায়ের এ আবেগ উচ্ছ্বাসই হযরত খালিদকে ফারাজের যুদ্ধ হতে অবসর হবার পর বাইতুল্লাহর হজ্জের ফরয আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ফরাজে দশদিন অতিবাহিত করার পর এ সময়টুকু আবেগ-উচ্ছ্বাসের এ আগুনকে এতোবেশী প্রজ্জ্বলিত করে তুললো যে, কোনো শক্তিই তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। তিনি জানতেন তাঁর অবর্তমানে ইরাক মুসলমানদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার অনুপস্থিতির সুযোগে ইরানীরা এ এলাকায় আবার ফেতনা-ফাসাদের আগুন ছড়াতে পারে। কিন্তু তারপরও হজ্জের তুলনায় এসব বিপদ-আপদের সম্ভাবনাকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন।

যদি শত্রু পক্ষ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুপস্থিতির কথা জানতো তাহলে তারা এ সুযোগে মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করার সুবর্ণ সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করতো না। এ বিপদের ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য এভাবে গোপনে হজ্জব্রত পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। শুধু মুষ্টিমেয় বিশেষ সমর নেতা ছাড়া সামরিক বাহিনীর কোনো সাধারণ সিপাহীও জানতো না তাদের সিপাহসালার তাদের মধ্যে নেই। হজ্জ পালনের জন্য খলিফাতুল মুসলিমিন থেকেও অনুমতি প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু খলিফা থেকে অনুমতি পেলেও এ খবর গোটা সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা ছিলো, তিনি হজ্জে যাচ্ছেন। আর তার

www.pathagar.com

রওনা হবার সাথে সাথে পেছন থেকে ইরান বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসতো। যদি তা-ই হতো তাহলে মুসলমানদের উপর মস্তবড় বিপদ আপতিত হতো। তখন হজ্জের কি মূল্য হতো ? আর যদি খলিফার কাছ থেকে হজ্জে গমনের অনুমতি পাওয়া না যেতো, তাহলে হজ্জ পালনের জন্য যে দাবদাহ তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো তা ঠাণ্ডা করার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যেতো না। তাই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সঙ্গোপনে হজ্জ পালন করার পথ বেঁচে নেয়াই সমীচীন বলে মনে করলেন—হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সামরিক বাহিনীর কোনো ব্যক্তিই যেনো এ খবর জানতে না পারেন। সে ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, বিনানুমতিতে হজ্জ পালনের জন্য যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেন, তাহলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওজর পেশ করে তাঁকে রাজী করিয়ে নিতে পারবেন। আর আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে হজ্জের সওয়াব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না।

বাহিনীকে হিরার দিকে রওনা হবার হুকুম দিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে পশ্চাৎ বাহিনীর সাথে সাথে আসছেন এভাব প্রকাশ করে গোপনে হজ্জ পালনে মক্কা মোয়াজ্জমায় রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আরো কিছু লোকও ছিলো। তারা শহর ও গ্রাম হতে বেশ দূরত্ব রেখে সোজা মক্কার দিকে রওনা হয়েছেন। এ পথ ছিলো খুবই কষ্টকর ও বন্ধুর। কোনো পথপ্রদর্শক ছিলো না। কিন্তু যৌবনকালে যেহেতু ব্যবসার জন্য দেশে দেশে তাঁকে ফিরতে হয়েছে এবং সিপাহসালার হিসাবে গোটা মরুভূমি এলাকা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই তিনি এসব এলাকার সব মাঠ-ঘাট, টিলা পথ মোটকথা প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই হজ্জ ভ্রমণ পথে তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। হজ্জের আগেই তিনি মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছে গিয়েছেন। হজ্জের সকল আরকান পালন করে তিনি কর্মস্থলে ফিরে এলেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, মক্কায় অবস্থানকালীন সময় কেউই তাঁর ওখানে যাবার কথা জানতে পারেনি। এমন কি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও কোনো কোনো বর্ণনামতে এ বছর হজ্জের সময় মক্কায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু জানতে পারেননি।

মক্কা হতে ফিরার সময়েও তিনি সেসব বন্ধুর ও কঠিন পথই অবলম্বন করেন যে পথে মক্কায় গমন করেছিলেন। হিরায় পাঠানো বাহিনী এখনো ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। এ সময় তিনি ফিরে এসে পশ্চাৎ বাহিনীর সাথে যোগ দিলেন। এবং তাদের সাথে একত্রে শহরে প্রবেশ করলেন। এভাবে তাঁর বাহিনীর কোনো সৈনিক এবং ইরাকের কোনো ব্যক্তিই জানতে পারেনি, এ নাজুক পরিস্থিতিতে তাদের সিপাহসালারে আজম খালিদ বিন ওয়ালিদ তাদের সাথে ছিলেন না। তিনি ছিলেন সে সময় হজ্জব্রত পালনে মক্কায়।

হিরায় অবস্থানের অবশিষ্ট দিনগুলো তিনি অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে অতিবাহিত করেন। একদিকে তিনি নির্বিঘ্নে হজ্জ পালন করতে সক্ষম হয়েছেন, অপর দিকে

www.pathagar.com

ইরাকে তার বিজয় অভিযান পরিপূর্ণতায় পৌছেছে। এখন তাঁর লক্ষ্যস্থল হলো ইরানের রাজধানী মাদায়েন। কিন্তু ফারাজের সফল অভিযান পরিচালনা করে তিনি বিজয়ের যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তা পরিপূর্ণতায় পৌছানো এবং এভাবে ইরানের[১] মত রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের সাফল্য অর্জন করা আল্লাহর মঞ্জুর। কোনো কোনো ইতিহাসে উল্লেখ আছে, যে বছর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জে গিয়েছেন সে বছর আমীরুল হজ্জ ছিলেন হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের খেলাফত কালে কখনো হজ্জ করেননি। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বছর আমীরুল হজ্জ হিসাবে ছিলেন—এ বর্ণনাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। বর্ণনা যেটিই সত্য হোক সর্বাবস্থায়ই খালিদের হিরায় ফিরে যাবার আগ পর্যন্ত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সিপাহসালারের হজ্জে আগমনের কথা কিছুই জানতেন না।

---

১. ইরাক বিজয়ের ব্যাপারে হিরার বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস বেত্তাগণ একমত। কোনো কোনো বর্ণনায় কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনার ক্রমিক ধারা ও ফলাফল সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। হিরা বিজয় সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে মতভেদ আছে। আম্বার, আইনুত তামার, ফারাজের যুদ্ধের ব্যাপারে আমি যা কিছু বলেছি সে ব্যাপারে তাবারী, ইবনে কাসির, ইবনে খালদুন একমত। কিন্তু বালাজুরী, ইজদি ওয়াকেদী একমত নন। তারা ফারাজের যুদ্ধের কথা মোটেও উল্লেখ করেন না। আম্বার ও আইনুত তামার সম্পর্কে তারা বলেন—এসব তখন ঘটেছে যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদকে সিরিয়ার সিপাহসালার করে পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

১৩

সিরিয়ায় হামলার কারণ

রোমকদের উদ্বিগ্নতা

ইরাক ভূখণ্ডে খালেদ বিন ওয়ালিদ যে বিরাট কৃতিত্ব আনজাম দিয়েছিলেন। যেভাবে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ইরানী দুর্ধর্ষ বাহিনীকে পরাস্ত করে দিয়েছেন, তার কাহিনী প্রতিবেশী দেশের প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত বলাবলি করতো। এসব খবরে রোমক সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসকবর্গ সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। কারণ, তাদের অবস্থাও ইরান সাম্রাজ্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিলো না। ইরাক সীমান্তে যেভাবে 'লাখম' বনু তোগলুব, আয়াদ এবং নায়ার ইত্যাদি আরব বংশোদ্ভূত গোত্র অবস্থিত ছিলো তেমনি সিরিয় সীমান্তেও বনু বকর, বনু আজরাহ, বনু ওদওয়ান, বনু বাহরাহ এবং গাসসানি গোত্রগুলো বসবাস করতো। রোমক শাসকদের ধারণা ছিলো, ইরাকে উপর্যুপরি আক্রমণ পরিচালনা করে যেভাবে মুসলমানরা তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ভুক্ত করে নিয়েছেন, তেমনি সিরিয়ার উপর হামলা পরিচালনা করেও তারা তাদের দখলে নিয়ে নেবার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবেন। এজন্যই তারা আরব সংলগ্ন সিরিয়া সীমান্তকে মযবুত করার প্রতি তাদের পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ সীমান্ত এলাকা মযবুত হলে মুসলমানদের অগ্রাভিযানকে প্রাথমিক অবস্থায়ই প্রতিরোধ করে রোম সাম্রাজ্যকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময় ও লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আরব হতে বিতাড়িত ইহুদী ও খৃষ্টানদের উসকানীতে রোম সাম্রাজ্যের তরফ থেকে আক্রমণের ভয়ে সিরিয় সংলগ্ন যে আরব সীমান্তকে তিনি নিরাপদ ও মযবুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে অবস্থার কি নতুন মোড় সৃষ্টি হলো ; সে সীমান্তকেই মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আজ রোমক সম্রাটগণ প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সিরিয়া ও রোমের হিরাকলের এ মনোভাব সম্পর্কে পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল ছিলেন। এ ব্যাপারে মাথাও ঘামাতেন। কিন্তু ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সিরিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। কারণ, ধর্মত্যাগের কলহ পরিপূর্ণভাবে শেষ হবার আগেই মুসলিম বাহিনীকে সিরিয় সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিলে ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে অনুগামী করা ধর্মত্যাগী গোত্রগুলো এখানে মুসলিম বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে পুনরায় ব্যাপক হারে বিদ্রোহ করে বসার আশংকা ছিলো। পরে মুসান্না বিন হারেসার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মুসলমানরা ইরাকে বিজয় লাভ করতে শুরু করলে এবং ইরানী সুলতানাতে প্রবেশ করে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু লাখমীদের রাজধানী হিরায় ইসলামী

www.pathagar.com

পতাকা উড্ডিন করলে সিরিয়ার কথাও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে পড়লো। উপরেই বলা হয়েছিলো যে, ইরাকের মতো সিরিয় সীমান্তেও অনেক আরব গোত্র বসবাস করতো এবং যেভাবে ইরাকের কিছু কিছু আরব গোত্র ঈসায়ী ধর্মে কায়েম থেকেও মুসলমানদের সাথে মিলে কেসরার বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলো, ঠিক এভাবে সিরিয়ার আরব গোত্রগুলোর ব্যাপারেও আশা করা হচ্ছিলো, তারা মুসলমানদের সাথে থাকবে। কেননা রোমকরা ছিলো শাসক আর সিরিয়াবাসীরা ছিলো শাসিত। শাসক শাসিতের মধ্যে সুপ্ত ঘৃণা-বিদ্বেষ সম্পর্কে সকলেই অবহিত। তাছাড়াও ইরান ও ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোর মতো রোমকগণও সিরিয় সীমান্তে বসবাসকারী আরব বেদুঈনগণের মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। এসব কারণে মুসলমানরা আশা করেছিলো, সিরিয় সীমান্তে অগ্রসর হয়ে রোমক শক্তিকে পরাজিত করতে পারলে সিরিয় আরবগণ স্বদেশীয় আরবদের সাথে এসে যোগ দেবে। ফলে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। রোমীয়দের উপর পরিপূর্ণভাবে বিজয় লাভ করে এ সুফলা ভূখণ্ডকে দখল করে নিতে পারবেন।

রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা করার ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে ইতস্ততভাব ও উদ্বিগ্নতা ছিলো, দাওমাতুল জুন্দুলের বিজয় ও মুসলমানদের জন্য এর দরযা খুলে যাবার পর তা শেষ হয়ে যায়। তারপরও যেহেতু এখনো ইরাকে যুদ্ধ চলছিলো তাই রোমীয়দের উপর তাৎক্ষণিকভাবে হামলা করা সমীচীন মনে করা হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয় সীমান্তে বসবাসরত মুসলমান শাসকদেরকে সুস্পষ্টভাবে হেদায়াত দিয়েছিলেন রোমীয় সীমান্তে আগে হামলা না করে বসতে। আর যে পর্যন্ত রোমীয়দের তরফ থেকে হামলা শুরু না হবে, আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেতে এবং তাদের নিজেদেরকে রোমকদের শত্রুতা ক্রয় করা থেকে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাতে। এদিকে যেহেতু মুসলমানদের বিজয়ের সব অবস্থা রোমকগণের জানা ছিলো তাই তারাও সিরিয় সীমান্ত পার হয়ে ইসলামী বাহিনীর উপর হামলা পরিচালনা করতে দ্বিধাবোধ করছিলো। তাই তারা তাদের সীমানায়ই ঘাঁটি বানিয়ে অবস্থান করছিলো। এভাবে উভয় পক্ষের মনেই তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে প্রথম প্রথম ভয়ভীতি বিরাজিত ছিলো। উভয় পক্ষই যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে ইতস্তত করছিলো।

রোমক সাম্রাজ্য মুসলিম বাহিনীকে ভয় করতো। কারণ, তারা দেখেছে, আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াতের পর মুসলমানরা আরবের উত্তর সীমান্তের ধর্মত্যাগীদের দমন করে ফেলেছে। সীমান্ত এলাকাকে মযবুত করার জন্য যে বাহিনী পাঠানো হয়েছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করেছে। কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই তারা কামিয়াব হয়ে ফিরে এসেছে। সকল গোত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমানদের আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছে। দাওমাতুল জুন্দুল ছাড়া আর সব এলাকা মুসলমানদের দখলে এসে গেছে। ফিলিস্তিন ও সিরিয় সীমান্তে বসবাসকারী আরবদের নিয়ে যে

www.pathagar.com

বাহিনী সিরিয় সীমান্তে মযবুত ছিলো তাদেরকে রোমীয়রা কোনোভাবেই আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারছিলো না। এরা মুসলমানদের সাথে মিশে যাবে —এ ভয় তাদের সবসময়ই ছিলো।

সিরিয়ার সীমান্তে ইসলামী বাহিনীর সরদার ছিলেন খালিদ বিন সাঈদ বিন আস। প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফার এ ইচ্ছার বিরোধিতা করেন এবং তা না করার জন্য জিদ ধরেন। অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মুরতাদদের মুকাবিলায় না পাঠিয়ে তাইমার সাহায্যকারী বাহিনীর আমীর বানিয়ে সিরিয় সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিলো, খলিফার কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট আদেশ না আসা পর্যন্ত যেনো নিজের অবস্থান ছেড়ে সরে না দাঁড়ায়। আর শত্রুপক্ষ প্রথমে হামলা না করলে যেনো তিনি শত্রুর সাথে যুদ্ধ শুরু করে না দেন। ধর্মত্যাগী গোত্রগুলো ছাড়া আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোকে তার সাথে মিশিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অবশ্যই চালাবে।

উভয় পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি

খালিদ বিন সাঈদ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ হুবহু পালন করে চলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই তার পতাকাতলে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে উঠে। হেরাকল তারই সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের বিরাট বাহিনী গড়ে উঠার সংবাদ পেয়ে সে নিজেও পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে সমর প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। হিরাকলের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর জানিয়ে খালিদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে রোম সীমান্তে আক্রমণ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠালেন। তা না হলে তারা আকস্মিকভাবে মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের পরাস্ত করে দিতে পারে। খালিদ বিন সাঈদের চিঠি পেয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেন। দক্ষিণে আরব থেকে আসা খবরগুলো ছিলো উৎসাহব্যঞ্জক। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব এলাকার ধর্মত্যাগীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেন রেখে ইকরামা নিজ বাহিনী নিয়ে ফিরে আসছিলেন। এ বাহিনী ফিরে আসলে সিরিয়ায় অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীকে সমর সাহায্য পাঠানো ছিলো বেশ সহজ। কিন্তু প্রশ্ন ছিলো, যে বাহিনী রোমীয় দুর্ধর্ষ বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম তাদের দ্বারা কি এত বিরাট বাহিনীর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়া যথেষ্ট ছিলো? তাদের সমর সরঞ্জাম ছিলো প্রচুর এবং কিছুদিন আগে হিরাকলে তার সমর সম্ভার ও সৈনিক সংখ্যার আধিক্যের কারণে ইরানের বিরাট বাহিনীকেও পরাস্ত করে দিয়েছিলো। এ সংকট হতে উদ্ধার পাবার জন্য প্রয়োজন ছিলো ইসলামের উপর অটল থাকা দক্ষিণ আরবের গোত্রগুলোকে সাথে মিলিয়ে নিয়ে তাদেরকেও ইসলামী বাহিনীর সাথে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া। তাহলেই রোমক বাহিনীর সাথে ইসলামী বাহিনী টিকে থাকার আশা পোষণ করতে পারে।

www.pathagar.com

খুব গভীর চিন্তা-ভাবনার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জোবায়ের, আবদুর রহমান বিন আওফ, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা বিন জাররাহ, মুয়াজ বিন জাবাল, উবাই বিন কায়াব, যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সকল বড় বড় মুহাজির ও আনসারদেরকে তলব করে আনলেন। তাদের সম্মুখে ব্যাপারটি পেশ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ছিলো আরববাসীদেরকে সিরিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে সবরকমে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার সব বাস্তবায়নের সুযোগ পাবার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এখন আপনারা সকলে অবগত হয়েছেন, বাদশাহ হিরাকলে আমাদের মুকাবিলা করার জন্য বিরাট সামরিক বাহিনী একত্রিত করেছে। আমার মতে এ সংকটের মুকাবিলা করার জন্য পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আমাদের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। রোমীয়দের সাথে মুকাবিলা করার জন্য আমাদেরকেও অধিক সংখ্যক সেনা সিরিয়ায় পাঠাতে হবে। যিনি মারা যাবেন শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। আর যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন তিনি গাজী হবেন। আর আল্লাহর দরবারে তার জন্য যে সওয়াব লিখা হবে তার কোনো সীমা সংখ্যা থাকবে না। এখন আপনারা পরামর্শ দিন এ পরিস্থিতিতে আমাদের কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের পর সর্বপ্রথম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ ! আমরা যে নেক কাজেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি তাতে সকলের আগে আপনাকে পেয়েছি। আপনি যা বলেন এতে আর কারো কোনো কথা থাকে না। মনে হচ্ছে আমাদের সিরিয়া বিজয় করে নেয়া আল্লাহ তায়ালারও অভিপ্রায়। আপনি নিসন্দেহে অধিক সংখ্যক লোক সিরিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীনের মদদগার। তিনি নিশ্চয়ই ইসলামের শান-শওকত বাড়াবেন। এর উন্নতির জন্য যে ওয়াদা তিনি তাঁর রাসূলের সাথে করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন।"

হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের মধ্যে সতর্কতার লক্ষণ ছিলো বেশী। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও বললেন ঃ

"হে খলিফাতুর রাসূল ! এ ব্যাপারে আরো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। রোমক সাম্রাজ্য আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। প্রথম চোটেই গোটা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে এদেরকে অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিসম্মত হবে না। আমার মতে রোমীয়দের উপর পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে আক্রমণ করার পরিবর্তে প্রথম প্রথম ছোট দল পাঠিয়ে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালানো হোক। তাদের কিছু কিছু ক্ষতিসাধন করে তারা ফিরে আসুক। এরপর

www.pathagar.com

আবার কিছু ছোট ছোট বাহিনী পাঠিয়ে আগের মতো আক্রমণ চালিয়ে সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তারা আবার ফিরে আসুক। এভাবে কিছুদিনের বিরতির পর আবার ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক। এর ফলে একদিকে সিরিয়াবাসীরা আমাদের ধারাবাহিক আক্রমণের কারণে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। অপরদিকে আমাদের বাহিনীকে বার বার রোমীয়দের ক্ষতিসাধন করে সকল গানিমাতের মাল নিয়ে ফিরে আসতে দেখে আরবীয়দের শক্তি ও হিম্মত বেড়ে যাবে। এতে রোমীয়দের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার সাহস তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এরপর অতি সহজে ইয়েমেন, রবিয়া ও মুদারকে একত্রিত করে রোমীয়দের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এটা আপনার মর্জির উপর নির্ভর করবে। আপনি ইচ্ছা করলে সকলকে সাথে নিয়ে নিজে রওনা হয়ে যেতে পারেন অথবা আপনার তরফ থেকে কাউকে নেতা নির্বাচিত করে পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের বক্তব্যের পর সকলে নীরব হয়ে গেলো। বেশ কিছু সময় এভাবে খামুশ কাটাবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"এখন আপনারা যারা অবশিষ্ট আছেন, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।"

এবার হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেনঃ

"বর্তমানে আপনিই মুসলমানদের বড় মরুব্বি ও শুভাকাংখী এবং দীনের মুহাফেজ। আপনি যদি মুসলমানদের কল্যাণের দিক চিন্তা করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে ফলাফল যাই ঘটুক, তা বাস্তবায়নের আদেশ আপনি ঘোষণা করে দিন। কেউই আপনার বিরোধিতা করবে না।"

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের পর সম্মেলনে উপস্থিত সকল ব্যক্তিই তার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন ঃ

"হে খলিফাতুর রাসূল! আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমরা আমাদের হৃদয় ও জীবন দিয়ে আপনার হুকুম পালন করবো। আর আপনি আমাদের প্রতি যে নির্দেশ দেবেন তা-ই আমরা গ্রহণ করবো।"

এসব বক্তব্য শুনে এবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি নেবার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"আমি তোমাদের জন্য কয়েকজন আমীর নিযুক্ত করছি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করবে এবং আমীরের বিরোধিতা করবে না। তোমাদের নিয়াত এবং সিরাত পাক ও পবিত্র হওয়া দরকার। কেননা আল্লাহ ঐসব লোকদের সাথে আছেন যারা আল্লাহভীরু।"

www.pathagar.com

মানুষের মনে রোমক সাম্রাজ্যের এত ভয়-ভীতি বিরাজিত ছিলো যে, খলিফার হুকুম শুনে তারা কিছুক্ষণ বেশ চুপ হয়েছিলো। অবশেষে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিরবতা ভঙ্গ করে গর্জে উঠে বললেন ঃ

"হে মুসলমানেরা ! তোমাদের কি হলো ? তোমরা কেন খলিফার কথার উত্তর দিচ্ছো না। অথচ তাঁর প্রস্তাবে তোমাদের জন্য শুধু কল্যাণই নিহিত রয়েছে।"

হযরত ওমরের গর্জন উপস্থিত লোকজনের মনে তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার লাভ করলো। তারা সকলে সিরিয়া অভিযানে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।[১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যস্ততা ও দায়িত্ব

অন্যান্য ব্যাপারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়া অভিযান পরিচালনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জারির বিন আবদুল্লাহ ছিলেন খালিদ বিন সাঈদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে সিরিয়া হতে মদীনা এসে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে কিছু দাবী-দাওয়া পেশ করেন। এতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাগ হলেন। তিনি বললেন ঃ

"তোমাদের জানা আছে মুসলমানরা এ সময়ে ইরান ও রোমে দু'টি সিংহের মুকাবিলায় লিপ্ত। এ সময় তোমরা দাবী-দাওয়া আদায়ের পেছনে লেগে আছো। তুমি এখনি ইরাকের দিকে রওনা হয়ে যাও। ওখানে পৌছে খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে যোগদান করো। অন্য কোনো সময় এসব দাবী পেশ করার জন্য এখন মুলতবী রাখো।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর আদেশানুযায়ী জারির হিরা চলে গেলেন। সে সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ ওখানে অবস্থান করছিলেন।

খেলাফতের প্রথম থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ঝুঁকি পোহাতে হয়েছে। ধীরে ধীরে এ যুদ্ধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এজন্য তাঁর অধিকাংশ সময়ই এসব সমস্যা সমাধানে এবং এসব ঘাটতি পূরণে কাটাতে হয়েছে। কোনো সময় ইরাকে ছড়িয়ে থাকা বাহিনীর ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা। কখনো তাদেরকে সাহায্য পাঠাবার চিন্তা-ভাবনা, কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ছেড়ে যাওয়া পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেয়া, অভাব- অনটনের ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইত্যাকার কঠোর কাজে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ব্যস্ত থাকতে হতো। কখনো তাঁর মনে পড়তো উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর কথা। হুকুমাতের সাথে তাদের কৃত ওয়াদা রাজধানীর সাথে তাদের বাহ্যিক সহজ-সরল সম্পর্ক তো আবার সন্দেহযুক্ত নয়। কখনো কখনো বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানের বিজয়ের সংবাদ এসে মনের

---

১. ইজদি লিখেন, খালিদ বিন সাঈদ এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনিই সকলের আগে যুদ্ধে যাবার মত দিয়েছেন। কিন্তু তাবারী, ইবনে খালদুন এবং ইবনে আসীর তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে এ বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। আমরাও তাবারীর বর্ণনাকে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করছি, খালিদ এ সময়ে তিমাতে অবস্থান করছিলেন। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না।

www.pathagar.com

কোণে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে তুলতো। আবার কখনো কোনো কোনো সময় নেতার অদূরদর্শিতা ও নিরুৎসাহিতার খবর এসে মন-মগজে চিন্তার উদ্রেক হতো। প্রতিটি খবরের ব্যাপারে ভাবতে হতো, এ খবর মানুষের কাছে প্রকাশ করা যাবে কি না। প্রকাশ করলেও কিভাবে করতে হবে। মোটকথা দিন-রাতই তিনি এসব চিন্তা-ভাবনার মাঝে মগ্ন থাকতেন। প্রত্যেকটি কঠিন কঠিন ব্যাপারকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাধানে নিমগ্ন থাকতে হতো তাঁকে। যদিও তাঁর পরামর্শদাতারা অভিজ্ঞ, সরল প্রাণ এবং প্রতিটি ব্যাপারে গভীর ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাদের উপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো। অধিকাংশ ব্যাপারে তিনি তাদের কাছ থেকে বরাবরই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তারপরও প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁকে তার নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কাজ করতে হতো। তিনি মনে করতেন, যেহেতু জনগণের সামনে শুধু খলিফাকেই জবাবদিহি করতে হবে। তাই প্রত্যেক ব্যাপারে দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হবে। তাই এ দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বা দলের উপর ছেড়ে না দেয়া উচিত।

এসব ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খুবই সচেতন ছিলেন। ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তিনি মদীনার বাইরে যাবেন না বলে শপথ করেছিলেন। দিনরাত তিনি রাজধানীতেই পড়ে থাকতেন। সবসময়ই তিনি এসব চিন্তা-ভাবনায় বিভোর থাকতেন। কোন্ ব্যাপারে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, সামরিক বাহিনীকে কোথায় কিভাবে সমর সাহায্য পাঠাতে হবে। অমুক জায়গার বিদ্রোহে কাকে পাঠিয়ে দমন করা যেতে পারে, বিজিতদের সাথে কি আচরণ করতে হবে, বিজিত জায়গার ব্যবস্থাপনা কিভাবে চালাতে হবে—এসবই ছিলো তাঁর দিনরাতের ভাবনা।

ধর্মত্যাগীদের নিশ্চিহ্ন করার পর ইসলামী বাহিনী ইরান ও রোমের বিরাট ও জবরদস্ত সুলতানাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এবং ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে শুরু করলে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর জিম্মাদারী ও ব্যস্ততা আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তিনি এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন যে, রাষ্ট্রীয় কাজ ছাড়া অন্য সব কাজই তাঁর চোখের অন্তরালে চলে গেলো। এমন কি তিনি তার নিজেকেও ভুলে বসেছিলেন। নিজের আরাম-আয়েশ স্বাস্থ্য পর্যন্ত তিনি এ পথে কুরবান করে দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রাজনীতি অত্যন্ত সফল ছিলো। তাঁর খেলাফতকালে আদল ও ইনসাফ, প্রজা সাধারণের উপর অনুকম্পা ও দয়ার ক্ষেত্রে নজীরবিহীন। তাঁর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে তিনি যে দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে এর কোনো নজীর নেই। অত্যন্ত বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে তিনি গোটা আরবকে ইসলামী হুকুমাতের অনুগত বানিয়েছিলেন। এদিকে বিভিন্ন গোত্রকে তিনি তাদের বৈধ অধিকার দিতে কোনো রকম ইতস্ততঃ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেসব আযাদী দান করেছিলেন হযরত

১৯—

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেসব আযাদী তাদেরকে দিতে থাকেন। আর যে যাকাত তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আদায় করতো সে যাকাত আদায় করার দাবী ছাড়া তিনি তাদের কাছে আর বেশী কিছু আদায় করার দাবী জানাননি। আর যাকাতের অধিকাংশই তাদের গোত্রের গরীব মিসকীনদের মধ্যে খরচ করা হতো। খাজনা, মালে গানিমাত ইত্যাদি হতে রাষ্ট্রের যে আয় হতো, তার একটি পয়সাও তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করা হারাম মনে করতেন। রাষ্ট্রের বায়তুলমাল থেকে তিনি শুধু এতটুকু অর্থ গ্রহণ করতেন যে অর্থ তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের নির্বাহের জন্য প্রয়োজন বলে মুসলমানরা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমদানীর বেশীর ভাগ অর্থই যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে খরচ হতো। অবশিষ্টাংশ গরীব অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। খেলাফতের প্রাথমিক অবস্থায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসস্থান 'সানাহতেই' বায়তুলমাল অবস্থিত ছিলো। পরে কাজের পরিধি বেড়ে যাবার কারণে তিনি তার বাসস্থান পরিবর্তন করে মদীনায় স্থানান্তরিত করেন এবং বায়তুলমালকেও সাথে সাথে মদীনায় নিয়ে আসতে হয়। ইরান থেকে বেশ পরিমাণে গানিমাত আসতে শুরু করলে অন্য কাউকে বায়তুলমালের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানানো হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা যত ধন-সম্পদ সে সময় আসতো তিনি সাথে সাথেই তা জনগণের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। বায়তুলমাল থেকে এমন কিছু উদ্বৃত্ত হতো না যার জন্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। তাঁর খেলাফতকালে একদিন মদীনার নিকটবর্তী বনু সালিত গোত্রে একটি সোনার খনি আবিষ্কার হয়। সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। কিন্তু তিনি তার অনুসৃত কর্মনীতি অনুযায়ী খনি হতে উদ্ধার করা সোনা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। কিছুই বাঁচিয়ে রাখতেন না।

ধন-সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমতার নীতি অবলম্বন করতেন। প্রথম যুগের মুসলমান, পরে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান, আযাদ ও দাস, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে তিনি কোনো রকম পার্থক্য নির্ণয় করতেন না। কেউ কেউ তাঁকে প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী ওজিফা কেন দেয়া হচ্ছে না তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা তাদের বদলা আল্লাহর কাছে পাবেন। দুনিয়াতে তিনি পাবেন যা অন্য মুসলমানরা পান। ন্যায় ও ইনসাফের এবং সাম্যের এ অনুসৃত নীতি সকল মানুষকে তাঁর অনুরক্ত বানিয়ে দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে তার জন্য একটি মর্যাদা ও ভক্তির আসন চিহ্নিত হয়েছিলো।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সকলের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য নির্ভিক পরামর্শদাতা। হযরত ওসমান, আলী, তালহা, জুবাইর প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিলো। তাদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি কোনো কাজ করতেন না। কিন্তু এতো সতর্কতার পরও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো না। নিজকে রক্ষা করার জন্য পরামর্শ গ্রহণের ছায়া ধরে কোনো কাজের দায়-দায়িত্ব কারো উপর তিনি চাপাতেন না। বরং প্রত্যেক

www.pathagar.com

কাজের দায়িত্ব নিজে বহন করতেন। এ ধরনের বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তার খেলাফতকালে পাওয়া যায়। উসামার বাহিনী যাত্রা করার সমস্যা দেখা দিলে সকল পরামর্শদাতারাই এ যাত্রার জন্য এ সময়টাকে সঠিক সময় মনে করেননি। কারণ, মদীনার চারিদিকে ধর্মত্যাগীদের ভীষণ বিদ্রোহ। উসামার বাহিনী রওনা হয়ে গেলে মদীনায় যুদ্ধ করার লোক বেশ কমে যাবে। কিন্তু সকলের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে উসামাকে রওনা হয়ে যাবার হুকুম জারী করে দিলেন। তিনি ধর্মত্যাগীদের সাথে এমনভাবে মুকাবিলা করলেন যে, সকল পরামর্শদাতাকেই তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা স্বীকার করে নিতে হলো। এরপর যখন মালিক বিন নুবিয়ার ঘটনা পেশ হলো, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদকে পদচ্যুত করার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বেশ চাপ সৃষ্টি করলেন। একজন মুসলমানকে হত্যা করার জন্য তাঁকে শাস্তি দেবার দাবী জানালেন। তখনও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত সঠিক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন।

দায়িত্বের বোঝা যতো বেশী তাঁর উপর চেপে বসতো তাঁর স্বভাবে ততবেশী বিনয়ও, কোমলতা ও সরলতা এসে যোগ হতো। যতদিন তার শহরতলীর বাড়ী সানাহতে তিনি ছিলেন, ততদিন বিশ্রামের জন্য কিছু না কিছু সময় বের করে নিতে পেরেছেন। সাধারণত তিনি ভোরে ঘোড়ায় আরোহণ করে সানাহ থেকে মদীনায় এসে ফযরের নামায পড়ায়ে রাষ্ট্রীয় কাজে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। কোনো কোনো সময় তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। তার স্থলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়াতেন। জুমার দিন দুপুর পর্যন্ত তিনি বাসায়ই থাকতেন। মাথার চুল ও দাঁড়িতে খেজাব লাগাতেন। এরপর মদীনায় এসে জুমার নামায পড়াতেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাজ বেড়ে যাবার কারণে সানাহ হতে মদীনায় চলে আসার পর তিনি এ বিশ্রামের সময়টুকুকেও মুসলমানদের জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করতে থাকেন। কাজের এতো আধিক্য সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের জন্য কোনো খাদেমের ব্যবস্থা করেননি। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি মসজিদে কাটাতেন। জনগণের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। যুদ্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ পাঠাতেন। মানুষদেরকে নানা উপদেশ দিতেন। প্রয়োজনে তিনি মানুষকে পরামর্শও দিতেন ও নিতেন। রাষ্ট্রের সকল ছোট বড় ব্যাপার মসজিদেই তার সামনে পেশ করা হতো। আর সেখানে বসে বসেই তিনি সেসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ফরমান জারী করতেন।

গরীব-মিসকীনদের প্রতি তিনি ছিলেন বেশ দয়ালু। শীতকালে কম্বল খরিদ করে গরীব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে তিনি গরীব দুঃখিদের প্রয়োজন মিটাতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, মদীনায় একজন অন্ধ বুড়ি বাস করতো। আমি প্রতিদিন ভোরে তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য যেতাম। প্রতিদিনই আমার বিস্ময়ের সীমা থাকতো না যখন আসতাম, শুনতাম এর আগেই কেউ এসে বুড়িরসব কাজ-কর্ম করে দিয়ে গেছেন। কে এ লোকটি

www.pathagar.com

তা উৎঘাটন করার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম। রাত বাকী থাকতে একদিন বুড়ির বাড়ীর কাছে একটি ঝুপড়ির আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে লোকটির অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এদিকে আসছেন। তাঁকে দেখেই আমি মনে মনে বলে উঠলাম, 'আবু বকর ! নিশ্চয়ই এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না'। বস্তুত তিনি এসেই এ অন্ধ বুড়ির কাজ-কাম সেরে ফেরত চলে গেলেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোটা জীবনটাই তার কার্যক্রমের বাস্তব নমুনা। আরবের লু-হাওয়ার ভূখণ্ডে যেখানে চারিদিকে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগীদের কলহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো সে সময় নিরাশ হৃদয়ের জন্য তিনি ছিলেন অন্ধকার রাতের একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। গোটা আরব তার ন্যায় ও ইনসাফ, দয়া ও করুণা, কৌশল ও স্বচ্ছ রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলো। আর এ বৈশিষ্ট্যেই তাঁর সফলতার মূল কারণ।

জিহাদ ও গানিমাত

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁকে সফলতা দান করবেন। দীনের সাহায্য করবেন বলে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওয়াদা করেছেন। আসমান-জমিন টলে গেলেও আল্লাহর ওয়াদা টলতে পারে না। সুতরাং তার ওয়াদা পূরণ হয়েছে। ধর্মত্যাগের যুদ্ধে মুসলমানরাই গৌরবময় বিজয় লাভ করেছেন। ইরাকের যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সবসময়ই তারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এমন কোনো যুদ্ধ হয়নি যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে গানিমাতের মাল লাভ করতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় ফাণ্ডে গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদ জমা হতো। বাকী সম্পদ যুদ্ধের ময়দানেই অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো। প্রত্যেক সৈনিক হাজার হাজার দেরহাম করে গানিমাতের মাল ভাগে পেতেন। যুদ্ধে পেছনে থাকার লোকেরা এসব দৃশ্য দেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠতো। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরফ থেকে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা হলে সাথে সাথে আরব গোত্রগুলো পাগলপারা হয়ে তাতে শরীক হয়ে যেতো।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা গানিমাতের সম্পদের লোভে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হতো। বরং যুদ্ধে শরীক হবার মূল কারণ ছিলো শাহাদাত প্রাপ্তির অনুপ্রেরণা। প্রত্যেক মুসলমানদের মনেই সদা এ বাসনা জাগ্রত থাকতো। কে না জানতোনা যে, মুসলমান মুজাহিদ ও তাদের শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যায় আকাশ-পাতাল তফাত থাকতো। শত্রুপক্ষ উত্তম যুদ্ধ প্রস্তুতি ও দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে মুকাবিলা করতে এসে তাদের শৌর্যবীর্যের মহড়া দেখাতো। তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অর্থই ছিলো মৃত্যুকে আহ্বান করে আনা। কিন্তু ভয়-ভীতিহীন মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহর পথে কোনো বিপদকেই বিপদ মনে করতো না। সবসময় তারা শত্রু বাহিনীর ব্যূহ

www.pathagar.com

ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতো। শাহাদাত প্রাপ্তির এ দুর্দমনীয় অনুপ্রেরণা দেখে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরান বাহিনীর সরদারদেরকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন —"আমি তোমাদের কাছে এমন এক জাতি নিয়ে আসছি যারা মৃত্যুকে এতোটা ভালোবাসে যতটা তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।"

প্রকৃতির আইনে যে জাতি মৃত্যুকে ভয় করে না বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে সে জাতিরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে বলে বিবেচনা করা হয়। আর যারা নিজেদের চাওয়া পাওয়াকে আল্লাহর পথে কুরবান করতে পারে, জাতির নেতৃত্বের মুকুট তাঁর শিরেই শোভা পায়। মুসলমানরা নিজেদের জন্য মৃত্যুকে পসন্দ করে, যার কারণে তাদেরকে সবসময়ের জীবনদান করা হয়েছে। আল্লাহর পথে সবরকমের নির্যাতন নিগ্রহ সহ্য করেছে, এজন্য তাদেরকে উভয় জগতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করা হয়েছে।

তারপরও এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, গানিমাতের সম্পদ প্রাপ্তির আশাও কিছুটা তাদের যুদ্ধের ময়দানে যাবার কারণ ছিলো। আরব জাতির স্বভাব অনুযায়ীই তারা এত পর্যাপ্ত গানিমাতের সম্পদ দেখে কিভাবে ধৈর্যধারণ করতে পারে ? যদিও ইসলাম আত্মস্বার্থ উদ্ধারের প্রবণতা অনেকটা মিটিয়ে দিয়েছিলো। গানিমাতের সম্পদ প্রাপ্তির লোকের চেয়ে আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদে শরীক হবার অনুপ্রেরণাই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর এ কুদরতী অনুপ্রেরণাকে একেবারে মিটিয়ে ফেলা সহজ ছিলো না। কোনো না কোনো একটা সীমা পর্যন্ত এ অনুপ্রেরণা তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিলো। বস্তুত স্বয়ং খালিদ বিন ওয়ালিদ ইল্লিসের যুদ্ধ শেষে বলেছিলেন, ইরাকে ধন-দৌলতের পর্যাপ্ততা ও মালে গানিমাতের আধিক্য, যা আরবরা স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি—যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে অবশ্যই যথেষ্ট ছিলো।

ধর্মত্যাগী গোত্রগুলোকে ধর্মত্যাগের শাস্তি হিসাবে ইরাকের যুদ্ধে যোগদান হতে জোর করে বিরত রাখা হয়েছিলো। নিজের ভাই-বন্ধুদের ঘরে ধন-দৌলতের পর্যাপ্ততা দেখে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তাদের মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু এখন আর কি করা যেতে পারে। যারা ইসলামের উপরে অবিচল রয়েছে তারা শুধু সফলতা ও কামিয়াবীর সৌভাগ্য অর্জন করেনি বরং ধন-সম্পদ প্রাপ্তির গৌরবও অর্জন করেছেন। কিন্তু ধর্মত্যাগীদের ভাগ্যে অনুশোচনা ও নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই জুটেনি।

সিরিয়া যাত্রার প্রস্তুতি

এতসব সত্ত্বেও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে সিরিয়া যাবার আহ্বান জানালে—প্রাথমিক দিকে রোমের বিরাট সুলতানাত, তাদের বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর সাথে মুকাবিলায় যেতে তাদের বুক কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন তাদের মনে রোমকদের এ ভয় সাময়িক। যখনই অবস্থার নাজুকতা তারা উপলব্ধি করতে পারবে, দলে দলে তখন তারা জিহাদে যোগ দেবার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। বস্তুত অবস্থা তা-ই হয়েছিলো। কিছুক্ষণ পরেই পটপরিবর্তন ঘটলো। লোকেরা একের পর এক এসে সিরিয়া যাত্রার জন্য নিজেকে পেশ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

মদীনাবাসীদের তরফ থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়েমেনবাসীদেরকেও এ উদ্দেশ্যে তৈরি করতে চাইলেন এবং তাদেরকে লিখলেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর জিহাদ ফরয করে দিয়েছেন। তিনি হুকুম দিয়েছেন, অবস্থা সচ্ছল হোক অথবা অসচ্ছল, যুদ্ধ সরঞ্জাম পর্যাপ্ত হোক অথবা স্বল্প, সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

বস্তুত তিনি বললেন ঃ

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"হে মু'মিনগণ ! নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। জিহাদ একটি অত্যাবশ্যকীয় ফরয। আর এর সাওয়াবও এতো বড় ও বিরাট যা অনুমান করা সম্ভব নয়। তোমাদের যেসব ভাই আমার সামনে উপস্থিত ছিলো তাদেরকেও আমি সিরিয়ার যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছি। তারা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অত্যন্ত সৎ ও সরল মনোভাব সহকারে সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

"হে আল্লাহর বান্দাগণ ! এখন তোমাদের পালা। তোমরাও আমার আহ্বানে সাড়া দাও। আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পালন করার জন্য এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করো।"

ইয়েমেনবাসীদের উপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর চিঠির বেশ প্রভাব পড়েছে। খলিফার দূত জনসমাবেশে চিঠি পড়ে শুনালে 'জুলকালাহ হামিরী' নামক এক সরদার নিজ গোত্রসহ ও ইয়েমেনের আরো কয়েকটি গোত্র নিয়ে সিরিয়া যাত্রার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। জুলকালাহর অনুসরণে 'মোজহাজ' গোত্রের 'কায়েস বিন হুবায়র মুরাদী', ইজদ গোত্র থেকে 'জুন্দুব বিন ওমর ওয়াদদূসী' এবং তায় গোত্র থেকে 'হাবিস বিন সায়াদ তায়ী' নিজ নিজ সঙ্গী-সাথী ও গোত্রসহ মদীনার পথ ধরলেন।

এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পয়গামবাহী দূত যখন ইয়েমেনের প্রতিটি গোত্রের কাছে তাঁর বাণী শুনাবার কাজে নিমগ্ন ছিলেন এবং ইয়েমেনবাসীরাও রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, সে সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুহাজির, আনসার ও মক্কাবাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের গোত্রগুলোকে একত্রিত করে সিরিয়ায় পাঠাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।

এসব বাহিনীকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কখন পাঠানো শুরু করেছেন ? সিরিয়াভিমুখে যাত্রাকারী সর্বপ্রথম বাহিনী কোন্টা ছিলো ? যেসব বাহিনী মদীনায় এসে একত্রিত হয়েছিলো তাদের আমীর কে ছিলেন ? এসব বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে।

www.pathagar.com

অধিকাংশ বর্ণনায় জানা যায় ১২ হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার দিকে প্রথম বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১২ হিজরীর প্রথম দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদকে যখন ইরাক পাঠালেন, সাথে সাথেই সাঈদ বিন আসকে সিরিয়ায় রওনা হয়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন। তবে আমাদের ধারণায় প্রকৃত ঘটনা হলো, যে সময় ইয়েমেন, কান্দাহ এবং হাজরামাউতে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ চলছিলো তখনই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম ইরাক গিয়ে ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর সে সময়ই খালিদ বিন সাঈদকে সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো। তাকে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিলো সীমান্ত রক্ষা করা। রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ বাঁধানো নয়। ইয়েমেন ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ধর্মত্যাগীদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করা, ইরাকের 'হিরা' বিজয় এবং সিরিয়ার সীমান্ত শহর দাওমাতুল জুন্দুল অনুগত করার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে সিরিয়া অভিযানের কথা উদয় হলো।

এ ঘটনার দ্বারাও আমাদের কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সিরিয়ার উপর আক্রমণ করার কথা উঠলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমত ইয়েমেনবাসীদেরকে ওখানে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। আর ওখানকার ধর্মত্যাগের ফেতনার চির অবসান ঘটার আগে তাদের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। এখানে একথাও লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, 'ইকরামা' ও 'জুল কালাহ' ইয়েমেনে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করার পর ওখানে তারা থাকেনি। বরং মুহাজিরকে সাথে নিয়ে এসে কান্দাহ ও হাজরামাউতের ধর্মত্যাগের কলহ দমন করার জন্য রওনা হন। দক্ষিণ আরবে পরিপূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হবার পর, মদীনায় ইকরামার ফেরত আসার সময় হয়ে গেলে, যে বাহিনী নিয়ে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তাদের ছেড়ে অন্য বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এ বাহিনীকে বুদাইল সংগঠিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবের বিদ্রোহ দমন, ইয়েমেন হতে মদীনা প্রত্যাবর্তনে এবং ওখান থেকে সিরিয়া রওনা হবার জন্য তো একটা দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিলো। মক্কা হতে মদীনা যেতেও উটে চড়ে দশদিন সময় লাগতো। আর মদীনা হতে সিরিয়ার দূরত্ব এক মাসের পথের চেয়ে কোনো অবস্থায়ই কম ছিলো না।

উপরে উল্লেখিত ঘটনার মতো সিরিয়ার উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম কাকে আমীর নিবার্চন করেছেন এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী এ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন খালিদ বিন সাঈদ বিন আস উমবী। আমি এর আগে এ বর্ণনাও করেছি যে, মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই তাদেরকে সিরিয়া সীমান্তে 'তায়মা'য় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, রোমীয় মুসলমানদের (ধর্মত্যাগের) বিপদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরবের উপর হামলা করার চেষ্টা করতে না পারে। এ দু'টো বর্ণনার বিপরীত আর একটি বর্ণনাও আছে, খালিদ বিন সাঈদ

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে ইয়েমেনের শাসক ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের এক মাস পর মদীনায় গিয়ে পৌছেন। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত আলী ও ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলেন ঃ

"হে বনু আবদে মুনাফ ! তোমরা হৃষ্টচিত্তে, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে খেলাফতের রশি অন্যকে কিভাবে ছেড়ে দিলে ? অথচ খেলাফত ছিলো তোমাদের প্রাপ্য জিনিস।"

পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার করে খালিদ বিন সাঈদকে সিরিয়া পাঠাতে চাইলে হযরত ওমর বললেন—আপনি এমন একজন লোককে বাহিনীর সিপাহসালার বানিয়ে পাঠাচ্ছেন যে এর আগে ঝগড়া-ফাসাদ লাগাবার মতো কথাবার্তা বলেছে।

এ ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশী জিদ ধরলে অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু সাঈদকে বাদ দিয়ে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন। আর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলেছিলেন, খালিদ বিন সাঈদ নিজে অহংকারী মানুষ। তাই এ ধরনের অভিযানে তাকে পাঠানো উচিত হবে না। এসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও হুঁশিয়ার লোকের প্রয়োজন। খালিদ বিন সাঈদকে কখনো আমীর বানিয়ে পাঠানোই হয়নি বলেও বর্ণনা আছে। তিনি আবু ওবায়দা বিন জাররাহর বাহিনীতে শামিল ছিলেন।

এসব বর্ণনার বিপরীত আমার ধারণা—যা আমি আগেও বলেছি, খালিদ বিন সাঈদকে সিরিয়ার সীমান্তের হিফাযতের জন্য 'তায়য়া'য় পাঠানো হয়েছিলো। আর তিনি তার ক্ষুদ্র বাহিনীসহ ওখানেই অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়া যুদ্ধে যাবার জন্য সাধারণভাবে যখন আহ্বান জানালেন, তখন তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। বরং "রোমীয়দের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে" বলে খালিদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। খালিদ জানিয়েছিলেন দরবারে খেলাফাত থেকে সমর সাহায্য না পাঠালে রোমীয়রা তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।

রোমকদের যুদ্ধের প্রস্তুতি, সামরিক বাহিনীর আনাগোনা, তাদের হিসাবে সঠিক ছিলো। কারণ, ইরাকে মুসলমানদের বিজয়ের পর বিজয়, আরবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীদের বিভিন্ন জায়গার বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের ধারাবাহিক খবর এরা পেয়ে আসছে। এদের মনে এখনো তাবুকের যুদ্ধের স্মৃতি জাগরুক আছে। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অধিক সংখ্যক সঙ্গী-সাথী নিয়ে রোম সীমান্তে এসে রোম সীমান্তে অবস্থানকারী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে মদীনা চলে গেছেন। এখন আবার তার অনুগামীরা রোম সীমান্তে পৌছে তা অতিক্রম করার চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

এসব অবস্থা দেখে রোমক শাসক গাসসানী ও রোম সীমান্তে বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রের কাছে, সীমান্তে মযবুত ঘাঁটি তৈরি করে মুসলমানদের প্রতিরোধ ও কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে সিরিয় সীমান্তে প্রবেশ করতে না দেয়ার নির্দেশ জানিয়ে দিলো। সুতরাং তারা বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে সীমান্ত এলাকায় জমা করলো।

এখন রোমক ও মুসলিম বাহিনী মুকাবিলা করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন। মুসলিম বাহিনী ছিলো সীমান্তের এ পাড়ে আরব এলাকায়, আর গাসসানীয় বাহিনী ছিলো সীমান্তের ওপাড়ে সিরিয় সীমায়। উভয় পক্ষই আক্রমণের হুকুমের অপেক্ষায়।

এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদের একের পর এক বিজয়ের খবর শুনে রোমানদের আরো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আজ আম্বারবাসী অপারগ হয়ে শহরের দরযা খুলে দিয়েছে, আজ আইনুত তামার মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করেছে, আজ অমুক বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে— তারা শুধু একাধারে এসব খবর শুনে চলেছে।

রোমানদের বিশ্বাস ছিলো, তায়মা অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীও নিশ্চিন্তে বসে থাকার মতো শক্তি নয়। তারাও তাদের ভাই-বন্ধুদের সাহায্যের জন্য সিরিয় সীমান্তে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসবেই। তাই তারা নতুন প্রেরণা ও উদ্দম নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

এ অবস্থা দেখে খালিদ বিন সাঈদ পুনরায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রোমীয়দের উদ্যম ও প্রেরণা এবং বাহরা, কালব, তানুখ, লাখাম, জাজাম ও গাসসান গোত্রের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর জানিয়ে সিরিয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সিরিয়ায় পাঠাবার জন্য বাহিনী সংগ্রহে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সময় ব্যস্ত ছিলেন। উত্তরে তিনি খালিদকে লিখলেন ঃ

"তোমার আবেদন অনুসারে তোমাকে অগ্রসর হবার অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু সর্বপ্রথম তুমি আক্রমণ রচনা করো না। সবসময়ই আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।"

সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ছিলো প্রথম বক্তব্য যা তিনি খালিদ বিন সাঈদের পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন।

---

www.pathagar.com

১৪

সিরিয়া বিজয়

ইসলামী বাহিনীর অগ্রাভিযান

খালিদ বিন সাঈদ নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী এবং বেদুঈন গোত্রগুলো সহ 'তায়মায়' অবস্থান করছিলেন। তাকে মুকাবিলা করার জন্য সীমান্ত এলাকার গোত্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত রোমীয়দের বিরাট বাহিনী সীমান্তের ওপারে পুরোদমে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এত বিরাট বাহিনী দেখার পরও মুসলমানদের সাহস ও হিম্মত হ্রাস না পেয়ে বরং আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। দৃঢ়তা এবং মনোবলও তাদের আগের চেয়ে আরো বেশী বেড়ে গেলো। খালিদ বিন সাঈদ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাতই তাঁর বাহিনীকে তৈরি হবার নির্দেশ দিলেন। এ বাহিনী নিয়েই তিনি সিরিয় সীমান্তে ঢুকে পড়লেন। রোমক বাহিনী ও তাদের সাহায্যকারী দল ইসলামী বাহিনীকে তাদের দিকে এগুচ্ছে দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে পলায়ন করতে শুরু করলো। খালিদ বিন সাঈদ তাদের অবস্থানে প্রবেশ করে তাদের ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র দখল করে নিলেন এবং মদীনায় খলিফার কাছে এ প্রথম বিজয়ের খবর পাঠিয়ে দিলেন। ওখান থেকে জবাব এলো ঃ

"তুমি সামনে অগ্রসর হয়ে চলো। কিন্তু তোমার কাছে অতিরিক্ত সাহায্য বাহিনী এসে পৌছা পর্যন্ত নিজ থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ রচনা করো না।"

সুতরাং হযরত খালিদ বিন সাঈদ সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে চললেন। মুরাদ নদীর পূর্বাঞ্চলের কাছে 'কাসতল' নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে আর একটি রোমক বাহিনীর সম্মুখীন হতে হলো। এখানেও তারা শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলো। এ অবস্থায় রোমক ও সিরিয় বাহিনীর ব্যক্তিত্বে বড় আঘাত লাগলো। লজ্জায় শরমে তারা আগের চেয়েও আরো জোরেশোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাতে লাগলো।

রোমক বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে খালিদ বিন সাঈদ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাঁর অগ্রাভিযানের বিজয় অব্যাহত রাখার জন্য তাড়াতাড়ি সমর সাহায্য পাঠাতে চিঠি লিখলেন। এরই মধ্যে মদীনা হতে সমর সাহায্য রওনা হয়ে গিয়েছিলো। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ব্যাপারে খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিশ্চিত ছিলেন। আল্লাহর সাহায্যের উপর ছিলো তাঁর পূর্ণ ভরসা। রোমক শক্তি কোনো অবস্থাতেই ইরানীদের চেয়ে উন্নত ছিলো না। ইরানীদের উপর যখন আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন, তখন এদের উপরও আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বিজয় দান করবেন—এ বিশ্বাস আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছিলো। সীমান্ত রক্ষার ভার তারা সীমান্ত বেদুঈনদের উপর ছেড়ে দিয়ে বেশ আরামে-আয়েশে

www.pathagar.com

দিন কাটাচ্ছে। এরা শৌর্যবীর্যে কারো চেয়ে কম না হলেও জাতীয়তা ও ভাষার দিক দিয়ে তারা রোমকদের সাথে নয় বরং আরবীয়দের সাথেই সম্পর্কিত ছিলো বেশী। সিরিয়ার আরবরা ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী হলেও হেরাকলের ঈসায়ী ধর্মের সাথে এদের ধর্মের পার্থক্য ছিলো প্রচুর।

কায়সার সরাসরি মুসলমানদের মুকাবিলায় ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছে না দেখে সিরিয়রা উপলব্ধি করলো, নিজ জাতির ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে কায়সার তাদের বাঁচিয়ে রেখে সিরিয়দেরকেই ময়দানে কুরবানী দেবার কৌশল আটছে। এ দুশ্চিন্তায় তাদের সাহস শক্তি লোপ পেলো। তারা কেন রোমীয়দের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিজেদের জীবন বিনষ্ট করবে। তারা তাই যুদ্ধ হতে ফিরে থাকার পথ অবলম্বন করলো এবং খালিদ বিন সাঈদের অগ্রযাত্রার পথকে সুগম করে দিলো।

ইসলামী বাহিনীর যাত্রা

খালিদ বিন সাঈদের সাহায্যের জন্য কোন্ বাহিনী সর্বপ্রথম রওনা হয়ে এসেছিলো এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাবারী, ইবনে আসির ও ইবনে খালদুনের বর্ণনার সাথে ওয়াকেদী, ইয়েজদী ও বালাজুরির বর্ণনায় গরমিল আছে। তাবারি ও তাঁর সাথীরা বলেন, ইকরামা বিন আবু জেহেল কান্দাহ ও হাজরামাউতের বিদ্রোহ দমন করে ইয়েমেন ও মক্কা হয়ে মদীনায় পৌছার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে খালিদ বিন সাঈদের সাহায্যে রওনা হবার নির্দেশ দিলেন। যে বাহিনীকে নিয়ে ইকরামা দক্ষিণাঞ্চলে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আর একটি বাহিনী তৈরি করে ইকরামার উপর তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাকে সিরিয়ার দিকে রওনা হয়ে যাবার হুকুম দিলেন। এজন্য এ বাহিনীকে জায়শে বেদাল (পরিবর্তিত বাহিনী) বলে অভিহিত করা হয়েছিলো। ইকরামার পর পরই তিনি 'জুল কালাহ হামিরীকে' তাঁর সাথে ইয়েমেন থেকে ফিরে আসা বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে সিরিয়া যাত্রা করার নির্দেশ জারী করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো এসব বাহিনীর আগমনের কথা শুনে যেনো খালিদ বিন সাঈদের মনে প্রশান্তি থাকে। তিনি যেন তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেন।

ঠিক এ সময়েই ওমর বিন আস রাদিয়াল্লাহ আনহু ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ হতে অবসর হয়ে 'কাজায়ায়' অবস্থান করছিলেন। খালিদ বিন সাঈদের সাহায্যে তাঁরও সিরিয়ায় যাওয়া আবু বকরের অভিপ্রায় হলেও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধে তার কৃত কার্যক্রমের কারণে তিনি তাকে ইখতিয়ার দিলেন। মন চাইলে সিরিয়ায় গিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারো অথবা 'কাজায়াতে'ই থাকতে পারো। তিনি তাঁকে লিখেছিলেন এ ভাষায় ঃ

> "হে আল্লাহর বান্দা ! আমি তোমার জিম্মায় এমন কাজ সপর্দ করতে চাই যা দীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়েই তোমার জন্য উত্তম। তুমি যেটাই করতে চাও এতে আমার অনুমতি আছে।"

www.pathagar.com

উত্তরে ওমর বিন আস লিখলেন ঃ

"আমি ইসলামের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর মাত্র। আল্লাহর রসূলের পরে এখন আপনিই এ তীর পরিচালনাকারী। যে দিকেই আপনি বিপন্ন মনে করেন বিনা দ্বিধায় আপনি এ তীর পরিচালনা করতে পারেন। এ তীর বেশ শক্ত ও হৃদয় বিদীর্ণকারী।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদ বিন ওক্‌বাকেও এ মর্মে চিঠি লিখলেন। তিনি প্রতি উত্তরে ওমর বিন আসের মতো অত্যন্ত অকপট মনোভাব ও একাগ্রতা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তাই খলিফা হযরত ওমর বিন আসকে ফিলিস্তিনে এবং ওয়ালীদ বিন ওক্‌বাকে উর্দুনের শাসক নিযুক্ত করে সিরিয়া রওনা হবার হুকুম দিলেন।

আদেশকে শিরোধার্য করে উভয় নেতা সিরিয়া রওনা হলেন। ওয়ালিদ বিন সাঈদের কাছে সর্বপ্রথম ওয়ালিদ বিন উক্‌বা গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি সেখানে গিয়ে জানালেন যে, মদীনা হতে মদীনাবাসীরা তাদের ভাইদের সাহায্যের জন্য উদ্বিগ্ন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ খবর শুনে ওয়ালিদ বিন সাঈদের আনন্দের সীমা রইলো না। রোম বিজয়ের গৌরব তার ভাগ্যে আসুক এ চিন্তায় তিনি ওয়ালিদ বিন ওক্‌বাকে সাথে নিয়ে বিরাট রোমক বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে চাইলেন। রোমক বাহিনীর সিপাহ্‌সালার ছিলেন বাহান। তার খেয়াল ছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদ যেভাবে ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে ইরান বাহিনী প্রধান হরমুজকে পরাজিত করে ইরানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন সেভাবে তিনিও রোমক বাহিনী হাবাসকে পরাজিত করে রোমীয়দের উপর নিজেদের প্রভাব কায়েম করতে পারবেন।

বাহান খালিদ বিন সাঈদের পরিকল্পনার কথা শুনে তার বাহিনীকে সিরিয়ার দিকে রওনা করলো। তার ইচ্ছা ছিলো ওয়াকুসা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান 'মারজুস সাকারে' অবস্থান গ্রহণ করে মুসলমানদের মুকাবিলা করার। বাহানের পেছনে হটে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে ছিলো একটি রণকৌশল। চারিদিক থেকে অবরোধ করে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করাই ছিলো মুসলমানদের উদ্দেশ্য। এ ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বার বার তাকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয় লাভের নিশা ও গৌরব তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো, পেছন অরক্ষিত রেখে সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না। মারাজুস সকারে পৌঁছার পর বাহান পেছনের দিকে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করে তাদের পেছনের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিলো। ঘটনাচক্রে মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী মূল বাহিনী হতে পৃথক হয়ে পড়লো। এ ক্ষুদ্র বাহিনীতে খালিদ বিন সাঈদের ছেলেও শামিল ছিলো।

বাহান সর্বপ্রথম এ ছোট বাহিনীকে আক্রমণ করে খালিদ বিন সাঈদের ছেলে সহ সকলকে হত্যা করে ফেললো। নিজ ছেলের হত্যা এবং নিজ বাহিনীকে রক্ত পিপাসু

www.pathagar.com

শত্রু বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত দেখে খালিদ চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। বাহিনীকে ইকরামার হাওলা করে খালিদ বিন সাঈদ কিছু লোক সাথে করে পালাবার পথ বেছে নিয়ে মদীনার কাছে 'জুলমারওয়া'য় এসে থামলো। এ খবর শুনে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদকে এক কড়া চিঠি লিখলেন। তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেয়া হলো। তাই তিনি তার পরাজিত সাথীদের নিয়ে দুঃখজনক অবস্থায় জুলমারওয়াতেই অবস্থান করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন ঃ

"খালিদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার চেয়ে ভালো জানতেন। আমি যদি এ দু' ব্যক্তির কথা শুনতাম, তাহলে আজ মুসলমানদেরকে এ পরাজয় বরণ করতে হতো না।"

খালিদ বিন সাঈদের পলায়নের পরও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহস হিম্মতে ভাটা পড়েনি। ইকরামা বিন আবু জেহেল মুসলিম বাহিনীকে রোমীয়দের অবরোধ থেকে উদ্ধার করে সিরিয়ার সীমান্তে ফিরে এসেছে এবং সমর সাহায্য পাবার উদগ্র অপেক্ষায় আছে খবর পেয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে সমর সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা শুরু করে দিলেন।

শোরহাবিল বিন হাসানা ইরাকে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে ছিলেন। এ সময় তিনি গ্রেফতারকৃত লোকজন ও গানিমাতের মাল নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন। খলিফা তাঁকে ওয়ালিদ বিন ওকবার স্থানে সিরিয়ায় যেতে আদেশ করলেন। খালিদ বিন ওকবাও এ পরাজিতদের মধ্যে শামিল ছিলেন যারা খালিদ বিন সাঈদের সাথে পালিয়ে জুলমারওয়া অবস্থান করছিলেন। শোরহাবিল, ইবনে সাঈদ ও ইবনে ওকবার বাহিনীকে একত্রিত করে তাদেরকে নিয়ে ইকরামা বিন আবু জেহেলের সাহায্যে রওনা হয়ে গেলেন। এর সাথে সাথেই খলিফা আর একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়াভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। এ বাহিনীর অধিকাংশ লোকই মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ইয়াজিদকে পাঠাবার পর পরই খালিদ বিন সাঈদের অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। শুধু এসব বাহিনী পাঠানোকেই খলিফা যথেষ্ট মনে করেননি বরং ওবায়দা বিন জাররাহকে হামসের শাসক বানিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনীকে সাথে দিয়ে তিনি তাকে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন।

এসব বাহিনী জারফ গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন। খলিফা যখনই কোনো বাহিনীকে বাইরে পাঠাতেন নিজে শহরের বাইরে এসে সেনাপতিকে এ উপদেশ ও দোয়া করে বিদায় দিতেন ঃ

"মনে রাখবে, প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। যে এ উদ্দেশ্যকে বুঝেছে, সে সফলতা লাভ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করে, আল্লাহ স্বয়ং এর জামিন। প্রাণপণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমাদেরকে কাজ করতে হবে। কারণ, প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো কাজ পরিপূর্ণ হয় না। মনে রাখবে,

www.pathagar.com

যার ঈমান নেই তাকে মুসলমান বলা যায় না। যে কাজ সওয়াবের নিয়তে করা হয় না তার কোনো সওয়াব পাওয়া যায় না। যে কাজে ভালো নিয়ত নেই, সেটা কাজ নয়। আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য কুরআনে আল্লাহ অনেক ঘোষণা দিয়েছেন। এ সওয়াব নিজের জন্য নির্দিষ্ট করা কোনো মুসলমানের কাজ নয়। আল্লাহর পথে জিহাদ একটি ব্যবসা। এ ব্যবসা আল্লাহ মু'মিনের জন্য চালু করেছেন। যে ব্যক্তি এ জিহাদকে অবলম্বন করেছেন আল্লাহ তাকে অসম্মান ও অমর্যাদা হতে বাঁচিয়ে রাখেন। উভয় জগতেই তার মর্যাদা অপরিসীম।"

ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া পাঠাবার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে যে উপদেশ দেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"নিজের বাহিনীর সাথে ভালো মানুষের মতো থাকবে। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদেরকে সংক্ষেপে উপদেশ দান করবে। বেশী উপদেশ দিলে কিছু অংশ ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদেরকে উপদেশ দেবার আগে নিজেকে সংশোধিত হতে হবে। এরূপ করলে লোকেরা ভালো ব্যববহার করবে। শত্রুর দূতদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু বেশী সময় তাদেরকে বসিয়ে রাখবে না। তারা যেন তৎপরতা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে, সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে চাকচিক্যময় স্থানে তাদেরকে বসাবে। নিজেদের কলাকৌশল তাদের থেকে গোপন রাখবে। তারা যেনো তোমাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তা বিনষ্ট করতে না পারে। সবসময় সত্য কথা বলবে। তাহলে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যাবে। রাতে সাথীদের সাথে উঠাবসা করবে। এভাবে সকল খোজ খবর সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সেনাবাহিনীর পাহারার ব্যবস্থা করবে। আর পাহারাদার সান্ত্রীকে গোটা বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দেবে। আকস্মিকভাবে তাদের পরিদর্শন করবে। কোনো অপরাধীকে সাজা প্রদান করতে ভীতবিহ্বল হয়ো না। বিশ্বস্ত ও সরল প্রাণ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখবে। যাদের সাথে মিশবে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে মিশবে। কাপুরুষতা দেখাবে না। কারণ, তোমাকে দেখে তারাও কাপুরুষ হয়ে যেতে পারে।"

এসব বাহিনী পাঠিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহ তায়ালা এসব বাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে রোমকদের উপর বিজয় দান করবেন। কারণ, এসব মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক হাজারেরও বেশী মুহাজির ও আনসার সাহাবা ছিলেন। আর এসব সাহাবা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরিসীম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তারা তাঁর পাশে পাশে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব বাহিনীতে আহলে বদরও শামিল ছিলেন ; যাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ ! যদি আজ তুমি এ ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনো সময় এ ভূমিতে তোমার ইবাদাত বন্দেগী করা হবে না।"

এরা সেসব লোক যাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ পাক আকাশ থেকে ফেরেশতা নাযিল করেছেন। তাদের সম্পর্কে কুরআনে পাকে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

"কত ছোট ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বিরাট বিরাট বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯)

খালিদ বিন ওয়ালিদ যেসব সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করে ইরানের ক্ষমতাধর শক্তিকে হারিয়ে দিয়ে ইরানকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন তাদের মধ্যে তো এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই ছিলো যারা ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খালিদের বাহিনীতে তো বেশীর ভাগ যোদ্ধাই ছিলেন ওমান ও বাহরাইনের লোক। যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যারা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যোদ্ধাদের শৌর্যবীর্য, বীরত্ব, সরলতা ও ভালোবাসা কি বদর, ওহোদ এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান হতে পারে ? যারা প্রতি ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য ও তাকে হিফাযত করেছেন ? এভাবে তাদেরকে কি মক্কা, মদীনা ও তায়েফের ঐ বিরাট অশ্বারোহীদের সমকক্ষ বলে ধরে নেয়া যায় যাদের কাজই ছিলো সদা-সর্বদা তীরান্দাজীতে নিমগ্ন থাকা ও বিশ্ববাসীকে তরবারীর চাকচিক্য প্রদর্শন করা ? তাই খালিদ বিন ওয়ালিদ যদি দক্ষিণ আরবের এসব দুর্বল ভিত্তিমূলহীন বাসিন্দাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ করে ইরানের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে ইকরামা, আবু ওবায়দা, ওমর বিন আস এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান মক্কা-মদীনার বিখ্যাত বিখ্যাত বাহাদুরদের দ্বারা রোম সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিতে পারবেন না কেনো ?

ইরাকে ইসলামী বাহিনীর বিজয়ের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার দিকে দ্রুত বাহিনী পাঠাতে ক্রটি করেননি। যদি তিনি খালিদ বিন সাঈদের পরাজয়ের কারণে রুষ্ট হয়ে সিরিয়ার প্রতি লক্ষ্যারোপ না করতেন এবং সেখান থেকে নিজের সব বাহিনী ডেকে নিয়ে আসতেন তাহলে এর ফল হতো বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। এতে শুধু ইরাকের কষ্টার্জিত বিজয়গুলোই বেকার হয়ে যেতো না বরং উল্টো রোমকরা আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ রচনা করে বসতো। আর ইসলাম ইরান ও রোমের দুই পরাশক্তির মধ্যে চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র খেলাফতকালে এটা কিভাবে সম্ভব ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে সমর অধিনায়কগণ সিরিয়ায় পৌঁছতে শুরু করলেন। অবশ্য ওমর বিন আস তাঁর বাহিনী নিয়ে 'আরবাতে' অবস্থান নিয়েছিলেন। আবু ওবায়দা 'বালাকা' পার হয়ে জাবিয়া পৌঁছেছেন। পথিমধ্যে সিরিয় আরবীয়দের পক্ষ হতে কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে

www.pathagar.com

পরাভূত করে দেন। এদিকে শোরহাবিল উর্দুনে গিয়ে পৌঁছলেন। আর ইয়জিদ বিন আবু সুফিয়ান 'বালকাতে' অবস্থান গ্রহণ করলেন। 'ওয়াসেন' নামক স্থানে আবু সুফিয়ানকে রোমক ও বেদুঈনদের একটি বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বলেও এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আক্রমণে রোমানদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

এখানে বর্ণনায় পারস্পরিক বিরোধ পাওয়া যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা বিনা বাধায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনা এর বিপরীত। এসব বর্ণনা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, মুসলিম বাহিনী ইকরামার কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত রোমীয়রা এদের তেমন কোনো মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়নি। আর সামরিক বাহিনী যথানিয়মে তাদের মুকবিলা করার জন্য আনেওনি। এসব কাজ ছিলো বেদুঈনদের উপর ন্যস্ত। তারা কয়েকটি জায়গায় মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু মামুলী লড়াইয়ের পর পিছ পা হতে বাধ্য হয়েছে। ফিলিস্তিনের দক্ষিণ প্রান্তে রোমক ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিলো পরবর্তীতে তা আবার হযরত ওমরের খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো।

ইকরামার বাহিনীর কাছে মুসলমানদের বিভিন্ন বাহিনী পৌঁছে যাবার পর এসব বর্ণনার পার্থক্য শেষ হয়ে যায়। আবু ওবায়দা দামেশকের রাস্তায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আর শোরহাবিল অবস্থান নিয়েছিলেন তিবারিয়া ও উর্দুন নদীর উঁচু এলাকার 'গাওর' এর কাছে একটি উঁচু বিস্তীর্ণ এলাকায়। ইয়াজিদ বালকায় সিরিয়াকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। ওমর বিন আস আরবায় জাবরুন বিজয় করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলেন।

ইয়ারমুক ঃ রোমক বাহিনীর আক্রমণ

প্রথম প্রথম রোমকগণ মুসলমানদের তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। তাদের ধারণা ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তাবুক এসে ওখান থেকে ফিরে চলে গেছেন ঠিক এভাবে এরাও কিছু ঢাকঢোল পিটিয়ে অবশেষে আরবে ফিরে চলে যাবেন। খালিদ বিন সাঈদের পরাজয় ও পলায়ন রোমীয়দের এ ধারণাকে বদ্ধমূলে পরিণত করেছে। ইকরামার সাহায্যে ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী এসে সিরিয় সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে—এ খবরকেও তারা কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তারা ভেবেছিলো এদের সকলেরই পরিণতি খালিদ বিন সাঈদের পরিণতির মতোই হবে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী একত্রিত হতে লাগলে তাদের স্বপ্ন ভাঙ্গলো। অবস্থার নাজুকতা তারা উপলব্ধি করলো। তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, যদি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তারা মুসলমানদের মুকাবিলা না করে তাহলে এখানেও ইরাকের অবস্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। গোটা সিরিয়া মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এ কারণেই রোম সম্রাট হিরাকলে প্রত্যেক মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার জন্য বিরাট বিরাট

www.pathagar.com

বাহিনী পাঠাতে লাগলো। তারা যেনো পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের শক্তি সামর্থকে বিনষ্ট করে দেয়। তাদের যেনো চিরতরে সিরিয় ভূমি হতে বের করে দেয়া হয়।

বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী, এবার মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। আর রোমক বাহিনীর সংখ্যা ছিলো দু' লাখ চল্লিশ হাজার। ইকরামার সৈন্য সংখ্যা ছিলো ছয় হাজার। আবু ওবায়দা, ইয়াজিদ ও ওমর বিন আসের বাহিনীর সংখ্যা ছিলো আট হাজারের মধ্যে।

রোমক বাহিনীতে হিরাকলের ভাই তাজারোকের কাছেই সৈন্য ছিলো সবচেয়ে বেশী। নববই হাজার সেনার সমন্বয়ে ছিলো তার বাহিনী। ওমর বিন আসের মুকাবিলা করার জন্য তার বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আবু ওবায়দার মুকাবিলায় ছিলো ফায়কার বিন নাস্তুসের বাহিনী। এর বাহিনীতে সৈন্য ছিলো ষাট হাজার। শোরহাবিলের মুকাবিলা করছিলো দারাকেস। তার সৈন্য ছিলো চল্লিশ হাজার। ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের মুকাবিলা করার জন্য পাঠানো হয়েছিলো চরচা বিন জরকে। হিরাকলে স্বয়ং খামিসে এসে অবস্থান গ্রহণ করে সার্বিক পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো। সে সেখানে বসে প্রতিপক্ষের খবর পেতে থাকে। আরবদের দখলের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করাই ছিলো তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তার ভাই তাজারোক পরাক্রমশালী ইরান বাহিনীকে পরাজিত করেছিলো। এ তাজারোককে দিয়েই আরব শক্তিকে চুরমার করে এমন চরম শিক্ষা দেবার বাসনা করে চলছিলো, যা জীবনে সে কোনো দিন ভুলতে পারবে না।

রোমীয়দের বিরাট বাহিনী দেখে মুসলিম বাহিনী ভীত হয়ে উঠলো। দূত পাঠিয়ে তারা ওমর বিন আসের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ না করে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ জানালেন। এ নাজুক পরিস্থিতিতে পৃথক পৃথকভাবে শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করলে কোনোভাবেই সুফল বয়ে আনবে না। তাই সব মুসলিম বাহিনীকে এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মুকাবিলা করতে হবে। আমরা এক স্থানে একত্রিত হয়ে যাই তাহলে শত্রুপক্ষ সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মুকাবিলায় টিকতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থায়ই থেকে যাই, তাহলে আমাদের কোনো বাহিনী শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এবং খুব শীঘ্র পরাজিত হয়ে যাবে।

খেলাফতের দরবার থেকেও ওমর বিন আসের পরামর্শের অনুরূপ পরামর্শ আসলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সমর নায়কদের লিখলেনঃ

> "একত্রিত হয়ে একটি বাহিনীর রূপ ধারণ করো। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মুকাবিলা করতে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যকারী হবে, আল্লাহও তার সাহায্যকারী হবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁকে অস্বীকার করবে, অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিবে, আল্লাহও তাকে ত্যাগ করবেন। গুনাহ থেকে বেঁচে থেকো। আল্লাহ তোমাদের সহায় ও সংরক্ষণকারী হবেন।"

www.pathagar.com

ইসলামী বাহিনীর চারজন নেতাই খলিফার পরামর্শনুযায়ী এক জায়গায় একত্রিত হয়ে দামেশকের পথে ইয়ারমুকের বাম পাশে অবস্থান গ্রহণ করলেন। রোমক বাহিনী প্রধান এ অবস্থা দেখে তার সকল বাহিনী নদীর ডান পাড়ে এনে জড়ো করলো।

হুরান পাহাড় হতে ইয়ারমুক নদীর উৎপত্তি। বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে 'খুরারদুন' মৃত সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। ইয়ারমুক ও উর্দুন নদী তাদের মোহনা থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল উপরের দিকে গিয়ে ইয়ারমুক নদীর একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের পাশে চক্কর খেয়েছে। যাকে তিন দিক থেকে উঁচু উঁচু পাহাড় ঘিরে রেখেছে। এ ময়দান এত বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত যে, এতে একটি বিরাট বাহিনী বেশ সহজে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। এ জায়গাটিকেই রোমক বাহিনী নির্বাচন করে অবস্থান গ্রহণ করলো। কিন্তু এ নির্বাচনে তারা ভুল করলো। এ ময়দানটি অবশ্যই বেশ প্রশস্ত ছিলো কিন্তু তিন দিক দিয়ে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে এর থেকে বের হবার পথ ছিলো মাত্র একটি। এ পথটি ছিলো মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। অতএব রোমক বাহিনী প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। এ অবস্থা দেখে ওমর বিন আস চীৎকার দিয়ে বললেন ঃ

"হে মুসলিমগণ ! তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। রোমক বাহিনী এখন তোমাদের অবরোধের মধ্যে। আর এ ধরনের অবরুদ্ধ বাহিনী কদাচিতই রক্ষা পেয়ে থাকে।"

এখন অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, রোমক বাহিনী তাদের শক্তি সামর্থ ও সংখ্যাধিক্যের জোরে মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করতে পারছে না। অপরদিকে মুসলমানগণও এ নৈস্বর্গীয় সাহায্যের পরও রোমক শক্তির উপর বিজয়ী হতে পারছে না। মুসলমানরা রোমীয়দের বের হবার পথ বন্ধ করে বসে আছেন। এ পথ দিয়ে রোমীয়রা বের হবার চেষ্টা করলে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে আঘাত হেনে পেছনে সরিয়ে দিতেন। আর মুসলমানরা রোমীয়দের উপর হামলা করে তাড়াতাড়ি নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসতেন। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার সুযোগে তারা যেন পাল্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে না যায়। এভাবে দু'টি মাস অতিবাহিত হলো। কেউ কারো উপর বিজয় লাভ করতে পারলো না। এদিকে মুসলমানরা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ লিখে তাঁর কাছে আরো সমর সাহায্য প্রার্থনা করে লিখলেন, এভাবে সময়ের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। তারা যুদ্ধের উদ্দম উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ায় প্রেরিত বাহিনীর সিপাহসালারদের উপর আস্থাশীল ছিলেন। আবু ওবায়দা ও তার সাথী সিপাহসালারগণ এ নীতি গ্রহণ করবেন, ঘুর্ণাক্ষরেও তিনি এ ধারণা করতে পারেননি। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ—যারা স্বল্প সংখ্যক হয়েও মক্কার অধিক সংখ্যক মুশরিক বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, তারা রোমক শক্তির কাছে আজ এত অসহায় হয়ে পড়বেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা ভাবতেও পারছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহ

www.pathagar.com

আনহু, সহ মদীনায় অবস্থিত আহলে রায় সাহাবাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ আলাপ-আলোচনা ও পরার্শের মাধ্যমে প্রকৃত ব্যাপার আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো।

সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসা করে মুসলমানরা কখনো শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেখেনি। উন্নতমানের নেতৃত্ব, ঈমানী শক্তি এ দু'টো ছিলো মূল উপায় যা মুসলমানদেরকে সবসময় বিজয় ও সফলতা দান করেছে। সিরিয়া পাঠানো সৈনিকদের মধ্যে ঈমানী শক্তি অবশ্যই কম ছিলো না। কারণ, তাঁরা ছিলো প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী (সাবেকুনাল আউয়ালুন)ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহা সম্মানিত সাহাবাদের মধ্যে গণ্য এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। যাদের হাতেই মক্কা বিজয় এবং ধর্মত্যাগের ভয়াবহ কলহের অবসান ঘটেছে। অতএব অবশ্যই নেতৃত্বে ক্রটি আছে। রোমক বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য এমন একজন নেতার প্রয়োজন যিনি নির্ভিক চিত্তের অধিকারী। কোমলতা কি, তা তিনি জানেন না। যুদ্ধের ময়দানের যে কোনো পরিস্থিতিতেই যার কদম পেছনের দিকে হটে যায় না। মৃত্যু ভয় যার মনকে আচ্ছন্ন করে না। সিরিয়ায় প্রেরিত জেনারেলদের মধ্যে আবু ওবায়দা যোগ্য জেনারেল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের। ওমর বিন আস তো বুদ্ধিমান লোক হওয়া সত্ত্বেও ময়দানের সিপাহী নন। ইকরামা দক্ষ সৈনিক বটে কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির সমস্যা সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতার অভাব আছে। এসব সিপাহসালাররা বড় বড় যুদ্ধের মাঠে কাজ করেনি। উপরন্তু এদের একজন আর একজনের অধীনস্থতা মানতেও তৈরি ছিলেন না।

এ সত্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে স্পষ্ট হবার পর তাঁর দৃষ্টি এমন এক লোকের প্রতি নিবদ্ধ হলো যার মধ্যে একজন সুদক্ষ সিপাহসালার হিসাবে এসব গুণাবলীর সব কয়টিই ছিলো। আর তিনি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। এ খেয়াল আসার সাথে সাথেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সিরিয়ায় পাঠাবার মনস্থ করলেন এবং সাথীদেরকে বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! খালিদ বিন ওয়ালিদের মাধ্যমেই আমি রোমকদের মনে কোনো প্রকার শয়তানী চক্রান্তই থাকতে দেবো না।"

সিরিয়াভিমুখে খালিদের যাত্রা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ সিদ্ধান্তের সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। কেননা সিরিয়ার অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে, আর কালবিলম্ব করা মুসলিম বাহিনীর জন্য কঠিন বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। সকলেই খালিদ বিন ওয়ালিদকে সিরিয়ায় পাঠাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন। খালিদ গোপনে হজ্জ করে পুনরায় ইরাক পৌছে যাবার সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিলো। তিনি খালিদকে লিখলেন ঃ

"তুমি এখান থেকে রওনা হয়ে ইয়ারমুকে মুসলিম বাহিনীর সাথে গিয়ে যোগদান করো। ওখানে তারা শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কালাতিপাত করছে। তোমার এ

www.pathagar.com

কাজ (গোপনে হজ্জ করা) ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কাজ আর যেন না ঘটে। এটা আল্লাহর এক অপরিসীম করুণা যে, তোমার সামনে শত্রু দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর তুমি মুসলমানদেরকে শত্রুর অবরোধ থেকে সুন্দরভাবে উদ্ধার করে আনতে পারো। হে আবু সুলায়মান ! আমি তোমাকে তোমার সরলতা, সৌভাগ্যের জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ অভিযানকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে পৌঁছাও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমার মনে যেনো কোনো অহংকার সৃষ্টি না হয়। কেননা অহংবোধের পরিণতি ক্ষতিকর ও অমর্যাদাকর। নিজের কোনো কাজের জন্য গর্ববোধ করো না। আল্লাহই করুণাময় ও দয়াবান। তিনি মানুষের কার্যক্রমের বিনিময় দান করেন।"

এ সময় ইরাক থেকে চলে যেতে খালিদের মন চাইছিলো না। যতদিন পর্যন্ত তাঁর হাতে ইরানী দারুল হুকুমাত বিজয় ও ইরান শাহ কেসরার সিংহাসন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে না পড়বে ততদিন তিনি ইরাকেই অবস্থান করতে চাইছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তখন ওটা খালিদ বিন ওয়ালিদের জন্য কোনো কঠিন কাজ ছিলো না। কারণ, তখন ইরান বাহিনী খালিদের মুকাবিলার চাপ সহ্য করতে না পেরে একের পর এক যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেই চলেছে। তাদের সব শক্তি সামর্থ নিঃশেষ। শুধু একটা হেচকা টানে তাদের সাম্রাজ্যকে সমূলে উৎপাটন করা সহজ হয়ে পড়েছিলো। মাদায়েন বিজয়ের ব্যাপারটিও কোনো মামুলী ব্যাপার ছিলো না। এটাও ছিলো এমন এক বিরাট মর্যাদা যা লাভ করার জন্য রোমক সম্রাট কায়সারের মতো বাদশাহর মনকেও অস্থির করে রেখেছিলো।

এ পর্যায়ে ইরাক ছেড়ে সিরিয়া যাবার হুকুম পাবার পর খালিদ বিন ওয়ালিদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে ইরাক থেকে সরাবার ব্যাপারে ওমর বিন খাত্তাবের হাত ছিলো। বস্তুত তাবারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পড়ার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন ঃ

"এ কাজ নিশ্চয়ই ওয়াইসার বিন উম্মে শামলার (ওমর বিন খাত্তাব)। আমার হাতে কেন ইরাকের বিজয় ঘটেছে এতে তিনি ঈর্ষান্বিত।"

সম্ভবত খালিদ বিন ওয়ালিদের মনে একথাও জেগে থাকবে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে তাঁর স্থান দখল করতে চান। এ কারণেই তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর চাপ প্রয়োগ করে তাঁকে সিরিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এ ধারণা তার মনে উদয় হলেও 'বদ ধারণা' পোষণ করার জন্য তাকে দোষারোপ করা যায় না। কেননা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন ঃ

"আমার ইচ্ছা ছিলো, যখন আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলাম, তখন ওমর বিন খাত্তাবকে ইরাকে পাঠাবার। আমি আমার মৃত্যুর পর তাহলে আল্লাহর কাছে গিয়ে বলতে পারতাম, হে আল্লাহ ! আমি আমার দু'টো হাতকেই তোমার রাহে বিছিয়ে দিয়ে এসেছি।"

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন খালিদের মনে অবশ্যই এসব ধারণা জাগবে। আর এর প্রতিক্রিয়া তার কাজে পড়বে। এ জন্যই তিনি চিঠিতে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, যে কাজ (গোপন হজ্জ) তুমি করেছো, ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর করবে না। এভাবে তিনি তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছেন, তার প্রথম কাজ হলো খলিফার আদেশ মানা। খলিফার ইচ্ছা বা মর্জির বিরুদ্ধে কোনো কাজ না করা।

ধারণা করা হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদের তরফ থেকে গর রাজীর আশংকা করার কারণে চিঠিতে তিনি যেখানে তার বাহাদুরী ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন, সেখানে তাকে এজন্য কোনো প্রকার অহমিকা ও গর্ববোধ করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় এ সত্য উৎঘাটন করে দিয়েছেন, দয়া ও করুণা দানকারী একমাত্র আল্লাহ পাক। নিজের শক্তি ও হিম্মতের উপর ভরসা করে বিজয় লাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদ বিন ওয়ালিদের মনে উত্থিত সন্দেহ-সংশয়কে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তিনি তাকে অর্ধেক বাহিনী মুসান্না বিন হারেসার অধীনে ইরাকে ছেড়ে দিয়ে বাকী অর্ধেক নিয়ে সিরিয়ায় রওনা হয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে চিঠির শেষ ভাগে লিখলেন ঃ

"আল্লাহ তোমাকে সিরিয়ায় বিজয়ী করলে তুমি সে বাহিনী নিয়েই ইরাক চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তোমার দায়িত্ব আবার হাতে তুলে নেবে।"

এভাবে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের সন্দেহ দূর করেছিলেন, ইরাকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বা অন্য কোনো লোকের আসার ব্যাপারে কোনো ভাবনা করা ঠিক নয়। কেননা সেখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন মুসান্না বিন হারেসা। সিরিয়া বিজয়ের পর তার উপর আবার ইরাকের দায়িত্ব সপর্দ করা হবে।

খালিদ বিন ওয়ালিদের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না, আল্লাহ তাঁকে সিরিয় বিজয়ের গৌরব দান করবেন। যদিও তিনি ওখানকার সব খবরাখবর পেতেন, কিন্তু তারপরও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তার মন ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ ছিলো যে, তিনি আল্লাহর তরবারী। আর আল্লাহর তরবারী বান্দাদের হাতে পরাজিত হতে পারে না। সুতরাং তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হুকুম অনুযায়ী সিরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সিরিয়ায় সংঘটিত ওসব ঘটনাবলী সম্পর্কে যেহেতু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাঁর সাথে সকল সাহাবাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু অর্ধেক বাহিনী মুসান্নার নেতৃত্বে এখানে রেখে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই তিনি বাহিনীকে এমনভাবে সাজা[illegible] ত সব সাহাবী তাঁর ভাগে আসে। ঠিক সম পরিমাণ লোক মুসান্নার ভাগে রই[illegible] [illegible]রা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত সাহচর্য পাননি। এরপর তিনি বাহিনীকে বাছাই করে এমন লোকদেরকে তাঁর সাথে রাখলেন যারা দূত হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। ঠিক সম পরিমাণ লোক মুসান্নার ভাগে রাখলেন যারা নিজ নিজ গোত্রেই অবস্থান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কোনো সময় হাজির হননি। এরপর বাকী লোকদেরকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে এক ভাগ মুসান্নাকে দিয়ে আর এক ভাগ নিজে নিয়ে নিলেন। ভাগের এ অবস্থা দেখে মুসান্নার ভীষণ রাগ পেলো। তিনি খালিদকে বললেন ঃ

> "আল্লাহর কসম ! আমি আপনাকে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমের এক চুল পার্থক্য করতে দেবো না। তাঁর হুকুমানুযায়ী সাহাবাদের অর্ধেক আমার কাছে থাকবেন। আর অর্ধেক আপনি নিয়ে যাবেন। আপনি কেনো আমাকে এদের থেকে বঞ্চিত করবেন ? অথচ আমার বিজয় সাহাবাদের উপরই নির্ভরশীল।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসান্নার জিদ দেখে বুঝিয়ে শুনিয়ে মর্যাদাশীল সাহাবাদেরকে তাঁর সাথে রাখতে রাজী করিয়ে নিলেন।

তাঁর চলে যাবার পর আবার কোনো বিপদ এসে পড়ে ভয়ে খালিদ দুর্বল নারী-পুরুষদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ না করুন যদি ইরানীরা মুসলমানদের কোনো ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারে তাহলেও যেনো এসব দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা এর থেকে রক্ষা পায়। এসব কাজ সেরে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বাহিনী নিয়ে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। মুসান্নাও একটি বাহিনী নিয়ে বেশ পথ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন।

ইরাক থেকে সিরিয়ায় যেতে একটি বিস্তীর্ণ মরু পথ ধরে যাওয়াই ছিলো সবচেয়ে নিকটবর্তী পথ কিন্তু এ পথটি ছিলো প্রথমত ভয়াবহ ও কঠিন চলার পথ। এ পথ অতিক্রম করা ছিলো বড় দুঃসাধ্য কাজ। অত্যন্ত হুঁশিয়ার পথিকের পক্ষেও এ পথ ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে যদি হাজার রকমের সংকট অতিক্রম করে কোনো রকমে এ দুর্গম মরু পথ পাড়ি দেয়া সম্ভবও হয় তাহলেও বাকী পথ সহজে অতিক্রান্ত করা সম্ভব হয় না। কারণ, সীমান্তের সব আরবীয় গোত্রগুলো রোমক সম্রাজ্যের মিত্র ছিলো। কায়সারের একটি বাহিনীও ওখানে অবস্থানরত ছিলো। তারা অতি সহজে মুসলিম বাহিনীর পথ কেটে দিতে পারতো। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রথমে আরবে এসে ওখান থেকে সিরিয়ার পথ ধরে যাত্রা করতে পারতেন। এ পথ ধরেই এর আগে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য সিপাহসালারগণ সিরিয়ায় গিয়েছিলেন কিন্তু এ পথে সময় অনেক বেশী লেগে যেতো। ফলে সিরিয়ায় গমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে পড়তো। তাই যে পথে শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে না ও সাথীদের কাছেও তাড়াতাড়ি পৌছা যাবে। এ ধরনের পথ সন্ধান করাই ছিলো খালিদের প্রথম কাজ। যে পথেই যাবার চিন্তা করছেন সে পথেই হয় ভয়াবহ মরু পথ অতিক্রম করে শত্রুর সাথে মুকাবিলা করে সিরিয়ায় পৌছতে হয় অথবা আরবের দীর্ঘ দূরত্বের পথ ধরে সিরিয়ায় পৌছতে হয়।

www.pathagar.com

অবশেষে এখানেও আল্লাহর সাহায্য নেমে আসলো। আল্লাহর তরফ থেকে একটি নতুন ও অভিনব পথের দিকনির্দেশনা হলো। সাথীরা এ পথ অতিক্রম করা অসম্ভব বলে ধারণা করলো। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সিদ্ধান্তে অটল। তাই বাধ্য হয়ে সকলকেই তাঁর কথা মানতে হয়।

বর্ণিত হয়েছে, আইনুত তামার থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে মরু পথ, তা ধরে যাত্রা করা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সমীচীন মনে করলেন না। অন্য পথের তুলনায় এ পথের দূরত্ব কম হলেও যেহেতু মাঝপথে রোমীয়দের মিত্র গোত্র ছিলো এবং কায়সারের বাহিনীও ঐ পথে ঘাটি করে বসেছিলো ; তাই সংঘর্ষ থেকে বাঁচার জন্য খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পথ না ধরে ঐ পথ অবলম্বন করলেন। যা এর আগে আইয়াজ বিন গানামের সাহায্যের জন্য হিরা হতে দাওমাতুল জুন্দল যাবার জন্য অবলম্বন করা হয়েছিলো।

বাহিনী সহ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে দাওমাতুল জুন্দল পৌছলেন। ওখান থেকে ইয়ারমুকে পৌছার জন্য সারহানের বনাঞ্চলের পথ অবলম্বন করলেন। এখানে বনু কালবের কিছু গোত্র বসবাস করতো। তারা বস্তির উপর আক্রমণ করে একে বিজয় করে নিলেন। যদি সারহানের বনাঞ্চলের পরিচিত পথ ধরে তিনি চলতেন তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই বসরা পৌছে যেতে পারতেন। ওখান থেকে আবু ওবায়দার বাহিনীকে সাথে নিয়ে ইয়ারমুকে ইসলামী বাহিনীর সাথে যোগ দিতেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিলো, বসরা পৌছার আগেই রোমীয় শক্তি তাদের পথ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। তাহলে ইয়ারমুক পৌছতে বিলম্ব ঘটে যেতো। এসব আশংকার কারণে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথীদের কাছে বিনা সংঘর্ষে রোমের কাছে পৌছে যাবার কোনো সহজ পথ আছে কিনা, তা জানতে চাইলেন। কারণ, পথিমধ্যে রোমকদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ইয়ারমুকে পৌছতে দেরী হয়ে যাবে। সকলে প্রশ্নের উত্তরে একমত হয়ে জবাব দিলেন—পথ তো আছে বটে কিন্তু এ পথে তো সেনাবাহিনী কোনো রকমেই চলতে পারবে না। শুধু একা একা পায়ে চলা পথ। কাজেই এমন পথ ধরে মুসলমানদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু মর্দে মুজাহিদ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পথ অবলম্বন করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করলেন। তিনি বললেন ঃ

> "তোমরা তোমাদের নিজকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য পেশ করেছো। এখন তোমরা পেছনে হটতে অথবা আত্মবিশ্বাস কমিয়ে ফেলতে পারো না। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদান পাওয়া যায় নিয়াত অনুযায়ী। আল্লাহর রহমত ও সাহায্য পেয়েও বিপদাপদকে ভয় করা ও হিম্মত হারিয়ে ফেলা কোনো মুসলমানের উচিত নয়।"

একথা শুনে সংগী-সাথীদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেলো। তার সামনে আত্মসমর্পণ করে তারা বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আপনার জীবনকে আল্লাহ্ সকল প্রকার কল্যাণ ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। এ কারণেই দ্বিধাহীনচিত্তে আপনি আপনার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন। আমরা আপনার সাথে থাকবো।"

তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাহ্‌বার খুঁজলেন। লোকেরা রাফে বিন ওমাইরা আত-তায় এর নাম বললেন, তিনি তাঁকে ডেকে বললেন ঃ

"আমরা এ পথে রওনা দিতে চাই। পথ দেখিয়ে নেবার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হলো।"

রাফে জবাবে বললেন ঃ

"এ পথে আপনি এত ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জাম সহ্ চলতে পারবেন না। এ পথ তো এমন যে এখানে একজন আরোহী মাত্র পথ অতিক্রম করতে পারে। তাও আবার নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে নয়। গোটা পাঁচটি রাত লাগবে। পথ হাবাবার ভয় ছাড়াও এ পথে পানির নামগন্ধও পাওয়া যাবে না।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ তার দিকে চোখ মটকিয়ে তাকিয়ে বললেন ঃ

"যত যাই হোক, আমাকে ঐ পথ ধরেই যেতে হবে। তোমরা এখন বলো ও পথে যেতে হলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ?"

রাফে বলে উঠলেন ঃ

"যদি আপনি একান্তই এ পথ ধরে যেতে চান তাহলে লোকজনকে পর্যাপ্ত পানি সাথে নেবার হুকুম দিন। আর যারা পারে তারা যেনো তাদের নিজের উটকে খুব বেশী করে পানি পান করিয়ে ঠোঁট বেঁধে নেয়। কারণ, এ সফর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজ্জনক। আর আমাকে খুব মোটা তাজা বিশটি বয়স্ক উট সংগ্রহ করে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

রাফের চাহিদানুযায়ী খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁকে বিশটি উটের ব্যবস্থা করে দিলেন। এ বিশটি উটকে প্রথমত রাফে বেশ তৃষ্ণার্ত করে রাখলেন। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে রাফে এ উটগুলোকে বেশ ভালো করে পানি পান করালেন। বেশ তৃপ্ত হবার পর রাফে উটগুলোর ঠোঁট ছিদ্র করে বেঁধে দিলেন, যেন তারা পথে জাবর কাটতে না পারে। এরপর তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে বললেন, এখন আপনি বাহিনীকে রওনা হবার হুকুম দিতে পারেন। বাহিনী রওনা হলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাদের সাথে রওনা হলেন। যেখানেই অবস্থান গ্রহণ করা হতো সেখানেই চারটি উটের পেট চিরে যে পানি পাকস্থলী হতে পাওয়া যেতো তা ঘোড়াকে পান করানো হতো। আর সাথে করে আনা পানি সৈনিকরা পান করতো।

বিরাণ মরুভূমি ভ্রমণের শেষ দিন খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু রাফেকে যিনি চোখে কম দেখতেন, বললেন, পানিতো শেষ হয়ে গেছে। এখন কি করা যেতে পারে ? রাফে উত্তরে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। আমরা সহসাই পানি পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছি।"

সামান্য দূর অগ্রসর হবার পর বাহিনী দু'টো টিলার কাছে পৌছলে রাফে লোকদেরকে বললেন ঃ

"দেখতো, 'উ'ছজের' এমন কোনো ঝাড়-জংগল আছে ? যা দেখতে মানুষের পিঠের মতো।"

মানুষেরা বললো, কই এমন কোনো ঝাড়-জংগল তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। একথা শুনে রাফে ভীত বিহ্বল হয়ে, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে বললেন, ভালো চাও তো যেভাবেই হোক তা খুঁজে বের করো। অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর সে ঝাড় পাওয়া গেলো। কিন্তু কেউ বোধহয় তা কেটে দিয়েছিলো। এখন শুধু কাণ্ডটি বাকী ছিলো। তাই চিনা যাচ্ছিলো না। ঝাড় পাওয়া যাবার পরই উচ্চস্বরে মুসলমানরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে উঠলো। রাফে বললেন ঃ

"এখন তোমরা এ ঝাড়ের মূলের কাছে মাটি খুড়ে বের করো।"

মাটি খোড়ার পর সেখানে কূপ বের হয়ে আসলো। এ কূফ থেকে সকলে তৃপ্তি মিটিয়ে পানি পান করলেন। নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার পর রাফে বললেন ঃ

"আমি ছোটবেলা আমার পিতার সাথে এ কূপের কাছে একবার মাত্র এসেছিলাম।"

এবার খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয় সীমান্তে প্রবেশ করলেন। পথে আর কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি। দ্রুত সফর করে তারা 'সূয়া' পৌছে গেলেন। ভোর হবার সামান্য আগে তারা ওখানে পৌছেই বস্তির উপর হামলা করে বসলেন। মুসলমানদের আগমনের কোনো আভাস ইঙ্গিতও তারা এর আগে পায়নি। ভীত হয়ে তারা মুকাবিলা করার কোনো শক্তি না পেয়ে মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিলো। আর একটু এগুবার পর 'তাদাম্মুর'বাসীদের সাথে সংঘর্ষ হলো। সামান্য প্রতিরোধের পরই তারাও বশ্যতা স্বীকার করলো। কাছেই ছিলো দামেশক, কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর হামলা পরিচালনা করতে চাইলেন না। কারণ, এভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তারা পথে রোমকদের সাথে লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকতো। ফলে প্রোগ্রাম অনুযায়ী মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ইয়ারমুক পৌছতে পারতো না। আর এ কারণেই চলার সাধারণ পথ ছেড়ে দিয়ে তারা মিত্রপক্ষীয় এলাকার পথ ধরে 'কসমে' গিয়ে পৌছলেন। ওখানকার অধিবাসীরা 'কাজায়া' গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলো। তারা মুসলমানদের সাথে আপোষ করে নিলো। ওখান থেকে তারা 'আজরোতে'র দিকে চললো। 'মারজ রাহেত' পৌছার পর গাসসানীদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরাজিত করে ওখানকার লোকজনকে গ্রেফতার করে ফেললেন। ওখান থেকে রওনা হয়ে বসরা গিয়ে পৌছলেন। এখানেই আবু ওবায়দা বিন জাররাহ, শোরহাবিল বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। তাদেরকে সাথে নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহরের উপর হামলা করে বসলেন

এবং তা বিজয় করে নিলেন। এখান থেকে এসব সমরনায়কগণ স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে ওমর বিন আসের কাছে পৌছলেন। তিনি ফিলিস্তিনে 'গাওরের' কাছে 'আরবাত' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ সাথীদের কাছেই নিজ বাহিনীর জন্য ঘাটি বানালেন। এভাবে সকল ইসলামী বাহিনী ইয়ারমুকে এসে একত্রিত হলো।

খালিদ সাইফুল্লাহর সিরিয়া সফরের ব্যাপারে এ বর্ণনাই সাধারণত ইতিহাসে পাওয়া যায়। দৃশ্যত এসব বর্ণনা গল্প কাহিনীর চেয়ে বেশী কিছু পার্থক্য বলে মনে হয় না। যা প্রখ্যাত প্রখ্যাত লোকদের ব্যাপারে রচনা করে করে প্রচার করা হয়। রাফে বিন ওমাইরার রাহবরীতে কণ্টকাকীর্ণ মরুপথ অতিক্রম করার ঘটনা দৃশ্যত খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। কিন্তু এরপরও তা বিশ্বাস না করে কোনো উপায় নেই। কেননা খালিদ সাইফুল্লাহর গোটা জীবনটাই বিস্ময়কর ঘটনায় ভরপুর। আইয়াজ বিন গানামের সাহায্যে 'আইনুত তামার' থেকে 'দাওমাতুল জুন্দল' যাবার ঘটনা কি বিস্ময়কর ছিলো না ? খালিদের গোপন হজ্জ সমাপনের বিষয়টি কি মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে তাক লাগিয়ে দেয় না ? মুসাইলামার দমন, ইরাকের বিরাট বিরাট বিজয়সমূহ কি মানুষকে বিস্মিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় ? উদ্দেশ্য হাসিল ও লক্ষ্যে পৌছার জন্য সবসময়ই তিনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যার দ্বারা অল্প সময়ে অত্যন্ত উত্তম ফলাফল লাভ করা যায়। এখানেও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অভ্যাস অনুযায়ী তাই করেছেন। এ ভয়াবহ ও বন্ধুর মরু পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় পৌছলেন যেনো পথে শত্রুর সাথে সংঘর্ষ না হয় এবং সহজে তিনি মুসলিম বাহিনী পর্যন্ত পৌছে যেতে পারেন। সুতরাং তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করেছেন। শত্রুরা তাকে পথে রুখে রাখতে পারেনি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক তো এ বর্ণনাকে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে এ সতর্কতাও অবলম্বন করেছেন যেনো বর্ণনায় অবিশ্বাস্য কিছু না আসে। এ কারণেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে খালিদের সাথে ইরাক হতে আসা বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন এ বাহিনীর সংখ্যা ছিলো নয় হাজার। কেউ বলেন ছয় হাজার। আবার কেউ বলেন পাঁচ হাজার থেকে আট শতের মধ্যে ছিলো। যারা বাহিনীর সংখ্যা নয় হাজার ছিলো বলে দাবী করেন, তারা বলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুম অনুযায়ী খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সে সময় ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিলো আঠার হাজারের কাছাকাছি। আর যারা বাহিনীতে সেনা সংখ্যা এক হাজারের কম বলেন, তারা বলেন, আরবে আজমে খালিদের বাহাদুরীর যে প্রতাপ প্রতিপত্তি ছড়িয়ে ছিলো সিপাহসালাররা ও বড় বড় রাজা-বাদশাহ তার নামে ভয়ে কেঁপে উঠতো। শত্রুদের ভীত করার জন্যই তাঁকে ওখানে পাঠানো হয়েছিলো। নতুবা যেসব সৈনিক ওখানে রোমের মুকাবিলায় উপস্থিত ছিলেন, তারাই সংখ্যার দিক দিয়ে যথেষ্ট ছিলেন। তাছাড়াও মদীনা হতে বরাবরই তাদের কাছে সমর সাহায্য এসে পৌছতো।

www.pathagar.com

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক হতে অবশ্যই অর্ধেক বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু 'কারাকার' পৌছার পর জংগল ও সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার কারণে তিনি নিজের সাথে মাত্র কয়েকজন সৈন্য রেখে বাকী সব সৈনিককে ওয়াদিয়ে ছারহানের বড় পথ ধরে সিরিয়ায় পৌছার পরামর্শ দিলেন। তিনি কয়েকজন মাত্র সাথী নিয়ে বসরা পৌছে গেলেন। আমাদের মতে এ বর্ণনাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ, উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, খালিদ পথে রোমীয়দের সাথে সংঘর্ষ বাঁধা থেকে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। তাই সহজ পথ ছিলো বাহিনীর বেশী সংখ্যক ছেড়ে দিয়ে মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে রওনা হওয়া। কেননা শত্রুর সামনে তাদের এ পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথে চলে যাওয়া একটি ছোট দলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী শত্রুদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

যাই হোক, এসব ব্যাপারে বর্ণনা যে রকমই হোক না কেনো, একথা নিশ্চিত সত্য যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিরাপদে মুসলিম বাহিনীর সাথে ইয়ারমুক গিয়ে যোগ দিয়ে রোমকদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। হিরাকলে বাহানকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়েছিলো। সে খুব জাঁকজমকের সাথে এসে 'ওয়াকুসা' নামক স্থানে অবস্থিত রোমক বাহিনীর সাথে মিলিত হলো। এ বাহানই খালিদ বিন সাঈদকে পরাজিত করেছিলো। বাহান পৌছার কারণে রোমক বাহিনী খুশীতে আত্মহারা। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদের আগমনে মুসলিম বাহিনীও অসীম আনন্দিত। উভয় পক্ষ এখন অপরকে হারাবার জন্য সকল সামরিক উপায়-উপকরণ নিয়ে স্বশরীরে দণ্ডায়মান।

মুসলমানদের জন্য এ অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। একেতো রোমের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। দ্বিতীয়ত সাজ-সরঞ্জাম ও সমর প্রস্তুতির দিক থেকেও রোমক শক্তির কাছে মুসলমানদের কোনো তুলনাই হয় না। পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেই রোমক শক্তি মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য বের হয়েছিলো। এরপরও একথা বলা ঠিক হবে না যে, রোমকরা আরবদের থেকেও বেশী যুদ্ধ বিশারদ ছিলো। যুদ্ধের রীতিনীতিও আরবদের থেকেও বেশী জানতো। ঠিক এ কারণে পুরো দু'টি মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ফায়সালা হতে পারেনি। উভয় উভয়ের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করে বসে আছে। বাহ্য দৃষ্টিতে সমর-সম্ভারে তো রোমকরা ছিলো আরবদের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু অন্তর দৃষ্টিতে মুসলমানরা তাদের চেয়ে অনেক গুণ অগ্রসর ছিলো। সিরিয়ায় বসবাসকারী বদ্দু জাতি আর ইরানের সাথে যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী হেরাকলের সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো রোমক বাহিনী। এদের মধ্যে প্রথমত কোনো যৌথ স্বার্থ নিহিত ছিলো না। আর দ্বিতীয়ত যে যুদ্ধের জন্য তারা বেরিয়ে আসলো তার জন্য তাদের সামনে সুনির্দিষ্ট আদর্শও ছিলো না। পক্ষান্তরে গোটা আরব সমন্বয়ে গঠিত ছিলো মুসলিম বাহিনী। দ্বিতীয়ত তাদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, রোমীয়দের সাথে এ যুদ্ধ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। এ

www.pathagar.com

যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি নিশ্চিতই শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। পরকালে তিনি অবশ্যই জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করবেন। আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আর যারা শাহাদাত লাভ করতে পারবে না, আল্লাহর দরবারে তারা মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবেন। তারাও শহীদদের মতো বিরাট প্রতিদানের যোগ্য হবেন। এ ছাড়াও তারা এ দুনিয়ায় মালে গানিমাতের মালিক হবেন। তাদের একদিকে বিরাট বাহিনী জমায়েত হবার বিশ্বাস অপরদিকে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিলো। একদিকে দুনিয়ার উপায়-উপকরণের উপর ভরসা ছিলো, অপর পক্ষে ছিলো রূহানী শক্তির স্পন্দন।

দিন, সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে চলেছে। উভয় পক্ষের বাহিনী নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কারো মধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থা খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে অসহ্য ছিলো। আজ পর্যন্ত শত্রু পক্ষকে দেখলে তাঁর পক্ষে ধৈর্যধারণ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠতো। কিন্তু এখন খালিদ বিন ওয়ালিদের পক্ষে একা কিছু করার সুযোগ ছিলো না। মুসলিম বাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেক ভাগের সেনাবাহিনীর পৃথক পৃথক সেনাপতি ছিলো। এমনকি প্রত্যেক বাহিনীতে নামাযের জন্য আযানও পৃথক পৃথকভাবে দেয়া হতো। ইরাক থেকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানকার সাথীদের শুধু সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। তাকে এ সকল বাহিনীর আমীর করে পাঠানো হয়নি। নিজের এত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো না। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে রোমীয়রা মুসলমানদের উপর হামলা করতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের হামলাও তেমন কোনো সুফল দান করলো না। মুসলিম বাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে ক্যাম্পে ফিরে আসতো।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এ সময়গুলো ছিলো বড় ধৈর্যের পরীক্ষার দিন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয় বাহিনীর নেতৃত্বে তাঁর উপর অর্পণ করেননি। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও তাঁর উপর নেতৃত্ব ছেড়ে দেবার কথা বলতে পারছেন না। কারণ, তাহলে অন্যরা ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে মদীনায় একটি শক্তিশালী পক্ষ আগ থেকেই গড়ে উঠেছিলো। তারা জোরেশোরে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। কিন্তু ইয়ারমুকের এ প্রান্তরে এখন যা ঘটছে তাতে মুসলমানদের সাহস হিম্মত বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। রোমীয়রা বরাবরই তাদের সারি সুবিন্যস্ত করছে। তাদের ক্যাম্প থেকে আসা গোপন খবর থেকে জানা যাচ্ছে, তারা মুসলমানদের উপর তুমুল আক্রমণ পরিচালনার জন্য সময় সুযোগ খুঁজছে। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্যান্য সমর নায়করাও রোমকদের প্রস্তুতি গ্রহণের ভয়াবহ খবর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ অবস্থায় সকল বাহিনী প্রধানদেরকে একজন সমন্বিত নেতার নেতৃত্বে এক করার জন্য পরামর্শ দিতে খালিদের মন চাইলো। কিন্তু এ সংকট সন্ধিক্ষণে এতবড় শক্তির সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি তার ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করতে পারছিলেন না। তিনি যদি সব ইসলামী বাহিনীর একজন সিপাহসালার হবার জন্য কোনো এক

www.pathagar.com

ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন, তাহলে অন্যান্যরা এতে অসন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন। এখন কি করবেন তিনি ?

এদিকে বাহানের আগমনের পর রোমকদের যুদ্ধ প্রস্তুতি বেশ বেড়ে গেলো। কিছুসংখ্যক পাদ্রীও সে সাথে করে নিয়ে এসেছিলো। এসব পাদ্রীরা জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোকমদেরকে উত্তেজিত ও ঈসায়ী ধর্ম রক্ষার ব্যাপারে তাদের যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতো। অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় রোমকদেরকে তারা বলতো। যদি এ সময় তারা দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা না করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা না নেয়, তাহলে ঈসায়ী ধর্ম এখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই ঈসায়ী ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবনের বাজি লাগিয়ে একজন মুসলমানকেও জীবন্ত ছেড়ে দেয়া যাবে না।

এসব অগ্নিঝরা বক্তৃতায় বেশ প্রভাব পড়লো। রোমক বাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো। প্রত্যেকটি রোমক ঈসায়ী ধর্ম রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। অবশেষে একদিন মুসলমানরা খবর পেলেন রোমক বাহিনী আগামী দিন হামলা করার জন্য তৈরি। বাহান এমনভাবে তার বাহিনীকে সারিবদ্ধ করলো যার কোনো নজীর আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি। এসব খবর মুসলিম বাহিনীর নেতাদের বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তারা একত্রিত হয়ে রোমক বাহিনীর মুকাবিলা করার উপায় চিন্তা করতে লাগলো।

প্রত্যেক নেতাই বিভিন্ন পরামর্শ দান করলেন। কিন্তু বাহিনীকে সারিবদ্ধ করার ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বললেন না। কেননা প্রত্যেক নেতাই তার নিজ বাহিনীকে সারিবদ্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল। খালিদের বলার পালা আসলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহর হামদ ও ছানা পড়ে বলতে লাগলেন ঃ

> "আজকের দিন আল্লাহর সৃষ্ট দিনগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ কারো জন্য কোনো গর্ব অনুভব করা, নিজ মতামতকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করার দিন নয়। আমাদের জিহাদ আল্লাহর জন্য। আজ আমাদের সকল কার্যক্রম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিবদ্ধ হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, আজকের বিজয় চিরদিনের বিজয়। আবার আজকের পরাজয়, চিরদিনের পরাজয়। আজ এমন এক জাতির সাথে আমাদের মুকাবিলা হচ্ছে যারা প্রতি ক্ষেত্রেই তৈরি ও সুশৃংখলিত। আজ আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। খলিফাতুন নবী আজ আমাদের থেকে অনেক দূরে। তিনি যদি আমাদের খবর জানতেন, তাহলে কখনো তিনি আমাদেরকে এভাবে যুদ্ধ করতে দিতেন না। অবশ্য আপনারা এমন কোনো আদেশ তাঁর কাছ থেকে পাননি। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আপনারা এভাবে সমাধা করুন যেনো এটা আমাদের খলিফার এবং তার শুভাকাংখিদের নির্দেশ।"

খলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণের সময় সমর নেতাগণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। মাথা নীচু করে সকলেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন। অবশেষে তারা

www.pathagar.com

উপলব্ধি করলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাই ঠিক। তিন মাসের মধ্যে তারা রোমক শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছেন না এটাই তো তার প্রকৃত প্রমাণ। বরং উল্টো মুসলমানদের এ অবস্থার সুযোগে রোমক শক্তি নিজেদের পুনর্গঠিত ও মযবুত করে নিয়েছে। এ সময় এ সকল সমর নায়কদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, আল্লাহ না করুন যদি রোমীয়রা বিজয় লাভ করে আর তাদেরকে পরাজিত করে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তাহলে সিরিয়া আসার পূর্বে আবু বকর তাদেরকে যে বিভিন্ন জায়গার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন তার কি হবে ? আবু ওবায়দা যদি হামসে পৌছতে না পারে, তাহলে ওখানকার দায়িত্ব কিভাবে লাভ করতে পারবে ? মুসলমানদেরকে যদি পেছনেই সরে আসতে হয়, তাহলে ইয়াজিদ 'বালকার' শাসনভার কিভাবে দখল করতে পারবে ? যদি তাদেরকে পেছনেই সরতে হয়, তাহলে শোরহাবিল উর্দুনে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে ? যদি এ ভূখণ্ডে মুসলমানরা টিকতে না পারে, তাহলে ওমর বিন আস 'আরবায়' কিভাবে হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করবে ? যদি রোমীয়রা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে এ সমর নেতাগণ কোন্ মুখে মদীনা প্রবেশ করবেন ? মদীনাবাসীকে কিভাবে তারা মুখ দেখাবে ?

অবশেষে তারা বললো ঃ

আপনি বলুন, এ অবস্থায় আমাদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত ?

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন ঃ

"আমি উদ্ভূত এ পরিস্থিতিকে সহজেই আয়ত্বে নিয়ে আসবো—এ আশায়ই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এখন এখানে যে অবস্থা, তিনি যদি তা জানতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্রিত রাখতেন। যে অবস্থার ভিতর দিয়ে এখন তোমরা অতিবাহিত করছো তা তোমাদের প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে অনেক কঠিন এবং মুশরিকদের অনুকূলে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা সকলেই পৃথক পৃথক হয়ে আছো। আমি জানি তোমাদের সকলকে বিভিন্ন শহরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় যদি কোনো এক ব্যক্তিকে সিপাহসালার নিয়োগ করে তার আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে তাতে তোমাদের মর্যাদা কমবে না। আর আল্লাহ এবং আমীরুল মু'মিনীনের কাছেও তোমাদের ইজ্জত হ্রাস পাবে না। একটু লক্ষ্য করে দেখো শত্রু কত বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করে বসে আছে। স্মরণ রাখবে যদি আমরা আজ এদেরকে এদেরই পরিখায় ঠেলে দিতে পারি, তাহলে সবসময়েই আমরা তাদেরকে ঠেলতে থাকবো। কিন্তু যদি তারা আমাদেরকে পরাস্ত করে দেয়, তাহলে আমরা আর কোনোদিন বিজয় লাভ করতে পারবো না। অতএব এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো আমাদের প্রত্যেকেই পালাক্রমে আমাদের পদ লাভ করবো। আজ যদি একজন আমীর হন, কাল আমীর হবেন আর একজন। পরশু হবেন অন্যজন। তারপরের দিন হবেন চতুর্থজন। এভাবে প্রত্যেকেই আমীর হবার সুযোগ পাবেন। তবে আজকের জন্য তোমরা আমাকে আমীর নিযুক্ত করো।"

www.pathagar.com

যুদ্ধের সূচনা

খালিদের মতামত ছিলো অত্যন্ত যুক্তিসংগত। সকল নেতাই তার মতে সম্মতি জানালেন। প্রথম দিনের জন্য তারা তাকেই আমীর নিযুক্ত করলেন। এরা মনে করেছিলো আজও রোমক বাহিনীর হামলা অন্যদিনের মতো স্বাভাবিক হবে। যুদ্ধ বিলম্বিত হবে। কাজেই প্রত্যেকেই পালাক্রমে আমীর হবার সুযোগ পাবেন।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ এক মাস ধরে রোমীয়দের নিয়ম-কানুন ও সারিবদ্ধভাবে কৌশল বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে আসছিলেন। তিনি তাদের মুকাবিলায় এমন একটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইলেন যা শুধু রোমীয়দের তাকই লাগিয়ে দেবে না বরং মুসলমানদেরকেও বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি ইসলামী বাহিনীকে আটত্রিশটি ছোট ছোট দলে ভাগ করেন। প্রত্যেক ভাগে কমবেশী এক হাজার সিপাহী ছিলো। তারপর বললেন ঃ

"তোমাদের শত্রু সংখ্যা অসংখ্য। আর তারা সংখ্যাধিক্যের জন্য গর্বিত। এ অবস্থায় এদের মুকাবিলা করার জন্য আমরা আমাদের বাহিনীকে অনেক ছোট ছোট দলে বিভক্ত করাই উত্তম পন্থা বলে মনে করি। তাহলে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত সংখ্যা থেকে অনেক বেশী দেখতে পাবে।"

মধ্যবর্তী স্থানে তিনি আঠারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রেখে দিলেন। আবু ওবায়দাকে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতা বানিয়ে দিলেন। এসব দলে ইকরামা বিন আবু জেহেল, কা'কা বিন ওমরও শামিল ছিলেন। ডান দিকে তিনি দশটি দল নির্দিষ্ট করলেন। ওমর বিন আসকেও এসব দলের নেতা নিযুক্ত করলেন। এসব দলে শোরহাবিল বিন হাসনাও ছিলেন। বাম দিকে তিনি নিযুক্ত করলেন দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। এসব দলের সরদার নিযুক্ত করলেন ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেরও আবার পৃথক পৃথক নেতা ছিলেন। তারা ডান, বাম এবং মধ্যবর্তী নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করতেন। এসব দলের নেতারা বাহাদুরী ও বিরত্বের ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টান্ত শুধু নিজেরাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কা'কা' বিন ওমর, ইকরামা বিন আবু জেহেল, সাফওয়ান বিন উম্মিয়া ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়।

এ বিন্যস্ততা ছাড়াও খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীর জন্য একটি অগ্রগামী দল বানালেন। এর জন্য নিযুক্ত ছিলেন গিয়াস বিন আশিম। বিচারের দায়িত্বে অর্পিত হয়েছিলো আবুদ দারদার উপর। মেকদাদ ছিলেন বাহিনীর ক্বারী। তিনি বাহিনীকে সূরা আনফাল পড়ে শুনাতেন। আসবাবপত্রের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। বক্তা ছিলেন আবু সুফিয়ান। তিনি বাহিনীর মধ্যে ঘুরতে থাকতেন এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র দলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! তোমরা আরবের বন্ধু ও দীনের সাহায্যকারী। তোমাদের শত্রুপক্ষ রোমের মিত্র এবং শিরকের মদদগার। হে আল্লাহ ! আজকের যুদ্ধ শুধু তোমার নামের জন্য। হে আল্লাহ ! তোমার বান্দাদের উপর তোমার সাহায্য নাযিল করো।"

www.pathagar.com

এক ব্যক্তিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে শুনলেন ঃ

"হায় ! রোমক সৈন্য কত বেশী ও মুসলিমগণ কত কম ?"

একথা শুনে খালিদের রাগ বেড়ে গেলো। চীৎকার দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"হায় রোমক সৈন্য কত কম ; মুসলিম সৈন্য কত বেশী। স্মরণ রেখো আল্লাহর সাহায্যে সৈন্য বেড়ে যায়। আর ব্যর্থতা ও কাপুরুষতার কারণে তা কমে যায়। জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যা স্বল্পতার উপর নির্ভরশীল নয়।"

তারপর তিনি আবার বললেন ঃ

"হায় আমার ঘোড়া 'আশকরের' পা যদি ভালো থাকতো, শত্রু সংখ্যা আমাদের চেয়ে যত বেশীই হতো না কেন, আমি মোটেই এর পরওয়া করতাম না।"

খালিদের একথা সমস্ত সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, প্রত্যেকটি সৈনিকের দেহের রক্ত টগবগ করে উঠলো। প্রত্যেকের মনে শাহাদাতের আশা বইতে শুরু করলো। প্রত্যেকের মুখ হতে বের হতে শুরু করলো ঃ

"সৈনিকের সংখ্যা আল্লাহর মদদের কারণে বেড়ে যায়। ব্যর্থতা ও কাপুরুষতার কারণে কমে যায়।"

প্রতিটি সৈনিকের স্মৃতিপটে অতীতের যুদ্ধের দৃশ্য ফুটে উঠলো। ঐসব যুদ্ধে মুসলমানরা কাফেরদের অসম শক্তির সাথে মুকাবিলা করেন। কিন্তু ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তার কাছে তারা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। প্রতিবারই তাদের পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে পিছনে সরে যেতে হয়েছে।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিলো যা সিরিয়া আসার পর আজ পর্যন্ত আর দেখা যায়নি। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আজই বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প পোষণ করে ফেলেছেন—তারা তা উপলব্ধি করে ফেললেন। তারা জানতেন, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে কোনো শক্তি তাঁকে আর রুখে রাখতে পারে না। এদিকে তারা রোমক বাহিনীকেও পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হতে দেখেছেন। মুসলমানদের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেছে। এ সময় এদের মনে খালিদের বাণী জেগে উঠলো ঃ

"আজকের দিন আল্লাহর সৃষ্ট দিনগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আল্লাহ মু'মিনদের জন্য জান্নাতের দরযা খুলে দিয়েছেন। আজ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবেন, তাঁকে চিরদিনের জীবন দান করা হবে।"

এ বাণী সৈনিকদের সাহস হিম্মত আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলো। তারা যুদ্ধের নির্দেশ ও ময়দানে বাহাদুরী দেখাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রোমীয়দের প্রস্তুতির খবর যেভাবে মুসলমানরা সংগ্রহ করেছে। রোমীয়রাও তেমনি মুসলমানদের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে। এলাকার কিছু বদ্দু সম্ভবত এসব খবরাখবর আদান-প্রদান করেছে। তবে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর

www.pathagar.com

আগমনের সংবাদে কোনো কোনো রোমক নেতাদের মনে ভয় ও দুশ্চিন্তা প্রবেশ করার সংবাদও মুসলমানরা শুনতে পেলো। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়া এসব নেতাদের মধ্যে 'চরচা' নামক নেতাও শামিল ছিলো। সে আরব বংশোদ্ভূত ছিলো অথবা ছিলো রোমীয় কিন্তু বহু বছর থেকে সিরিয়ায় বসবাস করার কারণে 'চরচা' ভালোভাবে আরবী ভাষা শিখে ফেলেছিলো। মুসলমানদের অনেক খোঁজ খবরই সে জানতো। তার গোয়েন্দাদের মুখে সে খালিদের অনেক নজীর বিহীন ও বিরাট বিরাট বিজয়ের কথা শুনে তার মনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একান্ত সাক্ষাত ও আলাপের বাসনা জাগলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু চরচার এ মনোবাসনার খবর জানতে পারলেন। বাহান, রোমক বাহিনীকে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য বের হবার নির্দেশ দিলে 'চরচা' অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। এ সময়টাকে বড় সুযোগ মনে করে 'চরচা' খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন।হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিনী থেকে বের হয়ে এসে উভয় বাহিনীর মাঝখানে তার সাথে মিলিত হলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো। রোমীয়রা চরচার সাহায্য প্রয়োজন মনে করে মুসলমানদের উপর তুমুল আক্রমণ শুরু করে তাদেরকে নিজ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিলো।

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদের ক্যাম্পের সামনে নিজের বাহিনী নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। মুসলমানরা রোমীয়দের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে পিছনের দিকে সরে আসছে দেখে ঈমানী জযবা তার দেহের শিরা-উপশিরায় বইতে শুরু করলো। তিনি উচ্চ স্বরে রোমীয়দের বলতে লাগলেন ঃ

> "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পবিত্র আত্মার সাথে আমি প্রতিটি ময়দানে লড়াই করে এসেছি। আজ কি আমরা তোমাদের ভয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবো ? আল্লাহর কসম ! এটা হতে পারে না। একথা বলে তিনি তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "মৃত্যুর জন্য বাইয়াত করতে যারা তৈরি, তারা এখানে আসো।"

ডাক শুনে জাররার বিন আজোর, হারিস বিন হিসাম, তাঁর ছেলে ওমর বিন ইকরামা, চারশ' অন্যান্য বাহাদুর ও সম্মানিত মুসলমান এবং অশ্বারোহীগণ ইকরামার হাতে মৃত্যুর 'বাইয়াত' গ্রহণ করলেন। ইকরামা তাদেরকে নিয়ে রোমীয়দের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ আকস্মিক আক্রমণে রোমীয়রা দিশেহারা হয়ে উঠলো। বিপদের উপর বিপদ ; ঠিক এ সময়েই চরচা খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলাপ-আলোচনার ফলে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন এবং নিজের বাহিনীসহ মুসলমানদের সাথে যোগ দিলেন। এ ঘটনা রোমকদের জন্য আরো বিপদ ভীতসন্ত্রস্তের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

ইয়ারমুক বিজয়

রোমক বাহিনীকে পেছনে সরতে দেখে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে অগ্রসর হয়ে রোমক বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দিলেন। ইকরামা

www.pathagar.com

বাহিনীর শক্তি কম ছিলো না। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীও যোগ দিলে যুদ্ধের ময়দান প্রলয়ের মতো কম্পিত হয়ে উঠলো। রোমকদের জন্য পালাবার পথ ছিলো না। তাদের পেছনে ছিলো 'ওয়াকুসার' ভয়াবহ ঘাটি ও গভীর পরিখা তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলো। সামনে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে দ্বিধাহীনভাবে হত্যা করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলছে। হাতে তরবারী নিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আগে আগে। এ সময় মুসলিম নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম কাজ করেননি। তারাও বাহাদুরীর সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। বস্তুত আবু সুফিয়ানের কন্যা 'জাবিরিয়া' এ যুদ্ধে যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তা ওহোদের যুদ্ধে তার মা হিন্দার কার্যক্রমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জাবিরিয়া এ যুদ্ধে ওহোদের যুদ্ধের তার মার কৃতকর্মের ক্ষতি পূরণ কিঞ্চিত হলেও পূরণ করে দেয়।

প্রতিরোধের জন্য রোমক বাহিনী জীবন পণ লড়ে যাচ্ছে। তাদের হাতের কাছে চলে আসা কোনো মুসলমানও জীবন নিয়ে বাঁচতে পারেনি। রোমীয়দের বাহাদুরী ও বীরত্বের জন্য বেশ সময় নিয়ে পরিচালিত যুদ্ধের কোনো মীমাংসা হতে পারছিলো না। সন্ধা ঘনিয়ে এসেছে। লড়াই চলছে। ইকরামা ও তাঁর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহণকারী একজন লোকও পা পেছনে সরে আসেননি। যুদ্ধ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অপরিসীম বীরত্বের সাথে শত্রুর সামনে তারা দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। সূর্য ডুবে যাবার কারণে রোমক বাহিনীর মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলো। তাদের আরোহীদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ পরিলক্ষিত হলো। পালাবার জন্য তারা পথের সন্ধান খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সময় তাদের জন্য পালাবার কোনো পথ দিলো না। তাদের পেছনে ছিলো ওয়াকুসার ঘাটি আর সামনে ছিলো মুসলিম বাহিনী। পালাবারও পথ নেই, থাকারও আশ্রয় নেই।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপলব্ধি করলেন রোমক আরোহী সৈনিকদের পলায়ন তাদের সাথীদের পক্ষে আরো দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি বাহিনীকে একদিকে সরে যাবার হুকুম দিয়ে শত্রু পক্ষের আরোহীদেরকে পালাবার সুযোগ করে দিলেন। পথ খোলা পেয়ে ঘোড়া দৌঁড়িয়ে তারা সে পথে পালালো। অশ্বারোহী সৈনিকবিহীন ময়দান খালি পেয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে রোমক পদাতিক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নির্মূল করতে লাগলেন। রোমক বাহিনী তাদের পরিখায় প্রবেশ করলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেও গিয়ে পৌঁছলেন। এবার তারা ওয়াকুসার ঘাটির দিকে পালাতে লাগলো। যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য অধিকাংশ রোমক সৈনিকদের পায়ে বেড়ি বাঁধা ছিলো। তারা ধুপ ধুপ করে ঘাটিতে পড়তে শুরু করলো। যদি একজন পড়তো, তাহলে দশজন সাথে নিয়ে পড়তো। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো দেয়াল তার ভিত্তিমূলসহ মাটিতে উপড়ে পড়ছে। ক্রমে অন্ধকার গভীর হয়ে আসছে। তারা গর্ত দেখতে পাচ্ছিলো না। যারা পালিয়ে পালিয়ে এদিকে আসতো তারা জানতো না তাদের পূর্ববর্তীদের অদৃষ্টে কি ঘটেছে। তারা এ গর্তে পড়ে

www.pathagar.com

যেতো। তাবারীর বর্ণনানুযায়ী ওয়াকুসার ঘাটির শিকারে পরিণত হয়েছে প্রায় এক লাখ ত্রিশ হাজার সৈন্য। এদের মধ্যে আশি হাজার সৈন্যই নিজকে বেড়িতে বেঁধেছিলো। যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণকারী অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছাড়াই তাদের এ সংখা ছিলো। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই এ যুদ্ধ জারী ছিলো। ভোর হতে হতে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমক সেনা প্রধানের ঘাটি পর্যন্ত পৌছে গেলেন।

হিরাকলের ভাই তাজারোকও এ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। রোমের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে 'কাঁযকার' ও তার সাথীরা এ যুদ্ধে নিহত হয়নি। তারা এ দুঃসহ পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য তারা টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে ময়দানের এক কোণে বসে বসে বললো। যদি খুশীর দিন দেখতে ও ঈসায়ী ধর্মের সাহায্য করার উপযুক্ত না থাকতাম। তাহলে দুর্ভাগ্যের এ দিনগুলো চোখে দেখতাম না। বস্তুত এ অবস্থায়ই এসব লোক নিহত হয়। মৃত্যুই তাদেরকে এ লজ্জা থেকে রক্ষা করলো। বাহান পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করলো। পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য তারা এসেছিলো। কিন্তু পরিণতি প্রতিবারই ইয়ারমুকের যুদ্ধ হতে কম হয়নি।

রোমক বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হলো। মুসলিম বাহিনী তাদের সেনানিবাসে প্রবেশ করলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিরাকলের ভাই তাজারুকের খিমায় রাত কাটালেন। সকালে তারা ময়দানে তাদের দৃষ্টির সামনে কোনো রোমক সৈন্যকে দেখতে পেলেন না। এ ময়দানেই একদিন আগে রোমের দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিপূর্ণ ছিলো। এখানে দামী দামী জংগী ঘোড় দৌড় দেখতো। এখানে চারিদিকে আলীশান ও উঁচু উঁচু ঘাটির সারি নজরে পড়তো। সে জায়গা আজ একদিন পর বিরাণ ভূমি। এখানে একজন রোমকের নামগন্ধও নজরে পড়ছে না। একটি ঘোড়ারও ছায়া দেখা যাচ্ছে না। এখানে আলিশান ও উঁচু উঁচ ঘাটি আছে সত্য কিন্তু মালিক ছিলো না একজনও। সেখানে বাস করছে মুসলমানরা। এ দৃশ্য দেখে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে লাগলো। আল্লাহর এ বিরাট ইহসানের জন্য খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে ধরলেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলমান শহীদদের সংখ্যা কম ছিলো না। এ যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এদের মধ্যে অনেক সম্মানিত সাহাবা, বড় বড় বাহাদুর এবং অশ্বারোহী সৈনিকও শামিল ছিলেন। ইকরামা বিন আবু জেহেল, তাঁর পুত্র ওমর বিন ইকরামাকে বিজয়ের পর তাজারোকের ঘাটিতে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আনা হয়েছিলো। নেজা ও তরবারির আঘতে পিতা-পুত্রের সারা দেহ চালনীর মত ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়েছিলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইকরামার মাথাকে নীজের রানের উপর ও তাঁর ছেলে ওমর বিন ইকরামার মাথাকে নিজের হাটুর উপর রেখে উভয়ের চেহারা হতে মাটি মুছতে এবং গলায় পানি ছিটাতে লাগলেন। এ অবস্থায়ই তারা দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। আবু সুফিয়ানের চোখে একটি তীর বেঁধে গিয়েছিলো। আবু হাশমা এ তীর বের করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এ যুদ্ধের পরিণাম ছিলো রোমকদের জন্য খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। তাদের সকল আশা-ভরসা ধুলায় মিশে গেলো। সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেলো। এ সময় হিরাকলে হামসে অবস্থানরত ছিলেন। রোমক বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনে এক ব্যক্তিকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন। এদিকে মুসলমানগণ যুদ্ধ হতে অবসর হয়ে উর্দুনেরদিকে অগ্রসর হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উর্দুনকে রোমমুক্ত করে নিলেন। এরপর তারা দামেশকের দিকে যাত্রা শুরু করে একে অবরোধ করে রাখলেন।

তাবারী ও তার অনুসারীদের মতে দামেশক অবরোধ, এর বিজয় এবং পরের ঘটনাবলী, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো। ইয়ারমুকের যুদ্ধে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো যা এখানে বর্ণনা করা আমি সমীচীন মনে করিনি। কেননা সকল ঐতিহাসিকগণই এসব কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ক্রমবিন্যাসে পার্থক্য পাওয়া যায়। আমি এর আগে শুধু ঐসব ঘটনাই উল্লেখ করেছি যা তাবারী ও তাঁর অনুসারীরা সর্বসম্মতভাবে তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো, ঠিক তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মদীনা হতে মাহমিয়া বিন জানিম নামক একজন দূত যুদ্ধের ময়দানে এসে পৌছলেন। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলেন মদীনায় কোনো অসুবিধা নেই। সকলেই ভালো আছেন বলে তিনি জানালেন। তোমাদের সাহায্যের জন্য আরো বাহিনী আসছেন বলে সংবাদ দিলেন। লোকেরা তাকে খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে নিয়ে গেলেন। দূত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে একান্তে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইন্তেকালের খবর জানিয়ে তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিলেন। এ চিঠি হযরত ওমরের তরফ থেকে লেখা হয়েছিলো। এতে তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এমারত থেকে পদচ্যুত করে তদস্থলে আবু ওবায়দাকে এমারত গ্রহণ করার হুকুম দিয়েছিলেন। খবর সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা সাহস হিম্মত খুইয়ে না বসেন। এজন্য চিঠি পড়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তা তীরের খাপে রেখে দিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে খালিদ নিজের দায়িত্ব পালন করে বিজয় লাভ করার পর এমারতের দায়িত্ব হতে সরে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় খলিফার নির্দেশ মুতাবিক নেতৃত্ব আবু ওবায়দার উপর সোপর্দ করলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদচ্যুতির ঘটনার ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিকের মধ্যে মতভেদ নেই। মতভেদ ছিলো, এ চিঠি কি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে এসেছিলো না আবু ওবায়দার নামে। কেউ কেউ বলেন, খালিদের পদচ্যুতির ব্যাপারটি স্বয়ং তার কাছে নয় বরং আবু ওবায়দার কাছে এসেছিলো। তিনি এটাকে গোপন রাখেন। দামেশক অবরোধ করা পর্যন্ত এ চিঠির মর্ম খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জানানো হয়নি। কিন্তু অন্য কোনো ঐতিহাসিকের দাবী হলো দামেশক বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত আবু ওবায়দা চিঠির মর্ম গোপন রেখেছিলেন। শহরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হবার পর আবু ওবায়দা খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি দেখিয়ে দায়িত্ব বুঝে নিলেন।

www.pathagar.com

সিরিয় বাহিনীর সিপাহসালারের পদ থেকে খালিদের পদচ্যুতির ব্যাপারে তাবারী যেসব ঘটনা বর্ণনা করেন তা পড়ে পাঠকগণ বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ, ইরাক হতে নিয়ে আসা বাহিনীরই শুধু আমীর ছিলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। সিরিয়ায় অবস্থানরত কোনো বাহিনীর এমারতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এভাবে আবু ওবায়দা ও ওমর বিন আস, ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান এবং শোরহাবিল বিন হাসনার মতো নিজ নিজ বাহিনীর নেতা ছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন শুধু সকল নেতাদের মতামতের ভিত্তিতে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মিলিত বাহিনীর সিপাহসালার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিলো। যদি প্রথম দিনই বিজয় লাভ না হতো তাহলে পরের দিনই অন্য কাউকে সিপাহসালার হিসাবে নিয়োগ করা হতো। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদেরকে তাবারী ছাড়াও অন্যান্য ঐতিহাসিকের গ্রন্থও দেখতে হবে, এতে এ সম্পর্কে কি বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা

সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে ইয়েজদী, ওয়াকেদী এবং বালাজুরির বর্ণনা তাবারীর বর্ণনা হতে বেশ পার্থক্য সূচিত করে। এসব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধ সিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নয়। বরং এর আগেই 'আজনাদিন' ও 'দামেশকের' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। এসব বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগের যুদ্ধ হতে অবসর হবার সাথে সাথেই সিরিয়া বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ সময় সীমান্তে কোনো মুসলিম বাহিনী ছিলো না। একদিন তিনি মদীনার 'আহলুর রায়' (সিদ্ধান্তদানে সক্ষম) ব্যক্তিদেরকে ডেকে এনে সিরিয়ার অভিযান সম্পর্কে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। সকলেই তার মতামতকে সমর্থন জানালেন। তখন তিনি দক্ষিণ আরবের অন্যান্য এলাকার লোকদেরকে সিরিয়ায় গিয়ে জিহাদে যোগদানের জন্য পয়গাম পাঠালেন। এ সময় তিনি মদীনা, মক্কা, তায়েফ ও হিজাজের লোকজনকেও এ উদ্দেশ্যে তৈরি করতে লাগলেন। বাহিনী একত্রিত হবার পর তিনি চার ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বাহিনী প্রধান বানিয়ে সিরিয়াভিমুখে রওনা করে দিলেন। এ চার ব্যক্তি ছিলেন ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, আবু ওবায়দা বিন জাররাহ, মুয়াজ বিন জাবাল ও শোরহাবিল হাসানা। কোনো কোনো বর্ণনায় একথাও উল্লেখ হয়েছে, এ চার নেতার জন্য ঐসব এলাকাও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যেখানে তারা গভর্নর হিসাবে কাজ করেন। মতভেদ এড়াবার জন্য তাদেরকে তিনি হেদায়াত দিয়েছিলেন, যদি কোনো আমীরের এলাকায় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ লেগে যায়, আর এ সময় ওখানে অন্য কোনো আমীরও বিদ্যমান থাকে অথবা তার সাহায্যে পৌছে যায়, তাহলে ঐ এলাকার নির্দিষ্ট আমীরই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। এর বিপরীত আর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু ওবায়দা বিন জাররাহকে ও সকল বাহিনীর সম্মিলিত গ্রুপের সিপাহসালার এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে ডিপুটি সিপাহসালার নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।[১] 'জুলকালাহ হামিরী' ও ইয়েমেনের অন্যান্য সকল নেতা নিজ নিজ

১. বালাজুরির বর্ণনায় আছে আবু বকর যখন আবু ওবায়দাকে উপদেশ দিয়ে সিরিয়া পাঠাতে চাইলেন, তিনি অব্যাহতি চাইলেন। পরে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তার খেলাফত আমলে গোটা সিরিয়ার প্রধান করে ওখানে পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

গোত্রীয় 'দল' 'তায়' এবং 'আসাদ' ইত্যাদিকে নিয়ে মদীনায় হাজির হবার পর এসব বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ হয়েছিলো। প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে তার বাহিনীসহ সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর পেছনে পেছনে 'জাময়া' বিন আসওয়াদকে একটি বাহিনী সহ পাঠালেন।

অবশিষ্ট বাহিনী তখনো মদীনায় ছিলেন। বাহির থেকে আগমনকারী সৈনিকে যখন মদীনায় অলিগলি ভরে গেলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিয়ে মদীনার বাইরে এলেন এবং 'ছানিয়াতুল ওয়াদায়ায়' পৌছে বিদায় দিলেন। খালিদ বিন সাঈদ বিন আস এসব সৈনিকদের সাথে সিরিয়ায় রওনা হলেন। কিন্তু তিনি তার চাচাত ভাই ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের পরিবর্তে আবু ওবায়দা বিন জাররাহর বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছা করলেন। কারণ, আবু ওবায়দা সাবেকুনাল আউয়ালুনের (প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী) মধ্যে পরিগণিত ছিলেন এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে 'আমীনুল উম্মাত' এর আখ্যা লাভ করেছেন। এসব বাহিনী রওয়ানা হয়ে যাবার পর ইয়েমেন ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে আরো বাহিনী এসে মদীনায় জড়ো হতে লাগলো। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকেও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন–আগে পাঠানো বাহিনীর যেটির সাথে ইচ্ছা তারা যেন যোগদান করেন।

এ সময় হিরাকলে ফিলিস্তিনে ছিলেন। মুসলমানদের প্রস্তুতির খবর তিনি পেলেন। এলাকার সরদারদেরকে একত্রিত করে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করে তুললেন। হিরাকলে বললেন, এসব ভূখানাঙ্গা ও অসভ্য জাতি আরব মরু প্রান্তর থেকে বের হয়ে এসে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়। তোমরা তাদের আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দাও। ভবিষ্যতে আর এদিকে মুখ ফিরাতে তারা যেনো সাহস না পায়। যুদ্ধসরঞ্জাম ও বাহিনী দিয়ে তোমাদেরকে পুরোপুরি সাহায্য করা হবে। যাদেরকে নেতা নিযুক্ত করা হয় তোমরা মনপ্রাণ দিয়ে তাদের আনুগত্য করবে। বিজয় তোমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

ফিলিস্তিনের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে হিরাকলে দামেশকে এলেন। সেখান থেকে হামস ও এনতাকিয়া পৌছলেন। এসব এলাকায়ও তিনি ফিলিস্তিনের মতো গরম গরম বক্তৃতা করে ওখানকার জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। স্বয়ং এনতাকিয়াকে হেড্‌কোয়ার্টার বানিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এর মধ্যে আবু ওবায়দা বিন জাররাহ ওয়াদিয়ে কুররা ও হিজর হয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করেছেন। 'মায়াবে' একটি রোমীয় বাহিনীর সাথে তার সংঘর্ষ বাঁধে। রোমীয়রা মুসলমানদের সামনে টিকতে পারলো না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা পরাজিত হয়ে পেছনে সরে গেলো। 'জাবিয়া' পৌছে আবু ওবায়দা জানতে পারলেন

www.pathagar.com

হিরাকলে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য একটি বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেছে। এ বাহিনীর কোনো তুলনা নেই। তাই তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখে পরামর্শ চাইলেন। সাহায্য পাঠাবার জন্যও তিনি আবেদন জানালেন। এদিকে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি চিঠি লিখলেন। কিন্তু এতে রোমকদের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ভীত হয়ে পড়ার পরিবর্তে হিরাকলের ফিলিস্তিন থেকে এনতাকিয়া চলে যাওয়াকে তারই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার প্রমাণ হিসাবে চিত্রিত করেন। এ চিঠিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুবই খুশী হলেন। তাকে তিনি জবাবে লিখলেন—এভাবে সাহস ও হিম্মত হারাবে না। আল্লাহ সুনিশ্চিত তোমাদের সাহায্য যোগাবেন। কিন্তু তিনি আবু উবায়দার চিঠির জবাবে দুঃখ প্রকাশ করে লিখলেন, রোমকদের শক্তি ও জৌলুস দেখে তুমি ভীত হয়ে পড়েছেন। তারপরও উভয়কেই তিনি আরো সমর সম্ভার পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়ে দিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় চিঠি পাঠিয়ে ওদের থেকেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কাজ পসন্দ করলেন না। কেননা সাবেকুনাল আউয়ালুন অর্থাৎ আগে ইসলাম গ্রহণকারী ও পরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে তিনি এক সারিতে পরিগণিত করতে পসন্দ করতেন না। এরপরও তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারলেন না। এরই মধ্যে আরব গোত্রসমূহ যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় চারিদিক থেকে মদীনায় এসে একত্রিত হতে লাগলেন। মক্কা থেকেও একটি বিরাট দল মদীনায় এসে পৌছলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর বিন আসকে এসব লোকের আমীর বানিয়ে তাঁকে সিরিয়া যাবার হুকুম দিলেন। ওমর বিন আস জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর নেতৃত্ব কি আমার হাতে থাকবে।"

জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তোমার সাথে প্রেরিত বাহিনীরই শুধু তুমি নেতা থাকবে। কিন্তু সিরিয়ায় পৌছার পর যদি ইসলামী বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে দুশমনদের মুকাবিলা করতে হয়, তাহলে তোমাদের সকলের আমীর হবেন আবু ওবায়দা বিন জাররাহ।"

রওয়ানা হয়ে যাবার সময় ওমর বিন আস হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বায়না ধরলেন, আবু বকরকে বলে তাঁকে সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করে দিতে। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিস্কার জবাব দিয়ে বললেন ঃ

"আমি তোমাকে ধোঁকায় রাখতে চাই না। আমি অবশ্যই আবু বকরের কাছে তোমার জন্য এ সুপারিশ করবো না। কেননা আমার কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে আবু ওবায়দা তোমার চেয়ে অনেক উত্তম।"

ওমর বিন আস বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আমীর হবার কারণে আবু ওবায়দার মর্যাদা ও ফযীলতে কোনো পার্থক্য আসবে না।"

কিন্তু ওমর বিন আসের কথা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করলো না। তিনি আবার বললেন ঃ

"ওমর তোমার কি হলো। তুমি তোমার নিজের আমীরত্বের আগ্রহ প্রকাশ করছো। কিছু পার্থিব স্বার্থ ও মর্যাদা লাভ করা ছাড়া এতে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া আর কিছুর প্রত্যাশী হইও না। বাহিনী নিয়ে সিরিয়া চলে যাও। এবার যদি আমীর হতে না পারো তাহলে নিরাশার কিছুই নেই। আমীর হবার সুযোগ ভবিষ্যতে অনেক আসবে।"

এ ধরনের আলাপ-আলোচনার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর বিন আসকে রাজী করিয়ে নিলেন। অতপর ওমর বিন আস হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মূল্যবান নসিহত সংগ্রহ করে বাহিনী নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে আবু ওবায়দাকে সম্মুখে অগ্রসর হবার নির্দেশ থাকলেও তার সামনে অগ্রসর হবার গতিবেগ ছিলো বেশ মন্দা। মদীনা থেকে ওমর বিন আস সমর সাহায্য নিয়ে পৌছার পরও অগ্রসরতার বেগ বাড়েনি। বরং আবু ওবায়দা বরাবরই আবু বকরকে লিখতে থাকেন।

"রোম ও তাদের প্রতিবেশী মিত্র গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনেক সৈন্য একত্রিত করছে। অতএব এ অবস্থায় আমার কি করতে হবে তা আমাকে বলে পাঠান।"

আবু ওবায়দার একের পর এক চিঠি পেয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি সিরিয়ায় খালেদ বিন ওয়ালিদকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সময় ইরাকে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে লিখলেন ঃ

"আমার চিঠি পাবার সাথে সাথে ইরাক ছেড়ে সিরিয়া চলে যাও। মুসান্নার বাহিনীকে ইরাকে রেখে তোমার উত্তম উত্তম সাথী নিয়ে সিরিয়ায় পৌছে আবু ওবায়দা বিন জাররাহর সাথে যোগ দাও। এখন এসব বাহিনী আবু ওবায়দার অধীনে আছে। ওখানে পৌছার পর বাহিনীর সিপাহসালার তুমি হবে। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।"

এ চিঠি পাবার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় রেগে গেলেন। তিনি এখনো খলিফার চিঠি পড়েননি। তিনি ভাবলেন, এসব কাজ হযরত ওমরের। তিনি তাকে ইরাক থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বয়ং এ জায়গা দখল করতে চান। সুতরাং এ ক্ষেদ তিনি নিজ মুখেও প্রকাশ করে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

"আমি বুঝি, এসব ওমরের কাজ। আমার হাতে আল্লাহ ইরাকের বিজয় দান করাতে তিনি ঈর্ষান্বিত।"

কিন্তু হযরত আবু বকরের চিঠি খুলে পড়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। চিঠিতে তাঁকে সিরিয়ায় গিয়ে ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেসব ঐতিহাসিকগণ ঘটনাসমূহ এ ক্রমধারায় লিখেন তারাও উল্লেখ করেন, আবু বকরের চিঠি লিখার সময় খালিদ হিরায়। তখনো আম্বার ও আইনুত তামারের বিজয় লাভ ঘটেনি। চিঠি পেয়ে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে সিরিয়া রওনা হয়ে গেলেন। এ দু'টি জায়গা পথে পড়ে বিধায় তিনি তা জয় করে কারাকায় পৌছেন। কারাকার থেকে তিনি মরু অঞ্চল অতিক্রম করে 'সোয়া' পৌছেন। ওখান থেকে সিরিয়ার ভূখণ্ড শুরু হয়।

খালিদের সাথেই আবু বকর আবু ওবায়দাকেও একখানা চিঠি লিখেন। তাতে লিখেছিলেন ঃ

"আমি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব খালিদের উপর ন্যস্ত করলাম। তুমি তার বিরোধিতা করবে না। মনপ্রাণ দিয়ে তার আনুগত্য করবে। আমি তাঁকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করলাম। আমি জানি, দীনের দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা খালিদের চেয়ে অনেক উর্ধে। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শিতায়তায় তার জুড়ি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে সোজা ও সরল পথে চলার শক্তি দান করুন।"

এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদও আবু ওবায়দাকে লিখলেন ঃ

"আল্লাহর কাছে আমার মিনতিপূর্ণ আরাধনা, তিনি যেনো এ বিপদের দিনে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে নিরাপদে রাখেন। এ দুনিয়াতে শত্রুর হাতে পরাজিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। আমার কাছে খলিফাতুর রাসূলের চিঠি এসেছে। চিঠিতে তিনি আমাকে সিরিয়ায় গিয়ে সম্মিলিত ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ড হাতে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর কসম ! না আমি নিজে সিরিয় বাহিনীর সিপাহসালার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আর না সিরিয় বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত হবার ধারণা আমার মনে জাগতে পারে। আর না আমি কোনোদিন খলিফাতুর রাসূলকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ইশারা-ইঙ্গিতে এ ব্যাপারে কোনো চিঠি লিখেছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যে মর্যাদা আজ আপনার কাছে, তা ভবিষ্যতেও থাকবে। না আপনার কোনো নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যাবে। আর না আপনার কোনো মতামতের বিরোধিতা করা হবে। আর আপনার পরামর্শ ছাড়াও কোনো কাজ করা যাবে না। কেননা আপনি মুসলমানদের নেতা। আপনার মর্যাদাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর আপনার রায়কেও কেউ এড়িয়ে চলতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইহসান দ্বারা আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ভয়াবহ আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

www.pathagar.com

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'সোয়া' হতে 'লোয়া' গমন করলেন। ওখান থেকে 'কসম' আসলেন। এখানে বনু মাশজেয়ার সাথে তিনি সন্ধিস্থাপন করলেন। এখান থেকে তিনি 'গোরায়ের' ও 'জাতুসসিনমাইন' এর দিকে রওনা হলেন। পথে অবস্থিত গোত্রগুলোকে পরাভূত করে গোতা ও দামশ্‌ক পৌছলেন। পথে তাদাম্মুর অবরোধের ঘটনাও সংঘটিত হয়।[১]

গোতা হতে সানিয়াতুল ইকাবের পথ ধরে তিনি দামেশক যাবার ইচ্ছা করলেন। খালিদের আক্রমণের পর এ সানিয়া ঘাটি সানিয়াতুল ইকাব নামে ডাকা হয়। কারণ, এখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা ইকাব উত্তোলন করেছিলেন। দামেশকের পূর্ব গেট থেকে এক মাইল দূরে একটি গির্জায় তিনি নামলেন। পরে এ গির্জার নাম দেয়া হয়েছিলো 'দিরে খালেদ।'

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশীদিন দামেশকে থাকেননি। বরং এখান থেকে তিনি আরো সামনে অগ্রসর হয়ে 'কানাও' ও বসরা পৌছেন। এখানে মুসলিম বাহিনী একত্রিত হয়েছিলো। ঠিক এ সময়ে খবর পাওয়া গেলো যে, হিরাকলে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য 'আজনাদীন' নামক স্থানে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী এ খবর শুনে মুসলিম বাহিনী দামেশক অবরোধ ছেড়ে[২] দিয়ে অন্য বর্ণনা অনুযায়ী বসরা অবরোধ ছেড়ে দিয়ে রোমকদের মুকাবিলা করার জন্য 'আজনাদীন'-এর দিকে রওনা হলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের চব্বিশ দিন আগে আজনাদীন মুসলিম বাহিনী ও রোমক শক্তির প্রথম সংঘর্ষ হয়।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিন নেতা-ইয়াজিদ বিন সুফিয়ান, শোরহাবিল হাসানা ও ওমর বিন আসকে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে 'আজনাদীন' পৌছে যাবার খবর পাঠালে। খবর অনুযায়ী তারা তিন নেতা তাদের বাহিনী নিয়ে আজনাদীন পৌছে যান।

---

১. বালাজুরীতে উল্লেখ হয়েছে যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদামনুর থেকে 'হাওয়ারিন' ও 'সারাজুর রাহেত' হয়ে গোতায় দামেশক পৌছেন।

২. ইয়েজদীর বর্ণনানুযায়ী খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দামেশক থেকে বের হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তিনি ও আবু ওবায়দা গোতা ও এর আশেপাশের এলাকায় আকস্মিক ধাওয়া করা ছাড়া আর কোনো হামলা চালাননি। এ সময়ই তিনি হামসের হাকিমের নেতৃত্বে একটি বিরাট রোমক বাহিনী বসরার শোরহাবিলের পথ কেটে দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন বলে খবর পেলেন। তারা যেন তাদের সাথীদের সাথে এসে মিলতে না পারেন। তারপর আবার খবর পাওয়া গেলো রোমের বিরাট বাহিনী আজনাদীনে জমা হয়েছে। শহরের সকল অধিবাসী সিরিয়ায় বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহ সহ মিলে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য বিরাট প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর শুনার পর খালিদ ও আবু ওবায়দা দামেশক থেকে বের হয়ে আজনাদীনে যাবার ইচ্ছা করলেন। আবু ওবায়দা বাহিনীর পেছনের ভাগে ছিলেন। দামেশকবাসীরা সুযোগ পেয়ে তাদের পথ কেটে দিয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু টের পেয়ে বাহিনী নিয়ে পেছনের দিকে ফিরলেন ও আবু ওবায়দাকে দামেশকের জংগল থেকে মুক্ত করে আনলেন। খালিদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দামেশকবাসীরা পালিয়ে গিয়ে কিল্লায় আশ্রয় নিলো। খালিদ আবু ওবায়দাকে নিয়ে আজনাদীন রওনা হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ড নিজ হাতে তুলে নিয়ে তাদের বিন্যস্ত করতে শুরু করলেন। পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন আবু ওবায়দাকে। ডান দিকের বাহিনীর নেতা নিযুক্ত হলেন মুয়াজ বিন জাবালকে। আর বামদিকের বাহিনীর কমাণ্ডার বানালেন সাঈদ বিন আমের বিন হোজাইম জাহমীকে। অশ্বারোহীদের নেতা নিযুক্ত হলেন সাঈদ বিন জায়েদ বিন ওমর। আর তিনি নিজে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে সারির মাঝ দিয়ে ঘুরে ফিরা করতে লাগলেন।

রোমক বাহিনী আও-বাও না পেয়ে ঝট্ করে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে দিলো। জোহরের নামাযের আগে যুদ্ধ শুরু না করার জন্য খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে বলে দিয়েছিলেন। রোমকদের আকস্মিক হামলায় মুসলমানদের জীবনের অপচয় ঘটছে দেখে সাঈদ বিন যায়েদ রোমকদের উপর পাল্টা হামলা চালাবার জন্য খালিদের অনুমতি চাইলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম অশ্বারোহী বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালাবার হুকুম দিলেন। এরপর অবশিষ্ট সেনা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রু পরাজিত হলো। তাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হলো। অঢেল মালে গনিমাতের মালিক হলেন মুসলিম বাহিনী।

আজনাদীনের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু দামেশকে ফেরত এলেন এবং তা অবরোধ করে বসলেন। পূর্ব গেটের সংলগ্ন গির্জায় খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অবতরণ করলেন। বাবে জাবিয়ার সামনে অবস্থান গ্রহণ করলেন আবু ওবায়দা। আর ওমর বিন আস অবস্থান নিলেন 'বাবে তুমারের' সামনে। শোরহাবিল 'বাবে কারাবিসে' এবং ইয়াজিদ 'বাবে সাগিরের' সামনে ঘাটি বানালেন। এভাবে পরিপূর্ণরূপে মুসলমানরা গোটা শহর অবরোধ করে বসলেন ঃ

দামেশকবাসীরা হিরাকলকে জানালো যে, তারা এ সময় ভীষণ বিপদে নিপতিত। মুসলমানরা কঠিনভাবে তাদেরকে অবরোধ করে আছে। তাই শীঘ্র তাদের সাহায্যে বাহিনী পাঠাতে হবে। খবর পেয়ে হিরাকলে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলো। মারাজুসসাফারে খালিদের বাহিনীর সাথে তাদের মুকাবিলা হলো। রোমীয়রা পরাস্ত হয়ে পালাতে বাধ্য হলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবার দামেশকে ফেরত এলেন এবং অবরোধ করা শুরু করে দিলেন।

দামেশকবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত পেরেছে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। শহরের প্রাচীরগুলো ছিলো বেশ উঁচু ও মযবুত।

উঁচু দেয়ালের উপর থেকে তারা মুসলমানদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। শহরের মূল গেটে মযবুত বাহিনী নিয়োগ করা হলো। তারা মুসলমানদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দিবে না। কিন্তু কোনো কিছুই মুসলমানদেরকে অবরোধের কঠোরতা আরোপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। নিরুপায় হয়ে দামেশকের নেতারা আবার হিরাকলকে লিখে জানালো, যদি এ নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি তাদের সাহায্য না করেন, তাহলে শত্রুর সাথে আপোষ করা ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো পথ

www.pathagar.com

বাকী থাকবে না। হিরাকলে লিখলো, অত্যন্ত সাহস ও হিম্মতের সাথে শত্রুর মুকাবিলা করো। যে কোনো মূল্যে শহরের নিয়ন্ত্রণ ঠেকিয়ে রাখো। তোমাদের সাহায্য দূতের পেছনে পেছনে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। দামেশকবাসী অধীর আগ্রহে রোমক সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে তাদের সব আশা নিরাশার আধারে পরিণত হলো। হিরাকলের তরফ থেকে কোনো সাহায্য এসে পৌছলো না। সাহস হিম্মত হারিয়ে দামেশকবাসী মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে সন্ধিস্থাপন করা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পেলো না।

এ সন্ধির ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, বাবে জাবিয়ার কাছে আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু দামেশকবাসীর সাথে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন। সুলহে নামা পূরণ করে তিনি শহরে প্রবেশ করে জানতে পারলেন। পূর্ব গেট দিয়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জোর করে শহরে ঢুকে পড়েছেন ও নিজ বাহিনীর সাহায্যে শহর দখল করে নিচ্ছেন। উভয় নেতা একত্রিত হলে আবু ওবায়দা শহরবাসীর সাথে সন্ধি হবার খবর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। এখন শহরবাসীর জানমালের উপর মুসলমানদের আর কোনো ইখতিয়ার নেই। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শক্তির সাহায্যে শহর জয় করেছেন। দাবী করে বিজিতদের উপর বিজয়ীর সিদ্ধ ব্যবহার করতে চাইলেন। কিন্তু কথাবার্তার পর সন্ধি অটুট রাখার উপর উভয় নেতা একমত হন। আবার একেবারে বিস্তারিত বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, খালিদ সন্ধি করেছেন। আবু ওবায়দা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করেন। কিন্তু উভয় নেতা সর্বশেষ সন্ধি বহাল রাখার ব্যাপারে একমত হলেন। শহরবাসীদের সাথে বিজিতের মতো ব্যবহার করা হয়নি।

বর্ণনায় একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, দামেশকের অবরোধ চলছে, এ সময়ই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। তার স্থলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হন। খেলাফতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই তিনি সর্বপ্রথম খালিদকে পদচ্যুত করেন। তার স্থলে আবু ওবায়দাকে সিপাহসালার নিযুক্ত করেন। এ খবর তিনি আবু ওবায়দাকেও পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দামেশক পরিপূর্ণ মুসলমানদের হাতে না আসা পর্যন্ত আবু ওবায়দা এ খবর খালিদকে জানালেন না। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী দামেশক বিজয়ের আগেই আবু ওবায়দা খালিদকে এ খবর জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতে তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসেনি। তিনি সানন্দে দ্বিতীয় খলিফার আদেশ মাথা পেতে মেনে নিলেন। সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে এ হলো 'জাওয়াজদি' 'বালাজুরি' ও 'ওয়াকেদীর' বর্ণনা। এসব বর্ণনা পড়লে জানা যায় ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমধারা হিসাবে যেমন এসব বর্ণনা তাবারির সাথে বেমিল তেমনি খালিদ বিন ওয়ালিদের এমারত ও তার পদচ্যুতির প্রশ্নও উভয়ের মধ্যে বিস্তর মতভেদ।

তারপরও দু'টো ব্যাপার এমন আছে, যাতে কোনো মতভেদ নেই। প্রথমত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই ইরাকের মতো সিরিয়ার বিজয়ের বেড়ি উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এ উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী সহ সকল প্রকার সাহায্য পাঠানো হয়েছিলো। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে ইরাক ও সিরিয়ার এ প্রাথমিক বিজয়ই ইসলামী সুলতানাতের মূলভিত্তি। দ্বিতীয়ত খালিদ বিন ওয়ালিদ সিরিয়ায় ও ঐ কৃতিত্বপূর্ণ কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন যা তিনি ইরাকেও প্রদর্শন করেছেন। সকল জায়গায়ই তিনি বিজয়ের গৌরব লাভ করেছেন। সিপাহসালারের পদ থেকে চ্যুত হবার পরও মর্যাদা এতটুকুন কমেনি। আর তাঁর রণকৌশল সামরিক যোগ্যতাও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এসব তো তাঁর সামরিক যোগ্যতা ও পারদর্শিতাই শুধু নয় বরং এসব কদাচিৎ গুণের মর্যাদার মূল্য দিতে গিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাইফুল্লাহর খেতাবে ভূষিত করেন। এর স্বীকৃতি আবু বকর এ ভাষায় দিয়েছেন ঃ

> "আমি এ তরবারিকে কিছুতেই খাপযুক্ত করতে পারি না, যে তরবারিকে আল্লাহ কাফেরদের উপর বিজয়ী হবার জন্য খাপমুক্ত করেছেন।"

এসব বিভিন্ন বর্ণনার নিরিখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কঠিন, ইয়ারমুকের যুদ্ধ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছে অথবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কালে। যদি ওয়াকুসার ঘাটি, যার কাছে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, আরব সীমান্ত ও 'সারহমা' মরুপ্রান্তরের পথের কাছে হয়ে থাকে, তাহলে তাবারীর মতেরই প্রমাণ হয়। আর এ যুদ্ধ আবু বকরের কালেই সংঘটিত হয়েছে। কারণ, প্রাথমিক দিকে যুদ্ধ সীমান্তের কাছাকাছি হয়েছে। কিন্তু আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে বালাজুরীর এ বর্ণনাকেও অস্বীকার করা যায় যে, এ যুদ্ধ ওমরের খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যখন প্রাথমিক যুদ্ধগুলো শুরু হলো তখন রোমীয়রা দামেশকের দিকে সরতে শুরু করে। দামেশক শহর খুব মযবুত ছিলো না। বরং এর আশেপাশে এমন বসতি ছিলো যেখান থেকে মুসলমানদের হামলাকে খুব সহজে প্রতিরোধ করা যেতো। রোমীয়দের ধারণা ছিলো তারা পেছনে সরতে সরতে মুসলমানদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখান থেকে তাদের ফিরে আসা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। তখন তারা একটা হামলা করে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে। এরপর মুসলমানরা আর সিরিয়া আক্রমণ করতে সাহস করবে না। বস্তুত তাই হলো। মুসলমানরা দামেশক পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। কিন্তু রোমীয়দের প্রত্যাশার বাইরে অবরোধ বিলম্বিত হতে লাগলো। সর্বশেষ পরাজয় বরণ করে রোমকদেরকে আপোষ করতে হয়েছে। শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলো।

ঘটনার প্রকৃত ক্রমিক ধারা নির্ণয় করা তো বাস্তবিকই খুব মুশকিল। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুতির ব্যাপারটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বেশ সহজ। তাবারী, বালাজুরী সহ অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ এ ব্যাপারে পূর্ণ একমত যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইরাক থেকে সিরিয়া পাঠাবার উদ্দেশ্যই ছিলো রোমীয়দের মন থেকে সব শয়তানী প্ররোচনা দূর করা। আর দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ায়

www.pathagar.com

অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীর অচলাবস্থা সচল করে দেয়া। মতভেদ শুধু এ বিষয়ে যে, খালিদ কি ওখানে সম্মিলিত গ্রুপের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন অথবা তার সাথে ইরাক থেকে নেয়া বাহিনীরই শুধু নেতা ছিলেন ? যদি এ মতভেদ দূর হয়ে যায়, তাহলে পদচ্যুতির সব ঘটনাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তাবারী বর্ণনা করেছেন, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরাক থেকে সাথে নিয়ে আসা বাহিনীরই শুধু আমীর ছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন শুধু সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ড তার হাতে ছিলো। তাও সকল নেতাদের সম্মিলিত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। কিন্তু বালাজুরী বলেছেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খালিদকে সিরিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার বানিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু ওবায়দাকে লিখা চিঠিগুলোকে পেশ করেন।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমরা বালাজুরীর বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। কারণ, দেশের বিভিন্ন জায়গা হতে পৃথক পৃথক বাহিনী এক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করবে, অথচ একক নেতৃত্বের বদলে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের অধীনে বিভক্ত হয়ে থাকবে, একথা চিন্তাই করা যায় না।

তাবারী নিজেও একথা স্বীকার করেন যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সব ইসলামী বাহিনীকে পরস্পর মিলে একই বাহিনীর মতো থাকার ও একত্র হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই এটা অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো, ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব আবু ওবায়দা, ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান অথবা অন্য কোনো নেতার উপর ন্যস্ত ছিলো। অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের অভিমত ছিলো, এসব বাহিনীর আমীর ছিলেন আবু ওবায়দা। যদিও কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু ওবায়দা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখে এ দায়িত্ব পালন হতে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। আমরা যখন এসব কথাকে অস্বীকার করতে পারছি না তখন একথাতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত আবু বকর খালিদ বিন ওয়ালিদকে সিরিয় সম্মিলিত বাহিনীর সিপাহসালার করেই সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আর একথা বালাজুরীই বর্ণনা করেছেন।

খালিদ যদি সম্মিলিত বাহিনীর সিপাহসালার না হবেন, তাহলে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা হবার পর সর্বপ্রথম তাঁকে পদচ্যুত করার হুকুম পাঠাতেন না। কেননা তাবারী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খালিদ পদচ্যুত হবার পরও তাঁর সাথে থাকা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এ ধারা ঐ সময় পর্যন্ত জারী ছিলো যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে কানসারীনের আমারত ও বাহিনীর সিপাহসালার হতে পদচ্যুত করেননি। ১৭ হিজরী সনে ওমরের খেলাফতের পঞ্চম সনে এ ঘটনা ঘটেছিলো। এ অবস্থায় প্রথম পদচ্যুতি সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব হতে হয়েছে বলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পদচ্যুতি প্রথম পদচ্যুতির চার বছর পর হয়েছিলো। তাও তার অংশের বাহিনীর নেতৃত্ব হতে।

www.pathagar.com

এ হলো আমাদের মতামত। এ মত আমরা দৃঢ়তার সাথে পোষণ করি। এ মতামত গ্রহণ করলে এ ব্যাপারে উত্থিত বিভিন্ন সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যদি খালিদ ইরাক থেকে তাঁর সাথে আসা বাহিনীরই আমীর হতেন, তাহলে তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ আসার প্রয়োজন ছিলো না। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ারমুকের পরে এবং বালাজুরীর বর্ণনা মতে দামেশক বিজয়ের পর আবু ওবায়দা পুনরায় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব কাধে তুলে নেন।

www.pathagar.com

১৫

ইরাকে মুসান্না

ইরাকে মুসান্নার সমস্যা

সিরিয়ার পথে খালিদ বিন ওয়ালিদকে বিদায় দিয়ে আসার পর মুসান্না বিন হারেছা হিরায় ফিরে আসলেন। তিনি তার বাহিনীর মাধ্যমে বিজিত শহরগুলোর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা শুরু করে দিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সিরিয়া চলে যাবার খবর শুনলেই ইরানীরা তাদের ছিনিয়ে নেয়া শহর-গুলোকে ফিরিয়ে নেবার এবং ইরাক ভূখণ্ড হতে মুসলমানদের বের করে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করবে।

এ সময় সত্যি সত্যি নাজুক পরিস্থিতি ধারণ করেছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক নিবাসী বেদুঈনদের সাথে কঠোর আচরণ করেছিলেন। তাই তারা মুসলমানদের বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছিলো। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ছিলো সুযোগের সন্ধানে। এদিকে ইরানীদের বিশ্বাস ছিলো, ইরাকে ইসলামী শাসন কায়েম হলে তাদের জন্য তা মৃত্যুর শামিল হবে। তাই তারাও সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে বসেছিলো। মুসলমানদের দুর্বলতাকে পুঁজি করে তারা একবার হামলা করে তাদেরকে ইরাক সীমান্ত থেকে সরিয়ে দেবে। খালেদও বুঝতেন, তার চলে যাবার পর ইরানীরা অবশ্যই মুসলমানদের অনিষ্ট করার চেষ্টা চালাবে। এ কারণেই সিরিয়া যাবার আগে সকল মুসলিম নারী, শিশু, দুর্বল পুরুষদেরকে তিনি মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। মুসান্নার চোখের সামনে এসবই স্পষ্ট ছিলো। মুসান্না একটা বিরাট ও কঠিন ধরনের বিপদে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু সর্বপ্রথম ইরাকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ সহ অন্যান্য ইসলামী বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন। এ অবস্থায় যে ভূখণ্ডে তারই বিজয়মূলক পদক্ষেপ হয়েছে, সে ভূখণ্ডে এ মুসান্নাকেই আবার পরাজয় বরণ দেখতে হবে—এ ছিলো বড় অসহ্য ব্যাপার।

এসব ব্যাপার ছাড়াও আর একটি ব্যাপার মুসলমানদের উদ্বিগ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বহু বছর থেকে চলে আসা ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্যের পর ইরানবাসীরা সর্বসম্মতভাবে শাহরিয়ান[১] বিন ইরদশীর বিন সাবুরকে তাদের শাহান শাহ বানিয়েছিলেন। দেশের সর্বস্তরের নাগরিকরা মন-প্রাণ দিয়ে তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছে। নতুন বাদশাহকে কিছুদিন আন্তসমস্যা আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ওসব কাজ থেকে অবসর হবার পর সর্বপ্রথম নতুন বাদশাহ ইরাকের প্রতি মনোযোগ দিলেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অর্ধেক

১. রাওয়ায়েতে এর নাম শহরবাজান, শহরবাজ এবং শহর বারবাজত হিসাবে এসেছে।

www.pathagar.com

বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় চলে গেছেন। মুসলমানদেরকে ইরাক ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেবার এর চেয়ে উত্তম, সুবর্ণ সুযোগ শাহরিয়ানের দৃষ্টিতে আর পড়েনি। হরমুজকে তাৎক্ষণিকভাবে দশ হাজার সৈন্য দিয়ে মুসান্নার মুকাবিলা করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। মিয়া হরমুজ একটি ভয়ংকর হাতীর উপর আরোহণ করে মুসলমানদেরকে ইরাকের প্রত্যেক অলি-গলি হতে বের করে দিয়ে আরব সীমান্ত পর্যন্ত পার করে দিয়ে তবে দম নিবে—এমন দৃঢ়চিত্ততা নিয়ে ইরান থেকে যাত্রা করলো।

ইরানীদের প্রস্তুতি গ্রহণ ও হরমুজের আনাগোনার খবর এবং মুসলমানদের বিজিত এলাকাসমূহ অতিক্রম করে হরমুজ হিরা পৌঁছবে—একথা সহ্য করতে পারলেন না মুসান্না। মুসান্না এ সময় হিরায় বাস করতেন। তাই তিনি তার বাহিনী নিয়ে স্বয়ং হরমুজের মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। নিজের দু' ভাই মুয়ান্না ও মাসউদকে যথাক্রমে ডানে ও বামে নিযুক্ত করে হিরা থেকে বাবেলের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। এখনো তার সফর চলছে, এমন সময় শাহানশাহে ইরানের কাছ থেকে একখানা চিঠি পাওয়া গেলো ঃ

"তোমার মুকাবিলা করার জন্য ইরানীদের একটি বাহিনী পাঠিয়েছি। তারা তো আসলে মুরগী ও শূকর চরাবার লোক। কিন্তু তোমার অস্থিমজ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার জন্য যথেষ্ট।"

মুসান্না দূতের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে একবার পড়ে সাথে সাথে জবাব লিখে তার হাতে দিয়ে দিলেন ঃ

"এ চিঠি মুসান্নার তরফ থেকে শাহরিয়ানের নামে। তোমার অবস্থা দু' প্রকার ছাড়া কিছু না। হয় তুমি বিদ্রোহী। এর পরিণতি হবে তোমার জন্য খুবই করুণ। আমাদের জন্য হবে উত্তম। অথবা তুমি মিথ্যাবাদী। আর তুমি অবশ্যই জানো যে, আল্লাহর কাছে ও তার বান্দার দৃষ্টিতে পরিণাম পরিণতির দিক দিয়ে সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তি হলো মিথ্যাবাদী বাদশাহ। তোমার চিঠির মর্ম সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। তুমি এতো অসহায় হয়ে পড়েছো, আমার বিরুদ্ধে পাঠানোর জন্য মুরগী শূকর চরাবার লোক ছাড়া তোমার কাছে আর কোনো লোক নেই। আল্লাহর শোকর ! তিনি তোমার সব ষড়যন্ত্র স্বয়ং তোমার উপরই পাল্টে দিয়েছেন এবং তুমি মুরগী চরাবার লোক থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য।"

ইরানবাসীরা মুসান্নার চিঠির মর্ম সম্পর্কে অবহিত হলো। এর সাথে ইরান সীমান্তে এসে মুকাবিলা করার জন্য মুসান্নার আগমনের কথা শুনে তাদের উদ্বিগ্নতার সীমা রইলো না। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন শক্তি-সাহস অবশিষ্ট থাকবে ও বাদশাহকে বেপরোওয়াভাবে এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। কেউ কেউ আবার তাদের বাদশাহর এ ভাষায় চিঠি লিখাকেও ঠিক মনে করেনি। তাই তারা তাকে বললো ঃ

www.pathagar.com

"আপনি চিঠি লিখে মুসলমানদেরকে সাহসী বানিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি কাউকেও কোনো চিঠি লিখতে হয়, তাহলে দয়া করে পরামর্শ করে তা লিখবেন।"

মাদায়েন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে বাবেল শহরের ভগ্নাবশেষের কাছে মুসান্না অবস্থান গ্রহণ করে হরমুজের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। অবশেষে হরমুজও এসে পৌঁছলো। মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই তার হাতের মুঠি হতে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তাদেরকে ধ্বংস করেই তবে ছাড়বে—এ ছিলো তার বিশ্বাস। তার ভীতিপ্রদ হাতী ডানে বামে জোরে জোরে শূঁড় লম্বা করে বেড়াচ্ছে। মুসলমানরা আজ পর্যন্ত হাতীর যুদ্ধ মুকাবিলা করেনি। এ ভয়ংকর জীব দেখে তারা ভীত হয়ে পড়লো। মুসান্নাও বুঝতে পারলেন, যতক্ষণ হাতী যুদ্ধের ময়দানে বিদ্যমান থাকবে মুসলমানরা নিশ্চিন্তে ইরানীদের মুকাবিলা করতে পারবে না। সুতরাং কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে তিনি স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন। তরবারি উচিয়ে ধরে তারা হাতীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এটাকে মেরেই ছাড়লেন। মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। এবার নতুন উদ্দীপনা সহকারে তারা ইরানীদের উপর হামলা চালালো। পরাজিত না করা পর্যন্ত মুসলমানরা এ উদ্যমেই হামলা চালাতে থাকলেন। ইরান বাহিনী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পালাতে শুরু করলো। পেছন থেকে ধাওয়া করে মুসলমানরা তাদেরকে মাদায়েন পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এলেন।

দ্বিতীয়বার ইরানের পশ্চাদাপসরণ

হরমুজের পরাজয়ের খবর শুনে শাহরিয়ানের সারাদেহে বিদ্যুৎ চমকে দিলো। সেই সময়ই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সে অবস্থায়ই সে মারা গেলো। ইরানের সরদারগণ কেসরার কন্যাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চাইলো। তাহলে তারা আর একবার সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারে কিনা চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে পদচ্যুত করা হলো। তার স্থলে সাবুর বিন শাহরিয়ানকে সিংহাসনে বসালো। সাবুর 'কারখজাদকে' তার ওজীর নিয়োগ করলো। তার সাথে কেসরার কন্যা আজরমিদাখতকে বিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু 'আজরমিদাখত' শাহী খান্দানের বাইরে বিয়ে করতে রাজী হলো না। সে সাবুরকে বললো ঃ "হে বোন ! তুমি কি আমার গোলামের সাথে আমাকে বিয়ে দেবে? আমি কিছুতেই একথা মানতে পারি না।" কিন্তু সাবুর তার কোনো কথা শুনলো না। মন্দাচার করলো। এ কারণে 'আজরমিদাখত' একজন অনারব বাহাদুর 'সিয়াওখাশরাজিকে' সাথে নিয়ে নিলো। বিয়ের রাতে কারখজাদ বাসর শয্যায় গেলে সিওয়াখাশ আকস্মিকভাবে হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেললো। এরপর আজরমিদাখত তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে সাবরের 'মহল' অবরোধ করে বসলো। পাহারাদাররা বাধা দিলে তাদের হাতে নিহত হলো। সাবুরকে হত্যা করে আজরমিদাখত সিংহাসনে আরোহণ করলো।

এসব খবর সম্পর্কে মুসান্না অবহিত ছিলেন। তিনি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইরানী ঐক্য তার জন্য ছিলো বিপজ্জনক। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে দিলেন। তারা সিংহাসনে আরোহণের জন্য একে অপরের পেছনে লেগেছিলো। এ অবস্থা মুসান্নার অনুকূলে ছিলো। এ অবস্থার সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন। ভবিষ্যতে অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেয় বলা যায় না। তাই তিনি এ অবস্থায়ই মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহরের দ্বার প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। মাদায়েন জয় করাই ছিলো তার অভিপ্রায়। কিন্তু এজন্য আরো শক্তিশালী বাহিনীর প্রয়োজন ছিলো। এ সময় মদীনা হতেও কোনো সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিলো না। কেননা তখন সকলেই সিরিয়ায় রোমকদের মুকাবিলার জন্য ব্যস্ত ছিলো।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মুসান্না আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনায় একটি চিঠি লিখলেন। এ চিঠিতে তিনি বিভিন্ন বিজয়ের শুভ সংবাদ দিয়ে ঐসব ধর্মত্যাগী গোত্রগুলো হতে সাহায্য গ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন যারা পরে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এদেরকে ইসলামী সামরিক বাহিনীতে শামিল করতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আগে নিষেধ করেছিলেন। মুসান্না জানতেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহজে এ আবেদন মঞ্জুর করবেন না। কিন্তু আবার তিনি একথাও জানতেন যে, সাবেক মুরতাদ গোত্রগুলো নিজেদের অতীত কার্যক্রমের জন্য দুঃখিত। এখন তারা ইসলামী বাহিনীতে যোগদানের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

বহুদিন হলো চিঠির কোনো উত্তর না পেয়ে মুসান্না স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে মদীনায় গিয়ে সাক্ষাত করতে চাইলেন। ইরাক সীমান্তের নিম্নাঞ্চলে বাহিনীকে রেখে বশির বিন ফাসাসিয়াকে ইরাকে নিজের স্থলাভিসিক্ত করে মদীনায় রওনা হলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সময় মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকা সত্ত্বেও তাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনেন। এ সময় ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি তাঁকে ডেকে এনে বললেন ঃ

> "আমি যা বলি শুনো ও সে অনুযায়ী কাজ করো। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকবো এ আশা আমার নেই। আমার মৃত্যুর পর আগামীকালের আগেই যুদ্ধ করার জন্য মুসান্নার সাথে বাহিনী পাঠিয়ে দেবে। দীনি কাজ ও আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে কোনো বিপদাপদই যেন তোমাকে গাফেল করে না রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি কি করেছি তুমি দেখেছো। অথচ সে সময় মুসলমানরা বড় পরীক্ষায় ছিলো। সে সময় যদি আমি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পালনে দেরী করতাম অথবা দুর্বলতা দেখাতাম, শুধু মদীনায়ই আগুন জ্বলে উঠতো না ; বরং ইসলামও বিপন্ন হয়ে উঠতো। সিরিয়ার বিজয় ঘটে যাবার পর ইরাকবাসীদেরকে ইরাকে পাঠিয়ে দেবে। কারণ, তারা ইরাকের কাজই ভালো করে সম্পাদন করতে পারবে। ইরাকেই তাদের চোখ খুলেছে।"

www.pathagar.com

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উপদেশ অবিকল মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। পরে তিনি বলতেন ঃ

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন, আমি খালিদের নেতৃত্ব পসন্দ করি না। এজন্যই তিনি আমাকে খালিদের সাথীদেরকে ইরাকে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু খালিদকে সাথে পাঠাবার কথা বলেননি। আর না আমার কাছে তার কথা উল্লেখ করেছেন।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম মুসান্নার সাথে একটি বাহিনী ইরাক পাঠিয়ে দিলেন। সাবেক মুরতাদদের ইসলামী বাহিনীতে শামিল করার জন্যও তিনি তাকে হুকুম দিয়ে দিলেন। কেননা এখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাদের তরফ থেকে কোনো রকম কলহ-বিবাদ উঠার সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই।

www.pathagar.com

১৬

কুরআন সংকলন

ইয়ামামার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

কুরআনে পাকের একত্রিকরণের ইতিহাস জানার জন্য আবার ইয়ামামার যুদ্ধের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কেননা এ যুদ্ধের ফলেই এ বিরাট খেদমত সম্পাদন করার খেয়াল কারো কারো মনে জেগেছিলো। যুদ্ধ ও বিজয়ের ঘটনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমি প্রথম এ ঘটনা আগে বর্ণনা করিনি।

ধর্মত্যাগের যুদ্ধগুলোর মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধই সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শুধু ভয়ংকর যুদ্ধই ছিলো না। এ যুদ্ধের ফলাফলও ছিলো সুদূর প্রসারী। মুসাইলামা বিন হাবিবের মৃত্যু মিথ্যা নবীর দাবীদারদের উপর ছিলো একটা বিরাট আঘাত। বাহরাইনে ধর্মত্যাগীদের নির্মূল করণের দ্বারা বনু হানিফা পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেলো। আর এ ঘটনাই মুসান্না বিন হারিসাকে ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে সাহস যুগিয়েছে। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাকে পরাজয় করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ তার পূর্ণ শক্তি খাটিয়েছেন। এদিকে মুসাইলামাও মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য কোনো চেষ্টা বাদ রাখেনি। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই মুসাইলামা পরাজয় বরণ করেছে। তার হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধের ময়দানে মারা গেছে। আর নিজেও ওয়াহশী গোলামের হাতে নিহত হয়েছে। এদিকে মুসলমানদেরও কম ক্ষতি হয়নি। বার শত মুসলিম বীর সেনানী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহাবী ও হাফেজে কুরআনও ছিলেন।

এ বিজয় মুসলমানদের জন্য একদিকে যেমন ছিলো খুশীর পয়গামবাহী আবার অপরদিকে তেমনি ছিলো দুঃখবহ ঘটনাও। অনেক সম্মানিত সাহাবী হাফেজে কুরআন শহীদ হবার কারণে মুসলমানরা বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ ক্ষতি পূরণ হবার ছিলো না। বিশেষ করে এতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মনে ব্যথা পেয়েছিলেন। কেননা তাঁর ভাই যায়েদ এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। দুঃখে-কষ্টে তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বিন ওমরকে বিজয়ের পর মদীনায় এনে বললেন ঃ

"তোমার চাচা যখন শহীদ হলেন, তখন তুমি ফিরে এলে কেন ? তুমি কেন তোমার মুখ আমার থেকে লুকিয়ে রাখলে না।"

আবদুল্লাহ বিন ওমর শুধু বললেন ঃ

"তিনি শাহাদাত প্রাপ্তির আরজু করেছিলেন। তাই তিনি তা পেয়েছেন। আমিও এ আশায় প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু আফসোস শাহাদাত প্রাপ্তি আমার ভাগ্যে জুটলো না।"

www.pathagar.com

ওমরের পরামর্শ

নিজের ভাই ও অন্যান্য ঘনিষ্ট বন্ধুদের শাহাদাতের বেদনাদায়ক ব্যথাও হযরত ওমরকে জাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়ে গেছেন। এখনো যুদ্ধের ধারা শেষ হয়নি। শেষ হবার তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন। যদি এভাবে হাফেজে কুরআনগণ শহীদ হতে থাকেন, তাহলে 'কুরআন' গ্রন্থাকারে এক জায়গায় একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কুরআনের অস্তিত্বই মিটে যেতে পারে। অতএব হাফেজগণ বেঁচে থাকতে কুরআন বিলোপ হবার আশংকা থাকবে না। এ বিষয় নিয়ে তিনি বেশ কয়েক দিন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। একদিন তিনি তার এ চিন্তা-ভাবনার কথা মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পেশ করে বললেন ঃ

"ইয়ামামার যুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক হাফেজ শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার ভয় হয় অন্যান্য যুদ্ধে আরো হাফেজ শহীদ হলে কুরআন পাকের অনেক অংশই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমার মত হলো, আপনি কুরআনে কারীম একত্র করার হুকুম জারী করে দিন। তাহলে তা বিলোপ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।"

এ বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এখনো কোনো চিন্তা-ভাবনা করেননি। ওমরের মুখে একথা শুনার পর তিনি বললেন ঃ

"আমি ঐ কাজ কিভাবে করবো, যা আল্লাহর রাসূল করেননি।"

এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ চললো। এ দীর্ঘ আলোচনার বিস্তারিত কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেননি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশেষে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত সমর্থন করেন। তিনি যায়েদ বিন সাবিতকে ডেকে পাঠালেন। এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে যায়েদ বিন সাবেতের একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

"ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তার কাছে গেলাম। সে সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ওখানে ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে দেখে বললেন, "ওমর আমার কাছে এসে বললো—ইয়ামামার যুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক লোক শহীদ হয়েছেন। এদিকে যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চলছে। আল্লাহ না করুন কোনো সময়ে না আবার সব হাফেজে কুরআন শহীদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশ বিলোপ হয়ে যাবে। তাই আমার মতে আপনি কুরআন একত্র করার হুকুম দিয়ে দিন। তাহলে তা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে রক্ষিত হয়ে যাবে।" যায়েদ বিন সাবেত বলেনঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একথা শুনে আমি ওমরকে বললাম, আমি ঐ কাজ কিভাবে করবো যে কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। কিন্তু ওমর বললেন, এ কাজে উম্মতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই তা করতেই হবে। ওমর দার দাবীতে এমন অটল রইলেন। অবশেষে আল্লাহ

www.pathagar.com

আমারও সিনা খুলে দিলেন। আমিও ওমরের সাথে একমত হয়ে গেলাম।" যায়েদ বিন সাবেত বললেন, "এ সময় হযরত ওমর মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিলেন। আবু বকর আমাকে বলে চললেন, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান মানুষ। আমি সহ তোমার সত্যবাদিতা ও সত্য কথনে কেউ কোনো সন্দেহ করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী লিখার সৌভাগ্য তুমিই অর্জন করেছো। তাই কুরআনে কারীম তালাশ করে করে তুমি তা এক জায়গায় একত্র করো।—আল্লাহর শপথ ! যদি পাহাড়কে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম আমাকে দেয়া হতো, তাহলে তাও আমার কাছে কুরআন জমা করার কাজ থেকে সহজ মনে হতো।" আমি আরজ করলাম, "আপনারা দু'জন ঐ কাজ কি করে করতে পারেন, যে কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুও বললেন, ওতে উম্মতের কল্যাণ নিহিত আছে। তিনি অবিরত আমার কথার জবাব দিতে লাগলেন। এভাবে আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো আমারও সিনা খুলে দিলেন। অতএব আমি এ কাজ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলাম। কুরআনে কারীম তালাশ করে চামড়া, লাকড়ী, পাথরের টুকুরো এবং মানুষের সিনা হতে জমা করতে শুরু করলাম। সূরা তাওবার দু'টি আয়াত আমি খাজিমা আনসারীর কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ছাড়া আর কারো কাছ থেকে এ দু'টি আয়াত পাওয়া যায়নি। এ দু'টো আয়াত হলো ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ ـ ايات : ١٢٨

আমি যখন কুরআনে কারীমের নিরীক্ষামূলক কপি লিখে নিলাম। জানতে পারলাম যে, এতে সূরায়ে আহযাবের একটি আয়াত সন্নিবেশিত হয়নি। এ আয়াতটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনতে পেতাম। অবশেষে সে আয়াতটিও খাজিমা আনসারীর কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। এ ব্যক্তির একজনের সাক্ষ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনের সাক্ষ্যের বরাবর হবে বলে ঘোষণা করেছেন। সে আয়াতটি হলো ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ـ ايات : ٢٣)

এ আয়াত পাবার পর আমি একে উপরোল্লিখিত সূরায় সন্নিবেশিত করেছি। যেসব পাতায় কুরআনে কারীমকে জমা করা হয়েছে, তা হযরত আবু বকর

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে সংরক্ষিত ছিলো। তাঁর ইন্তেকালের পর তা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফছার কাছে ছিলো।"

এটিই হলো যায়েদ বিন সাবেতের ঐ হাদীস যা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত করেছেন। সকল বর্ণনাকারী এ হাদীসের বিশুদ্ধতায় একমত। কুরতুবী লিখেছেন, যায়েদ যে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে সূরার নিয়ম মাফিক কোনো ধারাবাহিকতা ছিলো না। আর এটা পরে তারতিবের সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং উম্মুল মু'মিনীন হাফছার কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে থাকে।

অন্যান্য বর্ণনা

এমনও একটি বর্ণনা আছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুই সর্বপ্রথম কুরআনে কারীম সংকলন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১] তিনি একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, এ আয়াতটি অমুক সাহাবীর স্মরণ ছিলো। কিন্তু সে সাহাবী ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন—একথা শুনে তিনি ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে কুরআন জমা করার হুকুম দিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি এতদসংক্রান্ত বর্ণিত সকল বর্ণনার উল্টো। কুরআন জমা করার পরামর্শ নিসন্দেহে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথম দিয়েছিলেন। কিন্তু তা জমা করার সৌভাগ্য হয়েছিলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ আবু বকরের উপর রহমত বর্ষণ করুন। কুরআন জমা করার ব্যাপারে তিনি সকলের চেয়ে পুরস্কার পাবার বেশী অধিকারী। কেননা তিনিই সকলের আগে কুরআন জমা করেছেন।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সর্বপ্রথম কুরআন জমা করেছেন বলে যারা দাবী করেন, তারা বলেন, যখন তিনি এ কাজ করতে চাইলেন, প্রথম একটি ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে সাহাবাদের উপদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনের যা কিছু লাভ করেছেন তা যেন তার কাছে নিয়ে আসেন। সাহাবাদের অভ্যাস ছিলো, তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা শুনতেন, চামড়ায়, কাঠে এবং হাতের উপর লিখে রাখতেন। সুতরাং যার কাছে কুরআনের যা রক্ষিত ছিলো সব ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এনে জমা দিলেন। কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করতেন না। যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি তার স্বপক্ষে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী পেশ না করতেন। এই বলে যে, সত্যিই এ আয়াত আল্লাহর রাসূল তাঁর নিজ জবান মুবারকে ইরশাদ করেছেন। এ কাজ ওমর সুসম্পন্ন করার আগেই শাহাদাত লাভ করেন। তারপর হযরত ওসমান এ দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি যায়েদ বিন সাবেতকে ডেকে এনে কুরআনে

১. কিতাবুল মাছাহেফ, ইবনে আবু দাউদ পৃষ্ঠা-২০ ও কিতাবুল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন, সুয়ূতী পৃষ্ঠা-৫৯।

www.pathagar.com

কারীমকে একত্র করার আদেশ দেন এবং হেদায়াত দান করেন, লেখার ধারাবাহিকতায় কোথায়ও কোনো মতভেদ পরিলক্ষিত হলে তা যেনো 'মোদেরের ভাষায়' লিখে নেন। কেননা কুরআনে কারীম মোদেরেরই এক ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর নাযিল হয়েছিলো।

কুরআন একত্র করার সময়কাল

কুরআন জমা করার ইতিহাস বর্ণনার আগে আমি আবু বকরের উক্তি—"আমি ঐ কাজ কিভাবে করবো, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং করেননি"-এর ব্যাখ্যা করে দিতে চাই। রাসূলের উপর নবুয়াতের দায়িত্ব সপর্দ হবার পর থেকে মদীনায় ইন্তেকাল পর্যন্ত একাধারে তেইশ বছর পর্যন্ত অহী নাযিল হচ্ছিলো। কোনো কোনো সময় কিছু কিছু আয়াত নাযিল হতো। কোনো কোনো সময় আবার গোটা সূরা নাযিল হতো। প্রথম নাযিল হয়েছিলো সূরা আলাকের আয়াত ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِىْ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ط (ايات : ١-٥)

এ সূরার অবশিষ্ট আয়াতগুলো যা আমরা আজকাল কুরআনে কারীমে উপরোল্লিখিত আয়াতের সাথে সন্নিবেশিত দেখতে পাই—তা শুধু পরেই নাযিল হয়নি বরং বহু অহী নাযিল হবার অনেক পরে নাযিল হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্যের অর্থ কি একথা বুঝা যাবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত কুরআন কারীম বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ছিলো। এর আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা ছিলো না। আর সূরাগুলোর মধ্যেও নয়। সবই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলো। আর আজকাল যে ক্রমধারা পরিলক্ষিত হয় তা আগে ছিলো না।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা ছিলো, রাসূলের ওফাত পর্যন্ত কুরআনে কারীম বাস্তবিকই বিক্ষিপ্তভাবে ছিলো। তাদের কথার সমর্থনে তারা যায়েদ বিন সাবিতের হাদীস পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন আর এ সময় কুরআন একত্রে এক জায়গায় জমা ছিলো না। প্রাচ্যবিদদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী একথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মিয়র তার গ্রন্থের ভূমিকায় যায়েদ ইবনে সাবিতের একথাকে জোরেশোরে নিজের সমর্থনে পেশ করে বলেন ঃ

"কুরআনে কারীমের বিভিন্ন অংশকে অত্যন্ত সাদাসিদেভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে কোনো রকম ইতস্তত করা হয়নি। কোনো বিষয়ের উপর বুৎপন্নমতিত্তা ও কড়াকড়ি নীতি আরোপ করা হয়নি। একথা হতে একত্র কারীর ঈমান, সরলতা আর সত্য আকীদার প্রমাণ পাওয়া যায় যা এ কিতাবের সাথে ছিলো। এসব পবিত্র আয়াতগুলোর প্রতি গভীর আকীদা ও মর্যাদারই ফলে যে

www.pathagar.com

তিনি এগুলোকে ক্রমবিন্যাস করে যাবার চেষ্টা করেননি। বরং যেসব আয়াত তিনি পেয়েছেন তা-ই তিনি এক জায়গায় একত্র করেছেন।" যেসব প্রাচ্যবিদ এ মতের ধারক তারা বলেন, যায়েদ বিন সাবিত ও তার সহযোগীরা কুরআন জমা করার সময় এর নাযিলের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করেননি এবং মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত হতে আগে লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা অনুভব করেননি। স্থান ও কালের দাবী আছে কি নেই এর প্রতি লক্ষ্য না করেই মক্কী সূরার মধ্যে মাদানী সূরা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রাচ্যবিদদের মতে যদি যায়েদ বিন সাবিত সময় ও ক্রমবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন তাহলে তা জ্ঞানগত গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী প্রমাণিত হতো। আর রাসূলে আরবীর সব অবস্থার যাচাই-বাচাই করতে ও তাঁর সীরাত পরখ করতে বেশ সাহায্য পাওয়া যেতো।"

প্রাচ্যবিদগণ আরো লিখেছেন যে, কুরআন একত্রকারীগণ আয়াতকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও ক্রমবিন্যাস করেননি। এর ফলে একই সূরায় ইতিহাস ও কিসসা সম্পর্কেও যেমন কথা পাওয়া যায়, তেমনি ঈমান ও ইবাদাতেরও কথাবার্তা পাওয়া যায়। আবার শরয়ী আহকামও পাওয়া যায়। ঠিক একইভাবে মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত আইন-কানুনও পাওয়া যায়। উপরন্তু বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এক ধরনের বর্ণনাকে এক জায়গায় একত্র করার পরিবর্তে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে একটি জিনিসকে তালাশ করার জন্য সমস্ত কুরআনের পাতা উল্টিয়ে মূল উদ্দেশ্য লাভ করা যায়। প্রাচ্যবিদদের মতে কুরআন একত্রকারীগণ বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রেখে বিশেষ করে কুরআন নাযিল হবার ধারাবাহিকতার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শনের প্রমাণ দিয়ে তারা বিশ্বকে একটি জ্ঞানগত বিষয় তুলে ধরা হতে বঞ্চিত করেছেন।

প্রাচ্যবিদদের এসব কথার মূল ভিত্তিই হলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঐ কথা—ঐ কাজ আমি কিভাবে করবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। কিন্তু তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর একথার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। তাদের ধারণা হলো, কুরআনের আয়াতগুলো অহী নাযিলের শুরু হতেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো। এজন্য প্রথম খলিফা ও তৃতীয় খলিফার কালে এগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই সকল আয়াত তাঁর হুকুমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একথার স্বপক্ষে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

"মালেক বলেন, কুরআনে মাজীদ ঐভাবে সংকলিত করা হয়েছে যেভাবে সাহাবারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা পড়তে শুনেছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন ঃ

"আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান মুবারক থেকে শুনে শুনে সত্তরেরও বেশী সূরা মুখস্ত করেছিলাম। একবার আমি তাঁর সামনে

www.pathagar.com

সূরায়ে বাকারার إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ـ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছি।"

যায়েদ বিন সাবিত বর্ণনা করেন যে, তিনি গোটা কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পড়ে শুনিয়েছেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে, আনাস বিন মালেকের কাছ থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে চার ব্যক্তি কুরআনে কারীম একত্র করেছেন (হেফজ করেছেন)। এ চার ব্যক্তিই আনসার ছিলেন। অর্থাৎ এরা ছিলেন উবায় বিন কায়াব, মুয়াজ বিন জাবাল, যায়েদ বিন সাবিত এবং আবু যায়েদ।"

আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথার অর্থ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ চারজন সাহাবা ছাড়া আর কোনো সাহাবী কুরআন হেফজ করেননি। এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় কুরতুবী লিখেন ঃ

> "অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, তামিমুদ্দারী, ওবাদা বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন আসও কুরআন কারীম হেফজ করেছিলেন। এসব বর্ণনার বিদ্যমানতায় আনাস বিন মালেকের বর্ণনা 'আনসারদের চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কুরআন হেফজ করেননি' একথার এ অর্থ করা যায়, এ চারজন ছাড়া আর কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনে কুরআন হেফজ করেননি। বিভিন্ন সময় সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনে কুরআন হেফজ করতেন ও অন্যদেরকে শিখাতেন। তারপরও সকল সাহাবার পক্ষে এটা অসম্ভব ছিলো, তারা কুরআনে কারীমের সকল আয়াত রাসূলে কারীমের জবান থেকে শুনেছেন। এভাবে অনেক সাহাবা কুরআনে কারীমের কিছু অংশ রাসূল থেকে আবার কিছু অংশ সাথী সাহাবাদের কাছ থেকে লাভ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায়, চারজন সাহাবীর সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে কুরআনে কারীম হেফজ করার মর্যাদা এজন্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে যে, এরা ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রাণ প্রথম যুগের মুসলমানদের (সাবেকুনাল আউয়ালুন) মধ্যে গণ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে স্নেহ করতেন।"

একথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর হযরত জিবরাঈল আমীনের সামনে একবার গোটা কুরআনে কারীম পড়ে শুনাতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর তিনি তা একবারের পরিবর্তে দু'বার তার সামনে দাওরা শুনান।

সীরাতে নববীতে যেসব ঘটনা লেখা আছে তা উপরে উল্লেখিত বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ দেয়। এসব ঘটনার মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার

www.pathagar.com

ব্যাপারটিও সন্নিবেশিত হয়েছে। যা রাসূলের নবুয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পর সংঘটিত হয়েছে। মক্কায় যখন আল্লাহর দীন ক্রম উন্নতি লাভ করতে শুরু করলো এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ শুরু হলো তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফরী অবস্থায় ছিলেন। জাতির মধ্যে এই ভেদাভেদ দেখে ওমরের খুব রাগ ধরলো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করলেন। হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে তিনি তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। পথে দেখা হলো নাঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে। নাঈম ওমরকে নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে যেতে দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ অবস্থায় তুমি কোথায় যাচ্ছো। ওমরের উদ্দেশ্যের কথা শুনে তিনি বললেন, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো পরে হত্যা করবে। আগে নিজের ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ফাতেমা আর ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন।" এ খবর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে যাবার পরিবর্তে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি। ঘরের বাইর থেকে তিনি শুনলেন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দু'জনকে কুরআন পড়ে শুনাচ্ছেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি বোন ও ভগ্নিপতিকে মারতে শুরু করলেন। কিন্তু পরে এ কাজের জন্য লজ্জাবোধ করে বোনকে বললেন, যে কিতাব তুমি পড়ছিলে আমাকে দেখাও। তাই বোন কয়েকটি পাতা উঠিয়ে আনলেন। এতে সূরা 'ত্বাহা' লিখা ছিলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সহীফা পড়ার পর তার উপর কুরআনের অলৌকিক প্রভাব পড়লো। তিনি তখনই উঠি গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম কবুল করেন।

ঐসব পাতা যাতে সূরা ত্বা-হায় লিখা ছিলো তা ছিলো অনেক সহীফার একটি সহীফা যা মুসলমানদের মধ্যে জারী ছিলো। এতে সূরায়ে ত্বা-হা ছাড়াও আরো কয়েকটি সূরা লিখা ছিলো। ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর তের বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, "আমার কাছ থেকে যেন কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে না রাখা হয়। যদি কেউ কুরআন ছাড়া কোনো হাদীস লিখে নিয়ে থাকে, সে যেন মুছে ফেলে।" সাহাবাগণ নামাযে তেলাওয়াত করা ও দীনের আহকাম শিখার জন্য কুরআনে কারীমের যতটুকু অংশ লিখতে পারতেন তা লিখে নেয়া আবশ্যকীয় ছিলো। এভাবে ঐসব লোকও কুরআনে কারীম লিখতেন। যাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে কুরআন শিখানো ও দীনি তালিম দেয়ার জন্য পাঠাতেন। পৃথক পৃথক আয়াত লিখতেন না। বরং গোটা সূরা লিখে রাখতেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব তাদেরকে লিখিয়ে দিতেন।

কুরআনে কারীম থেকেও আমাদের সাহায্য হয়। বস্তুত আল্লাহ কুরআনে কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ۝
اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ـ(المزمل : ١ـ٤)

"হে কম্বল মুড়ে শয়নকারী। রাতে দাঁড়িয়ে থাকো কিছু সময়ের জন্য অর্থাৎ রাতের অর্ধেক অথবা এর চেয়ে কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়মের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করো।"[১]

সূরা মুজাম্মিলের আয়াত রাসূলের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তার নবীর কাছে এ প্রত্যাশা করা, তিনি রাতে উঠে তারতিবের সাথে কুরআন পড়বেন—এর থেকে বুঝা যায় এসব কুরআনের আয়াত কোনো সময়ই অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিলো না। বরং যখনই রাসূলের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তখন তিনি তা তার জায়গায় রাখার নির্দেশ দিতেন। একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, যখন এ আয়াত ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ(البقرة : ٢٨١) নাযিল হয়েছে তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতকে সূরা বাকারায় দু' শত আশি আয়াতের প্রথম দিকে সন্নিবেশিত করবেন।"

কুরআনে কারীমে বারবার এর নিজের পরিচয় কিতাবের শব্দ দিয়েই করেছে। সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা বাকারাই হলো কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা। এ আয়াত দিয়েই আল্লাহ এ সূরার প্রারম্ভ করেছেন ঃ

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

(এ কুরআন একটি কিতাব। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই। এটা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত)। এভাবে আরো কয়েকটি জায়গায় কুরআনের স্থলে কিতাব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিতাব তাকে বলা হয় যা লিখিত হয়। এর আগে আমি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণ করেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন লিখিত হতো। যায়েদ বিন সাবিতের একথা আমরা আগেই উদ্বৃত করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কুরআনে কারীম এক জায়গায় জমা করা ছিলো না। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমরা রাসূলের কাছে থাকতাম এবং কুরআনকে কাপড়ের টুকরায় সংকলন করতাম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর হেদায়াত ও বাণী অনুযায়ী বিভিন্ন আয়াত নিজের সুযোগ-সুবিধা মতো লিখে নিতাম। বস্তুত তালিফ বা সংকলন অর্থই হচ্ছে তাই। তাছাড়াও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে এবং গোটা সূরা যেমন সূরা আল বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা আন নিসা, সূরা আর রায়াদ, সূরা জ্বিন, সূরা আন নাজম, সূরা আর রাহমান এবং সূরায়ে আল কামার ইত্যাদি তেলাওয়াত করতেন। এসব কথা হতে প্রমাণিত যে, আয়াতের ক্রমবিন্যাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই তাঁরই নির্দেশ মুতাবেক পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কারী ও হাফেজগণ তা মুখস্ত করে রেখেছিলেন।

১. তারতিল অর্থ শুধু থেমে থেমে পড়াই নয় বরং এর অর্থে তালিফ ও তারতিবও শামিল। বস্তুত আরবী ভাষায় তারতিল হলো খুব উত্তমভাবে খুলে খুলে ও থেমে থেমে পড়া।

www.pathagar.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবাগণ শুধু কুরআন শরীফ মুখস্ত করেই রাখেননি বরং চারজন সাহাবা তো যথানিয়মে লিখে রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আয়াতের ক্রমবিন্যাস সংক্রান্ত রাসূলের ওফাতের আগেই লিখা সহীফা এবং পরে সংকলিত সহীফার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কুরআনের আয়াতের ক্রমধারা ঠিক করে দিয়েছেন। অবশ্য সূরার ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে। বলা হয়ে থাকে যে, এ কাজ উম্মতদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে গেছেন।

রাসূলের জীবনেই কুরআন জমা করা হয়েছে বলে যখন প্রমাণিত হলো তখন আবু বকরের ঐ কথার অর্থ কি দাঁড়ায় যা তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কুরআন জমা করার প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন—"ঐ কাজ আমি কিভাবে করতে পারি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি" এবং কি দলিলের কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও যায়েদ বিন সাবিতের দিল খুলে গেলো এবং উভয়ই হযরত ওমরের প্রস্তাব অনুযায়ী কুরআনে কারীম জমা করার উপর একমত হয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকরের বাইয়াত হয়ে যাবার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ঘরে একা একা থাকতে লাগলেন। লোকেরা একথা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এসে বললে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে অপসন্দ করেন ? এজন্যই কি ঘরে বসে গেলেন ?" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন, "আল্লাহর কসম ! একথা অবশ্যই ঠিক নয়। আমার ভয় হচ্ছে লোকেরা আবার কুরআনের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করে না বসে। এজন্যই আমি শপথ করেছি, যে পর্যন্ত কুরআন জমা করে না নিবো সে পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবো না।[১]

রাসূলের ওফাতের পর কুরআন একত্র করার ব্যাপারে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু একা কাজ করেননি। বরং আরো কয়েকজন সাহাবাও এ কাজে শরীক ছিলেন।

---

১. আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর একথা–"আমার ভয় হচ্ছে লোকেরা না আবার কুরআনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে বসেন" শুধু ইমাম সুয়ুতী কিতাবুল ইতকানে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য সংকলনকারীরা শুধু আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর একথাটি লিখেছেন, "আমি শপথ করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন জমা করে না নিবো ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবো না।" ইবনে আবু দাউদ কিতাবুল মাছাহেফে এ বর্ণনায় লিখেছেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাইয়াতের কয়েকদিন পরে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে এনে বললেন, "হে হাসানের পিতা ! আপনি আমার ইমারতে অসন্তুষ্ট ? উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ ! অবশ্যই নয়। আমি কসম করেছি, জুমার দিন ছাড়া কুরআন জমা না করা পর্যন্ত আমি বেরুবো না। তিনি এবার তাঁর খিদমতে হাজীর হলেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করে ফিরে গেলেন। ইবনে আবু দাউদ বর্ণনার শেষের দিকে একথাও লিখেন যে, অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এটাও আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা বলে দাবী করেছেন—আমি ঐ পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন জমা করে না নেবো। এখানে জমা করা অর্থ হেফজ করা। কারণ, সে সময় যারা কুরআন হেফজ করতেন তাদের সম্বন্ধে বলা হতো, তিনি কুরআন জমা করেছেন।

www.pathagar.com

কুরআন জমা করার ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও অন্যান্য সাহাবার খেদমতকে পসন্দ করেছেন এবং এ মর্যাদাশীল কাজ থেকে কাউকেই বিরত রাখার ধারণাও তার মনে উদয় হয়নি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। তিনিই তা হেফাযত করবেন। কোনো মুসলমান তার নিজের তরফ থেকে বানিয়ে কুরআনে কিছু কমাবেন, বাড়াবেন একথা ভাবাও যায় না। আর কেউ যদি এমন কাজ করে, যার আশংকা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রকাশ করেছেন, তাহলে আল্লাহ নিজেই তার এ কিতাবের হিফাযত করবেন। তার এ কাজ থেকে তাকে ব্যর্থ মনোরথ করে দেবেন। এ কারণেই কুরআন এক জায়গায় একত্র করার জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পরামর্শ দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাময়িকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা তিনি তো এমন কোনো কাজ করছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। আর এমন কাজ হতে বিরত থাকছেন না যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ মুসলমানদের উপর সপর্দ করে রেখেছিলেন। কোনো কোনো লোককে রাসূল নিজে কুরআন শরীফ শিখিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্যরা তাদের বর্ণনা থেকে নকল করে অথবা শুনে মুখস্ত করে নিতেন। আবু বকরের খেয়াল ছিলো রাসূলের যুগের এ পদ্ধতিই চালু থাকুক। মানুষেরা একজন থেকে জিজ্ঞেস করে আর একজন শিখুক অথবা হেফজ করে নিক। খেলাফতের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হোক।

এটাই ছিলো হযরত আবু বকর ও যায়েদ বিন সাবিতের দলিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত ওমর বার বার জোর দেয়াতে দলিল-প্রমাণ দিলে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের মতামত বাদ দিয়ে ওমরের মত গ্রহণ করেন ও কুরআন এক জায়গায় জমা করার জন্য হুকুম দিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আবু বকর ও ওমরের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত সংলাপের কোনো বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেতো তাহলে এ ব্যাপারে আরো অনেক দিক দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কুরআন জমা করার ব্যাপারে এমন কোনো কাজ বাকী ছিলো যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে যাননি এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও যায়েদ বিন সাবিতকে তা করতে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে। কেননা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী নাযিল হতো তখন সাথে সাথে তিনি লিখিয়ে নিয়ে বলে দিতেন যে, এ আয়াত অমুক সূরার অমুক জায়গায় সন্নিবেশিত হবে।

এর জবাব হলো—একথা ঠিক, অবতীর্ণ আয়াতের ব্যাপারে তিনি অহী লেখকদেরকে এর সন্নিবেশিত হবার জায়গা বলে দিতেন। কিন্তু এসব আয়াত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখিত ছিলো। যেহেতু তাঁর উপর ধারাবাহিকভাবে অহী নাযিল হচ্ছিলো এ জন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনকে এক জায়গায় একত্রিত করে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর অহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে,

www.pathagar.com

কুরআন পরিপূর্ণ হলো। তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহিহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করে যেতে পারেননি। তা বিনষ্ট, রদবদল এবং পরিবর্তন হবার আশংকার প্রেক্ষিতে তাঁর পরে তাৎক্ষণিকভাবে কুরআন এক জায়গায় একত্রিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

এসব কারণেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন একত্রিকরণের ব্যাপারে জোর দাবী জানিয়েছিলেন। যেহেতু ওমরের দলিল মযবুত ছিলো এবং এতে সরাসরি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত ছিলো, তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশেষে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা মেনে নিলেন। যায়েদ বিন সাবিতকে কুরআনে কারীম জমা করার হুকুম দিলেন।

আবু আবদুল্লাহ জানজানী তার গ্রন্থ তারিখুল কুরআনে লিখেছেন, সাক্ষী সাবুদে মনে হচ্ছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিলো, হাড়ে, কাঠে, চামড়াসহ বিভিন্নভাবে কুরআন যেভাবে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছিলো তা অবকিল কাগজের পাতায় লিখে এক জায়গায় একত্র করা। কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে খুব সতর্কতা ও সাবধানতা থাকায় তারা এমন কোনো কাজ করতে চাইতেন না যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। এ কাজ না আবার বিদআতের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়ে এজন্য তারা ভয় করতেন।

ওসমানের যুগে কুরআন সংগ্রহ

কুরআন একত্রিকরণের ব্যাপারে কি কি কাজ করা হয়েছে তা বর্ণনা করার পূর্বে একথা বলা প্রয়োজন, ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে সংঘটিত ঘটনাবলী, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কুরআন একত্রিকরণ সংক্রান্ত মতামত খুবই সঠিক ছিলো বলে প্রমাণ হয়। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, কুরআন জমা করা না হলে ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফত যুগে বিজয়ের ধারা অব্যাহত গতিতে বিস্তৃত হয়ে চলছিলো। বিজিত এলাকার নওমুসলিমদেরকে কুরআন পড়ানো ও শিখানোর কাজ ন্যস্ত হয়েছিলো সাহাবাদের উপর। কিন্তু ইসলামী সুলতানাতের সীমা-পরিসীমা যেহেতু অসীম বিস্তৃতি লাভ করেছে, তাই মানুষের 'কারায়াতের' মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে লাগলো। আস্তে ধীরে এ মতভেদ বেড়েই চললো। একদল অন্যদল থেকে তাদের কারায়াতের বিশুদ্ধতার দাবী করতে শুরু করলো। অবস্থা এতদূর গড়ালো, কারায়াতের পার্থক্যের দরুন একে অপরকে কাফের আখ্যায়িত করতে শুরু করলো। এভাবে একটা বিরাট ফেতনা সৃষ্টি হয়ে গেলো। এ সময় হুজাইফা বিন ইয়ামান আরমানিয়া আজারবাইজানে কর্মব্যস্ত ছিলেন। কুফরী ও ফাসেকীর ফতুয়ার বাড়াবাড়ি দেখে তিনি বিপদের বড় ঝড় অনুভব করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে মদীনায় পৌঁছে তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আরজ করলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! উম্মতে মুসলিমার খোঁজ খবর নিন। তারা ধ্বংস হবার পথে এগিয়ে চলছে। ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ? সমস্ত ঘটনা খুলে বলে হুজাইফা আরজ করলেন, আমাদের সামরিক

www.pathagar.com

বাহিনীতে সিরিয়া ও হিজাজের লোক শামিল হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কারায়াত' নিয়ে মতভেদ শুরু হয়েছে। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কাফের, ফাসেক বলা পর্যন্ত শুরু হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে তারা না আবার এভাবে কুরআন নিয়ে মতভেদ শুরু করে দেয়। যেভাবে ইহুদী খৃষ্টানরা তাদের কিতাব নিয়ে করেছিলো। হুজাইফার কথা শুনে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও বিপদ অনুভব করলেন। তিনি বড় বড় সাহাবাদেরকে একত্র করে সব ঘটনা তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তারা বললেন, আপনিই বলুন এ বিপদ থেকে বাঁচার পন্থা কি ? তিনি বললেন, আমার মতে সমস্ত লোককে একটি 'কারায়াতের' উপর একত্র করতে হবে। কেননা আজ যদি মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতের সৃষ্ট বিপদ আজকের বিপদ থেকে হবে আরো বেশী ভয়াবহ।

সম্মানিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় মেনে নিলেন। তাই তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার কাছ থেকে ফেরত দেবার অঙ্গীকারে 'মুসহাফে আবু বকর' কয়েকদিনের জন্য চেয়ে এনে এর বহু কপি নকল করিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। এছাড়া কুরআনে কারীমের অন্যান্য সব 'নুসখা' ও লেখা নষ্ট করে দেবার হুকুম দিলেন।

হযরত ওসমানের যুগে উত্থিত এ মতভেদ হযরত ওমরের দূরদৃষ্টি ও অসীম প্রজ্ঞার পরিচায়ক। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 'মুসহাফে আবু বকর' রাদিয়াল্লাহু আনহু নকল করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে অবশিষ্ট সকল মাসহাব বিনষ্ট করার হুকুম দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে 'কারায়াতে'র মতপার্থক্য চিরদিনের জন্যে বিলোপ করে দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি কুরআন জমা করার হুকুম জারী না করতেন, তাহলে এ মতভেদ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে মুসলমানদেরকে এমন কলহের সম্মুখীন করতো যা রাজনৈতিক কলহ হতেও অনেকগুণ বেশী ভয়াবহ হতো। এসব দেখে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন এবং তিনি খুবই সঠিক বলেছেন ঃ

> "কুরআনে কারীম একত্রে এক জায়গায় জমা করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে বেশী সওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। কেননা তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন জমা করেছেন।"

ইবনে মাসউদের দ্বিমত পোষণ

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সংলাপের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিনা খুলে গেলে তিনি যায়েদ বিন সাবেতকে কুরআন জমা করার মর্যাদাবান দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ অপসন্দ করে বললেন ঃ

> "হে মুসলমানগণ ! আমাকে তো কুরআনে কারীম লেখা হতে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ জায়গায় এক লোকের উপর এ কাজ সপর্দ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার ইসলাম গ্রহণের সময় একজন কাফেরের ঔরষে ছিলো।"

অর্থাৎ যায়েদ বিন সাবিত। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ইসলাম গ্রহণের সময় যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জন্মগ্রহণও করেননি। কেউ কেউ বলেন, ইবনে মাসউদ একথা তখন বলেছেন, যখন ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর খেলাফতকালে যায়েদ বিন সাবিতকে কুরআনে কারীম লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কয়েকজন সাহাবাকেও তাঁর সাথে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। হতে পারে যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ উভয় ক্ষেত্রেই নারাজ ছিলেন। ব্রস্তুত কুরতুবী লিখেন ঃ

"আবু বকর আম্বারী বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরফ থেকে যায়েদকে কুরআন জমা করতে দেবার অর্থ এই নয় যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদের সাথে এঁদের উভয়ের কোনো শত্রুতা ছিলো। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ নিসন্দেহে মর্যাদার দিক দিয়ে যায়েদ থেকে উন্নত ও প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য।"

দীনের অন্যান্য খেদমতের দিক দিয়েও তিনি যায়েদ থেকে বেশ অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু এতসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও হেফজে কুরআনের দিক থেকে ইবনে মাসউদ যায়েদের সমতুল্য ছিলেন না।

এর থেকে মনে হয় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফত কালেই ইবনে মাসউদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছিলো।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদের অসন্তুষ্টি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে, শুধু একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জবান থেকে শুনে শুনে সত্তরটিরও বেশী সূরা মুখস্ত করেছি। কিন্তু যায়েদ বিন সাবিত সে সময় ছেলেপেলেদের সাথে মদীনার পথে-ঘাটে খেলাধূলা করতো।" বরং তিনি ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে ইরাকবাসীদের উত্তেজিত করতে শুরু করেছিলেন। তিনি যায়েদ বিন সাবিতকে সাহায্য না করার কথা বলে বলতেন, "আমি আমার মুসহেফ লুকিয়ে ফেলেছি। আর যে ব্যক্তি তার মুসহেফ লুকাতে পারে সে যেনো অবশ্যই তা লুকিয়ে ফেলে।

একদিন তিনি একটি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"হে লোকেরা ! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ 'মুসহেফ' লুকিয়ে ফেলো। তোমরা কিভাবে আমার থেকে এ আশা করতে পারো যে, আমি যায়েদ বিন সাবিতের 'কারায়াত' অবলম্বন করবো। অথচ আমি সত্তরের চেয়ে অধিক সূরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবান মুবারক থেকে শুনে মুখস্ত করেছি। সে সময় যায়েদ বিন সাবিত শিশু ছিলো এবং সাথী বন্ধুদের সাথে মদীনার অলিগলিতে খেলাধূলা করতো। আল্লাহর শপথ ! যে কোনো আয়াত কোথায় এবং কি উপলক্ষে নাযিল হয়েছে—একথা আমার চেয়ে আর কোনো ব্যক্তি বেশী জানে না। আল্লাহর কিতাব আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। আমি

www.pathagar.com

তোমাদের কাছে আমার বড়াই দেখাচ্ছি না। আমার চেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব জানার লোক আছে বলে আমি জানলে, আমি অবশ্যই সফরের ক্লান্তি সহ্য করবো এবং তাঁর কাছে পৌছবো।"

এত বলার পরও আকাবেরে সাহাবারা ইবনে মাসউদের এসব উক্তিকে ভালো চোখে দেখেননি। কারণ, এর থেকে ফেতনা বিস্তৃতি লাভ করার সম্ভাবনা ছিলো। আর ফেতনার পথ ইসলাম বড় কঠোরভাবে বন্ধ করেছে। বস্তুত আবুদ দারদা হতে একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন ঃ

"আমরা তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে খুবই নরম দিল, কোমলমতি ও স্নেহপ্রবণ লোক বলে জানতাম। জানি না তার কি হয়ে গেলো, তিনি কেন নেতৃবৃন্দের উপর অভিযোগ ও কুৎসা রটনা করতে লাগলেন।"

একথা ঠিক যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বদরী সাহাবা ছিলেন। যায়েদ বিন সাবিত বদরী ছিলেন না। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারেও ইবনে মাসউদ যায়েদ এবং তাঁর পিতার অনেক আগের লোক। একথাও সত্য যে, ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সত্তরের বেশী সূরা মুখস্ত করেছিলেন। কিন্তু এত সবের পরও একথাও আপন জায়গায় সত্য, যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতেবে অহী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত যায়েদ গোটা কুরআনই তাঁর থেকে লাভ করেছেন। আর যা-ই হোক অন্তত এ বৈশিষ্ট্য তো ইবনে মাসউদের ছিলো না। কুরতুবী লিখেছেন ঃ

"সাধারণত একথা সকলেরই জানা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই গোটা কুরআন লিখেননি। কুরআনের এমন কিছু অংশও ছিলো যা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর লিখেছেন, কোনো কোনো ইমাম তো একথাও বলেন যে, ইবনে মাসউদ গোটা কুরআন শিখার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।"

একথাও স্মরণযোগ্য যে, ইবনে মাসউদের মুসহেফে কুরআনে কারীমের শেষ দু' সূরার অর্থাৎ সূরায়ে আন নাস ও সূরায়ে আল ফালাক ছিলো না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যোগ্য মনে করেই যায়েদ বিন সাবিতকে কুরআন জমা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুত তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর চাপের মুখেই কুরআন একত্রিত করার কাজ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করেই যায়েদ ইবনে সাবিতকে ডেকে বলেছিলেন ঃ

"তুমি বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। আল্লাহর কিতাবে কোনো রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন আসবে এমন কথা তোমার ব্যাপারে চিন্তা করা যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও তুমি অহী লিখেছিলে। এ কারণেই আজও তোমার উপর আমি কুরআনে কারীম একত্রিত করার দায়িত্ব অর্পণ করছি।"

www.pathagar.com

কুরতুবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চেয়ে যায়েদ বিন সাবিতের মর্যাদা সম্পর্কে আবু বকর আম্বারীর যে বক্তব্য তাঁর নিজ গ্রন্থে উদ্বৃত করেছেন, তার আংশিক আমি উপরে বর্ণনা করেছি। অবশিষ্টাংশ এখানে উদ্বৃত করা হচ্ছে ঃ

"আবু বকর আম্বারী বলেন, যায়েদ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চেয়ে ভালো হাফেজে কুরআন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায়ই তাঁকে গোটা কুরআন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাসূলের জীবনে তাঁর থেকে সত্তরটির মত সূরা মুখস্ত করেছিলেন। বাকী সূরা শিখেছেন তাঁর ওফাতের পর। তাই যে ব্যক্তি রাসূলের জীবনে কুরআন খতম করে তাকে হেফজও করে নিয়েছেন, কুরআনে কারীম জমা করা তারই অধিকার—তাকে এ ব্যাপারে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।"

যায়েদ যুবক ছিলেন। একাগ্রচিত্তে কাজ করতে পারবেন বলেই বোধ হয় তাঁকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্যদের উপর অগ্রণী মনে করেছিলেন। কম বয়স হবার কারণে তার মধ্যে তার মতে অনঢ় থাকা, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির খামাখা প্রদর্শন করার স্পৃহা তার মধ্যে ছিলো না। সাহাবা কেরামদের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কুরআন জমা করার কাজ বেশ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। অথচ গোটা কুরআন তাঁর মুখস্ত ছিলো। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলে কারীমের ইন্তেকালের বছর তিনি যখন হযরত জিবরাঈল আমীনের সামনে দু' দু'বার কুরআনের দাওর দিচ্ছিলেন, দ্বিতীয়বার যায়েদ বিন সাবেত উপস্থিত ছিলেন। এটাই ছিলো তাঁর জীবনের শেষ দাওর।

হযরত যায়েদ বিন সাবিতও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক প্রদত্ত এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এ জন্যই কুরআন শরীফ সংকলনের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে প্রস্তাব রাখলে তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! আমাকে যদি পাহাড় কেটে নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রাখার হুকুম দেয়া হতো, তাহলেও আমার কাছে কুরআন জমা করার চেয়ে সহজ মনে হতো।"

একথা বলার কারণ ছিলো, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, ওমর, ওসমান, আলীসহ অনেক বড় বড় সাহাবারই কুরআনে কারীম হেফজ ছিলো। চারজন আনসারী সাহাবা (যার উল্লেখ উপরে হয়েছে) সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনে কারীম শিখেছেন। তারা ক্রমিকধারা অনুসারে অবিকল তা লিখে রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও একটি মুসহেফ ক্রমধারা অনুসারে সাজিয়ে নিজের কাছে তা তৈরি করে রেখেছিলেন। এছাড়াও কোনো লোকের মুসহেফ পরিপূর্ণ ছিলো আর কারো কারো মুসহেফ অসম্পূর্ণ ছিলো। এ অবস্থায় যেখানে অনেক বড় বড় মহাসম্মানিত সাহাবা যায়েদ বিন সাবিতের দেখাশুনা ও তাঁর কঠোর মোহাসিবা

www.pathagar.com

করার জন্য বিদ্যমান ছিলেন, তার এতো বিরাট দায়িত্ব মাথায় নেয়া অবশ্যই পাহাড়কে এক জায়গা হতে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার চেয়েও ছিলো কঠিন কাজ।

এসব মহাসম্মানিত আসহাব ছাড়াও সবচেয়ে বড় মোহাসিবা করার জন্য যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিদ্যমান আছেন, যিনি তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করেছেন, যার দৃষ্টি থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল-ত্রুটিও গোপন থাকতে পারে না। আল্লাহর মোহাসিবার ভয়ই ছিলো বেশী, যার জন্য যায়েদ বিন সাবিত অপরিসীম প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করেছেন। হাড়, চামড়া, কাঠ, গাছের ছাল, পাথর ইত্যাদির উপর লিখিত এক একটি আয়াত জমা করা, একটির সাথে আর একটিকে তুলনা করে দেখা, ক্রমবিন্যাসের মাধ্যমে এক জায়গায় লিখতে তিনি কোনো কায়ক্লেশ বাকী রাখেননি। এভাবে এমন একটি মুসহেফ তৈরি হয়ে উঠলো যা ভবিষ্যতে কুরআনে কারীমের কোনো অংশ কোনো কারণে বিনষ্ট হবার আশংকা দূরিভূত হয়ে গেলো। কারায়াতের সব মতভেদ বিলুপ্ত করে মুসলমানদেরকে একটি 'কারায়াতের' উপর একত্র করার প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু এ মুসহেফকে সামনে রেখে এর নকল করিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে পাঠাবার নির্দেশ জারী করেছেন।

একথা বলার প্রয়োজন রাখে না, যায়েদ বিন সাবিত নিজের মুসহেফ থেকে কুরআনের আয়াতকে এর অবতীর্ণ হবার তারিখের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে সংকলিত করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জামানায় আয়াতের ক্রমিকধারা নিজেই নির্দিষ্ট করেছেন। কোনো কোনো সময় এমনও দেখা যেতো, তিনি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতকে মক্কী সূরায় শামিল করে দিতেন। যায়েদ বিন সাবিতের পক্ষে নিজ থেকে ক্রমিক বিন্যাস করা সম্ভব ছিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দিষ্ট করা ক্রমিকধারাকেই তিনি বহাল রেখেছেন। এ ক্রমিকধারা অনুযায়ীই তিনি কুরআনে কারীমকে চামড়ায় লিখে জমা করে দিয়েছেন।

যায়েদের কর্মপদ্ধতি

প্রশ্ন উঠতে পারে, যায়েদ বিন সাবিত কুরআনে কারীম সংকলনের ব্যাপারে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। দ্বিধাহীনচিত্তে এর জবাব দেয়া যায়, তিনি ঐ জ্ঞানগত ও অনুসন্ধিতসু কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যা আজকালকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা করে থাকেন। তাছাড়া যে পরিমাণ পরিশ্রম ও প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে যায়েদ এ কাজ করেছেন তার এক-দশমাংশও এ কালের অনুসন্ধানীরা করতে পারতেন না। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্ত করেছেন অথবা আংশিক লিখে রেখেছেন তা যেনো অবশ্যই যায়েদকে জানানো হয়। লিখিত অংশ তার সামনে পেশ করে দেবে। সুতরাং যায়েদ বিন সাবেতের কাছে অধিক সংখ্যক হাড়, পাতা, খেজুর গাছের ছাল, চামড়া ও পাথরের উপর লেখা সূরা জমা হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

আয়াত ও সূরাকে এক জায়গায় জমা করার কাজ পূর্ণ হলে যায়েদ বিন সাবেত তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন এবং ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করার কাজ শুরু করলেন। কোন্ আয়াত কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, ভালো করে একথা পরখ করার আগে কোনো আয়াত তিনি গ্রহণ করতেন না। নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা যায়েদের কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু।

اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ۔

আয়াতটি পড়লেন অর্থাৎ 'আনসার' ও 'আল্লাজিনা' এর মধ্য হতে 'ওয়াও' অক্ষরটি বাদ দিয়েছিলেন। যায়েদ বিন সাবিতের কানে আয়াতটি যাওয়া মাত্র তিনি বলে উঠলেন—মূল আয়াতটি হলো—ওয়াল্লাজিনাত্তাবাউহুম বিইহ্সান। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এতে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি উবাই বিন কায়াবকে ডেকে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই যায়েদের কারায়াতের সত্যতা স্বীকার করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর মন থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য একথাও বললেন—"আল্লাহ্র শপথ ! এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ঐ সময় পড়িয়েছেন, যখন আপনি বাজারে আটা বেচাকেনায় ব্যস্ত ছিলেন।" এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং বলেন, "সত্যিই যায়েদের কারায়াতই সঠিক।"

শুধু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুই নন বরং যখনই কোনো সাহাবীর সাথে যায়েদ বিন সাবিতের কারায়াতের পার্থক্য ঘটতো তখনই তিনি সন্দেহ নিরসনের জন্য এ ধরনের অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সঠিক কারায়াত নির্দিষ্ট করার জন্য অন্যান্য সাহাবাদের সাক্ষ্য তলব করতেন। পাতা, হাড় ইত্যাদির উপর লেখা আয়াতের উপর যদি মতপার্থক্য হতো তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ভালো করে নিশ্চিন্ত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সামনে অগ্রসর হতেন না। এ ব্যাপারে হাফেজের উপরও নির্ভর করতেন না অথচ তিনি নিজেও হাফেজে কুরআন ছিলেন। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের বছর জিবরাঈল আমীনের সামনে তিনি কুরআনের যে শেষ দাওর করেছিলেন সে সময়ও যায়েদ উপস্থিত ছিলেন। 'আসসাবেকুনাল আউয়ালুন' আয়াতে শুধু একটি ওয়াও'র মতভেদের ব্যাপার থেকেও বুঝা যায় কুরআনের আয়াতের সঠিকতার অনুসন্ধানে যায়েদের মান কত উন্নত ছিলো। আর যে কাজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার উপর ন্যস্ত করেছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের দ্বারা সে কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন।

কুরআন জমা করার কাজে যায়েদ বিন সাবিতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই অনাদিকালের জন্য কুরআন শরীফ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাত থেকে পবিত্র থাকতে পারলো। সুবিচারবোধ সম্পন্ন সকল প্রাচ্যবিদগণ একথা স্বীকার করেছেন, বর্তমান কুরআন অবিকল ঐ কুরআনই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং যা যায়েদ বিন সাবিত অপরিসীম পরিশ্রম করে জমা করেছিলেন। বস্তুত স্যার উইলিয়াম মেয়র লিখেছেন ঃ

"আমরা জানি দুনিয়ার এমন একটি কিতাবও নেই যা কুরআনের মতো পূর্ণ বারশত বছর পর্যন্ত সবরকম পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে পবিত্র আছে।"

সূরার ক্রমবিন্যাস

আয়াতের বিশুদ্ধতা ও এর ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে যায়েদ বিন সাবিত প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সূরার ক্রমধারার ব্যাপারে কোনো বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করেননি। সূরার বর্তমান অবস্থা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের কায়েম করা।[১] এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। কেউ কেউ বলেন, সূরা ক্রমবিন্যাসের কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতদের জন্য রেখে গেছেন। কেউ কেউ বলেন, কিছু সূরার ক্রমবিন্যাস তিনি নিজে করে গেছেন। কিন্তু অবশিষ্ট সূরা ক্রমবিন্যাসহীন অবস্থায় রেখে গেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সব সূরাই ক্রমবিন্যাস তিনি নিজেই করে গেছেন। ইবনে ওহাব তার 'জামে' নামক গ্রন্থে লিখেনঃ

'রবিয়াকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো, সূরা আল বাকারা ও আলে ইমরানকে অন্যান্য সূরার আগে কেন রাখা হয়েছে অথচ এর আগে আশিটিরও বেশী সূরা নাযিল হয়েছে। আর এ দু'টি সূরা মক্কায়ও নাযিল হয়নি এবং মদীনায় নাযিল হয়েছে। --

'উত্তরে রবিয়া বলেছিলেন, অবশ্যই এ দু'টো সূরাকে সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ ক্রমবিন্যাস সহকারেই কুরআন তাদের সামনে পড়া হতো যারা একে

---

১. একথা ঠিক নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার ক্রমবিন্যাস নির্দিষ্ট করেননি এবং বর্তমান বিন্যাস ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালের। প্রকৃত ব্যাপার হলো আয়াতের মতো সূরার ক্রমিক বিন্যাসও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যান্য ব্যাপার ছাড়াও আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের নিম্নলিখিত হাদীসও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"আউস বিন আবু আউস হুজাইফা বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বনু সাকিফের যে প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিলেন তার মধ্যে আমিও ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন। আমাকে কুরআন শরীফের মঞ্জিল পুরা করতে হবে। আমার ইচ্ছা যতক্ষণ পর্যন্ত তা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাইরে যাবো না। এ ব্যাপারে আমরা সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। আপনারা কুরআনে কারীমকে কিভাবে কয়েক অংশে ভাগ করে রেখেছেন ? তাঁরা জবাব দিলেন ঃ তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা, তের সূরা এবং কাফ থেকে শুরু করে কুরআনের শেষ পর্যন্ত যাকে মোফাসসল' বলা হয়।" উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা সূরার ক্রমবিন্যাসের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কেননা ঐসব মঞ্জিল যা এ হাদীসের আলোকে কুরআনের বিভাজন করা হয়েছে—আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ সাত ভাগকে পরিভাষায় মঞ্জিল বলা হয়। প্রত্যেক মঞ্জিলে এতটি সূরাই আছে যা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে এ হাদীস অনুযায়ী সাত মঞ্জিল সূরা কাফ থেকে শুরু হয়। প্রথম ছয় মঞ্জিলে মোট আট চল্লিশটি সূরা আছে। আর এ সংখ্যাগুলোই উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

www.pathagar.com

জমা করেছেন। কিন্তু তারা নিশ্চুপ রয়েছেন, এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। এ ক্রমবিন্যাসে তারা একমত ছিলেন। তাই এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠাবার কোনো কারণ নেই।"

কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন ঃ

"কুরআনের সূরাসমূহের যে ক্রমবিন্যাস আজকালকের মুসহেফে পাওয়া যায়, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নির্দিষ্ট করা। আর উবাই বিন কায়াব, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদের মুসহেফে যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা এ জন্য যে, শেষবার জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সামনে কুরআন পড়ে শুনাবার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ক্রমবিন্যাস করেননি। কিন্তু এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে সাহাবাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[১]

কোনো কোনো লোক এ রায়ের বিরোধিতা করে বলেন, সূরাগুলো রাসূলের বিন্যস্ত করা নয়। প্রমাণ হিসাবে তারা বলেন। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস নিজের মুসহেফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর জমা করেছিলেন। যদি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সূরার ক্রমবিন্যাস করতেন তাহলে অবশ্যই আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ইবনে আব্বাস তার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং নিজেদের মুসহেফে রাসূলের নির্দিষ্ট করা বিন্যাস অনুযায়ী বিন্যস্ত করতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে কুরআন জমা করার সময় যায়েদ বিন সাবিত সূরা ক্রমবিন্যাস করেননি। সূরার এ বিন্যাস পরিপূর্ণভাবে সাহাবাদের ইজতেহাদের ফল। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দেশ দেননি।[২]

আমার মতও তাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ থেকে সূরার ক্রমবিন্যাস করেননি। বরং এ কাজ তিনি উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। বস্তুত এ সংক্রান্ত ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন ঃ

"আমি ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি 'আনফাল' ও বারায়াতের সূরা দু'টিকে, যা ক্রমধারায় আশি ও দু' শ' আয়াত সম্পন্ন, এভাবে কেন লিখে দিয়েছেন, উভয় সূরার মধ্যে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা হয়নি। এবং এভাবে এ দু'টো সূরাকে সাতটি দীর্ঘ সূরার (সাবয়ে তেওয়াল) অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। উত্তরে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোনো কোনো সময় এক সাথেই কয়েকটি সূরার আয়াত নাযিল হতো। তাঁর উপর অহী হতে শুরু করলে তিনি অহী লেখকদের কাউকে কাউকে ডেকে নিতেন এবং নির্দেশ দিতেন, এ

১. আলজামেয়ুল আহকামুল কুরআন-কুরতবী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২।

২ তারিখুল কুরআন-আবু আবদুল্লাহ জানা জানি হতে, ৪৮ পৃষ্ঠা হতে ৫৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

আয়াতকে অমুক সূরার অমুক স্থানে লিখে দাও। সূরায়ে 'আনফাল' মদীনার জীবনের প্রথম দিকে তাঁর উপর নাযিল হয়েছিলো। আর 'বারায়াত' নাযিল হয়েছিলো শেষ জীবনের দিকে। যেহেতু এ দু'টো সূরার বিষয়বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এ জন্য আমি ধারণা করেছি যে, সূরায়ে বারায়াত সূরায়ে আনফালের অংশ। কিন্তু যেহেতু তিনি আমাকে স্পষ্ট কিছু বলেননি, এ সূরা কোন্ সূরার অংশ। এ জন্য আমি উভয় সূরাকে একত্র করে দিয়েছি। এবং এদের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি। এভাবে আমি এ দু'টো সূরাকে সাতটি দীর্ঘ সূরার অন্তর্গত করে দিয়েছি।"[১]

কুরআন সংকলন সম্পন্ন

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে যায়েদ কি গোটা কুরআন শরীফই সংকলন করেছিলেন অথবা এ কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুখারীর একটি বর্ণনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেসব পাতায় যায়েদ কুরআন সংকলন করেছিলেন তা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে ছিলো। তাঁর মৃত্যুর পর ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা নিজের কাছে রেখে দেন। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর পর তা তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হাফসার কাছে ছিলো। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় কুরআন সংকলনের কাজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগেই পরিপূর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু কিছু বর্ণনা এমনও আছে যাতে বুঝা যায়, কুরআন সংকলনের কাজ ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে পরিপূর্ণ হয়েছে।

---

১. এ হাদীস থেকে একথা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, কুরআন ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতামতের কোনো দখল ছিলো। বরং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আয়াতের মতো সূরাগুলোর ক্রমিক ধারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই স্বয়ং করেছেন। এছাড়া ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসীম সতর্কতার প্রমাণ পাওয়া যায়–প্রত্যেক সূরায় প্রথমে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার সাধারণ নিয়ম ছিলো। কিন্তু এ সূরাতে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে না পাবার কারণে নিজের মতামতের প্রাধান্য দিয়ে এখানে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে দেননি।

[আসল কথা হলো, ইবনে আব্বাস ওসমানকে সূরা আনফাল ও বারায়াতকে একত্র করে লেখার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আয়াত ও সূরা নাযিল হবার সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এগুলোকে বিশেষ বিশেষ স্থানে সংযোজন করতেন। এর অর্থ পরিষ্কার, তাঁর নির্দেশক্রমেই এ দু'টো সূরাকে এভাবে রাখা হয়েছে। এরপর হযরত ওসমান নিজের কথা প্রকাশ করেছেন, আমার ধারণা ছিলো, আনফাল ও বারায়াত একটি অপরটির অংশ কিন্তু যেহেতু তিনি এ রকম বলেননি তাই একটাকে আর একটার অংশ বলি না। এ বর্ণনাটি একথার একটি মযবুত প্রমাণ, আয়াত ও সূরার সকল ক্রমিক বিন্যাস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করে গেছেন। তিনি যা বলেছেন সাহাবাগণ তার চুল বরাবরও পরিবর্তন আনেনি।–অনুবাদক]

www.pathagar.com

কোন্ বর্ণনা সঠিক—একথা জানা খুবই দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য উভয় বর্ণনায় এভাবে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যায়েদ বিন সাবিত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে কুরআনের অধিকাংশ অংশ সংকলিত করে নিয়েছিলেন। যেসব পাতায় তিনি কুরআন লিখতেন, তা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে দিয়ে দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেসব নিজের কাছে সংগ্রহ করে নেন। যায়েদ ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে যখন কুরআনে কারীম পরিপূর্ণ করলেন। তখন পাতাগুলোও তাঁর কাছে জমা দিলেন। এভাবে কুরআনে কারীমের সব পাতা ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর কাছে একত্রিত হলো। এ পাতাগুলোকে সামনে রেখে ওসমান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু অন্যান্য মুসহেফ তৈরি করেছেন। আজ আমরা যে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করছি তা অবিকল এ কুরআন যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যায়েদের মাধ্যমে জমা করেছেন। আর এ কুরআন এ শব্দ ও এ ক্রমবিন্যাস অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে।

আবু বকরের সর্বোত্তম অবদান

"আল্লাহ তায়ালা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কুরআনে কারীম সংকলন করার কারণে তিনি সকল মানুষ থেকে বেশী পুরস্কার পাবার হকদার হয়েছেন।"

উপরোক্ত উদ্বৃতিটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে বলেছেন। আর এর উপর প্রত্যেকটা মুসলমানের স্থির বিশ্বাস। এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় মনে কয়েকবার প্রশ্ন উঠেছিলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোন্ অবদান সবচেয়ে বেশী বড় ও মর্যাদাশীল ? ধর্মত্যাগীদের চিরতরে মূলোৎপাটন ? ও আরব ভূখণ্ড থেকে ধর্মত্যাগের চির অবলুপ্তি ? না, ইরাক সিরিয়ার বিজয়, যা এ বিরাট সুলতানাতের ভিত্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে ? যার কারণে মানুষ তামাদ্দুন তাহযীব সম্পর্কে অবহিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। অথবা আল্লাহর কালাম একত্র করার কাজ। যা একজন উম্মি রাসূল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। আর যিনি আপন নূরের আলোতে বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। এ প্রশ্ন মনে জাগার পর, কুরআন একত্রিত করণই নিসন্দেহে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ও মহান কীর্তি এতে কোনো দ্বিধা নেই। আর এ খেদমতের দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন। একদিন আরব উপদ্বীপের অবস্থা ধীরে ধীরে ক্রমবনিতর দিকে ধাবিত হতে চললো। যে শক্তি ও সুনাম খেলাফতে রাশেদা ও উম্মিয়ার কালে সঞ্চিত হয়েছিলো। আব্বাসিয়ার কালে তার অবলুপ্তি ঘটে। ইসলামী সুলতানাতের উপরও ধীরে ধীরে অবনতি আসতে শুরু করলো। মুসলমানরা অধঃপতিত অবস্থার দিকে পতিত হতে শুরু করলো। এমন কি ইসলামী সুলতানাতের নাম পর্যন্ত মানুষের মন থেকে মিটে যেতে শুরু করলো। মানুষ আরবকেও ভুলতে শুরু করলো। যদি আল্লাহ মুসলমানদের জন্য হজ্জ করা ফরয না করতেন, তাহলে একদিন অবশ্যই এমন আসতো, যেদিন আরব বিশ্বের বিস্মৃত জাতির দেশের নামের মধ্যে

www.pathagar.com

পরিগণিত হতো। কিন্তু আল্লাহর কালাম নাযিল হবার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অবিকল বিদ্যমান। ভূ-পৃষ্ঠে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে, আল্লাহর কালামও ততদিন বেঁচে থাকবে।

এ বর্ণানার অর্থ এই নয়, আমি ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ ও ইসলামী সুলতানাতের প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অস্বীকার করছি। নিসন্দেহে এ দু'টো কাজও অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী। এ দু'টো কাজের প্রত্যেকটি কাজই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি ধর্মত্যাগীদের মূলোৎপাটন ছাড়া আর কোনো কাজ নাও করতেন, তাহলেও এ একটি কীর্তিই তাঁর মহিমা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হতো। এভাবে তিনি ইসলামী সুলতানাতের নিয়ম-শৃংখলা বিধান করা ছাড়া যদি আর কোনো কাজে হাত না দিতেন, তাহলেও এ কার্যক্রমটিই তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্কর রাখার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু এসব কীর্তিগাঁথার সাথে সাথে যখন কুরআন সংকলনের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সংযোজন ঘটে, যা গুরুত্ব ও উপকারের দিক দিয়ে এ দু'টো কীর্তির চেয়েও মূল্যবান, তাহলে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো ব্যক্তিত্ব জন্ম দিতে মাতৃজাতি অপারগ।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর হাজার হাজার রহমত বর্ষণ করুন যাঁর অক্লান্ত, অবিরাম, নিরলস ও পবিত্র চেষ্টা-সাধনার ফলে আজও আমরা কুরআনের মহামূল্যবান নেয়ামাত ঐভাবে হাতের কাছে পাই, যেভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম লাভ করেছিলেন।

www.pathagar.com

১৭

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল

খেলাফতের ধারণা

খেলাফতের বাইয়াতের পর এক ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'হে আল্লাহর খলিফা' বলে ডাকলে তিনি সাথে সাথে তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন ঃ

"আমি আল্লাহর খলিফা নই। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা একথা ঐতিহাসিকগণ তাঁর অসীম বিনয়ভাবের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। আমাদের মতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথা অনুসন্ধান ও গবেষণা যোগ্য। কারণ, এতে শুধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিনয়ভাবেরই প্রকাশ হয় না বরং হুকুমাতের ঐ ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যা প্রথম যুগের মুসলমানদের মনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে হাজার হাজার বছর এবং পরেও শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের এত দীর্ঘ সময়ে হাজার হাজার বাদশাহ ও শাসক অতিবাহিত হয়েছে যাদের ব্যাপারে স্বয়ং তারা ও তাদের প্রজাদের দাবী ছিলো, তারা এ ভূখণ্ডে আল্লাহর নায়েব হিসাবে কাজ করছে। এ জন্য তাদের মর্যাদার সমান মর্যাদাবান লোক এ বিশ্বে আর কেউ নেই। মিসরের ফেরাউনদের অবস্থা কারো অজানা নেই। এসব ফেরাউনদের মধ্যে এক ফেরাউন তো এতটুকু বেড়ে গিয়েছিলো যে, সে নিজেকে انا ربكم الاعلى 'আমি তোমাদের অতি মর্যাদাবান রব' ঘোষণা করে ইলাহ হবার দাবী করে বসলো। সেকালে প্রকৃতই মিসরের একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর মতও এটাই ছিলো যে, বাদশাহগণ 'প্রভু' বিশেষণের অধিকারী। এরপর আর যা ত্রুটি বাকী ছিলো তা ধর্মীয় নেতাগণ পূরণ করে দিয়েছেন। তারা তাদের অনুসারীদেরকে বাদশাহর পূতপবিত্র হবার বন্দনার গান শিখাতে লাগলেন। আশওয়ার ইরান হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য দেশের অবস্থাও এমনই ছিলো। ওখানকার অধিকাংশ বাদশাহ নিজেকে দুনিয়ার খোদার 'নায়েব' এবং 'খোদার ছায়া' বলে মনে করতেন। তাদের প্রজা সাধারণের ধারণাও ছিলো তা-ই।

মধ্যযুগীয় ইউরোপেও পাদ্রীদের এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিলো যারা রাজা বাদশাহদের ইঙ্গিতেই তাদের উঁচু সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতো না। পাদ্রীদের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর তরফ থেকেই বাদশাহদের উপর এ মর্যাদা সপর্দ করা হয়েছে। এ কারণেই ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

www.pathagar.com

তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর নায়েব মনে করা হতো। তাদের মুখ নিঃসৃত প্রতিটি কথা অহীর মতো ধারণা করা হতো। তার হুকুম আল্লাহর হুকুম বলে ধরে নেয়া হতো। এ অবস্থা না মেনে চলা কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। পনর শত শতক এবং কোনো কোনো জাতির সতর শত শতক পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজমান ছিলো। যদিও এ সময় ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে বেশ উন্নতি লাভ করেছিলো। কিন্তু আজ অনুকরণের যে আবরণ মানুষের চোখকে ছেয়ে ফেলেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা দূরীভূত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত ও স্বাধীন মন ও সাম্যের পতাকাবাহীগণ এ অবৈধ ও মানবতা বিধ্বংসী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করেছে এবং হাজার হাজার জীবন গৃহযুদ্ধে আত্মাহুতি না দিয়েছে।

রাজা-বাদশাহর মান-মর্যাদার এ অনুভূতি বিশ্ব চরাচরে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। ইউরোপ তো মাত্র কিছুকাল আগে এ অভিশাপ মুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিনয় ভাব লক্ষ্য করার যোগ্য। এক ব্যক্তি তাঁকে আল্লাহর খলিফা বলে ডাকছেন আর সাথে সাথেই তিনি তাকে একথা বলে বাধা দিচ্ছেন যে, "আমি আল্লাহর খলিফা নই বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা।"

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা" একথা বলেও কোনো কোনো শান-শওকত ও মাহাত্মের প্রদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো একথা বুঝানো যে, তিনি আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্য থেকে মুসলমানদের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় শাসন কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত মাত্র। কিন্তু ঐসব কাজে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হবার ধারণাও তাঁর মনে উদিত হতে পারে না। যেসব কাজ শুধু আল্লাহর রাসূলের সাথেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। এ বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের প্রথম ভাষণে বলেছেন ঃ

> "আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব সপর্দ করা হয়েছে অথচ আমি এতবড় দায়িত্ব বহন করার উপযোগী নই। আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা ছিলো তোমাদের কেউ এ দায়িত্ব বহন করুক। দেখো ! যদি তোমাদের কেউ এ ধারণা করে থাকে, আমিও ঐ কাজ করবো, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। তাহলে তার এ ধারণা ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দা ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তাঁকে নবুয়াতের নেয়ামতের সৌভাগ্যও দান করেছেন। সর্বপ্রকার পাপাচারের উর্ধে তার স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। আমিও আল্লাহর বান্দা। কিন্তু কারো থেকে আমি উত্তম নই। তোমরা আমার কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচিত পথে চলি, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর যদি আমাকে সত্য পথ থেকে বিমুখ দেখো তাহলে আমাকে বাধা দিয়ে সোজা পথে ফিরিয়ে আনবে।"

www.pathagar.com

মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত ও তাদের ইচ্ছায়ই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে সেভাবে খলিফা করে পাঠাননি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। অন্যান্য মুসলমানদের উপর তাঁর যদি কোনো মর্যাদা থেকে থাকে এবং অবশ্যই আছে—তবে তা শুধু তাঁর তাকওয়ার জন্য। খেলাফতের জন্য নয়। এজন্য তিনি আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলের প্রদর্শিত শিক্ষা অনুযায়ী হুকুম দেবার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমের খেলাফ ও রাসূলের হাদীসের বিপরীত কোনো হুকুম তিনি দিতে পারেন না। আর মুসলমানরাও এমন হুকুম গ্রহণ করতে পারে না। বস্তুত তিনি খেলাফতের প্রথম ভাষণেই এ ব্যাপারটিকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> "আমার অনুসরণ ততক্ষণ পর্যন্ত করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করি। আর যদি তাঁর হুকুমের নাফরমানি করি তাহলে আমার অনুসরণ করা তোমাদের উপর ফরয নয়।"

ওমরের লকব

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের 'লকব' 'খলিফায়ে রাসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখেননি। এ ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। কেউ কেউ তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন লকব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেন। তিনি এ লকবকে পসন্দ করেন এবং তা-ই অবলম্বন করেন। এরপর থেকে পরবর্তী সকল খলিফাকেই আমীরুল মু'মিনীন নামে ডাকা হতো। 'খলিফায়ে রাসূলের' পুনরাবৃত্তি হতে বাঁচার জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু 'খলিফা' লকব পরিত্যাগ করেন। পরে এ পুনরাবৃত্তি বড় বিদঘুটে রূপ ধারণ করতো। কেননা ওমরের 'লকব' যদি খলিফায়ে খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতো তাহলে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর 'লকব' যদি খলিফায়ে খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খলিফায়ে খলিফায়ে খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে স্মরণ করতে হতো।"

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু 'খলিফাতুর রাসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে 'আমীরুল মু'মিনীন' লকব অবলম্বন করার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আমি খলিফায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অংশে খলিফা শব্দকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর মুসলমানদের উপর স্পষ্ট করে দিয়েছে, শাসনকার্য সমাপণে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত। যদি 'খলিফা' লকবের দ্বারা এর আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা হতো তাহলে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ 'লকব' ছেড়ে আমীরুল মু'মিনীন শব্দ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হতো না।

www.pathagar.com

আমীরুল মু'মিনীন লকব অবলম্বন করার কারণ ছিলো, ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বুঝে ফেলেছেন, আরব উপদ্বীপে ও অন্যান্য বিজিত এলাকায় ইসলামী শাসনব্যবস্থা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর এ বিপ্লব এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছে, মানুষ যা দেখে হয়রান হয়ে গেছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে ইসলামী শাসনব্যবস্থার কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা সমন্বিত হুকুম বিদ্যমান ছিলো না। অবশ্য কুরআনে কারীমে 'শুরা'কে ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেছেন ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ 'হে নবী ! পার্থিব ব্যাপারে মানুষ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করো।' এভাবে আরো এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ মুসলমানদের সকল ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ফয়সালা হয়ে থাকে।

রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দেবার জন্য যেহেতু আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে বিস্তারিত হুকুম-আহকাম বিদ্যমান ছিলো না, আর এসব কাজ ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ ও নিজের উত্তম বিবেচনার ভিত্তিতে করতে হতো। তাই তার অবস্থান ছিলো একজন সিপাহলারের মতো। সিপাহসালার বাদশাহর কাছ থেকে তো মৌলিক নীতিমালা পেয়ে থাকেন কিন্তু সেনাবাহিনীর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে যুদ্ধের যাবতীয় বিষয়ের দেখাশুনা তার নিজকেই করতে হয়। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাষ্ট্র শাসনের সকল ব্যবস্থাপনা চলমান অবস্থা ব্যবস্থা অনুযায়ী শরীয়াতের সীমারেখার মধ্যে থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানাকে সামনে রেখে নিজেকেই করতে হতো। কোনো বিষয়ে যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে এ কর্মনীতিই অবলম্বন করা ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো না। এ কারণেই ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলে আমীরুল মু'মিনীন খেতাব অবলম্বন করা পছন্দ করেছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য করলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, কঠোরতা ও কোমলতা এবং উদারতা প্রদর্শনের স্থান সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা ও কোমলতার স্থানে কোমলতা প্রদর্শন না করলে সঠিকভাবে কোনো কাজ সম্পাদন হয় না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিরাট বিশাল কামিয়াবী আর তাঁর অসীম ক্ষমতার মূল উৎসই ছিলো এ দু'টি বৈশিষ্ট্যকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগাতে পারা।

আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় পর্যন্ত আরব ছিলো অসংখ্য ধর্মের লীলানিকেতন। এর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল পরস্পরের সাথে শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত ছিলো। এক অংশের লোক অপর অংশের লোক থেকে একেবারেই

www.pathagar.com

বিপরীত ছিলো। ইয়েমেন ছিলো ইরানীদের শাসনের অধীন। ওখানে ঈসায়ী ধর্ম ও মূর্তিপূজা পাশাপাশি কায়েম ছিলো। ওখানকার মানুষ হামিরী ভাষায় কথাবার্তা বলতো। যা উচ্চারণের দিক দিয়ে কুরাইশদের ভাষায় ছিলো বিপরীত। উপরন্তু ইয়েমেন শত শত বছর থেকে সভ্যতা সাংস্কৃতিক লীলাভূমিও ছিলো। এর বিপরীত হিজাজের লোকদের উপর বেদুঈনী প্রভাব ছিলো। এর মধ্যে ছিলো তিনটি শহর। মক্কা, মদীনা ও তায়েফ। এ তিনটি শহরেরও পরস্পরের 'হেজাজে অবস্থিত এ ছাড়া' আর কোনো এলাকা ছিলো না। এদের বাসিন্দাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তা ছিলো। এসব শহরের ব্যবস্থা ও গোত্রসমূহের মতো একে অপরের থেকে আলাদা ছিলো। ধর্মীয় ব্যাপারে মক্কার অধিবাসীগণ প্রাণপণ মূর্তিপূজায় নিমগ্ন ছিলো। কিন্তু এরপরও এখানে ঈসায়ী ধর্ম প্রচলিত ছিলো। মদীনার ইহুদীগণ শক্তিশালী হলেও মূর্তিপূজকদের সংখ্যা ছিলো বেশী। আরব উপদ্বীপে যখন তওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলিত হলো এবং আল্লাহ চাইলেন এখন আরবের চারিদিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। এজন্য ঐ ধরনের উপায়-উপকরণ ঠিক করে দিলেন। ইয়ামেনকে ইরানী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দিলেন। তারা ভিনদেশী প্রভাব থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেলো। মক্কা বিজয়ের পর হেজাজে দ্রুত ইসলাম প্রসার লাভ করতে লাগলো। হেজাজের পরে অন্যান্য আরব ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে একই পথে চলতে শুরু করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত তার শিক্ষার উপর ঈমান আনার ব্যাপারে গোটা আরব একত্রিত হলো। কিন্তু সকল গোত্র আপন আপন অবস্থানে স্বাধীন স্বেচ্ছাধীন ছিলো। অবশ্য আরকানে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম যাকাত। এ যাকাত তাদেরকে মদীনায় অবশ্যই পাঠিয়ে দিতে হতো।

এ দীনি ঐক্য আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করার মূলভিত্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলো। মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিত্র সন্ধিস্থাপন করেছিলো। তিনি মক্কার উপর আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হলেন। সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী সেলিম, মুজায়ানা, গাতফান গোত্রগুলোও ইসলামী বাহিনীতে যোগদান করে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। মক্কা বিজয়ের পর ওখানকার লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আকাংখা প্রকাশ করলেন। বস্তুত হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীতে মক্কাবাসীরাও শামিল ছিলো। এরপর আরব গোত্রসমূহে ইসলাম প্রসারিত হয়ে গেলে তিনি নতুন মুসলমানদেরকে কুরআন শিখাবার ও দীনি শিক্ষা দেবার জন্য নিজের শাসকদেরকে বিভিন্ন দিকে পাঠাতে লাগলেন। মানুষদেরকে কুরআন শিখাবার ও দীনি শিক্ষা দেবার সাথে সাথে সাহেবে নেসাব লোকজনের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে মদীনা পাঠাবার দায়িত্ব সম্পাদন করেন অথবা এলাকার হকদারদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিতেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরবের আশেপাশে সংঘঠিত এ দীনি বিপ্লবের ফলে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, যেখানে দীন ও মাযহাবের দিক থেকে আরব একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি রাজনৈতিক ও

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও আরব একটি ঐক্যে পৌছে গিয়েছিলো। কিন্তু আরববাসীরা এ রাজনৈতিক বিপ্লব সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিলো। কারো মনে একথা উদিত হতে পারেনি, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্তেরও আনুগত্য তাদেরকে করতে হবে। তারা মনে করে বসেছিলো, যে শিক্ষা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পেয়েছে তা তো অবশ্যই তাদের মনের মুকুরে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। আর তারা অবিকল ইসলামের আহকামের উপর আমল করতে থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তারা থাকবে পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেকটি গোত্র আগের মতো স্বাধীন ও বাইরের শাসনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আরব উপদ্বীপে যে ফেতনা সংঘটিত হলো এবং যার ফলে ধর্মত্যাগের যুদ্ধ ঘটলো, এসবের কারণই হলো এ ধরনের স্বাধীন মনোভাবের অভিব্যক্তি। অধিকাংশ আরব গোত্রের মনেই এ স্বাধীন মনোভাবের বীজ কাজ করেছিলো। রাজনৈতিক দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অবস্থায় আরবকে রেখে গেছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সে অবস্থায়ই আরবকে স্থিতি রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরব গোত্ররা তাদের হারানো স্বাধীনতা ও স্বাধীকার পূর্ণলাভের বাসনায় বিভোর ছিলো। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যে ঈমান ছিলো এর উপর ভিত্তি করেই তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, নিজেকে মুসলিম বলে দাবীকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঐসব জিম্মাদারী পালন করে চলতে হবে যা একজন মুসলমান হিসাবে তার উপর অর্পিত হয়। আর যেসব সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে মদীনায় পাঠানো হতো তা অবিকল পাঠাতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী গোত্রসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোনো ব্যক্তিকে তাদের শাসক মানতে, রাষ্ট্রশাসনে মুহাজির ও আনসারদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে, যাকাতের সম্পদ মদীনায় পাঠাতে তৈরি ছিলো না। তারা পরিষ্কার বলতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ভিন্ন। তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁর উপর অহী নাযিল হতো। তার আনুগত্য বান্দাদের উপর ফরয। কিন্তু তাঁর পর অন্য গোত্রকে তাদের সমধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে শাসন করার অধিকার কোনো গোত্রর বা কোনো ব্যক্তির নেই।

মুহাজির, আনসার ও খেলাফত

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে বাইয়াতের ফলে আরবে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো তা আমাদেরকে আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করতে হয়। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ খেলাফতের ব্যাপারটাকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন। আর তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সে সময়কার রাজনৈতিক ব্যবস্থার কি বিপ্লব সাধিত হলো ? এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করা এবং রাসূলের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আগে আগে থাকার কারণে মুহাজির ও আনসারগণ নিজেদেরকে সুলতানাত ও

www.pathagar.com

হুকুমাতের অধিকারী মনে করতেন। এমন কি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী আত্মীয়-স্বজনকেও তারা এ অধিকার দিতে রাজী ছিলো না। ধর্মত্যাগের ফেতনার পর তা দমন করার জন্য মক্কাবাসীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। সিরিয়ার দিকে অভিযানের প্রশ্ন দেখা দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কাবাসীদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুহাইল বিন ওমরের মধ্যে বেশ ঝগড়াই হয়ে গেলো। সুহাইল ওমরের আচরণের আপত্তি জানিয়ে বললেন ঃ

> "আমরা তোমাদের মুসলমান ভাই। আমাদের ও তোমাদের খান্দান ও বংশ এক। এরপরও তোমাদের কাছে আমাদের আত্মীয়তার সামান্য মূল্যও কি নেই। আমাদের হক ছিনিয়ে নিতে তোমরা বদ্ধপরিকর। একথা ঠিক যে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা আমাদের অগ্রগামী। কিন্তু শুধু এ কারণে হুকুমাত ও সুলতানাতের ব্যাপারেও তোমরা অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার পেতে পারো না।"

কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাপারটি তুলে ধরে বললেন, প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান এবং ইসলামের আত্মত্যাগকারীদেরকেই মজলিসে শুরায় প্রতিনিধিত্ব দেয়া যেতে পারে। তারাই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করার ও প্রশাসনিক কাজ দেখাশুনা করার জন্য দায়িত্বশীল। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসীর ব্যাপারে যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদের এ ধারণা তাহলে অন্যান্য আরব গোত্রের ব্যাপারে তাদের মনোভাব যতই তীব্র হোক তা কমই বলা যাবে।

ওমরের বিপরীত মক্কাবাসীদের ধারণা ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিবারণ করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা পরিচালনায় যদি মুহাজির ও আনসাররা পরস্পর পরামর্শ করে একটি পথ বের করে নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নিযুক্ত করে নেন, তাহলে কোনো অসুবিধা ছিলো না। কিন্তু তাদেরকে চিরদিনের জন্য এ অধিকার দেয়া যেতে পারে না। মক্কা ও তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বরাবরই শরীক আছে। এজন্য রাষ্ট্র শাসনে ও পরামর্শের ব্যাপারে তাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। অবুঝ ও মূর্খতার কারণেই শুধু ইসলাম গ্রহণ করতে না পারায় তাদেরকে বুনিয়াদী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণাও ছিলো তাই। যখন অন্যান্য ইসলামী গোত্রসমূহ মদীনাবাসীদের সাথে যোগ দিয়ে ধর্মত্যাগের যুদ্ধে ও ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ হতে কিভাবে ফিরিয়ে রাখা যায় ? তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ ও পরামর্শে মদীনাবাসী ও প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটাই হলো ইনসাফের দাবী। এ কারণেই সিরিয়া আক্রমণের সময় তিনি মক্কাবাসীদের সাথে পরামর্শ করেছেন। তাদের কাছে

www.pathagar.com

সাহায্য চেয়েছেন। গানিমাতের মাল ও ওজিফা বন্টনের সময়ও তিনি এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। বস্তুত একবার মদীনার কাছে একটি বিজিত এলাকায় সোনার খনি বের হলে তার সোনা মদীনায় আসতে শুরু হলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব সোনা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কে করেছেন পরে এর প্রতি তিনি লক্ষ্য করেননি। যখন কেউ কেউ এ সোনা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের বেশী অংশ পাবার দাবী করলেন তখন তিনি বললেন ঃ

"ঐসব লোক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাদেরকে বিনিময় দেয়াও আল্লাহরই কাজ। আর এ বিনিময় তারা আখেরাতে পাবেন। এ দুনিয়ায় তো তাদের হক ঐটুকুই যতটুকু অন্যান্য মুসলমানের।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি তার প্রথম মতামতের উপর অটল থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর থেকে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন। প্রত্যেকের মান-মর্যাদা অনুযায়ী তাদের ওজিফা নির্দিষ্ট করেন। যদিও পরে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুসৃত নীতিকেই সঠিক ছিলো বলে স্বীকার করেছেন। এসব কর্মনীতি পরিবর্তনের খেয়াল তাঁর ছিলো। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে এ সুযোগ দেননি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিজ্ঞ কর্মপদ্ধতি দূরদর্শিতারপূর্ণ কর্মকৌশল আরবকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে গ্রথিত করে ফেলে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সাম্যপূর্ণ অধিকার লাভ করেছেন দেখে মনপ্রাণ দিয়ে রাষ্ট্রের আনুগত্য করায় লিপ্ত হয়ে গেলো। তাদের বিশ্বস্ততার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো খলিফার নিজের ব্যক্তিত্ব। তার হুকুমের উপর আমল করা তাদের কাছে ছিলো ফরযে আইন।

ইসলামে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা

প্রশ্ন উঠে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনব্যবস্থা কোন্ ধরনের ছিলো। এটাকে কি পোপবাদের সাথে তুলনা করা যায় অথবা এক ব্যক্তির খেয়ালখুশীর উপর পরিচালিত রাষ্ট্র হিসাবে ধরা যায় অথবা গণরায় ভিত্তিক রাষ্ট্রের নামে ডাকা যায়?[১]

১. পাঠকবৃন্দকে এখানে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, দীনি ও মাযহাবী হুকুমাতকে পোপবাদ ও থিওক্রেসীর সাথে তুলনা করা যায় না। ঠিক এভাবে অদীনি ও ধর্মনিরপেক্ষ (SECULAR) হুকুমাত অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র যার উপর কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী, ওলামা, পুরোহিত এবং পাদ্রী শ্রেণীর লোকদের হাতে ধর্মীয় ইজারাদারী থাকে না। আর না কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যেসব রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় সেসব রাষ্ট্রে ধর্মীয় গোষ্ঠী, ওলামা, পুরোহিত ও পাদ্রীদের কিছু না কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে। কোনো একটা বিশেষ ধর্মকে সরকারী ধর্ম হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এরপরও দেশের জনসাধারণের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে এবং সুলতানাতের মেজাজ জনগণতান্ত্রিক ধরনের হয়। থিওক্রেসীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। থিওক্রেসী ধরনের রাষ্ট্রে শাহানশাহ সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি সকল প্রকার গুনাহ হতে পবিত্র। আর তিনি সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম পেয়ে থাকেন। সেসব হুকুম জারী ও তা বাস্তবায়ন করার পূর্ণ অধিকার তার। যেহেতু এ ধরনের রাষ্ট্রীয় শাসনে বাদশাহর হুকুমকে আল্লাহর হুকুমের মর্যাদা দেয়া হয়, তাই তার উপর কোনো আপত্তি উঠাবার অধিকার কারো থাকে না। সকলকে নীরবভাবে তার

www.pathagar.com

ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারীও জানেন যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমাতকে থিওক্রেসী বলে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। মিসরের ফেরাউন গোষ্ঠী ও ইউরোপের শাহানশাহরা যে ধরনের রাষ্ট্র শাসন চালাতেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার ধারণাও করা যেতে পারে না। তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশ পাবার দাবীদার কখনো ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর অহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এখন শুধু 'কালামুল্লাহ'ই মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য অবশিষ্ট আছে। কিতাবুল্লাহর আহকামই মুসলমানদের জন্য দলিল। কুরআন ছাড়া তাঁর আর কোনো কর্মপদ্ধতি ছিলো না। প্রত্যেক শাসকই কুরআনের নির্দেশিত পথে চলতে এবং এর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। মুসলমানদের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত শাসকের অনুসরণ ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করবেন এবং তাঁর সুনির্দিষ্ট সীমালংঘন না করবেন। কিন্তু কোনো শাসক যদি আল্লাহর কিতাবের হুকুমকে পাশ কাটিয়ে মনগড়া ও শরীয়াত বিরোধী আহকামের উপর আমল করেন, তাহলে তার অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য ফরয নয়।

ইসলামের আরোপিত এ পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি পোপবাদ ও থিওক্রেসীর সম্পূর্ণ বিপরীত। খলিফাতুল মুসলেমীনকে আল্লাহর নাযিল করা আহকামে আবদ্ধ ও তার সুনির্দিষ্ট সীমার অধীনে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। স্বৈর আচরণের অবকাশ এখানে মাত্রও নেই। কিন্তু পোপবাদে এ নীতি ছিলো না। সে ব্যবস্থায় শাসকই হলো সব ক্ষমতার অধিকারী। যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারতেন। তার সামনে কারো পক্ষে কোনো কথা বলা বা আপত্তি তোলার অবকাশ ছিলো না। তার জারী করা হুকুমকে আল্লাহর হুকুম বলে ধারণা করা হতো। কারো সাথে তার পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিলো না। তার হাতেই সমস্ত ক্ষমতার বাগডোর। প্রজা সাধারণকে তার গোলামের মতো আনুগত্যশীল হিসাবে থাকতে হতো।

কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, আল্লাহর কালামকে রাষ্ট্রশাসনের মূল উৎস মানা ও শরীয়াতের সীমারেখা কায়েম রাখার কারণে ইসলামী হুকুমাতেও পোপবাদের রূপ ধারণ করেছে। এতে ও অন্যান্য থিওক্রেট শাসনের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য

আনুগত্য করে যেতে হয়। বস্তুত আমি যেমন এ ব্যাপারে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। মিসরের ফেরাউনদের অবস্থা এ ধরনের ছিলো। পনর শতক পর্যন্ত ইউরোপের শাহনশাহগণ নিজেদেরকে এ দলে অন্তর্ভুক্ত করতেন। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব আজকাল কোথাও পাওয়া যায় না।

এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন অর্থ হলো 'ওমারা' ও নবাবদের শাসন। এ ধরনের শাসনও ইউরোপে বহু বছর পর্যন্ত চালু ছিলো। বিভিন্ন এলাকায় স্বেচ্ছাধীন নেতাগণ শাসক ছিলেন। লুটতরাজ হত্যা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে তারা তা লাভ করতো। তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছেলেরা স্থলাভিষিক্ত হতো। এ হুকুমাত আজকাল নেই।

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যা প্রাচীনযুগ হতে আজ বিভিন্নরূপে দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়ে এসেছে। আজকাল তা-ই প্রচলিত। এর অর্থই হলো সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি জনগণ দ্বারা নির্দিষ্ট হবেন এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা চালাবার দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

www.pathagar.com

নেই। এ আপত্তি শুধু জ্ঞানের অভাবের কারণে হয়েছে। কুরআনী শাসনে শুধু মূলনীতি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় জায়গা ছাড়া তা করা হয়নি। ইসলামী হুকুমাতের বুনিয়াদ মূলনীতির উপরই রাখা হয়। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিশ্লেষণ করা মুসলমান জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

যে মূলনীতি কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে, একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় জীবনের অস্তিত্বের জন্য তা বাস্তবে কার্যকর করা খুবই প্রয়োজন। ইতিহাস সাক্ষী, যতকাল পর্যন্ত মুসলমানরা এসব মূলনীতি মেনে চলেছেন, জাতীয় জীবন ও ব্যক্তি জীবনকে এসব মূলনীতি অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন ততদিন পর্যন্ত তারা উন্নতির সিড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু যখন এসব মূলনীতির উপর আমল করা তারা ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেদের জন্য ইসলামের সাথে বিবদমান জীবন ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়েছেন সে সময় থেকে তাদের অবনতি ও অধঃগতি শুরু হয়েছে।

আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত মূলনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও গণক ধরনের একটি শ্রেণী জন্মলাভ করতো। তাহলে এ আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ থাকতো, ইসলামে পোপবাদ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সকলেরই জানা আছে, ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কোনো ইজারাদারী সমর্থন করে না। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সমানভাবে অধিকার প্রদান করে। সে কুরআনে কারীমের উপর গবেষণা করে নিজের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী ফলাফল বের করবে। পোপবাদের অভিযোগ এ কারণে ইসলামে আনা যায় না।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, সে নিজেকে আল্লাহর আহকাম মেনে চলার ও শরীয়াতের সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আনুগত্য করা শাসক শাসিত, ধনী-গরীব, আমীর-চাকর, প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই সমানভাবে ফরয। অপরদিকে জনসাধারণকে এ অধিকার দিয়ে দিয়েছে, যখন তারা চাইবে তাদের শাসককে ভুল নীতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। এ জীবনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনদের মোটেই অধিকার নেই যে, তারা নিজেদের জন্য কিছু আইন তৈরি করে নেবে। আর গরীবদের জন্য গড়ে নেবে অন্য কোনো আইন, নিজেদেরকে অগ্রণী ও উত্তম মনে করে তাদের জন্য এমন সুযোগ-সুবিধালাভের ব্যবস্থা করবে যা সাধারণ লোকদের লাভের ব্যবস্থা থাকবে না। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের উপর কড়াকড়িভাবে আমল করার কারণে দুনিয়ায় শান-শাওকত হতে মুক্ত ছিলেন। তার মনে একথা মাইলষ্টোনের মতো বদ্ধমূল হয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তির জিম্মায় জাতির আমানাত সপর্দ করা হয়, সে যদি তা খেয়ানাত করে কিছু অংশ ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে তাহলে সে আর কারো উপর নয় বরং নিজের উপরই যুলুমকারী। আর এ খেয়ানতের জন্য আখেরাতে তাকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

জাতি কর্তৃক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর যে আমানাত সপর্দ করা হয়েছে তা তিনি যেভাবে আদায় করেছেন ও খেলাফতকালে যে নিঃস্বার্থ ও আল্লাহভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমানকালের মানুষ অসম্ভব বলে মনে করেন। খেলাফত ও আমানাত তাঁর জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। মুসলমানদের ধন-সম্পদ থেকে কোনো রকম ফায়দা উঠানো তার মনে কখনো জাগেনি। খেলাফতের দায়িত্ব আসার পর তিনি নিজেকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহর দীনের খেদমত আর ইসলামী সুলতানাতের ব্যবস্থাপনার কাছে নিজেকে সার্বিকভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছিলো তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দুর্বল অভাবীদের সাহায্য করার চেয়ে পসন্দনীয় কাজ তাঁর কাছে আর কিছু ছিলো না।

যে রাষ্ট্র এ ধরনের হবে সেখানে স্বেচ্ছারিতার অবকাশ থাকে না। যার শাসক নিজকে অতিমানব মনে করে না। এ রাষ্ট্রকে কোনোভাবেই পোপবাদ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাসিত রাষ্ট্র নাম দেয়া যেতে পারে না। মুহাজির ও আনসারগণ পরামর্শ করেই খলিফা নিযুক্ত করেছেন। আরবের অন্যান্য গোত্রের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজনবোধ করেননি। কিন্তু এর উপরও কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। কেননা মুহাজির ও আনসারগণ এক গোত্রের লোক ছিলেন না, যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের মধ্যে একজনকে খলিফা নির্বাচন করে নিয়েছেন। বরং তারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলো। আর এটাও তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো তা পূরণ করার জন্যই করেছিলেন। নেতৃত্বের অনুপুস্থিতি উম্মতের জন্য একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দেয়া ছিলো খুবই প্রয়োজন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমাতের বুনিয়াদ ছিলো পরিপূর্ণরূপে পরামর্শের উপর। নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর হাতে আ'ম বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। শুধু এজন্যই বাইয়াত করা হয়েছিলো যে, তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সাথী। উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বংশীয় মর্যাদা, গোত্রীয় জাতীয়তার কোনো প্রভাব এ নির্বাচনে কাজ করেনি। খলিফা হবার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিজের কোনো দাবি ছিলো না। বরং তিনি নিজের স্থলে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু ওবায়দা বিন জাররাহর মধ্যে একজনকে খলিফা নির্বাচন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি খেলাফত লাভ করেননি। বরং সাকিফায়ে বনী সায়েদার গণসম্মেলনে আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনার পর তাঁর খেলাফতের উপর মুসলমানগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বাইয়াতের ব্যাপারে আনসাররাও কোনোভাবে মুহাজিরদের পেছনে ছিলেন না। তারা অত্যন্ত খাঁটি মনে তাঁর খেলাফতকে গ্রহণ করেছেন। বরং পরে যতবারই তার তরফ থেকে জান-মালের কুরবানীর আবেদন জানানো হয়েছে, আনসাররা বেশ সৎ সাহসে বেরিয়ে এসে এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

খেলাফতের পর তিনি প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার প্রতিটা শব্দ হতেও একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গণরায়ের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুলতানাতের কল্যাণের জন্য শুরাকে কত জরুরী মনে করতেন। তিনি বলেন ঃ

"আমাকে তো তোমাদের শাসক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি নেকীর পথ অনুসরণ করি তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করবে। যদি আমি নেকের পথে না চলে পাপের পথে অগ্রসর হই তাহলে তোমরা আমাকে ঠিক করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করতে থাকবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করি তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা ফরয থাকবে না।"

এ ভাষণ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের খলিফার কাজের তাদারকী করা তাদের সৎ পরামর্শ দেবার অধিকার আছে। যদি কখনো খলিফা আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করেন, তাহলে তার আনুগত্য প্রজাসাধারণের উপর ফরয নয়। আমাদের বুঝে আসছে না মজলিসে শুরার গুরুত্বের ব্যাপারে এর চেয়ে শক্তিশালী শব্দ আর কি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যুদ্ধের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ হবার পরও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে শুরার ব্যবস্থা একইভাবে কায়েম ছিলো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরামর্শ করা ছাড়া করেননি। প্রত্যেক মুসলমান তাঁর দৃষ্টিতে সমান অধিকারের মালিক ছিলেন। কোনো লোকই পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার কারণে অন্য লোকের উপর অগ্রাধিকার লাভ করতে পারে না। সাবেক ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে তিনি প্রথম হুকুম দিয়েছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধাভিযানে শামিল না করার জন্য। কেননা তাদের ব্যাপারে এখনো নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ আশংকা দূর হয়ে যাবার পর তাদেরকে ইসলামী বাহিনীতে শামিল করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। ইরাক অভিযানে তাদের থেকে কাজ নেবার জন্য তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আবু বকর ও আরবের রাজনৈতিক ঐক্য

এভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী নেজামে হুকুমাতের ভিত্তি প্রস্তুত করে পরবর্তী খলিফাদের জন্যে এ ভিত্তির উপর এক সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করতে ও গোটা আরবকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে একত্রিত করার সুযোগ গড়ে দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি আরবের রাজনৈতিক ঐক্য লাভকে বেশ সহজ করে দিয়েছিলো। যত বিদ্রোহী সরদার ও নেতাকেই তার সামনে হাজির করা হয়েছে তাকেই তিনি বিগত অপরাধ ক্ষমা করে জীবন রক্ষা করে দিয়েছেন। কোররা বিন হোবাইরা, ওমর বিন মাদিকারব, আশআস বিন কায়েস ইত্যাদি আরব সরদারগণের দৃষ্টান্ত সকলের সামনে দেদীপ্যমান। বিদ্রোহকে কঠিন হাতে দমন করার সাথে সাথে বিদ্রোহের নায়কদেরকে ক্ষমা করে দেবার ফলে তারা

www.pathagar.com

হৃদয় মন দিয়ে খেলাফতের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছেন এবং আরব ঐক্যের স্রোতধারায় মিলে গিয়েছিলেন। শুরার অবলম্বিত কর্মনীতি আরব ঐক্যের ব্যবস্থাকে আরো মযবুত করে ছিলো। যার ফলে ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সহজ হয়ে গেলো।

এ সময় জনসাধারণের চিন্তাধারারও এ দাবি ছিলো, নেজামে হুকুমাতের ভিত্তি শুরা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর রচিত হোক। আরবে ইসলামের বিকাশ ঘটেছে। ইসলামী শরীয়াত ছিলো আরবী ভাষায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আরব ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। আরব গোত্রগুলো বেদুঈন হোক অথবা শহুরে, স্বাধীনচেতা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোবৃত্তির লোক ছিলো। স্বাধীনতার চেয়ে বেশী প্রিয় আর কোনো জিনিস তাদের কাছে ছিলো না। বেদুঈনদের মধ্যে সাম্য নীতির ভাবধারা বিস্তার লাভ করেছিলো। ইসলামী শিক্ষা এ চিন্তাধারাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কেননা ইসলাম ছিলো পূর্ণ সাম্যের ঝাণ্ডাবাহী। আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর কাছে বংশীয় মর্যাদার কোনো মূল্য নেই। মানুষ কার্যক্রম দ্বারাই প্রকৃত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ সত্য উৎঘাটন করে দিয়েছেন, ইসলাম সাদা-কালো, আরব-অনারব, মনিব ও গোলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখা ঠিক মনে করে না। এর দৃষ্টিতে তাকওয়ার মানদণ্ডেই শুধু মর্যাদার অধিকারী হওয়া নির্ভর করে। এখন জমহুরিয়াতের যুগ। চারিদিকেও এ জমহুরিয়াতেরই গুণগান গাওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রকৃত জমহুরিয়াতের চর্চা শুধু ইসলামের প্রথম যুগেই পাওয়া গেছে। সে সময় জমহুরিয়াতের ভিত্তি ছিলো ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ এবং ইসলামের পবিত্র শিক্ষার ফলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মু'মিন ভাইয়ের শুভাকাংখি ছিলো। বস্তুত সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"তোমাদের কারো ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করে যা তার নিজের জন্য পসন্দ করে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত একথা কোনো মামুলী কথা ছিলো না। বরং একথাগুলোই ছিলো জমহুরিয়াতের প্রাণ। কোনো জমহুরিয়াতই ঐ সময় পর্যন্ত সফল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিজ্ঞজনোচিত কথাকে চলার পথের মশাল বানিয়ে জনগণকে পরস্পর শুভাকাঙ্খি বন্ধু ও সংবেদনশীল বানানো না হবে।

রাসূল প্রদত্ত শিক্ষার কারণেই এ আরব ঐক্যের প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। আর এর উপর ভিত্তি করেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সুলতানাতের বুনিয়াদ রেখেছেন এবং একটি বিরল জীবব্যবস্থা দুনিয়ার সামনে পেশ করে বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী শক্তির উৎস

আরব উপদ্বীপ পর্যন্তই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমাত সীমাবদ্ধ ছিলো না। এ হুকুমাত আরবের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। আরব ছাড়াও ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামী সুলতানাত কায়েম হয়ে গিয়েছিলো। প্রশ্ন উঠতে পারে। অনারবীয় এলাকায় ইসলামী সুলতানাত প্রতিষ্ঠা শুধু কয়েকটি আক্রমণের ফলশ্রুতি ? যাতে ঘটনাক্রমে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে ? অথবা এ ইনকিলাব যা আমি আগেই চিহ্নিত করছি। এ বিজয়ের পথ খুলে দিয়েছে ? আর এভাবে মুসলমানরা দুনিয়ার একটি বিস্তৃত এলাকায় ইসলামী রাষ্ট্র মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সুযোগ পেয়েছে ?

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত কোনো ব্যক্তির কাছে একথা গোপন নয়, ইসলামী বাহিনীর কামিয়াবীকে সাময়িক অথবা ঘটনাক্রমে ঘটেছে বলা যায় না, যেতে পারে না। এ বিজয় বিভিন্ন ঘটনাবলীর একটি দীর্ঘ তুঁতি গাথার একটি তুঁতি। ইসলাম দুনিয়ায় যে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে তাতে এ বিজয় সংগঠিত হওয়া ছিলো অবশ্যম্ভাবী। কেননা ইসলামী শিক্ষা ছিলো একটি বিপ্লব সৃষ্টিকারী শক্তির অধিকারী। এ শক্তি তার ক্রিয়া না দেখিয়ে থাকতে পারে না।

ইসলামকে শক্তিদানকারী উপায়-উপকরণে আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতারও বেশ প্রভাব আছে। ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি বড় প্রতীক। দ্বীনের ব্যাপারে তা কারো উপর শক্তি প্রয়োগ করে না। যদিও এর দাওয়াত বিশ্বজনীন ও ব্যাপক। কিন্তু এরপরও সে কোনো ব্যক্তিকে তার আকীদা বদল করার জন্য বাধ্য করে না। তবে একথা সত্য যে, ইসলাম তার উত্থাপিত দাওয়াত ও শিক্ষাকে ভালো করে তলিয়ে দেখার আশা পোষণ করে। যে ব্যক্তি মুক্ত মনে এ শিক্ষা অধ্যয়ন করবে তার পক্ষে গ্রহণ না করে উপায় নেই। কেননা ইসলাম হলো মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ধর্ম। সুস্থ ও সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন মানুষ তা গ্রহণ করতে দ্বিধা সংকোচ করে না।

যেখানে ইসলাম মুক্ত চিন্তার সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী সেখানে আবার ইসলামের বিরুদ্ধে মুক্ত চিন্তার সবচেয়ে বড় শত্রু। কেননা সে জানে, যদি লোকদেরকে আকীদা ও আমলে আযাদী দান করা হয় এবং কোনো ধর্ম ও পদ্ধতি অবলম্বনের ভার তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যে কোনো ধর্ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে ইসলামের পবিত্র শিক্ষা তাদেরকে তাদের অবলম্বিত ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে আসবে। তখন তাদের ভাগ্যে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

ইসলাম স্বাধীন ও মুক্ত বুদ্ধির যে নীতিমালা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে তার উপর মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে কাজ করে দেখিয়েছেন। তারা অসংখ্য দেশ বিজয় করেছেন। কিন্তু কোনো লোককে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি। এর বিপরীত তারা যে শহরকে বিজয় করেছেন সেখানকার নাগরিকদের পূর্ণ ধর্মীয়

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দান করেছেন। স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে নেন তিনি সেইসব অধিকার পান যা অন্যান্য মুসলমানরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার পিতৃ পুরুষের ধর্মে কায়েম থাকতে চায় তাকে জিজিয়া আদায় করতে হতো। জিজিয়া কোনো জরিমানা ছিলো না যে, অমুসলমানদের উপর ঘৃণা বিদ্বেষ প্রসূত ধার্য করা হয়েছে। বরং এর অবস্থান ছিলো যাকাতের মতো একটি ট্যাক্স। রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের উপর আরোপ করা হতো। বস্তুত ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করা হয়েছে তাতে একথা ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে, অমুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জান-মালের বিনিময়ে জিজিয়া আদায় করা হবে। আর অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সহকারে বসবাস করার দায়িত্ব বহন করবে ইসলামী রাষ্ট্র। আজও ইতিহাসে যেসব সন্ধিচুক্তি রক্ষিত আছে তাতে ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ থেকে অমুসলমানদের গির্জা-কালিসা, ইবাদাতের জায়গাও ধর্মীয় নেতা পাদ্রীদের হেফাযতের স্বাক্ষর বিদ্যমান আছে। যদি কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো, মুসলমানরা নিজেদের অঙ্গিকার পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে শুধু জিজিয়া আদায় করা বন্ধই হয়ে যেতো না বরং উসুলকৃত জিজিয়াও তাদেরকে ফেরত দেয়া হতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পাগলপারা মানুষদের হাতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, যার বুনিয়াদ স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার নীতিমালার উপর কায়েম করা হয়েছে, তা রোমক বাদশাহী হতে ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। আজকালকের গণতন্ত্রও গুণগত দিক দিয়ে এর মুকাবিলা করতে পারে না। মানুষকে আরবীয়দের অনুসারী ও অনুগামী বানানো অথবা মানুষকে রোমক ও ইরানীদের গোলামী থেকে ছুটিয়ে এনে আরবীয়দের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং এর বিপরীত এর উদ্দেশ্য ছিলো লোকদেরকে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দেয়া। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও স্নেহ বন্ধনের মত অটুট সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়া। ইসলামী সুলতানাতকে বিজিত জাতিগুলোর মর্যাদা বিজয়ীদের থেকে কোনো অংশেই কম ছিলো না। তাদের সাথে মুসলমানদের মত আচরণ করা হতো। যারা তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মে থাকতে ইচ্ছুক তাকেও আরবের অন্যান্য অমুসলমানদের অধিকারের মতো সকল অধিকার দান করা হতো। আরব বিজয়ীদের কারো কোনো কাজ দ্বারা একথা প্রকাশিত হয়নি যে, তারা আরব অনারবদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির পক্ষপাতি। ইরাক ও সিরিয়ায় যেসব লোক তাদের পৈতৃক ধর্মে কায়েম ছিলো তাদের সাথেও ঐ আচরণই করা হয়েছে, যা নাজরান এবং আরবের অন্যান্য এলাকার ঈসায়ীদের সাথে করা হতো। অবশ্য এসব লোকদের মধ্যে মুসলমানদের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি তাদের দাওয়াতে সাড়া না দিতো এবং ইসলাম কবুল করতে আগ্রহী না হতো তাহলে তারা আল্লাহর এ বাণীকে মনে রেখে তাদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থায় ছেড়ে দিতেন।

www.pathagar.com

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ .

অর্থাৎ যারা হেদায়াত কবুল করেন তার সুফল স্বয়ং তিনিই পাবেন। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ অবলম্বন করতে চান তার ক্ষতির দায়িত্বও তার নিজের বহন করতে হবে। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! তাদেরকে বলে দিন, মানা না মানা তোমাদের কাজ। তোমাদের হেদায়াত ও গোমরাহীর কোনো দায়-দায়িত্ব আমার নেই।

আবু বকরের শাসনব্যবস্থা

ইসলামী হুকুমাতের শাসন ব্যবস্থার যে রূপরেখা পেশ করেছে আবু বকর বিজয়ী দেশগুলোতে তা পুরোপুরি জারী করার সুযোগ পাননি। খালিদ বিন ওয়ালিদ নগর ব্যবস্থাপনার কাজ ওখানকার অধিবাসীদের উপর সপর্দ করে রেখেছিলেন। মুসলমানরা তাদের উপর শুধু সাধারণ দেখাশুনা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তদারকী করতেন। এভাবে এখানে অবিকল কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধাবস্থা চলার কারণে সাধারণভাবে হুকুমাতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই সামরিক কর্ম তৎপরতায় নিমগ্ন থাকতে হতো।

সিরিয়ার অবস্থাও ইরাক থেকে ভিন্ন কিছু ছিলো না। শুরাই রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানকার বাসিন্দাদের জন্য ইসলামের মতোই একেবারেই নতুন জিনিস ছিলো। ইসলামী বিজয়ের সময় এখানে স্বৈরাচারী শাসন জারী ছিলো। শাহানশাহই ছিলেন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি। যা খুশী তা-ই করতেন তিনি। পাদ্রী পুরুহিতগণ শাহানশাহর এজেন্ট হিসাবে কাজ করতো। স্বৈরাচারী শাসনকে বৈধ করার জন্য তারা আসমান-জমিনকে একাকার করে ছাড়তো। একদিকে হুকুমাতের চাপ অপরদিকে ধর্মীয় নেতাদের ওয়াজের ফলে জনসাধারণ তাদের শাসনকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। শাসকদেরকে সিজদা করতেও তাদের মনে বাজতো না। ইসলামী বিজয়ের সময় তাঁরা এমন শাসনব্যবস্থা প্রদর্শন করলেন যার ভিত্তি ন্যায়, ইনসাফ ও শুরার উপর স্থাপিত ছিলো। এ শাসন ব্যবস্থায় শাহী জাকজমক, ভয়ভীতি, দেন-দরবারের নাম নিশানাও ছিলো না। যা তারা শত শত বছর থেকে দেখে আসতে অভ্যস্ত ছিলো। তাই স্বতস্ফূর্তভাবেই তাদের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করলো। অত্যন্ত উষ্ণভাবে তারা মুসলমানদের অভ্যর্থনা জানাতে শুরু করলো। ইসলামের দিকে মানুষের এ আগ্রহ উদ্দীপনার কারণে মুসলমানদের সুলতানাত বাড়তে শুরু করলো এবং এর সীমা একদিকে হিন্দুস্তান ও অপরদিকে আফ্রিকার সাথে গিয়ে মিশলো। মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছেন, সততা সত্যবাদিতা, ন্যায় ও ইনসাফের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন এবং স্বাধীনতা, সাম্য ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বীজ প্রত্যেক দেশেই বপন করেছেন।

www.pathagar.com

বিজিত এলাকার ইসলামী নেজামে হুকুমাত পরিপূর্ণভাবে জারী করে যেতে পারার সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু পাননি। এ সময়ে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত যেসব কাজ হয়েছে তা ছিলো প্রাথমিক ধরনের। পরবর্তী খলিফাদের শাসনকালে শাসনব্যবস্থা যেভাবে সুশৃংখলিত রূপ ধারণ করেছিলো, যেভাবে মহকুমা স্থাপিত হয়েছিলো সেভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কালে ছিলো না। তাঁর খেলাফতকালে না হুকুমাত বাকায়েদা শাসনতান্ত্রিক রূপ ধারণ করেছিলো, না বিভিন্ন মহকুমা কায়েম হয়েছিলো। এর দু'টোর স্বাভাবিক কারণ ছিলো ঃ

এক ঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগ ছিলো অতীতের সকল যুগ থেকে ভিন্নতর এবং তাঁকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে এমন সময় একটি সরকার গঠন করতে হয়েছিলো যখন অতীতের সভ্যতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো এবং একটি নতুন সভ্যতা তার স্থান দখল করে নিয়েছিলো। আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে এসে গিয়েছিলো একটি বিপ্লব। আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিজয়ের বেশে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। চিন্তাধারার গতি পাল্টে গেলো। সমাজে এসে গিয়েছিলো ব্যাপক পরিবর্তন। একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থায় স্বল্প কালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিলো কতটা কঠিন।

সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে না ওঠার দ্বিতীয় কারণ ছিলো ঐ যুগটি ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকারকে সামরিক সরকারই বলা যেতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালীন সুসংগঠিত প্রশসান ব্যবস্থাই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সেই সব এলাকায় সুসংহত রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তেলার প্রশ্নই উঠে না —যেখানে ইসলামের আগমনের পূর্বে সুশৃংখল ব্যবস্থার কোনো অসিত্বই ছিলো না।

খেলাফতলাভের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সর্বপ্রথম ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রথম বছর এ বিদ্রোহ দমনেই অতিবাহিত হয়ে যায়। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ চলছিলো—এ সময় ইরানীদের পক্ষ থেকে হুমকী আসতে থাকে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইরাকের দিকেও মনোনিবেশ করতে হয়। ইরাক পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই সিরিয়া অভিযান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ব্যাপক ভিত্তির উপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করা এবং এর বিস্তারিত কর্মসূচী নির্ধারণ করা সম্ভব ছিলো না। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিলো এবং তা অর্জনের জন্য তিনি পুরোপুরি ব্যস্ত ছিলেন। এক, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত করা। দুই, শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করা।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামরিক সরকার ব্যবস্থা সেই বেদুঈন পন্থার অধিক নিকটতর ছিলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও আরব গোত্রসমূহের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। ঐ সময় সরকারের কোনো সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছিলো না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সামরিক সেবার জন্য এগিয়ে

www.pathagar.com

আসতো। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে এবং যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হলে বেদুঈন গোত্রগুলো অস্ত্রশস্ত্রসহ রওনা হতো এবং শত্রু পক্ষের দিকে মার্চ করতো। প্রত্যেক গোত্রের নেতাই স্ব স্ব গোত্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতো। তাদের নারীরাও তাদের সাহস যোগানের জন্য তাদের সফর সংগী হতো। যুদ্ধের রসদপত্র ও অস্ত্রের জন্য তারা সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো না। বরং নিজেরাই তার ব্যবস্থা করতো। সরকারের পক্ষে থেকে বেতনও দেয়া হতো না, বরং গানীমাতের মালকেই নিজেদের সেবার প্রতিদান মনে করতো।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে গানীমাতের মাল অর্জিত হতো তার চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করা হতো এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজধানীতে খলিফার খেদমতে প্রেরণ করা হতো যা তিনি বাইতুলমালে (সরকারী কোষাগারে) জমা করে দিতেন। খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সারধাণ ব্যয় নির্বাহ করা হতো এবং মদীনার নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের সাহায্য করা হতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছা ছিলো গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ মদীনায় পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে তা বন্টন করে দেয়া। এক দিরহামও ভবিষ্যতের জন্য জমা না রাখা। কতিপয় লোক তার কাছে বাইতুল মালের পাহারাদার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তিনি তা অনুমোদন করেননি। কারণ, বাইতুলমালে কোনো উদ্বৃত্তই থাকতো না। যার হেফাযতের জন্য পাহারাদারের প্রয়োজন হতে পারে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকার ছিলো নেহায়েত সাদাসিধা ও বেদুঈন ধরনের। তিনি নিজ যুগের সুসংহত ও নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর যুগ ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে খুবই সাদৃশ্য পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ অপসন্দ করতেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ভুলেও তা করতেন না। যে কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। তা করা তিনি সৌভাগ্যজনক মনে করতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর স্থবির অনুসারী ছিলেন না, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণাংগ নমুনা গ্রহণ করার ফলে তাঁর জন্য ইজতিহাদের দরযা খোলা ছিলো। এ ইজতিহাদের কারণে তিনি ইরাক ও সিরিয়া জয় করেন তাঁর হাতে এমন একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন হলো যার সংবিধান আল্লাহর বিধান ও পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর ছিলো ভিত্তিশীল। তিনি সর্বদা প্রান্তিকতা থেকে পবিত্র ছিলেন। আল্লাহর নূরের আলোকে সিরাতুল মুসতাকীমে পরিচালিত ছিলেন। তিনি সর্বদা রোমী সুলতানাতের শাসন প্রণালী সামনে রেখে বিভিন্ন বিভাগের রূপ দান করতেন। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও এর নির্দিষ্ট সীমা মোটেও অতিক্রম করেননি। ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসন প্রণালীই জারী ছিলো। খেলাফতে রাশেদার পরে সুলতানাত যখন উমাইয়াদের হাতে আসলো তখন শুরাই প্রকৃতির শাসন ব্যবস্থার স্থলে বংশীয় রাজতন্ত্র অনুপ্রবেশ করলো। আব্বাসীয় শাসনামলেও বংশীয় রাজতন্ত্রের ধারা কায়েম ছিলো। এ সময়ে আব্বাসীয়

www.pathagar.com

সুলতানাতের উপর রোম ও ইরানবাসীদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি হলো। তাদের হাতে খলিফারা হয়ে পড়লো অসহায়। হযরত ওসমানের খেলাফতকালেই ইরান ও রোমের উপর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করা হয়। কিন্তু এ সময় রাষ্ট্রের উপর অনারবদের প্রভাব ছিলো বেশ কম। উমাইয়া শাসনামলে ইরানের প্রভাব কিছুটা বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সুলতানাত পরিপূর্ণভাবে আরবীয় ধাচেই রয়ে গিয়েছিলো। আরববাসীগণ যেহেতু ইরানের সাহায্যেই খেলাফত লাভ করেছিলো তাই এ সময়ে তারা রাজনৈতিক খেলা খেলবার বড় সুযোগ পেয়ে গেলো। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে খলিফারা ইরানের হাতের খেলনায় পরিণত হলো।

এ সময়ই আলেমরা, যাদের অধিকাংশ অনারব ছিলো, রাষ্ট্রের জন্য আইন-কানুন নিয়মনীতি রচনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ হতো। এ মতভেদ কোনো কোনো সময় বাড়তে বাড়তে গৃহবিবাদে পরিণত হতো। ফলে রাষ্ট্র শক্তিকে তা দমন করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং উমাইয়া ও আরবীয় শাসনের মধ্যে কত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেলো। আবু বকরের খেলাফতকালে কত অনাড়ম্বর ও সহজ প্রকৃতির ছিলো আর এ কারণেই তাঁর খেলাফাতকালে একদিনের জন্যও দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো বিঘ্নতা ঘটেনি। আর শান-শওকতের দিক দিয়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল ছিলো তুলনা বিহীন। বড় বড় আলেম ও অভিজ্ঞ লোক রাষ্ট্রের আইন-কানুন রচনায় মশগুল ছিলেন। কিন্তু আত্ত বিদ্রোহ ও কোন্দলের জন্য রাষ্ট্রে একদিনের জন্যও কোনো শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করা যেতে পারেনি। এ শাসনামলে সব সময়ের জন্যই গৃহযুদ্ধ ঝগড়া-ফাসাদ লেগেছিলো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিশ্বাস করতেন—একদিন যেমন তাঁকে আল্লাহর দরবারে তার নিজের ব্যক্তিগত কার্যক্রমের হিসাব পেশ করতে হবে। তেমনি তাঁকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ব্যাপারে মানুষের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ ও মানুষের কাছে এ জবাবদিহির ভয়ে যখনই তিনি কোনো কাজে হাত দিতেন, তখনই তিনি আল্লাহর হুকুমের দিকে নজর দিতেন। সেই ব্যাপারটি নিয়ে মানুষের সাথে পরামর্শ করতেন। এভাবে যখনই কোনো ব্যাপার তার সামনে আসতো, তিনি ভালো করে চিন্তা-ভাবনা ও পরিণাম পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করা ছাড়া সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। মৃত্যু শয্যায়ও তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি সবসময়ই মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ইরাক থেকে মুসান্না শায়বানী মদীনায় এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি মুসান্নাকে সাক্ষাতে ডাকলেন। মনোযোগের সাথে আরজি শুনলেন। সে সময়ই তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে এনে সিরিয়া অভিযানের আগে মুসান্নার সাহায্যে বাহিনী পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। মোটকথা এভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে আত্মনিয়োজিত ছিলেন।

---

www.pathagar.com

১৮

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আরবের কোণায় কোণায় উত্থিত ধর্মত্যাগের বিদ্রোহকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধহস্তে দমন করেন। ইসলামী বাহিনী ইরাকের অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। ইরানের রাজধানী মাদায়েন বিজয় আর শুধু কয়েক দিনের ব্যাপার ছিলো মাত্র। এদিকে সিরিয়ায় রোমের দুর্ধর্ষ বাহিনীকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছিলো। ইসলামের গৌরবময় বিজয়ের হাওয়ার প্রবাহ সিরিয়া, দামেশক অনুভব করেছিলো। একদিকে এ ধরনের বিস্ময়কর বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিলো অপর দিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় এমন একটি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের কাঠামো গঠনে নিমগ্ন ছিলেন যার ভিত্তি ছিলো পারস্পরিক পরামর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন সংকলিত হয়ে গেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামোর জন্য পথ হয়ে গেছে পরিষ্কার। প্রকৃত ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বাস্তবভাবে কার্যকর হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এতোবড় গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ মাত্র দু' বছর তিন মাসের মতো কম সময়ের মধ্যে লাভ করেছে পূর্ণতা।

এটা কি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ও অলৌকিক সৃষ্টি নয় ? মাত্র সাতাইশ মাসের স্বল্প সময়ের মধ্যে দৈর্ঘ ও প্রস্থের একটি বিরাট এলাকার বিপজ্জনক বিদ্রোহ চিরতরে দমন হয়ে গেলো। আর এক মুহূর্তে গোটা আরব এমনভাবে এক হয়ে গেলো, যেনো এখানে কোনোদিন কোনো বিরোধিতা ও বিদ্রোহ সংঘটিতই হয়নি। অতপর এ আরববাসী, যারা আগে ফেতনা-ফাসাদ ও বিদ্রোহের শিকারে পরিণত হয়েছিলো তারা এ দু'টো বিরাট শক্তির অধিকারী দেশের উপর হামলা চালাতে শুরু করলো। অথচ এদেরকে তৎকালীন বিশ্বের সব দেশের উপর সমর সম্ভার ও সম্ভাব্যতা কৃষ্টির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করা হতো। আর এ দু'টো দেশ দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী, জনশক্তি ও সমরাস্ত্রের পর্যাপ্ততা সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন আরবদের কাছে পরাভূত হতে থাকে। ইরান ও রোমক সভ্যতার স্থলে এখানে ইসলামী সভ্যতার আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর আরবের এ ধরনের বিজয় এমন এক বিস্ময়কর ব্যাপার যার নজির ইতিহাসে নেই। আল্লাহর ফজল ও রহমত ছাড়া এমন কাজ করতে পারে—এ সাধ্য কার ? আল্লাহর কুদরাতের উপর পরিপূর্ণ ঈমান থাকার কারণেই আল্লাহ তায়ালা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তার পূর্ণ কুদরত নাযিল করেছেন। এ কারণেই যে কাজ বড় বড় রাজনীতিবিদ ও সিপাহ- সালারগণ বছরের পর বছর চেষ্টা করেও সমাধা করতে পারেন না সে কাজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন হালকা পাতলা দুর্বল লোক কয়েক মাসে আঞ্জাম দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মৃত্যু সংক্রান্ত বর্ণনা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু-অসুখ নির্ণয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে জনৈক ইহুদী খাবারের সাথে তাঁকে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো। খাবারের সময় তাঁর সাথে ইতাব বিন উসায়দ ও হারেস বিন কালদাহও উপস্থিত ছিলেন। হারেস বিন কালদাহ কয়েক লোকমা মুখে দিয়ে আর দেননি। তাই তাকে বিষের ক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায় ধরতে পারেনি। কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ইতাব বিন উসায়দ পূর্ণ মাত্রায় বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ বিষ তাৎক্ষণিক ক্রিয়াকর ছিলো না। বছরের মধ্যেই এ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। অতএব, যেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় ইন্তেকাল করলেন সেদিনই ইতাবও মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

কিন্তু এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমতঃ একথা বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ইহুদীদের মধ্যে এমন কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিলো না যার কারণে ধারণা করা যেতে পারে, ইহুদী স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাকে বিষ খাইয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই সকল ইহুদীকে মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়েছিলো।

এ প্রসঙ্গে ঐ বর্ণনাই বিশ্বাসযোগ্য যা তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা ও পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন। মৃত্যু রোগ প্রথমতঃ তাঁর এভাবে শুরু হয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনে তিনি ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে ভীষণ জ্বর পেলো। পনর দিন পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এসব দিনে তাঁর নির্দেশক্রমে ওমর বিন খাত্তাব নামায পড়াতেন।

কঠিন অসুস্থতাও তাঁকে রাষ্ট্রের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। অসুস্থতার প্রথম থেকেই তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, মৃত্যু খুব কাছে। খুব শীঘ্রই তিনি তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করবেন। এমন প্রশান্তির সাথে তিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন যেনো আল্লাহ তাঁর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা আঞ্জাম দেবার জন্য তিনি যথাসাধ্য কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেননি। একদিন লোকেরা তাঁর কাছে আরজ করলেন, "ডাক্তার ডেকে আপনি স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করুন।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি পরামর্শ করেছি।" লোকেরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার কি পরামর্শ দিলেন ?" তিনি বললেন, "আমি যা চাইবো তা-ই করবো।" অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আল্লাহর মর্জির উপর নিজের জীবনকে সোপর্দ করে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে চলে যাওয়াতেই তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রবল।

স্থলাভিষিক্তের ব্যাপার

মৃত্যুশয্যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কেই বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তার দৃষ্টিতে অতীতের ঘটনাবলী এক এক করে জেগে

www.pathagar.com

উঠছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সাথে সাথে সাকিফায়ে বনী সায়েদায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে মতভেদ ঘটেছিলো। আল্লাহ যদি মুসলমানদেরকে তাঁর হাতে একত্রিত না করতেন তাহলে বিরাট ফেতনা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিলো। আর এ ফেতনা শুধু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না বরং গোটা আরবকেও এ ঝগড়ায় জড়িয়ে ফেলতো। এ বহ্নিশিখা প্রথমতঃ মক্কা ও মদীনায় জ্বলে উঠতো। তার পরের পালা ছিলো ইয়েমেনের।

এ মতবিভেদ ও মতবিরোধের ধরন দীনি হতো না বরং হতো নির্ভেজাল পার্থিব এবং শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোত্রীয় জাতীয়তার ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। প্রথমত কোনো শ্রেণীর তরফ থেকে ক্ষমতার লোভ জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়। দ্বিতীয় এ সময়ে ইরান ও রোমক শক্তি সিংহের মতো মুখ হা করে আরবের দিকে তাকিয়েছিলো। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বিবাদ ও মতবিরোধ এসব রাষ্ট্রের জন্য সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে প্রমাণিত হতো। মুসলমানদের মতভেদের সুযোগ গ্রহণ করে তারা অতি সহজে আরবের উপর নিয়ন্ত্রণ করে নিতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের কারণে তাঁর জীবনকালে এ ফেতনা মাথা উঠাবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কে বলতে পারতো, ভবিষ্যতের জন্যও এ ফেতনার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মৃত্যু শয্যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মনপ্রাণ এ ভাবনা চিন্তায় বিভোর ছিলো। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সকল অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন তিনি। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে মতবিরোধ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর জীবদ্দশায়ই খলিফা নির্বাচন করে যেতে হবে। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করেননি। কোনো লোককে খলিফা নিযুক্ত করার আগেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু এতে আল্লাহর হিকমত নিহিত ছিলো অর্থাৎ মানুষ যেনো আবার মনে না করে বসে, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁকে নিযুক্ত করেছেন, তাই তিনি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে হুকুম-আহকাম লাভ করে থাকেন।

নিজের জীবনকালেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নিযুক্ত করতে চাই-লেও তিনি এ ব্যাপারে আহলে রায় সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের রায় মুতাবেকই তিনি খলিফা নিযুক্ত করে গিয়েছেন।

তাঁর ধারণায় শুধু ওমর বিন খাত্তাবই সঠিক অর্থে তার স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবেন। কিন্তু পরামর্শ ছাড়া ওমরকে খলিফা ঘোষণা করলে তা মানুষের কাছে বোঝা চাপিয়ে দেবার নামান্তর হতে পারে এবং মুসলমানরা এ নির্বাচনকে ভালো নজরে দেখবে না। অতএব তিনি আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.pathagar.com

"ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তোমার মতামত কি ?"

আবদুর রহমান বিন আওফ জবাবে বললেন ঃ

"যে ব্যাপারে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, সে ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনিই ভালো বুঝেন।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তারপরও তোমার কি মত ?"

এবার আবদুর রহমান জবাবে বললেন ঃ

"হে খলিফাতুর রাসূল ! ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো উত্তম লোক। তবে তিনি খুবই কঠোর প্রকৃতির লোক।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"ওমর শুধু এ জন্য কঠোর যে, আমি খুব কোমলতার সাথে কাজ করি। খেলাফতের দায়িত্ব কাঁধে চাপলে তার এ কঠোরতা অনেকাংশেই কমে যাবে। আমি নিজেও দেখেছি, যদি আমি কারো উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করি তাহলে ওমর তার সাথে কোমল আচরণ করেন। আর আমি যদি কারো সাথে কোমল আচরণ করি তাহলে তিনি আমার সম্মুখে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কঠোর হয়ে যান।"

একথা বলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আবার বললেন ঃ

"হে আবু মুহাম্মদ ! আমি তোমাকে যা বললাম, তুমি তা অন্য কারো কাছে বলো না।"

এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন ঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ ! ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তোমার কি রায়?"

উত্তরে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"এ ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে ভালো বুঝেন।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"এরপরও তাঁর ব্যাপারে আমি তোমার রায় চাই।"

ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তাঁর ব্যাপারে আমার উপলব্ধি হলো—তার অপ্রকাশ্য দিক (বাতেন) প্রকাশ্য দিকের চেয়ে উত্তম। আর তিনি জ্ঞান-গরিমায়ও আমাদের অদ্বিতীয়।"

এবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশী হয়ে বললেন ঃ

www.pathagar.com

"হে আবু আবদুল্লাহ ! আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমি যদি ওমরকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করি তাহলে তিনি তোমাদের কারো উপর বাড়াবাড়ি করবেন না।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকেও কারো কাছে একথা প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন।

এ দু' ব্যক্তি ছাড়াও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু সাঈদ বিন যায়েদ, উসায়দ বিন হুজায়ের সহ অন্যান্য মুহাজির ও আনসারদের সাথেও এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলেন। ভবিষ্যতের খলিফা নির্বাচনের পরামর্শ গ্রহণ ও এ ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খলিফা নিযুক্ত করতে চান শুনে কিছু কিছু সাহাবা উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কঠোরতা ছিলো প্রবাদ বাক্যের মতো। তিনি খলিফা হলে মুসলমানদের ভিতরে মতবিরোধ ঘটবে বলে তারা আশংকা করতে লাগলেন। এ সিদ্ধান্ত হতে বিরত রাখার জন্য তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রতিনিধি পাঠাতে পরামর্শ করলেন। এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তালহা বিন আবদুল্লাহ। তাঁরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে আরজ করলেন ঃ "আমরা শুনেছি, আপনি ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যদি তা-ই হয় তাহলে আল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খলিফা করার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আপনি কি জবাব দিবেন ? আপনার বর্তমানেই তো তিনি মানুষের সাথে যে আচরণ করেন, তা আপনার জানা। আপনার অনুপস্থিতিতে তো তার যুলুম নির্যাতনের কোনো সীমা থাকবে না ?"

একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বড় রাগ ধরলো। তিনি জ্বরাক্রান্ত অবস্থায়ই চীৎকার দিয়ে বললেন ঃ

"আমাকে বসাও।"

অতএব তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলো। তিনি প্রতিনিধিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ

"তোমরা কি আমাকে আল্লাহর গযবের ভয় দেখাচ্ছো ?

"আল্লাহর শপথ ! আমি যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হবো। আমি আরজ করবো, হে আল্লাহ ! আমি তোমার বান্দাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিক খলিফা বানিয়ে এসেছি।"

এরপর তিনি তালহাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"আমি এখন যা বললাম তা অন্যান্যদের কাছেও পৌঁছিয়ে দাও।"

এ তেজোদীপ্ত কথাবার্তার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে গেলেন। এরা লজ্জিত হয়ে নিজ নিজ বাড়ী চলে গেলেন। পরের দিন ভোরে

www.pathagar.com

আবদুর রহমান বিন আওফ তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁকে দেখে বললেন, "আল্লাহর শোকর, আজ আপনাকে সুস্থ মনে হচ্ছে।

উত্তরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

সত্যি ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

জী, হাঁ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু কতক্ষণ খামুশ থেকে দরদমাখা সুরে বললেন ঃ

ঐ ব্যক্তিকে আমি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করছি যিনি আমার কাছে সর্বোত্তম। কিন্তু একথা শুনলে তোমাদের সকলের চোখ মুখ শুকিয়ে যায়। আর তারা আমার নির্বাচনকে অপসন্দের দৃষ্টিতে দেখে।"

আবদুর রহমান বিন আওফ বুঝতে পারলেন, তাদের কালকের কথায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুঃখ পেয়েছেন। তিনি তাই আরজ করলেন ঃ

"আপনি মানুষের কথার পরওয়া করবেন না। এ সময়তো অনেক লোক খেলাফতের প্রশ্নে আপনার সাথে একমত। তাদের ব্যাপারে তো চিন্তার কোনো কারণ নেই। অবশ্য কিছু লোক ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ব্যাপারে রাজী নয়। তারা যদি আপনার সামনে তাদের কোনো রায় বলে থাকে তাহলে তা পরামর্শ হিসাবে উত্থাপন করেছেন। আপনার বিরোধিতা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা আপনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন তাতে তারা একমত হবে। কেননা তাদের বিশ্বাস আছে, আপনি যা করবেন, মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই করবেন।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমরের খেলাফতের বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাতেব ওসমান বিন আফফানকে ডেকে বললেন ঃ আমি যা বলছি তুমি লিখো।

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হলো ঐ ওসিয়াত বা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু কোহাফা এ দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ ও আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করার সময় লিখিয়েছেন। এটা হলো ঐ সময় যখন বড় বড় কাফেরও ঈমান আনছিলো এবং কট্টর মিথ্যাবাদীও সত্য কথা বলতে বাধ্য হচ্ছিলো। আমি আমার পর ওমর বিন খাত্তাবকে তোমাদের খলিফা হিসাবে নির্দিষ্ট করে যাচ্ছি। তোমরা তাঁর হুকুমের পূর্ণ অনুসরণ করবে। আমি তোমাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। ওমর যেনো ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করে আমিও তাঁর থেকে এ প্রত্যাশাই করবো। কিন্তু খোদা না করুন যদি এমন না হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর

www.pathagar.com

দরবারে নিজ নিজ খারাপ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই আমি আমার জানামতে তোমাদের কল্যাণের চেষ্টাই করেছি। নতুবা গায়েবের জ্ঞানতো শুধু আল্লাহ তায়ালারই।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ . وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমানকে দিয়ে ওসিয়াত লিখানো শুরু করেছেন। যখন এ শব্দগুলো পর্যন্ত পৌঁছলেন যে, "আমি তোমাদের উপর খলিফা বানাচ্ছি" তখন তিনি অবচেতন হয়ে গেলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সবই জানতেন। তাই এ বেহুশ বা অচেতন অবস্থায়ই তিনি এ শব্দগুলো লিখে দিলেন ঃ

"আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন খাত্তাবকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করছি। আর আমি তোমাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে কোনো চেষ্টার ত্রুটি করিনি।"

হুশ ফিরে এলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"আমি যা লিখিয়েছি তা আমাকে আবার পড়ে শুনাও।"

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখা সব কথাগুলো তাঁকে পড়ে শুনালেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখা কথাগুলো শুনে, আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন।

"মনে হচ্ছে, তোমাদের ভয় ছিলো বেহুশ অবস্থায়ই আমার মৃত্যু ঘটতে পারে এবং গোটা ওসিয়াতটা লিখে যেতে পারবো না। তাহলে খেলাফত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হবে।"

উত্তরে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"আপনি ঠিকই বলেছেন। সত্যিই আমার ধারণা এটাই ছিলো।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ভাষাটা ঠিক রাখলেন এবং খুশী হয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহ এ কাজের জন্য তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

কিন্তু এ ওসিয়াতের পরও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ওসিয়াতের ব্যাপারে তিনি জনসাধারণের মধ্যে আম ঘোষণা দিতে চাইলেন। যেনো ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আর না থাকে। তিনি মসজিদের দিকে দরযা খুলিয়ে নিলেন এবং তার উপরেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস দু' হাত দিয়ে তাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"আমি যাকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করবো তার উপর কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে ? কারণ, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য কোনো চেষ্টার

www.pathagar.com

ত্রুটি করিনি। আর না আমি আমার কোনো কাছের আত্মীয়কে খলিফা বানিয়েছি। আমি আমার পরে তোমাদের খলিফার জন্য ওমর বিন খাত্তাবের নাম উল্লেখ করেছি। তোমরা তার নির্দেশের পূর্ণ অনুসরণ করবে।"

এ কথায় লোকেরা বলে উঠলো ঃ

"আমরা আপনার নির্বাচনে রাজী আছি। আপনার কাছে আমরা অঙ্গীকার করছি, সর্বাবস্থায়ই আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করবো।"

ইবনে সায়াদের কোনো কোনো রাওয়ায়েতে একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসিয়াত লেখার পর এর উপর সিলমোহর লাগিয়ে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বেরিয়ে আসলেন। মোহর করা ওসিয়াত তাঁর হাতে ছিলো। লোকদের তিনি বললেন ঃ

"যার খেলাফতের কথা এ ওসিয়াতনামায় উল্লেখ হয়েছে তোমরা কি তাঁর হাতে বাইয়াত করবে?"

লোকেরা জবাব দিলো ঃ

"অবশ্যই বাইয়াত করবো।"

অতএব তাঁরা ওসমানের কথা মতোই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন খাত্তাবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। বাইয়াতের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে নিজের কাছে নিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন।

এ উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেয়া হলো ঃ

"আমি আমার পরে তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে আল্লাহকে ভয় করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। কোনো কোনো আমল রাতের অন্ধকারে করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি তা দিনের বেলায় কবুল করেন না। আবার কোনো কোনো আমল দিনে করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা তিনি রাতের বেলা কবুল করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরয ইবাদাত পালন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদাত কবুল হয় না। যে ব্যক্তির পাল্লা কিয়ামতের দিন ভারী হবে তিনি দুনিয়ায় নেক কাজ করার লোক হবেন। কেননা হক ও সত্য পালন করা ছাড়া পাল্লা হালকা হবে, ভারী হতে পারে না। আর যে ব্যক্তির পাল্লা হালকা হবে সে ব্যক্তি দুনিয়ায় খারাপ কাজ পালনকারী হবে। কেননা বাতিলের অনুসরণ ছাড়া পাল্লা হালকা হতে পারে না। আল্লাহ কুরআনে কারীমে যেখানে জান্নাতবাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে নেক কাজ করার কারণে তার প্রশংসা ও তাঁর ছোট খাটো খারাপ কাজ মাফ করে দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। তুমি যখন আল্লাহর কালামে এসব আয়াত তিলাওয়াত করবে তখন বলবে, হে আমার আল্লাহ! আমার ভয় হয় আমি যেনো আবার ওদের মধ্যে

www.pathagar.com

পরিগণিত হই। এভাবে যেখানে দোযখবাসীদের কথা উল্লেখ হয়েছে ওখানে ওদের বদ আমলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাদের ভালো কাজগুলোর কথা উল্লেখ হয়নি। যখন তুমি এসব আয়াতে পৌঁছুবে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ ! আমি আশা করি আমি ওদের মধ্যে পরিগণিত হবো না।' অধিকাংশ স্থানেই আল্লাহ রহমত ও আযাবের আয়াতকে এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছেন। যাতে বান্দাহর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নেক কাজের দিকে অগ্রসর হবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। ওখানে সে খোদায়ী আযাবের ভয়ও পাবে। সে শুধু হক ও সত্যের অনুসারী হবে এবং নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। হে ওমর যদি তুমি আমার এ নসিহতগুলোর উপর আমল করো, তাহলে মৃত্যু অপেক্ষা কোনো জিনিসই তোমার কাছে প্রিয় হবে না। আর তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা সহকারে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে তার নেয়ামতসমূহ পাবার আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর যদি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে তা বের করে দাও, তাহলে মৃত্যু অপেক্ষা কোনো জিনিসকে বেশী ভয় করবে না। স্মরণ রাখবে, এভাবে তুমি আল্লাহকে রাজী করতে পারবে না।"

এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমি ওমরকে আমার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে আমার জানামতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণের পুঁজি বানিয়েছি। আমার পর ফেতনার আশংকা আমি করেছিলাম। এ কাজ আমি শুধু ফেতনা ঠেকাবার জন্য করেছি। আমি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে এমন ব্যক্তিকে মুসলমানদের আমীর বানিয়েছি যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও সতর্ক। আর মুসলমানদের কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহী। আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আমার পর তুমিই মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। তারা তোমার বান্দা ও তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। হে আল্লাহ ! তাদের নেতাকে নেক কাজ সমাপন করার যোগ্যতা দান করো। তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করো। আর তার প্রজা সাধারণকেও তার অনুগামী বানিয়ে দাও।"

উপরে উল্লেখিত হেদায়াত ও দোয়ার সত্যতা বা নিশ্চিতকরণ আমাদের জন্য দুরূহ। বিশেষ করে "হে আল্লাহ ! তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করো" —এ অংশের ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ অংশ তো আবার আন্দাজ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে লাগিয়ে দেয়া হয়নি। কেননা তাঁকে কেউ "খলিফাতুল্লাহ" নামে অভিহিত করলে সাথে সাথে তিনি বলতেন, আমি খলিফাতুল্লাহ নই বরং খলিফায়ে রাসূলুল্লাহ। সুতরাং নিজকে এতো ছোট মনে করার পর-আবার নিজের ব্যাপারে 'রাশেদ' শব্দ ব্যবহার তিনি করবেন, তা মনে হচ্ছে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগেরই বিভিন্ন বর্ণনা আমরা ইতিহাসের বইতে দেখতে পাচ্ছি। তাই এসব বর্ণনা বাছাই করা ও তা গ্রহণ করার ব্যাপারে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আত্মসমালোচনা

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচনের কাজ শেষ করে এবং তাঁর পরে মুসলমানদের দেখাশুনার পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের আত্মসমালোচনা করতে শুরু করেন। আবদুর রহমান বিন আওফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে এত পেরেশান থাকতেন যে, আমি মাঝে মাঝে তার এ পেরেশানী দূর করার জন্য প্রবোধমূলক কথাবার্তা বলতাম। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, আল্লাহ পাক আপনার সব মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেছেন। আপনার মনে দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে কোনো আফসোস নেই।

একথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"তুমি ঠিকই বলেছো। কোনো দুঃখ মনে নিয়ে আমি এ দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছি না। অবশ্য তিনটি ব্যাপারে আমার আফসোস আছে। এগুলো কেন আমি করলাম। হায় ! যদি এগুলো আমি না করতাম, আবার তিনটি কাজ আমি করিনি। হায় ! যদি এ কাজগুলো আমি করতাম। আর তিনটি কথা এমন আছে যা আমি রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আফসোস! যদি একথাগুলো জিজ্ঞেস করে রাখতাম। যে তিনটি কাজ আমার করা উচিত ছিলো না তাহলো ঃ (১) হায় ! আমি যদি বিনানুমতিতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ না করতাম। যদি তারা লড়াই ঝগড়ার জন্যও তা বন্ধ করে থাকতো।[১] (২) আফসোস ! আমি যদি কুজায়াতুস সালমীকে আগুনে না জ্বালাতাম। হয় তাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করতাম অথবা তাকে জীবনে না মেরে মুক্ত করে দিতাম। (৩) আফসোস ! সকিফায়ে বনী সায়েদার দিন যদি খেলাফতের দায়িত্ব ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অথবা আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অর্পিত হতো। তাদের কেউ আমীর হতেন। আমি হতাম তাদের উজির।

যে কাজগুলো আমার করা উচিত ছিলো তাহলো ঃ

(১) গ্রেফতারকৃত অবস্থায় আশআস বিন কায়েসকে আমার কাছে আনা হলে তার শিরচ্ছেদ করা আমার উচিত ছিলো। কেননা আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে কলহ প্রিয় লোক। কোনো কলহ সৃষ্টি হলে সে অবশ্যই তাতে ঘৃতাহুতি দেবে।[২]

---

১. যেসব লোক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত গ্রহণ না করার কথা সমর্থন করে না তারা এ বর্ণনাটিও সমর্থন করে না। এভাবে কিছু লোক এ বর্ণনাটিও সমর্থন করেন না যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি আনসারদের খেলাফতের অধিকার সম্পর্কে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন।

২. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দূরদর্শীতার প্রমাণ হুবহু পাওয়া গেছে। সিফফিনের যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে শামিল হওয়া সত্ত্বেও আশআস গোপনে গোপনে আমীরে মুয়াবিয়ার সাথে মিলে গিয়েছিলো। তাহকিমের ফেতনা সংঘটিত হলে আশআস কূটকৌশল দ্বারা তা আরো উত্তেজিত করতে সকলের আগে ছিলো।

www.pathagar.com

(২) খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করতে পাঠাবার পর আমাকে মদীনা হতে বের হয়ে জুলকিসসায় অবস্থান গ্রহণ করা উচিত ছিলো। মুসলমানরা বিজয়ী হলে তো মঙ্গল। নতুবা আমি জুলকিসসায় থাকার কারণে তাদের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছতে পারতাম।

(৩) খালিদ বিন ওয়ালিদকে সিরিয়ায় পাঠাবার সাথে সাথে ওমর বিন খাত্তাবকে ইরাকে পাঠিয়ে দিলে আমার হাত দু'টো এভাবে আল্লাহর রাহে প্রসারিত হয়ে যেতো।

যে তিনটি কথা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনে রাখা দরকার ছিলো, তাহলো ঃ

(১) খেলাফত সম্পর্কে যদি তাঁর থেকে জিজ্ঞেস করে নিতাম তাহলে তারপরে কারো ব্যাপারে ঝগড়া করার প্রশ্নই উঠতো না।

(২) খেলাফতে আনসারদের অংশ আছে কি নেই, যদি একথাটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনে রাখতাম।

(৩) ভাতিজি ও চাচীর মিরাস সম্পর্কে যদি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা জেনে রাখতাম। কেননা এ দু'জনের মিরাসের ব্যাপারে আমার মনে এখনো আছে।

ভাতা ফেরত দেয়া

মৃত্যু শয্যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু একথাগুলোর চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন না। বরং আরো কতিপয় বিষয়েও চিন্তার ঘুরপাকেও তিনি বিভোর ছিলেন। খেলাফতের দায়িত্বে নির্বাচিত হবার পূর্বে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। খেলাফতের দায়িত্বে আসার পর ব্যবসা-বাণিজ্য তিনি আর চালাতে পারেননি। বায়তুল মাল থেকে তাঁকে পরামর্শক্রমে কিছু ওজিফা (ভাতা) গ্রহণ করতে হয়েছে। যা পরিবার-পরিজনের লালন-পালনের জন্য প্রয়োজন ছিলো। মৃত্যু শিয়রে এ ওজিফার কথাও তার মনে উদয় হলো। তিনি তার আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে এনে বলে দিলেন, খেলাফতের দায়িত্বে থাকাকালে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যে ভাতা গ্রহণ করেছি তা যেনো তথায় ফেরত দেয়া হয়। এ কাজ করার জন্য তারা আমার অমুক খণ্ড জমি বিক্রি করে তার মূল্যই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দেবে। বস্তুত তাঁর মৃত্যুর পর ওসিয়াত অনুযায়ী তাই করা হয়েছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হেদায়াত অনুযায়ী ভাতার সে অংক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবার সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অশ্রু আপ্লুত নেত্রে বললেন ঃ

> "আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর রহম করুন। তিনি চাইতেন তাঁর মৃত্যুর পর কেউ যেনো তার উপর কোনো কথা বলার সুযোগ না পায়।"

একটি বর্ণনায় একথাও উল্লেখ হয়েছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ওসিয়াত অনুযায়ী তার নিকটাত্মীয়রা বাইতুলমাল থেকে গ্রহণ করা অংশ ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে ফেরত দিতে গেলে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ

www.pathagar.com

"তাঁর পরে আমি আমীর নিযুক্ত হয়েছি। আর ভাতার এ অংক আমি তোমাদেরকে ফেরত দিলাম।"

এ প্রসঙ্গে তৃতীয় বর্ণনা হলো, মৃত্যুর সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দিনার বা দিরহামও রেখে যাননি।

পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে তিনি একটি গোলাম, একটি উট, একটি মখমলের চাদর রেখে যান। এর সর্বসাকুল্যে মূল্য ছিলো পাঁচ দিরহাম। মৃত্যুর পর এসব জিনিস ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য তিনি ওসিয়াত করে গেছেন। ওসিয়াত অনুযায়ী এসব জিনিস ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছলে তিনি কেঁদে ফেলে বললেন ঃ

"আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্থলাভিষিক্তের উপর একটি ভারী বোঝা চাপিয়ে গেলেন।"

এ বর্ণনার বিশুদ্ধতার উপর আমার সন্দেহ আছে। কেননা এর বিপরীত অনেক বর্ণনা থেকে মনে হয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বল্প হলেও কিছু না কিছু সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য পরিত্যক্ত এক-পঞ্চমাংশ ওসিয়াত করে গেছেন। তিনি বলেছেন, গানিমাতের সম্পদ থেকে যেমন রাষ্ট্র এক-পঞ্চমাংশ পায় এভাবে আমার আত্মীয়-স্বজনদের আমার সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ পাওয়া উচিত। এক-পঞ্চমাংশের পরিবর্তে এক- চতুর্থাংশ ওসিয়াত করার জন্য কেউ কেউ তাকে বললে উত্তরে তিনি বললেন, "আপনজনদের জন্য পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ ছেড়ে যেতে কার মন না চায়। কিন্তু আল্লাহর হক হবে সকলের আগে। আমি যদি এক-পঞ্চমাংশের জায়গায় এক-চতুর্থাংশের ওসিয়াত করে যাই, তাহলে তোমরা বলবে, তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করুন। আর যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করে, সে আল্লাহর জন্য কিছু রেখে যায় না।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি কোনো সম্পদ ছেড়ে না যাবেন এবং আয়েশার বর্ণিত এ হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া হয়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দিনার ও দিরহাম রেখে যাননি, তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক-পঞ্চমাংশ সম্পত্তির ওসিয়াত করলেন কিভাবে ? ওসিয়াত তো সে ব্যক্তিই করতে পারেন যার কাছে সম্পদ আছে। সে সম্পদ বেশী হোক কি কম হোক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। এ জমি ঠিকঠাক করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাতে বৃক্ষরোপণ করলেন। অতপর এ ভূমিখণ্ড তিনি হযরত আয়েশাকে দান করেছিলেন। মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন ঃ

"হে আমার কন্যা ! আমার পরে তোমরা আর্থিক দৈন্যতায় পড়ো—এ আমি মোটেই চাই না। আমি চাই তোমরা স্বাচ্ছন্দে বসবাস করো। কিন্তু এরপরও আমি তোমাকে যে ভূখণ্ডটি দিয়েছি তা যদি তুমি আমাকে ফেরত দাও, তাহলে

www.pathagar.com

আমি মিরাসী আইন অনুযায়ী তা তোমার ভাই-বোনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবো।"

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শুধু আর একটি বোন ছিলো। তিনি 'বোনদের মধ্যে' কথার অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। তিনি পিতার কাছে একথার ব্যাখ্যা চাইলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—তোমার বিমাতা হাবিবা বিনতে খারিজা সন্তান সম্ভাবা। আমার মনে হচ্ছে সে কন্যা সন্তান জন্ম দেবে।

এ বর্ণনাটিও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিত্যক্ত সম্পদ থাকার প্রমাণ।

কাফন-দাফনের ওসিয়াত

কাফন-দাফনের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ারিসদেরকে ওসিয়াত করেছিলেন। তাঁকে দু' কাপড়ে কাফন দেবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাধারণত দু' কাপড়েই কাফন পরানো হয়। কেননা নতুন কাপড় ব্যবহার করার অধিকার জীবন্ত মানুষের।[১] গোসল দেবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন আসমা বিনতে ওমাইসকে। যদি সে একা এ কাজ করতে না পারে তাহলে তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকেও সাথে নেবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাফন কাফনের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন এ সময় মুসান্না ইরাক থেকে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত প্রার্থী হলেন। অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়েও তিনি তাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকলেন। ধর্মত্যাগ করে আবার যারা অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইরাকের অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের ইসলামী সেনাবাহিনীতে যুক্ত করার জন্য মুসান্না তাঁর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে এনে বললেন—সিরিয়ার পূর্বে মুসান্নার সাহায্যে বাহিনী পাঠিয়ে দিও। আমার মৃত্যু যেনো তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত না রাখে।

---

১. দাফন-কাফনের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা আছে, সবগুলো বর্ণনাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনা এমনও আছে, তিনি একটি কাপড় পরিধান করে থাকতেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর এ কাপড়টি ধুয়ে আরো দু'টি নতুন কাপড় এর সাথে মিলিয়ে আমাকে কাফন দেবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একথা শুনে আমি বললাম, আমরা নতুন তিনটি কাপড় নিতে অসুবিধা কি? তখন তিনি বললেন, না, হে আমার কন্যা! মৃত লোকের শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ বেরুলে যেনো কাপড় তা শোষে নেয় সে জন্যই কাপড় ব্যবহার করা হয়। নতুন কাপড় ব্যবহার করার অধিকার জীবিত লোকের বেশী। আর একটি বর্ণনায় আছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতটি কাপড়ে কাফন করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বললেন, তিন কাপড়ে। তিনি বললেন, আমার এ দু'টো কাপড় ধুয়ে রাখবে। এর সাথে আর একটি নতুন কাপড় মিলিয়ে আমাকে কাফন দেবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আব্বাজান আপনাকে নতুন কাপড়ে কাফন করাবার সামর্থ আমাদের আছে। তখন তিনি বলেন, হে আমার কন্যা! জীবিত ব্যক্তি নতুন কাপড় ব্যবহারের অধিকারী। পুঁজ ইত্যাদি শোষে নেবার জন্যই তো কাপড় ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আরো বর্ণনা আছে। এসব বর্ণনা ইবনে সায়াদে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইন্তেকাল

মৃত্যু যাতনা সময় তাঁর কন্যা আশেয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা তাঁর পাশেই বসেছিলেন। পিতার এ অবস্থা দেখে হাতেমের এ কবিতাটি পড়লেন ঃ

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى . اذا حشرجت يومًا وضاق بها صدر

"মৃত্যু যাতনা যখন শুরু হয় আর নিঃশ্বাস বের না হবার কারণে যখন সিনা ও হাটুর সাথে লেগে যায়, তখন ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসে না।"

এ কবিতা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাগ হয়ে বললেন, হে কন্যা ! বরং তুমি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করো ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ .

"মৃত্যু যাতনা শুরু হয়েছে। এটা হলো এমন এক সময় যে সময়কে তোমরা ভয় পাও।"

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রূহ পিঞ্জর হতে উড়ে চলে গেলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা তার শিয়রে বসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।

وكل ذى غيبة يؤوب   وغائب الموت لايؤوب .

"প্রত্যেক চলে যাওয়া ব্যক্তির ফিরে আশার প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ফিরে আসার প্রত্যাশা করা যায় না মৃত্যু যাকে সাথে করে নিয়ে গেছে।"

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, এ কবিতাটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজে আবৃত্তি করেছেন। সবশেষে যে কথাটি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা ছিলো ঃ

رب توفنى مسلما والحقنى بالصالحين .

"হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে মুসলিম থাকা অবস্থায় মৃত্যু দান করো। আর মৃত্যুর পর পর সালেহীনদের সাথে আমাকে স্থান দাও।"

১৩ হিজরীর ২১শে জমাদিউল উখরা মুতাবেক ২২ আগষ্ট ৬৩৪ ইংরেজী সোমবার সূর্য অস্ত যাবার পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইন্তেকাল করেন। সে রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো তেষট্টি বছর। ওসিয়াত অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাকে গোসল করান। তাঁর ছেলে আবদুর রহমান তাঁর গায়ে পানি ঢেলে দেন। এরপর তার মৃত দেহ ঐ খাটে করেই মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে খাটে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ কবরে নামানো হয়েছিলো।

মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের মাজার ও মেম্বরের মধ্যে তার জানাযাহ রাখা হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নামাযে জানাযাহ

www.pathagar.com

পড়ান। এরপর তাঁর মৃতদেহ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে তাঁর জন্য কবর তৈরি করে রাখা হয়েছিলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লাশের সাথে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু হুজরায় প্রবেশ করতে চাইলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "জায়গা নেই।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধ বরাবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা রেখে তাঁকে দাফন করা হয়। দাফন শেষে শোকের ছায়া ও অশ্রুসজল নয়নে সকলে হুজরা হতে বেরিয়ে এলেন। খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছেড়ে এলেন। সারা জীবন এ দু'জন এক সাথে রয়েছেন। মৃত্যুর পরেও এ বন্ধুত্ব ছিন্ন হলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় খাদেম তাঁরই মুনিবের কাছে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে গোটা মদীনা থর থর করে কেঁপে উঠলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় ব্যথা বেদনার যে করুন ছায়া নেমে এসেছিলো তার দৃশ্য আবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময়ও দেখা গেলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রন্দনরত অবস্থায় এসে দরযায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ

"হে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ! তোমার উপর আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর শপথ ! তুমিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। ঈমান ও ইখলাসে তোমার সমকক্ষ কেউ ছিলো না। সরলতা ও ভালোবাসায় তোমার চেয়ে অগ্রসর কেউ ছিলো না। চরিত্র, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও মর্যাদার দিক দিয়ে তোমার দ্বিতীয় কিউ ছিলো না। ইসলাম ও মুসলমানদের যে খেদমত তুমি আঞ্জাম দিয়েছো, রাসূলের বন্ধুত্বে যেভাবে তুমি অবিচল ছিলে, তার পরিণাম আল্লাহই তোমাকে দান করবেন। গোটা জাতি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করায় উঠে পড়ে লেগেছিলো, সে সময় তুমি তার দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিলে। গোটা জাতি যখন তাঁকে নির্যাতন করেছিলো, তুমি তাকে হেফাজত করেছো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় যখন কেউ কর্ণপাত করছিলো না, সে সময় তুমি তাঁর সাথে মিলে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছো। তোমাকে আল্লাহ তাঁর কিতাবে সিদ্দীক আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত বলা হয়েছে ঃ

والذى جاء بالصدق وصدق به .

'হে কাফেরেরা ! সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করো যিনি তোমাদের কাছে সততা ও দৃঢ় ঈমানের সাথে কথাবার্তা বলতে এসেছেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম) আর তাঁর দিকেও তাকাও যে একথাগুলোকে বিশ্বাস করে (আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু)' আল্লাহর কসম তুমি ছিলে ইসলামের অলংকার। কাফেরদের কাছে তোমার অস্তিত্ব ছিলো কষ্টকর। তোমার সব দলিলই ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। তোমার দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনা বুঝার শক্তি ছিলো অপরিসীম। তোমার স্বভাব প্রকৃতিতে কোনো দুর্বলতার লেশমাত্রও ছিলো না। তুমি ছিলে একটি পাহাড়ের মতো অটল অবিচল। কোনো ঝড়ই এ পাহাড়কে স্বীয় স্থান থেকে টলাতে পারেনি। অবয়ব গঠনের দিক দিয়ে তোমাকে দুর্বল বলে মনে হতো। দীনের দিক দিয়েও তোমার চেয়ে শক্তিশালী কেউ ছিলো না। কিন্তু তুমি তোমার নিজকে খুব নগণ্য মনে করতে অথচ আল্লাহর দরবারে তোমার মর্যাদা ছিলো অনেক উচ্চে। দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিতে তুমি সত্যিকারে একজন মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলে। আর মু'মিনদের চোখে তুমি ছিলে অপরিসীম মর্যাদার মালিক। লোভ লালসা, আত্মস্বার্থ তোমার ধারে কাছেও ঘেষতে পারতো না। প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি তোমার কাছে ঐ সময় পর্যন্ত শক্তিশালী ছিলো এবং প্রত্যেক শক্তিশালী মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শক্তিশালী ব্যক্তি হতে দুর্বলের হক আদায় করে তার কাছে ফিরিয়ে না দিয়েছো। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেনো আমাদেরকে তোমার নেক কাজের বিনিময় হতে বঞ্চিত না রাখেন এবং আমাদেরকে তোমার পরে বন্ধু ও সাহায্যকারী বিহীন না করেন। বরং আমাদের উপায় অবলম্বন হিসাবে কোনো না কোনো উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেন ঃ

"হে প্রিয় পিতা ! আল্লাহ আপনার চেহারাকে চির উজ্জ্বল রাখুন। ইসলামকে জরাজীর্ণতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রাম-সাধনা আপনি করেছেন, তার উত্তম বিনিময় আল্লাহ আপনাকে দান করুন। আপনি এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে একে বঞ্চিত করেছেন। আর ভাগ্যবান করেছেন আপনাকে সমর্পণ করে আখেরাতকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আপনার মৃত্যু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বিধুর ঘটনা। আল্লাহ পাক তাঁর কালামে পাকে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার হুকুম দিয়েছেন। আর এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। এজন্য আমরা আপনার তিরোধানে ধৈর্য ধারণ করলাম। আমরা আল্লাহর কাছে এ পুরস্কারের প্রত্যাশী যা তিনি ধৈর্য ধারণ করার বিনিময়ে দান করে থাকেন। আপনার উপর আল্লাহ তাঁর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু ব্যথায় ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে কথা সরছিলো না। মৃত্যুর পর তিনি যখন হুজরায় প্রবেশ করলেন, তখন শুধু একথাগুলো তাঁর মুখ থেকে বের হলো ঃ

"হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা ! তোমার মৃত্যু জাতিকে এক ঘোর দুর্দিনে ফেলে দিলো। আমরা তো তোমার ধারে কাছেও পৌছতে পারবো না। তোমার সমমর্যাদা কিভাবে পাবো ?"

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু সংবাদ মদীনার বাইরের গোত্রগুলোর কাছে ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার ভয়াবহতায় দরদ মাখা এমন কোনো চোখ বাকী ছিলো না যা অশ্রুজলে ভরে উঠেনি। মক্কায় এ খবর পৌছলে, সেখানেও চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। সবদিকে কান্নার রোল পড়ে গেলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা আবু কোহাফা তখনো বেঁচে ছিলেন। চারিদিকের কান্নার রোল শুনে তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, আপনার ছেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি শোকে ব্যথায় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আর কোনো কথা বলেননি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরিত্যক্ত সম্পদের পিতার অংশ তার কাছে পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ

"এ সম্পদ আমার চেয়ে তার সন্তানরাই পাবার বেশী হকদার।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর পর তাঁর পিতা বেশী দিন বেঁচে থাকেননি। এ বেদনা বিধুর ঘটনার ব্যথা তিনি সহ্য করতে পারেননি। ছয় মাস পর তিনিও ইন্তেকাল করলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম যথাযথভাবেই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তিনি ইসলামের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যে বিপদ ও মুস্কিল সহ্য করেছিলেন এবং যেভাবে তিনি তাঁর নিজেকে এর খেদমতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তার কোনো নজির নেই। তিনি তাঁর পবিত্র নমুনা দিয়ে অন্য মুসলমানদের হৃদয়েও দীনের জন্য উদ্গ্রীবতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যে কোনো কঠোরতা ও বিপদ উপেক্ষা করে তিনি ঈমান, স্থির চিত্ততা ও দৃঢ় মনোবলের সাথে কাজ করে ইসলামকে সম্ভাব্য সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নিজের জীবন সপে দিতেও তিনি পরওয়া করেননি। প্রথম খলিফার যুগে আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। আর তারা এ পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। খলিফার ঈমান, দৃঢ়তা এবং মুসলমানদের দুর্জেয় সাহস ও হিম্মতের বদৌলতে ইসলাম আরবের সীমারেখা হতে বেরিয়ে রোম ও ইরানী দখলকৃত জায়গার দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাধ্যমে আল্লাহ যে কাজ করাতে চেয়েছেন তা সব পূর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁকে তার কাছে ডেকে নিয়েছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদি ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নিযুক্ত না করতেন, তাহলে ফল কি হতো তা বলা যায় না। খেলাফতের মসনদে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিযুক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবদানসমূহের শেষ কীর্তি। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতো সঠিক মানুষের সঠিকস্থলে নিযুক্তির কারণেই ইসলাম উন্নতির শেষ শিখরে পৌছেছিলো। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইসলামের যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিলো তা দেখলে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে, ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিযুক্তি ছিলো আল্লাহর

www.pathagar.com

তরফ থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দান করা ইচ্ছা শক্তি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবান দিয়ে আল্লাহ পাক এ কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

নিসন্দেহে একথা সত্য যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঐ সম্মানিত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব যারা নিজেদেরকে পার্থিব উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন ছিলো। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো এক অর্থাৎ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর কালেমা উড্ডিন করা। উভয় ব্যক্তির জীবনের এসব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আপন আপন জীবন একেবারেই ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর উভয়েই অত্যন্ত সফলতা লাভ করে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় নিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর রহম করুন। এ দুনিয়ার মতো বেহেশতেও তিনি তাঁকে অগণিত মেহেরবানী নসীব করে তার মাহবুব মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জায়গা দান করুন। আমীন।

---

www.pathagar.com

শেষকথা

এ গ্রন্থের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার কার্যক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মানুষের বিবেক বিস্মিত হয়ে পড়ে। যারা এ গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিরাট কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন, তা পাঠ করেছেন তারা আমার কথা অবশ্যই স্বীকার করবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের এ ইতিহাস গবেষণার এক প্রাণকেন্দ্র। এ ইতিহাস পাঠ করলে জাতির উত্থান-পতনের সুস্পষ্ট চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

এ সময় বিশ্বে বিরাট শক্তি সম্পন্ন দু'টি রাষ্ট্র ছিলো। এর একটি পাশ্চাত্য সভ্যতা, কৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতাকাবাহী ছিলো। আর অপরটি ছিলো প্রাচ্যের সভ্যতা, কৃষ্টি, বিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক। রোম সাম্রাজ্য ছিলো ল্যাটিনী, ইউনানী, ফাইনিকি ও ফেরাউনী সভ্যতা ও প্রভাবের উৎপত্তি স্থান। আর ইরান ছিলো ইরানী ও হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন এবং দূর প্রাচ্যের ধর্মসমূহের নকসা বহনকারী। প্রথমোক্ত সাম্রাজ্য মধ্য ইউরোপে এবং তার চেয়ে আগে রোম সাগরের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো। শেষোক্ত সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া হতে শুরু করে দাজলা ফোরাতের লম্বা-চওড়া ময়দান পরিবেষ্টন করে রেখেছিলো। এ দু'টি বিরাট সাম্রাজ্যের মাঝখানে ছিলো গাছ-পালাহীন এক ভয়াবহ মরুভূমি। এ মরুভূমিকে 'সিরিয়া মরুভূমি' বলা হয়ে থাকে। এখানে বাস করতো বেদুঈন জাতি। এরা আরব বদ্বীপ থেকে বের হয়ে রোম ও ইরান সীমান্তে এসে বসবাস করতো। এ দু'টো বিরাট ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য কখনো নিশ্চিন্তে বসে থাকতো না। বরং সবসময় তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের মহড়া দেখাতো। শতাব্দির পর শতাব্দি তাদের মধ্যে এ অবস্থা বিরাজিত ছিলো। বিশ্বে তাদের প্রতাপ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা কূট-কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো কাজ তাদের ছিলো না।

দারিদ্র্য বা অভাব-অনটনের জন্য তারা পরস্পর এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ বা একে অপরের এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী ছিলো না। বরং তারা অত্যন্ত সচ্ছল ও ঐশ্বর্যের মালিক ছিলো। শস্য-শ্যামল অঞ্চল ও সোনা উৎপাদনশীল ভূখণ্ড তাদের দখলে ছিলো। সবরকমের শিল্প এসব দেশে দিন দিন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার উৎস চারিদিকে জারী ছিলো। মোটকথা এ দু'টো দেশে কোনো জিনিসেরই অভাব ছিলো না। ওখানকার অধিবাসীগণ সবরকমের ঐশ্বর্য্যেরই মালিক ছিলো। অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয় রাষ্ট্রই মনে করতো, এসব ঐশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাস সামগ্রীর তারা একাই অধিকারী। এ মানসিকতার কারণেই একে অপরের ঐশ্বর্য্য ও বিত্তবৈভব দখল ও লুটপাট করার জন্য

www.pathagar.com

উদগ্রীব থাকতো। একে কোনো অপরাধজনক কাজ বলে তারা মনে করতো না। বরং তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করতো।

এ কারণেই এ দু'টি রাষ্ট্র একাধারে সাতশ' বছর পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলো। কখনো একটি সাম্রাজ্য বিজয় লাভ করতো আবার কখনো অন্য সাম্রাজ্য আনন্দের ঢাকঢোল বাজিয়ে অপরের এলাকা দখল করে নিতো। কিন্তু জয় পরাজয়ের এ ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতির হৃদয় থেকে তাদের ভীতি হ্রাস পেতো না। কারণ, তারা বুঝতো, আজ যে পক্ষ কোনো দুর্বলতার কারণে পরাজিত হয়েছে। তারা আবার এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ও তাদের প্রাধান্য প্রমাণ করার আগে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না। আজ যারা বিজয়ী, তারা আগামীকাল পরাজিত হবে। আর যারা আজ পরাজিত তারা আগামীকাল বিজয়ী। জয় পরাজয়ের এ ধারা পালাক্রমে চলে আসছে।

এ কালে যখন সব জায়গায় এ দু'টি সাম্রাজ্যের খ্যাতি উন্নতির শীর্ষে ছিলো। তাদের সমৃদ্ধির ডঙ্কা চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিলো। ঠিক সে সময় আরব ভূখণ্ড হতে একটি অখ্যাত ও অসভ্য জাতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দেখতে না দেখতেই তারা এক-চতুর্থাংশ আবাসস্থলে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা এমন এক আকস্মিক ঘটনা, এর রহস্য কোথায়, তা কেউ টেরও করতে পারেনি। আরবের এ কঠিন মরুভূখণ্ড হতে এমন এক জাতির জন্ম হতে পারে যারা ইরান ও রোমক শক্তির শত শত বছরের তামাদ্দুন-তাহজীবকে এত অল্প সময়ে ধূলিস্মাত করে দিতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কে ধারণা করতে পেরেছিলো যে, এ ভূখণ্ড হতে তাহজীব ও তামাদ্দুনের সূতা ছিড়ে যেতে পারে ? সূতা ছিড়ে যাওয়া তো বড় কথা—ওখান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো হালকা কিরণ ও আলোকরশ্মি বিতরণ করতে পারে—যার বাসিন্দাগণ কেসরা শাহে ফারেসের কাছে উট আর ছাগের রাখালের চেয়ে বেশী কিছু নয়। বরং কায়সারে রোম ভুখানাংগা অভিহিত করে যাদেরকে লাঞ্ছিত ও হীন মনে করতো—এ ভুখানাংগা ও মেষপালক রাখালের দল, যাদের প্রতি ইরান ও রোমবাসী তাচ্ছিল্যের কারণে চোখ উঠিয়ে দেখতেও অপসন্দ করতো—তারা আজ এমন বংশদর জন্ম দিতে পারলো—যারা কিসরা ও কায়সারের সাম্রাজ্যকে সমূলে উৎপাটন করে দিতে পারে ?

এসবই বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐ জাতি অপরিসীম দূরবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আরব ভূখণ্ড হতে বেরিয়ে এসে কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো। ঐ পর্যন্ত তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করেনি, যতদিন পর্যন্ত তারা এ পরাশক্তির আলোকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিয়েছে। পাঠকগণ এ গ্রন্থটি পাঠ করে নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আরবগণ এসব শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উপর সমরোপকরণ ও সংখ্যাধিক্যের দ্বারা বিজয় লাভ করেনি। বরং দৃঢ় মনোবল ও অজেয় ইচ্ছাশক্তি—সর্বোপরি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই তাদেরকে সফলতার মঞ্জিলে পৌছিয়ে দিয়েছে। এ ঈমান ও ইয়াকিনের দ্বারাই তারা একটি

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করতে পেরেছেন—যা একাধারে দশ শতক পর্যন্ত বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিলো। এ আলোকরশ্মিই ইউরোপ- বাসীকেও আলোকিত করেছে। তাদেরকে অন্ধকারের গহীন গহ্বর থেকে উদ্ধার করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ দেখিয়েছে। যার বদৌলতে তারা আজ উন্নত। ইসলাম তার সীমারেখাকে শুধু ইরান ও সিরিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং সে এশিয়া-হিন্দুস্তান, চীন, তুরস্ক, আফ্রিকা-মিসর, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, ইউরোপ, রুশ, ইতালি এবং হাসপানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এসব এলাকার তৃষ্ণিত প্রাণ ঠাণ্ডা করেছে।

এ অলৌকিক ঘটনা কিভাবে ঘটলো এবং তামাদ্দুন-তাহজীব, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত এবং অবহেলিত আরবরা স্বল্প আয় ও স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ইরান ও রোমের মতো একটি সভ্য জাতির উপরে বিজয় লাভ করলো ? এসব কি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে ? না, অবশ্যই না। ইসলামের এ বিজয় আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। যার দৃষ্টান্ত বিশ্বে মেলা অসম্ভব। যদি মনে করাও হয় যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কিছু ঘটনার কারণে এ অনুপম কামিয়াবী লাভ হয়েছে। তাহলে এর ফলাফল অবশ্যই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু আমরা দেখেছি বিজয়ের এ ধারাবাহিকতা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও অব্যাহত ছিলো। ইরান ও রোমের মুকাবিলায় মুসলমানরা প্রতিদিনই বিজয় লাভ করেই চলছিলো। কোনো ব্যক্তিই তাদের রুখে রাখতে পারেনি। কাজেই ঘটনাক্রমে এ বিজয় লাভ হয়েছে বলে প্রকৃত কারণ হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা যায় না।

গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে যে, সে সময় যা কিছু সংঘটিত হয়েছিলো তা তৎকালীন বিরাজিত অবস্থার দাবী অনুযায়ীই হয়েছিলো। ব্যক্তির যেভাবে অবনতি ঘটে থাকে ঠিক সেভাবে একটি জাতিরও অবনতি ঘটে থাকে। আর যে জাতি পতনের যুগে এসে পৌঁছে, তখন তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ফলে সে জাতির জীবনীশক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এ সময় এ অবনতিশীল জাতির জায়গা দখল করার জন্য আর একটি নতুন জাতি এসে দাঁড়ায়। তারা পূর্ব সভ্যতাকে বদলিয়ে নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়।

এ গ্রন্থে প্রথমেও কয়েকবার বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলার ঐসব কারণগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। যা বারবার পারস্য ও রোমে সংঘটিত হয়েছিলো। ইংরেজী ষষ্ঠ শতকে এসব কারণ আরো বেড়ে গেলো। পারস্যে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ চরমে গিয়ে পৌঁছলো। সে সময় পারস্যের সর্বত্রই আইন-শৃংঙ্খলার অবনতি ও নানা বিশৃংঙ্খলার প্লাবণ বইছিলো। সিংহাসনের বিভিন্ন দাবিদার দেখা দিতে লাগলো। এ সমস্যার প্রতিক্রিয়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা দিতে লাগলো। সকলেই আত্মস্বার্থের পেছনে ছুটতে লাগলো। জাতির মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হলো। গোষ্ঠীগত মনোভাব গড়ে উঠতে লাগলো। বিভিন্ন বিবাদ বিসম্বাদ জন্ম দিতে লাগলো। মানুষের

www.pathagar.com

আকীদা-বিশ্বাসও নড়বড়ে হয়ে উঠলো। আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের স্থলে জাতীয়তার বিষ বাষ্প ছড়াতে শুরু হলো। তাই যে কেউই ক্ষমতায় এসে বসতো বিপক্ষ দলকে নিষ্পেষণ করতো। তাদের সকল প্রকার আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত করে সবকিছুই নিজের জন্য কুক্ষিগত করে রাখতো। সেখানে এমন একটি জাতি গড়ে উঠে যারা আল্লাহর নেয়ামতের মূল্যায়ণ করতে পারে। রোমের অবস্থাও ইরানের চেয়ে কোনোদিক থেকে কম ছিলো না। ধর্মীয় গণ্ডগোল, ক্ষমতা দখলের পালা ওখানেও জারী ছিলো। বিভিন্ন ঈসায়ী ফেরকার মধ্যে অসংখ্য মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেক ফেরকাই নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাসকে অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইতো। ক্ষমতালাভের স্পৃহা নেতাদেরকে অস্থির করে রাখতো। ক্ষমতার দণ্ড হাতে নেবার জন্য খুনাখুনি ও যুদ্ধ বিগ্রহের ধারা জারি ছিলো। ফলে সেখানেও নানা দুর্বলতা ও অবনতির উপকরণ দেখা দিতে লাগলো। এ সময় জাষ্টিনাইন যদিও দূরদৃষ্টি, প্রভাব প্রতিপত্তি, ন্যায় ও ইনসাফ এবং শক্তির দ্বারা রোম সাম্রাজ্যের আধমরা অবস্থার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু চারিদিকের সব রোগ সারিয়ে উঠতে সক্ষম হননি। তার উত্তরাধিকারদের সময়ে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো। তাদের মধ্যে দূরদৃষ্টি ছিলো না। ছিলো না কোনো কলা-কৌশল। তাদের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তিও অবশিষ্ট ছিলো না। আর না ছিলো কোনো শক্তি, যার উপর নির্ভর করে অধঃপতিত রাষ্ট্রকে তারা উদ্ধার করতে পারে। সপ্তম হিজরী সনের প্রথম দিকে 'ফুকাস' ক্ষমতা দখল করেন। ডাণ্ডার জোরে তিনি দেশ শাসন করতে লাগলেন। তিনি কিন্তু বেশীদিন টিকে থাকতে পারলেন না। কিছু দিন পরই আফ্রিকার দখলকৃত অঞ্চলের শাসক হিরাকল ফুকাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে হত্যা করে রোম সিংহাসন দখল করে নিলেন। ফুকাসের জীবনের শেষ ভাগে ও হিরাকলের শাসনামলের প্রথম দিকে রোমের দুর্বলতার সুযোগে ইরানীগণ রোমের অনেক জায়গা দখল করে নিয়েছিলো। হিরাকলের শাসনের ভিত্তি মযবুত হলে তিনি ইরান অধিকৃত স্থানগুলোকে পুনর্দখলের চেষ্টা চালাতে শুরু করেন। সুতরাং আর একবার ইরান ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলো। কিন্তু সফলতা লাভ করলো রোমকগণ। হিরাকল তার দেশের অধিকৃত জায়গাগুলো ইরানের দখল থেকে মুক্ত করে নিলো। এভাবে হিরাকলের শক্তি, সাহস ও ক্ষমতা বেড়ে যেতে লাগলো। মানুষেরা মনে করতে লাগলো—এই বুঝি জাষ্টিনাইন শাসনামল টুটে গেলো।

বৈদেশিক শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করার পর হিরাকল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মযবুত করতে চাইলেন। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা ছিলো অনৈক্য ও সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের পারস্পরিক শত্রুতা। ঈসায়ী সম্প্রদায় বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। এক এক ফেরকা ছিলো অন্য ফেরকার ঘোর শত্রু। হিরাকল এ বাধা দূর করে ধর্মীয় মতভেদ মিটিয়ে ফেলে সকল নাগরিককে একটি ধর্মে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলো তাতে সকল ফেরকার লোকেরাই তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। তারা মনে করলো হিরাকল তাদের ফেরকা ও ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে

www.pathagar.com

শক্তি প্রয়োগ করে সকলকে তার নিজের ফেরকার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তাই তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো এবং গোটা দেশ ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এভাবে যে ধর্ম পদ্ধতিকে অবলম্বন করে হিরাকল সাম্রাজ্যের বন্ধনকে দৃঢ় করবে ভেবেছিলো, তা সাম্রাজ্যকে আরো দুর্বল করে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

এসব কারণেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দু'টো রাষ্ট্র উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার পর অবশেষে অবনতি ও দুর্বলতার অতল তলে নেমে গেলো। কালের আবর্তনের ধারা অনুযায়ী এতবড়ো শক্তিশালী জাতির স্থলে উদ্যম-উদ্দীপনা সহকারে একটি জাতি এসে দাঁড়ালো যারা বিস্ময়কর কর্ম স্রোতের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। উত্থান-পতনের স্বাভাবিক নিয়ামানুযায়ী এ নতুন জাতির ভাগ্যলিপিতে উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার ক্রমধারা ততদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিলো যতদিন তারা প্রকৃতই আল্লাহর হুকুমবরদারির বাহক ছিলো আর তাঁর হুকুমবরদারির মধ্যেই নিজেদের মুক্তির উপায়-উপকরণ নিহিত আছে বলে মনে করতো।

মানুষের আযাদী ও স্বাধিকার হারিয়ে যাওয়া তার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দুঃখ-কষ্ট হতেও অধিক পীড়াদায়ক। স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের উপর শর্ত আরোপ হওয়া, মুক্ত মনকে গলাটিপে ধরার মতো আইন-কানুন মানুষের মন-মানসিকতার উপর একটা অচল অস্থিরতার ভাব সৃষ্টি করে। এতে মানুষ মুক্ত মনে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা খুইয়ে বসে। স্বভাব প্রকৃতিতে সজীবতা ও সচেতনতা অবশিষ্ট থাকে না। নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। জাতির লোকজন যখন দেখে দেশে তাদের আযাদী ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাদের চিন্তা- চেতনায়, আকীদা-আমলে শর্ত আরোপ করা হচ্ছে, তখন তাদের মন-মগজে বিদ্রোহমূলক চিন্তা-ভাবনা অবিরত তোলপাড় করতে শুরু করে। বিদ্রোহাত্মক মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন তারা সম্ভাব্য সবরকম বৈধ অবৈধ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, যখন কোনো জাতির স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার উপর শর্ত আরোপ করা হয় এবং মানুষের মন-মানসিকতাকে স্থবির করে দিয়ে তাকে তার নিজস্ব যোগ্যতা প্রকাশ করতে দেয়া না হয়, তখনই তার অবনতি শুরু হয়। উন্নয়নের ধারা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার দরযা যখন উন্মুক্ত থাকে, মানুষ যখন স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন শুধু তখনই সম্ভব হয়। বিশ্ব উন্নয়নের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, সৃষ্টির প্রথম থেকে মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির মূল রহস্য নিহিত ছিলো মুক্ত চিন্তার ও স্বাধীন কর্মধারার উপর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বনে-জঙ্গলের গুহায় বসবাস করতো। দিনরাত বন্য জন্তু জানোয়ারের সাথে মুকাবিলা করে তারা টিকে থাকতে পেরেছে। কারণ, তারা মুক্ত চিন্তার ধারক হবার কারণে এমন এমন অস্ত্র বানাতে সক্ষম হয়েছে যা এসব হিংস্র পশুর মুকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এরপর মানব গোষ্ঠীর প্রথম দল যখন এসব বন-জঙ্গলের গুহা-গহ্বর হতে বের হয়ে নীল নদের কূলে বসতিস্থাপন

www.pathagar.com

করলো এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বে তাহজীব-তামাদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করলো তখন মানবীয় স্বভাব চরিত্র মানুষকে এমন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করলো যার দরুন শান্তি ও নিরাপত্তা ও স্বাধীন কর্মধারার ভিত্তিস্থাপন করা যায়। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা এমন কিছু মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন তৈরি করলো এবং প্রত্যেক লোকের জন্য এসব নিয়ম-নীতির উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা আবশ্যকীয় বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মানুষ যখন উন্নতির অনেক পথ অতিক্রম করলো এবং নিয়তির আরো অনেক রহস্য তাদের সম্মুখে উদ্ঘাটন হলো তখন মানব মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। মানুষের জন্য জ্ঞান-গবেষণার পথ খুলে গেলো। আর এসব পথের বদৌলতে তারা সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার পর্যন্ত পৌছে গেলো। মানুষ এভাবে কখনো উন্নতির সিঁড়ি পেয়েছে উন্নতি ও অগ্রগতি তখনই তাদের পদ চুম্বন করতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু যখনই মুক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে তখনই অগ্রগতি থেমে গেছে। মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার সাধিত হয়েছে। মানুষ বিশ্বকে জয় করার প্রোগ্রাম রচনা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছে। মোটকথা দ্রুততার সাথে উন্নতির সোপান অতিক্রম করে মানুষ কোথা হতে কোথা গিয়ে পৌছেছে। কিন্তু মানুষের স্বাধীন বিবেক ও চিন্তাচেতনার উপর যখন থেকে শর্ত আরোপিত হতে লাগলো অথবা তারা যখন নিজেরা নিজেদের উপর জ্ঞান-গবেষণার দরযা বন্ধ করে দিলো, তখন মানুষের জয়যাত্রা ও অগ্রগতির ধারা থেমে গেলো। উন্নতি অগ্রগতির পথ হলো রুদ্ধ।

ইরান রোমের অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে যতদিন চিন্তা ও কর্মধারার স্বাধীনতা অব্যাহত ছিলো। তারা উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো। কিন্তু যখন মুক্তচিন্তা লোপ পেলো। মানুষের সামাজিকতার উপর পাহারাদারী বসানো হলো। উন্নতির ধারা নিঃশেষ হয়ে গেলো। ফলে এদের আজিমুশশান তাহজীব ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এ মিটে যাওয়া তাহজীবের স্থানে অন্য আর একটি তাহজীব তার স্থান দখল করা ছিলো অত্যাবশ্যকীয়। আর এ মর্যাদা আদিকাল থেকে আরবদের ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আসছিলো। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর হাতেই এ তাহজীবের ভিত্তি স্থাপন করলেন। আর এ তাহজীব ইরান ও রোমের তাহজীবের স্থান দখল করে বিশ্বে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করে মূর্তিপূজা ও অগ্নীপূজার নিগড়ে আবদ্ধ মানবতাকে এ ভার জিঞ্জির থেকে নাজাত দিলেন। তাদেরকে তিনি দীক্ষা দিলেন, তারা যদি নিজের জন্য উন্নতি অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে চায় তাহলে তার একটি উপায় আছে। আর সে উপায় হলো চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা। আসমান-জমিনের অসংখ্য শক্তি ও জাতিকে জয় করে তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সামনে যে শিক্ষা পেশ করলেন, তা ঐসব লোকের জন্য অসহ্য ছিলো, যারা সরলপ্রাণ জনগণকে ফেসে

www.pathagar.com

তাদের ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস ও রসম রেওয়াজের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছিলো। তাদের অনুসারীরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন পথ অবলম্বন করুক তা তারা কিভাবে সহ্য করতে পারে ? এ জন্য তার বিরুদ্ধে বিরোধিতার এক ঝড় উঠিয়ে দিলো। বছরের পর বছর ধরে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রইলো। আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দৃঢ় সংকল্প দান করা হয়েছিলো। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সাথে এ যুদ্ধের মুকাবিলা করলেন। আর তিনি আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হবার আগ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অবচিল ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত শিক্ষা, অগ্রগতি সাধন করা ও তার সাদাসিধে ও পূত-পবিত্রতার ভিত্তিতে মানুষের হৃদয় মনে স্থায়ী আসন করে নেয়া ছিলো আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। বস্তুত তা-ই হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্বেই ইসলাম আরবের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো। গোটা আরব থেকে মূর্তিপূজারি পরিপূর্ণভাবে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।

শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই নয় বরং প্রত্যেক যুগেই সত্য ও ন্যায়ের আহ্বান উঠার সাথে সাথেই এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে। সত্যের আহ্বানকারীদেরকে বর্বর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। যারা এ আসমানী বিপ্লবের সামনে নিজেদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যেতে দেখেছে, তাদের হাতে সত্যের আহ্বানকারীদের অসীম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সত্য ও অসত্যের মধ্যে এ সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে আজও তা জারী রয়েছে।

তারপরও এ ক্ষেত্রে একটি পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে, মানবীয় হৃদয় এখনো শিশু কালের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। ইংরেজী ষষ্ঠ শতাব্দিতে তার যে অবস্থা ছিলো তা কম বেশ আজও আছে। সে সময় জেনেছে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে স্বাধীনতা, ন্যায়-ইনসাফ, সাম্য আর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। সরল প্রাণ জনগণ সবসময় ন্যায়-ইনসাফ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উচ্চকণ্ঠ দাবিদার নেতৃত্বের পেছনেই ঐক্যবদ্ধ হয়। ভবিষ্যত সুখ লাভের আশায় তারা নেতৃবৃন্দের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ত্যাগ স্বীকারে উদ্দীপ্ত এমন জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সংগ্রাম শেষে গণ মানুষ সঙ্গতভাবেই আশা করে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা হবে। যেসব নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা ও রাখার জন্য তারা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে তা বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু সবসময়ই মানুষকে নিরাশ হতে হয়েছে। অবশেষে তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, এসব নেতৃবৃন্দ জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। অথচ এ কারণে হাজার হাজার লোক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। ন্যায় ও ইনসাফ, মুক্তি ও সাম্যের এসব বুলি সবই ছিলো মিথ্যা। এসব মিথ্যা লোভী নেতারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয়েছে। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই তারা বেশীর ভাগ যুদ্ধে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। আর লাশের স্তুপের উপর দিয়ে নিজেদের জন্য মহল রচনা করেছে।

www.pathagar.com

মানুষের বারবার ধোঁকার শিকারে পরিণত হবার কারণ, যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি, তাহলো মানুষের মন এখনো শিশুসুলভ। শিশুরা যখন চলতে চেষ্টা করে তখন কাঁপতে থাকে আর বারবার মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু এতে তারা দমে যায় না। একবার মাটিতে পড়ে আবার উঠে আবার কেঁপে কেঁপে হাঁটতে থাকে। আবার পড়ে যায়, আবার উঠে। উঠা আর পড়ার এ ধারা জারী থাকে। কিন্তু এ উঠা পড়া ধীরে ধীরে শিশুর চলার পথে ভারসাম্য আনে। অবশেষে একদিন তার চলায় নড়বড় থাকে না। সে একেবারে সোজা হয়ে চলতে শুরু করে। শিশু অবস্থা অতিক্রান্ত করে যৌবনে পৌছে আর যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ জীবনে পদার্পণ করে। যেভাবে শিশু বারবার মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে, আবার উঠে। চলা হতে বিরত থাকে না। আর এ উঠা পড়াতেই তার চলার ভারসাম্য আসে। বিশ্বের জাতিসমূহেরও অবস্থা এ একই রকম। পারস্য আর রোম সাম্রাজ্যের মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়াতে মানবতার উপর এক ধাক্কা এসে লেগেছে। কিন্তু ধাক্কা তাদের জন্য রহমত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এসব আজিমুশশান সুলতানাতের জায়গায় ইসলামী সুলতানাতের রূপ দুনিয়ার জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছে। আর মানব হৃদয় শক্তি লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। ইসলাম এসে মানবতার মান ও মুখ রক্ষা করেছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে, যা দেখে বিশ্ব হতবাক হয়ে গেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ তায়ালা আরব উপদ্বীপকে শেষ নবীর প্রেরণের জন্য কেন বেছে নিলেন এবং এ ভূখণ্ডকে অসীম নূর নাযিল করার জন্য কেন নির্বাচন করলেন।

এ প্রশ্নের সঠিক ও নিশ্চিত জবাব দেয়া তো আমাদের সামর্থের বাইরে। কিন্তু বিশ্বের জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ধারাসমূহের উপর দৃষ্টি করলে আমাদের সামান্য ধারণা হয়, কেন আল্লাহ তায়ালা জাজিরানামায়ে আরবকে এ কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন।

মিসর, ইউনান, আশোরা আর রোমের ভূখণ্ড শত শত বছর থেকে মানব সভ্যতা ও সাংস্কৃতির লীলাভূমি ছিলো। বিশ্বের অন্যান্য অংশে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির যে আলো নজরে পড়ে তা সবই এসব দেশের আলো লাভ করার ফল। এসব এলাকায় মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এত উৎকর্ষ সাধন করেছিলো যে, অন্যান্য দেশের পক্ষে তার মুকাবিলা করা সম্ভব ছিলো না। এ জন্য রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য সে সময় গোটা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু উত্থান-পতনের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী এসব সাম্রাজ্যেও পতন নেমে এলো। শত শত বছর পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, সাংস্কৃতিতে যে দেশ সারা বিশ্বকে আলোকিত করে রেখেছিলো সে দেশ ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করলো। আরব উপদ্বীপ ছিলো ইরান ও রোমের সংলগ্ন দেশ। যেহেতু এসব এলাকা শত শত বছর থেকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিলো। উন্নত চরিত্রের নীতিমালা সম্পন্ন কোনো শিক্ষা তাদের সামনে পেশ করা হয়, তাহলে তারা তা শুধু গ্রহণই করবে না বরং

www.pathagar.com

আগের মতো তা অন্যান্য এলাকায়ও পৌঁছানোর ব্যাপারে সহযোগিতা যোগাবে। ইরান ও রোমের পতনের বিস্তৃত লিখন যেমন তাদের ললাটে লেখা ছিলো, সেখানে একথাও লেখা ছিলো, স্বাধীন ভূমিতে একজন মহা সম্মানীত ব্যক্তিত্ব ভূমিষ্ঠ হবেন। যে ব্যক্তিকে গ্রহণের মধ্যে পৃথিবীর মুক্তি নিহিত থাকবে। এ শিক্ষা আরব থেকে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করবে। তার থেকে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

বস্তুত হয়েছেও তাই। আল্লাহ তাঁর বিধান অনুযায়ী আরব ভূখণ্ডে তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। আর পাঠিয়েছেন ঐ শহরে যা পবিত্রতা ও সম্মানের দিক থেকে গোটা আরবের সকল শত্রুর থেকেই ছিলো স্বতন্ত্র।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে তাদের সামনে মানবতার সর্বোচ্চ সম্মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আরবদের হৃদয় জয় করার পর তিনি ইরান ও রোমের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি তাদের এমন অমূল্য শরীয়াত ও আসমানী শিক্ষার উপর ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন যা প্রত্যেক এলাকার মানুষের জন্য সমানভাবে উপকৃত। প্রত্যেক যুগের চাহিদা পূরণ করার মতো ছিলো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন আল্লাহর কালেমা উড্ডীন করার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। তারপর তিনি এমন একদল বিশ্বস্ত সাহাবা ও পবিত্র অনুরাগী রেখে গেছেন যারা তার মিশন পূরণ করা ও আল্লাহর পয়গাম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য মরণ পণ সংগ্রাম করেছেন।

এ পূত-পবিত্র অনুরাগী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দান করার গৌরব অর্জন করেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে মরণ-পণ সংগ্রামের দ্বারা তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তা মুসলমানরা ভুলতে পারবে না। আল্লাহ প্রেম, রসূল প্রীতি, নিঃস্বার্থ, ইখলাস ও দৃঢ়তার যে নমুনা তিনি পেশ করেছেন তার দৃষ্টান্ত পেশ করা কোনো কালেই সম্ভব হবে না। এসব কাজ প্রমাণ করে, তার আত্মিক মযবুতি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিলো। যদি সকল মানুষের মধ্যে এ ধরনের আত্মিক মযবুতি সৃষ্টি হতো তাহলে যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম নিশানা মিটে যেতো। সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার বন্যা বয়ে যেত্তো।

কিন্তু এখানো সে সময় অনেক দূরে। এটা মানুষের স্বভাব, তারা যখন তাদের পিতৃপুরুষের রীতিনীতি বিরুদ্ধ কোনো কথা বলতে শুনে, তখন তা যতো উপকারী যতো সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন, মানতে ও গ্রহণ করতে চায় না। বরং গোড়ামী দেখায়। পিতৃপুরুষের আকীদা ও রীতিনীতির উপর কায়েম থাকার দৃঢ়তা দেখায়, তা যত হাস্যস্পদ ও যুক্তিহীনই হোক না কেন। এর কারণ হলো, তাদের মানিসকতা উৎকর্ষ সাধনের ঐ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি, যে পর্যায়ে পৌঁছলে 'মযবুত মানসিকতা' বলে আখ্যায়িত করা যায়। যারা মনে করে, তারা শোরগোল করে খান্দানী মান-সম্মান ও ইজ্জতের দোহাই দিয়ে সত্য দীনের দাওয়াতের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে। তারা এমন অবুঝ বালকের মতো, যারা চীৎকার দিয়ে হিচ্‌কী টেনে

www.pathagar.com

পিতামাতার কাছ থেকে তাদের দাবী আদায় করে নেয়। কিন্তু মাতাপিতা যখন দেখে যে সন্তান সীমাতিরিক্ত হঠকারিতা ও বদতমিজি করতে শুরু করেছে তখন তারা তাকে গালমন্দ করে ও ধমক লাগায়। শিশু তখন নিশ্চুপ হয়ে বসে যায়। বস্তুত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীরাও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শোরগোল উঠিয়ে যথেচ্ছা শুরু করে দিয়েছিলো। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে এ বিদ্রোহ সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। যেমন অবাধ্য শিশু কানমলা খেয়ে মুরব্বির কথা শুনতে ও মানতে বাধ্য হয়, তেমনি মুরতাদ গোত্রগুলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধজনিত কার্যক্রমের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ধর্মত্যাগীদের দমনের দ্বারা আরবে ইসলামের জয় জয়কার হলো। আল্লাহ চাই-লেন ইরান ও রোম সাম্রাজ্যকেও ইসলামের সুশীতল বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এ জন্য তিনি শত শত বছর আগ থেকে তার ব্যবস্থাও শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি আরব উপদ্বীপের হাজার হাজার অধিবাসীকে ইরান ও রোমের মধ্যে সিরিয়া ভূমিতে আবাদ করে রেখে তাদেরকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

এসব ঘটনাপঞ্জি থেকে জানা যায়, যে অলৌকিক কাজ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে শুরু হয়েছিলো তা দু'টি পরস্পর শত্রু শক্তির ঝগড়া-বিবাদেরই ফল ছিলো না বরং তা ঐ খোদায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে শুরু করে যা সর্বাবস্থায় পূরণ হবার ছিলো। আর যা পূরণ হবার উপায় আল্লাহ আগ থেকেই যোগাড় করে দিয়েছিলেন। আরব উপদ্বীপ যদি সিরিয়া ও ইরাকের সংলগ্ন না হতো। যদি শত শত বছর থেকে বসবাসকারী সেসব গোত্রের ভাষা আরবী না হতো। যদি ঠিক সে সময়ে আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ না করতেন, যখন এ মাটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য পিপাসার্ত ও বিশ্ব নূরে হকের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলো, তাহলে এ বিশ্বের ইতিহাস অন্য রকম রচিত হতো। না রোমক ও ইরানী সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামী সংস্কৃতি প্রকাশ লাভ করতো আর না হেদায়াতের আলো বিশ্বের দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তো।

খোদায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবার সময় আসলে তার জন্য ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়ে যায়। আর যেসব লোক আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তাদের সুপ্ত প্রতিভা নিজ থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য শাসকবর্গ ও সেনাপতিদের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। ইসলামী সুলতানাতের রূপরেখা তাদের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। কেউ কি একথা চিন্তা করতে পারে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা আরব ভূখণ্ডে একটি বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা কার্যকর করবার ইচ্ছা না করতেন, তাহলেও কি এসব লোক এত বিরাট কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে পারতো, যা ইসলামী বিজয়সমূহের সময় তারা আঞ্জাম দিয়েছেন? যদি

www.pathagar.com

আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর না হতো তাহলে জনসাধারণের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান একজন সাধারণ বণিকের চেয়ে বেশী কিছু হতো না। সর্বাবস্থায়ই যাদের মনে ধন-সম্পদের চিন্তা লেগে থাকে। জাতির মধ্যে তাঁর মর্যাদা 'বনী তিম বিন মাররার সরদারের' চেয়ে বেশী কিছু হতো না। যদি ইসলামের আবির্ভাব না ঘটতো তাহলে খালিদ বিন ওয়ালীদের অবস্থান বনী মাখজুন ও কুরাইশের একজন সাধারণ বাহাদুর ব্যক্তির চেয়ে বেশী কিছু হতো না। ইতিহাসে তার নাম কখনো সেকান্দরে আজম, জুলিয়াস সিজার, রোহিনীপাল, চেঙ্গিস খান, নেপোলীয়ান বোনাপার্টের মতো বিশ্ববিখ্যাত সিপাহসালারদের সাথে গণ্য হতো না। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্ত না হতেন, তাহলে ওমর বিন খাত্তাব কোনো গণনায় আসতেন না। আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে যে অবিস্মরণীয় কীর্তি তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, যেভাবে তিনি ইরান ও রোম সাম্রাজ্যকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়েছেন, তার নাম নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আজ যদি এসব মহতি নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী আসন দখল করে থাকে এবং তাদের অমর কীর্তি উজ্জ্বল তারকার মতো জ্বল জ্বল করে থাকে, তাহলে তা শুধু এ জন্যই যে, এসব লোক ছিলেন ঐ পরিকল্পনার বাস্তব ছবি, যার আবির্ভাব আল্লাহর আজল থেকে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

ইসলাম বিরোধী মহল বলে থাকে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। আমি 'হায়াতে মুহাম্মদ' গ্রন্থে একথা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, কুরআনে কারীম আকস্মিক ও বর্বর যুদ্ধের নিন্দা করেছে। কোনো অবস্থাতেই তা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়নি। বস্তুত বলা হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط.

"(হে মু'মিনগণ !) আল্লাহর পথে জিহাদ করো। কিন্তু স্মরণ রাখবে তোমাদের পক্ষে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করার অনুমতি আছে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসে। অতর্কিত পৈশাচিক যুদ্ধ চালাবার অনুমতি তোমাদের জন্য নেই।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)

এভাবে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ .(البقرة : ١٩٤)

"যে জাতি তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তাদের উপর এতটুকু বাড়াবাড়ি করবে যতটুকু তারা তোমাদের উপর করেছে। আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, আল্লাহ আল্লাহভীরুদের সাথে আছেন।"

ইসলাম মানুষকে আপোষের আহ্বান জানায়। একে অপরের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার উপদেশ দেয়। শত্রুর সাথেও ভদ্র ব্যবহার করার হুকুম

www.pathagar.com

দেয়। ইসলাম স্বাধীন মতামতের পতাকাবাহী। ধর্ম ও ইবাদাতের মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ সে মোটেই সহ্য করে না। ইসলামের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে যে, এত উন্নত ও পবিত্র নীতিমালা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম কেন দিলেন এবং ইরাক ও সিরিয়ার বিজয়সমূহ কি উদ্দেশ্যে করেছেন ? আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম আহকামকে অন্তর দিয়ে মানা আবু বকর ফরয মনে করতেন। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করার সন্দেহ তাঁর উপর বিন্দুমাত্রও করা যায়নি। তাহলে একথার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, ইসলাম যদিও করুণা, ভালোবাসা, ক্ষমা, আপোষের আহ্বায়ক তারপরও সে মুসলমানদের উপর এমন শর্ত আরোপ করে না, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে জবরদস্তিকে কাজে লাগানো যাবে না। বরং তাদের অনুমতি দেয়, যেখানে দরকার হবে সেখানে এ উদ্দেশ্যে কঠোরতা ও শক্তিপ্রয়োগ করে কাজ করবে। আর এ কারণেই মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে ও শহরে আক্রমণ করেছে এবং সেখানকার বাসিন্দাদেরকে তরবারির জোরে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর হলো ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর হুকুম মুতাবেক যুদ্ধ করেছেন। সূরায়ে বারায়াতে (তাওবা) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ .(التوبة : ١١-١٢)

"কাফেররা যদি তাওবা করে নেয়, নামায আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই। তোমরা তাদের সাথে মুসলমানদের মত আচরণ করো। আমি আমার আয়াতসমূহ সচেতন জাতিসমূহের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। যদি তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর দীনের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করে তাহলে এ কাফের দলের সাথে লড়াই করো। কেননা তাদের কসম মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভবত এভাবে তারা বিদ্রোহ বিদ্রূপ থেকে বিরত থাকবে।"

তাই ধর্মত্যাগীরা যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সরাসরি মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো এবং দীন ইসলামের উপর বিভিন্ন অভিযোগ আনা শুরু করলো তখন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাদের সাথে যুদ্ধ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইরান ও রোমের দিকে মুসলিম বাহিনী রওনা করিয়ে দিলেন তখনও তিনি এক বিন্দুও আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাননি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা রাখার জন্য সর্বাবস্থায়ই

www.pathagar.com

যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রয়োজন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তরবারি দিয়ে জাতি-সমূহকে পদানত করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের উন্নত ও উচ্চাশা পূরা হবে না। আসল কথা হলো মানুষের মন-মস্তিষ্ক যেহেতু সে সব সময়ে শিশু স্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল সে জন্য সঠিক পথে আনতে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেছেন তাই করেছেন। কোথাও অত্যন্ত বিনম্রভাবে বুঝানো হয়েছে আবার কখনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মুসলমানরা যখন ইসলামের নীতিমালা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন, তারা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানব হৃদয় মানবতার উচ্চাশা ও দাবী পূর্ণভাবে পূরা হতে পারে না। এ দাবী আদায়ের জন্য এখানে হাজার হাজার বছর প্রয়োজন। ইসলাম যেহেতু মানুষের উপর তার শক্তির বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় না তা সে তাদের কল্যাণের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছে তা তাদের অবস্থা অনুযায়ী হয়েছে। এ পথে চললে মানুষ ধীরে ধীরে মঞ্জিলে মাকসুদের দিকে এগিয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টান্ত হলো ঐ পিতার মতো যিনি তার শিশুর প্রশিক্ষণের সময় তার শারীরিক গড়ন ও গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখে। শক্তির বাইরে কোনো বোঝা পিতা শিশুর উপর চাপায় না। তার উপর যুবক বয়সের ছেলের কাজকর্মের প্রত্যাশা পিতা করেন না। শিক্ষাদীক্ষায় একটা নিয়ম আছে যে পিতা তার বাচ্চার নির্দোষ আশা-আকাংখাকে সম্মান প্রদর্শন করে তা মেনে নেন। আবার তা অনিষ্টকর মনে হলে তাকে এর থেকে বিরতও রাখেন। এতে বাচ্চার অসন্তুষ্টির পরওয়া করেন না। এভাবে কখনো তিনি স্নেহ ও বাৎসল্যের সাথে সন্তানকে শিক্ষাদান করেন। আবার কখনো বাৎসল্য প্রশয় না দিয়ে শাস্তি দিতেও ইতস্তত করেন না। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সন্তানের কল্যাণই পিতার উদ্দেশ্য—আদর করা ও শাস্তি দেয়া সবই বাচ্চার সংশোধন ও কল্যাণের জন্য। ইসলামের অবস্থাও তা-ই। সে মানব মনকে ধীরে ধীরে মযবুতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলাম সর্বপ্রথম মাতাপিতার মতো মানুষের শিক্ষাদীক্ষার উপর জোর দেয়। এজন্য কখনো স্নেহের সুরে কাজ উদ্ধার করে আবার কখনো কঠোরতা অবলম্বন করে। কিন্তু সব অবস্থায়ই উদ্দেশ্য থাকে ধীরে ধীরে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটাই আসল উদ্দেশ্য কালামে পাকে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

মানব মন কোনো কোনো সময় অচল পাথরের মত হয়ে যায়। এর উন্নতি অগ্রগতি যেন একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। বস্তুত আমাদের যুগে মুসলমানদের অবনতি ঘটার কারণ হলো স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী মানব মন পাথরের মতো অচল হয়ে যাওয়া। কিন্তু এ অচল অবস্থা চিরদিনের জন্য হতে পারে না একদিন এমন আসবে যখন এ অবস্থা কেটে যাবে। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা আবার জেগে উঠবে। মানব মন ধীরে ধীরে মযবুতির শেষ সীমায় দিয়ে পৌছবে। হতে পারে এ অবস্থা শত শত বছর পরে সৃষ্টি হবে। কিন্তু হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ অবস্থা হবে ঐদিন, যেদিন মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত হবে এবং যে মানের দাবী ইসলাম করে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। মানব মনের পারস্পরিক পংকিলতা ও কলহ বিদূরিত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ অবস্থার সৃষ্টি তখনই হবে যখন এ বিশ্বের মানব গোষ্ঠী আকাশের বাণীর প্রতি কান উঠিয়ে শুনবে এবং আল্লাহর বাদশাহীকে কবুল করবে। কেননা মানব মন তখনই পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারে যখন পৃথিবীর আনাচে কানাচে আল্লাহর নূরের আলোকরশ্মি পৌঁছতে পারবে। এ পৃথিবীর এক অংশ যদি আসমানী নূরে উদ্ভাসিত হয় আর বাকী অংশ অন্ধকারে ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকে তখনই সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধ বিগ্রহের ধারা খতম হয় না এ অবস্থা দূরিভূত করার জন্য সকল যুগেই এমন ব্যক্তিত্বের জন্ম হতে থাকবে যারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানব মনকে সচেতন করার কাজ আঞ্জাম দিবে। যেভাবে মাতাপিতা ও শিক্ষক সকল সম্ভাব্য উপায়ে নিজেদের সন্তান ও ছাত্রের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়, এভাবে এরাও মানব জাতির শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

মানব হৃদয় পরিপূর্ণতায় পৌঁছার জন্য এখন পর্যন্ত যে উন্নতি সাধন করেছে তার মধ্যে বেশী কাজ করেছে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। ভবিষ্যতেও সে উন্নতির সব সিঁড়ি অতিক্রম করে যাবে যতক্ষণ ইসলামের পেশ করা শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়িয়ে থাকবে। ঐ সময় অবশ্যই আসবে এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি একথা বলছি না। বরং পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বস্তুত নিচে আমি বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাডশ'র একটি উদৃতি পেশ করছি। এ উদৃতি পড়লে আমার মতের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তিনি লিখেন ঃ

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের পেশ করা দীন বিশ্বের সকল দীনের উপর মর্যাদাশীল দীন। অন্যান্য দীনের উল্টো এ দীনে চিরদিন বেঁচে থাকার বিস্ময়কর শক্তি বিদ্যমান আছে। এর কারণ, যতটুকু আমি বুঝি, তাহলো, ইসলামই এমন ধর্ম যা নিজের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে এবং মানব গোষ্ঠীর সকল শ্রেণীকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে রাখার গুণাগুণ নিহিত আছে। আর এ জন্যই ইউরোপের লোকেরা আজকাল ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। মূর্খতা ও জাতীয়তার বিষবাষ্পের ভয়াবহ রূপ সহকারে ইসলাম মধ্যযুগে পেশ করা হয়েছিলো সাধারণ মানুষের কাছে। মানুষকে ধারণা দেয়া হয়েছিলো, ইসলাম ঈসা মসিহর সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবতার মুক্তিদাতা হিসাবে মনে করি। আমার বিশ্বাস, আজও যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের অনুরূপ কোনো ব্যক্তিত্ব ইসলামের একামাত ও খেদমতের দায়িত্বে আসে তাহলে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হয়ে

www.pathagar.com

যেতে পারে। আর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সৌভাগ্যের সয়লাব বয়ে যাবে। আজকের জগতে তাঁর বড়ই প্রয়োজন ছিলো।"

ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দিতে কারলায়েল ও গিবনের মতো জাদরেল চিন্তাবিদ বাস্তবতা ও ইনসাফের কষ্টিপাথরে ইসলামকে যাচাই বাছাই করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং দুনিয়াবাসীর কাছে পেশ করেছেন তার ফলেই ইউরোপবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের সুর সূচিত হতে শুরু করেছে। ইউরোপবাসী আজ বিচার বিবেচনার সাথে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছে। বর্তমানে বিংশ শতাব্দিতে ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের স্থান ইসলামের ভালোবাসা দখল করে নিয়েছে। অবস্থা এ হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে আগামী শতাব্দি পর্যন্ত ইসলাম পরিপূর্ণভাবে ইউরোপবাসীদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে ফেলবে এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে।

আমার নিজের জাতি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে ফেলেছে। এখন একথা সন্দেহমুক্ত মনে বলা যেতে পারে, গোটা ইউরোপে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।[১]

বার্নাডশ' ছাড়াও বিশ্বের আরো বড় বড় চিন্তাবিদ ইসলামের পুনর্জাগরণের ব্যাপারে এ একই ধারণা প্রকাশ করেছে। এর থেকে এ অনুমান করা কঠিন নয় যে, মানব মন ধীরে ধীরে স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর এটা ললাট লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজ হোক কি কাল হোক এ দুনিয়া বিপদ-মুসিবতের চক্কর থেকে উদ্ধার পেয়ে সত্যিকারে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে নেবে। এ অবস্থার নমুনা দৃষ্টিগোচার হচ্ছে। আজ পৃথিবীর দূরত্ব সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশ্বের জনগণের দেখা সাক্ষাত ও মেলামেশার পথ এখন যেভাবে সহজ হয়ে উঠেছে আগে কখনো এমন ছিলো না। ছাপাখানার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই-পত্র প্রকাশিত হচ্ছে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, মাযহাব মিল্লাত সম্বন্ধে বই-পুস্তক পাওয়া আজকাল দুষ্কর কাজ নয়। সংবাদপত্র যা মতবাদ, আদর্শ ও বিশ্ব প্রচারের সবচেয়ে বেশী কার্যকর উপায়, উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। রেডিও টিভি ও টেলিফোনের দ্বারা সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের খবর পলকের মধ্যে মানুষ পেয়ে যায়। এসব উপায়-উপকরণ ঐ ওয়াদাকৃত দিনটিকে কাছে আনার জন্য করা হচ্ছে। যখন গোটা জগতের ধর্ম একটাই হবে এবং দীনও হবে একটাই। যে বিশ্ব আজ যুদ্ধ-বিগ্রহের ডংকায় গুঞ্জরিত হচ্ছে সে বিশ্ব আগামীকাল শান্তি নিরাপত্তায় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হবে। যেখানে আজ সংকীর্ণ জাতীয়তা ও জাহেলিয়াতের ঘুংগুর বাজছে সেখানে ইসলামের সূর্য উদিত হয়ে সবরকমের অন্ধকার দূর করে দিবে।

এ শুভ্র প্রভাত কখন প্রকাশিত হবে, সৌভাগ্য সূর্য কখন উদিত হবে এটাই প্রশ্ন? যদিও আমাদের বাহ্যদৃষ্টিতে এ সময় এখনো অনেক দূরে। তারপরও আল্লাহর রহমত

১. বানার্ডশ'র বাণী–নূরে ইসলাম ৪র্থ সংস্করণ গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে, পৃষ্ঠা-৫৭২, ১৩৫২।

www.pathagar.com

থেকে তা বেশী দূরে নয়, এ দিন আমাদের খুব কাছে এসে যাবে। এ দিন মানুষ উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে যাবে। আদর্শ ও ইনসাফ, করুণা ও ভালোবাসা ও নেক কাজ ও তাকওয়া দ্বারা বিশ্ব ভরে যাবে। প্রতিটি মানুষ তার ভাইয়ের শুভ কামনা করবে। প্রতিটি জাতি অপর জাতির সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করবে। হিংসা-বিদ্বেষ চিরতরে বিলুপ্ত হবে। কোনো জাতি অন্য জাতির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে না এবং উন্নতি অগ্রগতির ব্যাপারে ছোট বড় সকল জাতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা যাবে।

এ যুগের মানুষ যখন অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করবে তখন দেখতে পাবে সে ইতিহাস যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-যজ্ঞ, কাটা-কাটি, রক্তপাত, নির্দয়তা-নিষ্ঠুরতা, ধোকা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচার ও যুলুম-নিপীড়নের এক দীর্ঘ ধারা। তারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মানব জাতির ঐ কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে যা ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য আপ্রাম দিতে গিয়ে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আদল ও ইনসাফ, করুণা ও দয়ার সব দাবীকে উপেক্ষা করে নির্মম নিষ্ঠুরতা ও যুলুম, নাইনসাফীকে নিজের পরিচয় বানিয়ে নিয়েছে। নিজের পিতৃ পুরুষের এসব কালো অধ্যায় অবলোকন করে তাদের হৃদয়ে অবচেতনভাবে তাদের উপর ঘৃণা ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে চাইবে। কিন্তু হঠাৎ করে তাদের দৃষ্টিপাত ঘটবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সংক্ষিপ্ত অথচ অপরিসীম দেদীপ্যমান শাসনকালের উপর। তারা হতবাক হয়ে বলে উঠবে ঃ

> "আল্লাহর হাজার হাজার রহমত ও বরকত রচিত হোক ঐ পূত-পবিত্র মানুষটির উপর যিনি তার গোটা জীবনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে ও ইসলাম প্রচারের কাজে নিমগ্ন রেখেছেন। তিনি দুর্বল ছিলেন কিন্তু দীনের পথে তিনি দৃষ্টান্তহীন অবিচল মনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গরীব ছিলেন অথচ আল্লাহর রাহে তিনি তাঁর এক একটি পয়সা দান করে দিয়েছেন। তাঁর ইপ্সিত চলার পথে পাহাড়সম বাধা ছিলো ঠিক, তাতে তাঁর অটল পা একটুও কেঁপে উঠেনি। ইসলামের তরীকে তিনি ভয়াবহ ঝড় ও ভীতিপ্রদ ময়দান দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিরাপদে অতিক্রম করে নিয়ে যান।"

ভবিষ্যতের কোনো বংশধররা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অমর কীর্তি ও অবদানকে ভুলতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর সালাম পাঠানোর লোকের জন্ম হতে থাকবে। আমরাও তাঁর পবিত্র আত্মার উপর হাজার হাজার সালাম পাঠাতে পাঠাতে তার পবিত্র জীবন চরিত লেখা শেষ করছি। আল্লাহর দরবারে তার জন্য দোয়া করি, তিনি আবার আমাদের মধ্যে সিদ্দীকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহু, ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহ আনহু, খালিদ সাইফুল্লাহর মতো শত্রু সারি বিদীর্ণকারী, দৃঢ়চেতা, পাহাড়ের মত অটল, সুস্থির মেজাযের মানুষের জন্ম দেন, আজকের জগতে ইসলামের তরীকে বয়ে নেবার জন্য যাদের বড়ই প্রয়োজন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

বিক্রয় কেন্দ্রঃ

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

আদর্শ পুস্তক বিপণী
১০, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com